ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে বাংলা সাময়িকপত্রে বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতিচর্চা

সুমিত কুমার বড়ুয়া

গবেষক

বাংলা বিভাগ, ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০১৭

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে বাংলা সাময়িকপত্রে বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতিচর্চা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পি. এইচ. ডি. উপাধিপ্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

সুমিত কুমার বড়ুয়া

গবেষক

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

অধ্যাপক স্যমন্তক দাস

তত্ত্বাবধায়ক

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

বাংলা বিভাগ

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০১৭

Certified that the Thesis entitled

‘ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে বাংলা সাময়িকপত্রে বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতিচর্চা’ submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor Samantak Das, Department of Comparative Literature, Jadavpur University, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor

Dated:

Candidate

Dated:

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
	মুখবন্ধ	1 – 2
	ভূমিকা	3 – 25
প্রথম অধ্যায়	পাশ্চাত্যে ও বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতিচর্চা	26 – 77
	টীকা ও উৎস নির্দেশ	78 – 84
দ্বিতীয় অধ্যায়	নির্বাচিত বাংলা সাময়িকপত্রে বুদ্ধদেব, বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি আলোচনার প্রস্থানভূমি	85 – 106
	টীকা ও উৎস নির্দেশ	106 – 107
তৃতীয় অধ্যায়	বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন	108 – 184
	টীকা ও উৎস নির্দেশ	185 – 195
চতুর্থ অধ্যায়	বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য	196 – 256
	টীকা ও উৎস নির্দেশ	257 – 264

পঞ্চম অধ্যায়	বুদ্ধচরিত সাহিত্য	265 – 307
	টীকা ও উৎস নির্দেশ	308 – 313
ষষ্ঠ অধ্যায়	শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও নন্দনতত্ত্ব	314 – 353
	টীকা ও উৎস নির্দেশ	354 – 361
সপ্তম অধ্যায়	প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত ও 'বৌদ্ধযুগ'	362 – 408
	টীকা ও উৎস নির্দেশ	409 – 413
	উপসংহার	414 – 419
	কয়েকটি নির্বাচিত চিত্র-পরিচিতি	420 – 436
	গ্রন্থপঞ্জী	437 – 463

মুখবন্ধ

যখন গবেষণা কর্ম শুরু করি, তখন আমার বিষয় ছিল শরৎ সাহিত্য। কিন্তু, বাংলায় বৌদ্ধ-বিষয়ক কাজ কর্ম করার সুপ্ত বাসনা মনে ছিল। আমাকে এই কাজে উৎসাহিত করেন সেন্টার ফর সোশাল সায়েন্সের প্রাক্তন অধ্যাপক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত, অধ্যাপক স্যমন্তক দাস ও অধ্যাপক সুজিতকুমার মণ্ডল আর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল কাফি। আমার গবেষণা কাজের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক স্যমন্তক দাস আমায় গবেষণা করার অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন, কোথাও নিজের মত চাপিয়ে দেননি যা বাস্তবিকই একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতার বিষয়। আমার উপর যে তিনি আস্থা রেখেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ ও অভিভূত।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব বাংলা বিভাগীয় প্রধান গোপা দত্ত ভৌমিক, অধ্যাপক শম্পা চৌধুরী, বর্তমান বিভাগীয় প্রধান শেখর সমাদ্দার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের অধ্যাপক সৌমিত্র বসুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমার বিষয় পরিবর্তন অনুমোদন করে কাজে উৎসাহিত করেছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করবার সুযোগ না পেলে আমার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হওয়া কোনভাবেই সম্ভব হোত না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যাপক ঐশ্বর্য বিশ্বাস নিষ্ঠা সহকারে বৌদ্ধবিদ্যার নানা বিষয়ে আমায় অবহিত করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল, অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা, অধ্যাপক অনন্যা বড়ুয়া; তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক কবিতা পাঞ্জাবি, অধ্যাপক পার্থসারথী ভৌমিক, অধ্যাপক সায়ন্তন দাশগুপ্ত, অধ্যাপক দেবশ্রী দত্তরায়; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যাপক বেলা ভট্টাচার্য; বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়; ইংরাজি বিভাগের অধ্যাপক হিমাদ্রি লাহিড়ী নিয়মিতভাবেই কাজের খোঁজ খবর নিয়ে আমায় উৎসাহিত করেছেন।

আমার গবেষণা পত্র দেখে যাঁরা খুশি হতেন আমার তিনজন লোকান্তরিত শুভৈষী; বাবা অনিলকুমার বড়ুয়া, ভন্তেকাকা ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার প্রাক্তন সেক্রেটারী ড. প্রজ্ঞানন্দশ্রী মহাস্থবির আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক দীপান্বিতা ঘোষ।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্দো-টিবেটান বিভাগের কিংবদন্তী অধ্যাপক ও বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সভাপতি সুনীতিকুমার পাঠক অকাতরে আমায় বিদ্যাদান করেছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে প্রভূত সমৃদ্ধ হয়েছি। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সহ সভাপতি নীরদবরণ বড়ুয়া ও পঙ্কজকুমার দত্ত আমায় নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সম্পাদক হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী সার্বিক অর্থেই আমার

কল্যাণমিত্র। কেবল বইপত্র দিয়েই নয়, ওঁর সঙ্গে পড়াশোনা সংক্রান্ত আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। নানাভাবে উৎসাহ জুগিয়েছেন জয়ন্তবোধি ভিক্ষু, বিনয়শ্রী মহাস্থবির, ড. ভিক্ষু বোধিপাল। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার অন্যান্যদের কাছেও আমি নানাভাবে উপকৃত হয়েছি।

সেন্টার ফর সোশ্যাল সায়েন্স, কলকাতার হিতেশরঞ্জন সান্যালের সাময়িক পত্রের সংগ্রহ আমায় প্রভূত সাহায্য করেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জাতীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচারের গ্রন্থাগার, ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড মিশনের (আসাম) গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বিভাগের গ্রন্থাগারিক সুশান্ত বড়ুয়া, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের গ্রন্থাগারিক নিতাইচন্দ্র মণ্ডল ও সুদীপ, বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগারিক আইভি আদক ও হরিশ মণ্ডল বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন। বাংলা বিভাগের গবেষক অনিন্দ্যবন্ধু গুহ, গবেষণা বিভাগের সহকর্মী পুরঞ্জিত বড়ুয়া নিজগুণেই আমার কাজে সহযোগিতা করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক আদিত্য চট্টোপাধ্যায় আর জাপানের ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির গবেষিকা মৃদুছন্দা চট্টোপাধ্যায় নানাভাবে আমার কাজে সঙ্গ দিয়ে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের অতিথি অধ্যাপক সুমনপাল ভিক্ষু সামগ্রিকভাবে আমার কল্যাণমিত্রের ভূমিকা পালন করেছেন। আমায় বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার যদি কিছু কৃতিত্ব থাকে, তবে তা তাঁর উপর বর্তাবে।

আমার এই গবেষণাকর্মের দিনগুলোয় আমার মা সবিতা বড়ুয়া আমার পাশে পাশে ছিলেন। আমার গবেষণার কাজ নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন বড়দাদা আসিতকুমার বড়ুয়া আর বড়দিদি নম্রতা বড়ুয়া। উৎসাহ দিয়েছেন আমিতকুমার আর সুজিতকুমার বড়ুয়া। গবেষণা কাজে নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন মাতৃসমা সুনন্দা দাস।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষের কাছে যা শিখেছি তাই আমার চির জীবনের পাথেয়।

আমার সকল শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ভূমিকা

বাংলায় পাল রাজবংশের শাসনাবসানের (পলপালের রাজ্যাবসান আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টাব্দ)[১] সঙ্গে সঙ্গেই কার্যত বৌদ্ধধর্মের অবসান ঘটেছিল। অতীত ভারতের সামগ্রিক ঐক্য ও সংহতির প্রতীক বৌদ্ধধর্ম ছিল প্রকৃত অর্থেই জাতির চালিকাশক্তি। কিন্তু এই বৌদ্ধধর্ম একসময় তার মূল জন্মস্থান ও কর্মস্থান থেকে অবসিত হয়েছিল, এই সত্যকে স্মরণ করে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন –

> অর্ধশতাব্দী পূর্বে বুদ্ধ কে, তাঁর ধর্মমত কি, বৌদ্ধ সঙ্ঘই বা কি এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের মধ্যে কোটিতে একজনও দিতে পারতেন না; কারন বৌদ্ধধর্মের এই স্মৃতি পর্যন্ত এদেশের মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ‘বৌদ্ধ’ এই শব্দটি অবশ্য আমাদের ভাষায় ছিল, এবং বৌদ্ধ অর্থে আমরা বুঝতুম – একটি পাষণ্ড ধর্মমত; কিন্তু পাষণ্ডী মতটি যে কি, সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনরূপ ধারণা ছিল না।[২]

বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মে যজ্ঞাদি আচার অনুষ্ঠান সর্বস্বতা ও অন্যদিকে দার্শনিক তত্ত্বের প্রাধান্যের সঙ্গে মানব সম্পর্ক ও প্রেম করুণা প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি বিকাশের প্রতি এই ধর্মের লক্ষ্য অপেক্ষাকৃত কম। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মে নিছক আচার অনুষ্ঠান সর্বস্বতার উপরে মানব সম্পর্ক ও হৃদয়বৃত্তির বিকাশের প্রসঙ্গ গুরুত্বময়। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেই জ্ঞানের মর্যাদা স্বীকৃত হলেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের জ্ঞান মূলত: তত্ত্বমুখী, অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের জ্ঞান মূলতঃ প্রেমমুখী। ব্রাহ্মণ্য আদর্শ থেকে বৌদ্ধ আদর্শই আধুনিক কাল ও আধুনিক মনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হওয়ার কারণেই ঊনবিংশ শতকের নবজাগ্রত মনন এই ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হয়েছিল। এই পুনরুজ্জীবনের ধারায় প্রাচীন ভারতের নানা যুগের আদর্শের যেন নতুন প্রাণসঞ্চার ঘটেছিল। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও শ্রদ্ধানন্দ বৈদিক যুগের আদর্শ; রাজা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ; আনাগরিক ধর্মপাল ও কৃপাশরণ মহাস্থবির বৌদ্ধ জীবনাদর্শ; রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ শঙ্করাচার্যের তথা ভারতবর্ষের পৌরাণিক আদর্শ; বঙ্কিমচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণানন্দ বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন রূপ ও শাখার আদর্শ; অরবিন্দ যোগসাধনা তথা নবভাগবত ধর্মের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, সঙ্গে ছিল অনেক গৌণ আন্দোলন।[৩]

অতীত ও বর্তমানের ভারতীয় চিন্তাধারার অবিচ্ছিন্ন গতি বা একৈকানুভূতি – ভারতবর্ষের অন্যতম ঐতিহ্য। নিজের অতীত ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ঔৎসুক্য ও অনুসন্ধান থেকে বর্তমানের কর্মোদ্যম ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা সঞ্চারের প্রেরণালাভই আধুনিক যুগের মৌলিক লক্ষণ। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এটিই রেনেসাঁস বা ‘আত্মবোধের পুনরুজ্জীবন’। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মূলকথা হল চিত্তের মুক্তিসাধন বা

স্বাধীন বুদ্ধির উদ্‌বোধন। খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতকে ইতালিতে এই বাণী প্রথম উদ্‌ঘোষিত হয়ে তা কালক্রমে সমগ্র ইউরোপে নানারূপে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রাচীন গ্রিক ও রোমক সভ্যতার পুনরুদ্বোধন। বিস্মিত শ্রদ্ধা, মুক্তবুদ্ধি ও অনাবিল দৃষ্টিতে প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরালোচনার ফলে মানুষের জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে তৎকালীন ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। সববিষয়ে কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে অতিপ্রাকৃতের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে মানব জীবনকে সর্বপ্রকারে বিকশিত করা এর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।[৪]

রেনেসাঁসের সবকিছুই মানবকেন্দ্রিক; একটা নতুন বিদ্যা, ভাব, আইডিয়া, প্রকাশভঙ্গী, জীবনযাপনের ধারার সন্ধানও গুরুত্বময়। ব্যষ্টি ও সমষ্টির ক্ষেত্রে ইহলোক ও ইহকালে পরিপূর্ণ জীবনই আদর্শ, এই জীবনের মধ্যে দেহ-মন-হৃদয়-বিবেকের অংশ রয়েছে। রেনেসাঁস অতীতের প্রেরণায় নিত্য নতুন করে জানতে চায়, এইক্ষেত্রে পুনর্বিচার আবশ্যক হয়ে পড়ায় খানিকটা ধারাভঙ্গ ঘটে থাকে। পুনর্মূল্যায়ন, পুনরারম্ভও এর মর্মীভূত। সমাজের অগ্রসর অংশ ঐতিহ্যের নিষ্ঠ হয়ে তার উপর স্বাধীন বিবেক ও মুক্তবুদ্ধির প্রয়োগ করে। অহেতুক বর্জন বা সংরক্ষণ না করে ধীরে জনমতের গতি অগ্রমুখী হয়ে ইতিহাসের অভিপ্রায়কে সিদ্ধ করে। প্রাচীন দেশের ইতিহাসের এই পট পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন নবীয়মান হয়ে ওঠে। রেনেসাঁসের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনায় শিবনারায়ণ রায় নানামুখী বিষয়ের উপর গুরুত্ব দান করেছেন –

> রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে মানুষ তার প্রাতিস্বকতাও আস্তিত্বিক স্বাধীনতার প্রমাণ দেয়। ঐতিহ্য-নিয়ন্ত্রিত নয়, পরমুখাপেক্ষী নয়, স্বনির্ভর ও বিবর্ধনমুখী ব্যক্তিত্বের সাধনাই রেনেসাঁসের প্রাণ, স্বাধীন ব্যক্তিও অবশ্যই অতীত থেকে এবং ওপর থেকে গ্রহণ করেন; কিন্তু বহু সূত্র থেকে উপকরণ নিয়ে যা কিছুরই তিনি নির্মাতা তার বিশিষ্টতার ভিতরে একান্তভাবেই তিনি নিজস্ব ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এই সাধনা ও স্বাক্ষর নানাভাবে প্রকাশিত – তাঁর জীবনচর্যায়, নব নব রূপের কল্পনায় ও বহিরায়নে, অন্তর ও বহির্জগতের বিষয়ে অদম্য প্রশ্নশীলতায়, মূল্যাবলী ও নৈতিক নির্ণায়কের বিচারে ও সংস্কারে, নতুন নতুন সাধনী ও প্রযুক্তি-প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনে, ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সমাজ-সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কাদির বিরচনে।[৫]

ঊনবিংশ শতকে বাংলার রেনেসাঁস ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে ধারাবাহিকতার সূত্রে না এসে ইউরোপের ইতিহাস থেকে এসেছিল। তা সূচনা পর্বে অর্থনৈতিক, পরে রাজনৈতিক ও শেষে সাংস্কৃতিক অর্থে ঘটে আধুনিক যুগে উত্তরণে সহায়তা করেছিল। বাংলার রেফরমেশন অর্থাৎ ধর্মসংস্কার তথা

সমাজসংস্কার রেনেসাঁসেরই সমকালীন, যদিও স্বতন্ত্র; আবার এনলাইটেনমেন্ট সমকালীন হলেও স্বতন্ত্র নয়। বাংলার রেনেসাঁস ইউরোপের চার শতাব্দীর বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ও বিমিশ্র অনুবর্তন হলেও অনুকরণ নয়, তা গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে ঘটেছিল। অন্নদাশঙ্কর রায় বাংলার রেনেসাঁসকে তিনভাগে করেছেন – (ক) প্রথম পর্ব – আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে জ্ঞানবুদ্ধি মিলিয়ে; (খ) দ্বিতীয় পর্ব – প্রাচীন ভারতের সঙ্গে চেতনা মিলিয়ে ও (গ) তৃতীয় পর্ব – অভূতপূর্ব গণজাগরণের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে। প্রথম পর্ব এখনো অব্যাহত, দ্বিতীয়টিও। তৃতীয়ের সূত্রপাতের পাশাপাশি প্রবাহমাণ তিনটি স্রোতের সংযোগের সঙ্গে সংঘর্ষের গতি ও প্রতিক্রিয়াও অব্যাহত।[৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' প্রবন্ধে (*পরিচয়,* শ্রাবণ, ১৩৪০) লিখেছেন, রেনেসাঁসের বাহকরূপে নব্য ইউরোপের চিত্তপ্রতীক ইংরেজ-সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে বাঙালি জাতির জড় ও স্থাবর মনেও জঙ্গমতার চাঞ্চল্য দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় –

> য়ুরোপের চিত্তদূত রূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর-কোনো বিদেশী জাত কোন দিন এমন করে আসতে পারেনি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, ... সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।

আধুনিক ভারত জাগৃতিতে বাংলার ভূমিকার সঙ্গে ইউরোপীয় রেনেসাঁসে ইতালির অবদান তুলনীয়। বাংলার রেনেসাঁস সম্পর্কে অধ্যাপক সুশোভন সরকার মন্তব্য করেছেন –

> The impact of British rule, bourgeois economy and modern Western culture was felt first in Bengal and produced an awakening known usually as the Bengal Renaissance. For about a century, Bengal's conscious awareness of the changing modern world was more developed than and ahead of that of the rest of India.[৭]

ইউরোপের সঙ্গে ভারতীয় রেনেসাঁসের মধ্যে মৌল প্রভেদ রয়েছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁস প্রাচীন গ্রিস ও রোমের সঙ্গে ছিন্ন যোগসূত্র পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল। অন্যদিকে বাংলার রেনেসাঁসে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন না হওয়ায় পুনরুদ্ধারের প্রসঙ্গই ওঠে না।

হিউম্যানিজমকে রেনেসাঁসের একটি বিশেষ লক্ষণ বা অবদান হিসাবে ধরা হয়। 'হিউম্যানিস্ট' শব্দ আর 'মানববাদী' একসঙ্গে ব্যবহার করলেও দুটোর স্বরূপ এক নয়। সহজিয়া সাধনার মতবাদ 'সবার উপর মানুষ সত্য' এটা হিউম্যানিস্ট ভাবনা নয়। পি. ও. ক্রিস্টেলার হিউম্যানেজিমের তিনটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ ধারা দেখেছেন যা পঠনপাঠন-গবেষণা, শিক্ষা ও লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। অমলেশ ত্রিপাঠী

স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির বিবর্তনে ঐতিহ্যের সাহায্যে আধুনিকীকরণ একটা মুখ্য প্রবণতা ছিল। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে পশ্চিমী আধুনিকতার পূর্ণ বিকাশ লাভ সম্ভব নয়, একথা অচেতন হলেও, রামমোহন প্রমুখ মনীষীরা জানতেন। কিন্তু তাই বলে তাঁরা নিষ্ক্রিয় না থেকে সীমিত শক্তিতে, সীমিত ক্ষেত্রে, ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাপূর্ণ উপাদানগুলিতে আধুনিকীকরণের কাজে লাগিয়েছেন। ইতালির ধাঁচের নয়, এটাই ছিল তাঁদের রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য। যাকে আবার 'elitist আন্দোলন'ও বলা চলে।[৮]

ঊনবিংশ শতকের প্রকৃতির মতোই বাঙালির রেনেসাঁসের প্রকৃতিও জটিল। রেনেসাঁস পশ্চিম ইউরোপ থেকে এসেছিল আর প্রাচীন ভারত থেকে এসেছিল রিভাইভাল, এইগুলি প্রায় সমসাময়িক হলেও সমধর্মা নয়। প্রথম দিকে রেনেসাঁস প্রবলতর হলেও পরবর্তীকালে রিভাইভাল প্রবলতর হয়েছিল। স্বাজাত্যবোধ ও দেশাত্মবোধের বিপরীতে বুদ্ধিজীবীরা তাকে বিদেশী ধনতন্ত্র আর স্বদেশী বুর্জোয়াচক্রের ভাববিলাসিতা, মিথ্যা রেনেসাঁস বলে মনে করেছেন। ব্রিটিশ শাসকরা বাংলার পুরাতন সমাজব্যবস্থা, অনেককিছু পরিবর্তন করলেও বর্ণবৈষম্যের ভিত্তিতে আঘাত না করে প্রধানত নিরাপদ নিশ্চিন্ত শাসন-শোষণের উদ্দেশ্যে আইনশৃঙ্খলা ও সামাজিক স্থিতিকে যেকোন উপায়ে বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁরা সামাজিক মূল অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বা সামাজিক অঙ্গবিন্যাসে সামাজিক স্থিতির স্বার্থে কোন সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটাতে চান নি। আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের অভ্যুদয়ে সামাজিক সচলতা ও পরিবর্তন সূচিত হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে নির্বিঘ্নে শোষণ-শাসনের সুবিধা হত না।

ঊনবিংশ শতকের সমাজসংস্কারদের সৎ প্রচেষ্টা এবং সংস্কার আন্দোলন কখনো কখনো বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করলেও, শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশের সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন – জাতিভেদ প্রথা, ধর্ম সম্প্রদায়-বৈষম্য্য ইত্যাদির পরিবর্তন হয়নি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ইয়ংবেঙ্গল, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ সংস্কারকদের প্রগতিশীল সংস্কার-আদর্শ যে খুব সফল হয়েছিল তা বলা যায় না। বাংলার নবজাগরণ দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগহীন মূলত নগরকেন্দ্রিক পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে শিক্ষিত মুষ্টিমেয় এলিটের মননজাত আন্দোলন। ইংরেজের আমলে ইউরোপীয় বিদ্যাশিক্ষার আলোকে দেখতে ও বিচার করতে শেখা বাঙালি ভেবেছিলেন যে এদেশেও ইউরোপের মত রেনেসাঁসের হাওয়া বইছে। এই

ভুলে ভরা ভাবনা ও সাদৃশ্যবোধ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন যে বাংলায় 'নবজাগরণ হয়নি', 'বাংলার তথা ভারতের নবজাগৃতি' 'একটি অতিকথা (myth)' ছাড়া আর কিছুই নয়।[৯]

বাংলা তথা ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রস্তাবের মধ্যে সীমাবদ্ধতা ও স্ববিরোধ থাকলেও এই তত্ত্বকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না, যার সঙ্গে রিভাইভালের ভাবনাও সমাপতিত হয়েছিল। রেনেসাঁসের দৃষ্টি সামনে, অনন্ত ভবিষ্যতে প্রসারিত; অন্যদিকে রিভাইভালের দৃষ্টি অতীতমুখী, তাকে অতিক্রমণের স্বাধীনতা হারিয়ে তাকেই অভ্রান্ত বলে ভাবে। বৈদিক সংস্কৃতির ধারা ভারতের একমাত্র ধারা নয়, বৌদ্ধধারা লুপ্ত বা ভারতবর্ষের বাইরে প্রসারিত হয়েছে। তবে বাংলার রেনেসাঁস বৌদ্ধ উত্তরাধিকার সম্পর্কে অব্যক্ত বা উদাসীন একথা বলা চলে। বাংলা তথা ভারতীয় রেনেসাঁস প্রাচীন ভারতের সঙ্গেও যে একপ্রকার ধারাবাহিকতা ফিরে পেয়েছিল। মৌর্য সম্রাট অশোক, কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক, মহাকবি অশ্বঘোষ প্রমুখের জীবন ও ব্যাপ্ত কর্মকাণ্ড, বৌদ্ধ জাতক, অনবদ্য চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য অবহেলিত অজ্ঞাত অবস্থায় পড়েছিল। ভারতীয় রেনেসাঁসের আলোচনায় বৌদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান বাদ দিয়ে কেবল ব্রাহ্মণ্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে অবলম্বন করতে গেলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই ভারতবর্ষকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হলে বহির্বিশ্বে রক্ষিত বৌদ্ধ উত্তরাধিকারের দিকেও আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে।[১০]

দীননাথ সান্যাল 'রামমোহন রায়' (*মানসী ও মর্ম্মবানী*, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনেরও অনেক আগে রামমোহন রায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে পরিচিত হবার তাগিদে তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধবিদ্যাচর্চা করেছিলেন। আবেগচালিত বাঙালির সকল ভাবনার মধ্যেই ধর্মভাবনা কোন না কোনভাবে যুক্ত থাকে। উনবিংশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালি ধর্মান্দোলনে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের সংস্কারমুখী কার্যকলাপের প্রেরণা হিসাবে বৌদ্ধধর্মের উদার আদর্শ কাজ করেছিল।

ঊনবিংশ শতকের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও অনুশীলনের পিছনে রেনেসাঁসের উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন পুথির উদ্ধার, তার পরিগ্রহণ, যথাযথ অনুবাদ এবং সম্পাদনা এর আবশ্যিক দিক বলে বিবেচিত হয়। পাশ্চাত্য মনীষীদের অনুকরণ করেই বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ব্রায়ান হটন হজসন (১৮০০ – ১৮৯৪), আলেকজাণ্ডার চোমা দ্য কোরশ (১৭৮৪ – ১৮৪২), ইউজিন বুনুর্ফ (১৮০০ – ১৮৫২) প্রমুখের প্রাচীন পুথি উদ্ধার, তার পাঠগ্রহণ,

সঠিক অনুবাদ এবং সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য গবেষকদের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির বহু অজানা তথ্য জানা যায়। প্রাচীন পুথির উদ্ধার, পাঠগ্রহণ, যথাযথ অনুবাদ এবং সম্পাদনায় ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে পথিকৃৎ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শরচ্চন্দ্র দাস, হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরী। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মনীষারা সকলেই কোন না কোনভাবে বৌদ্ধবিদ্যা চর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

প্রমথ চৌধুরী বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার সূচনা পর্বের ইতিহাসের অতিসংহত রূপরেখা দিয়েছেন – পালিগ্রন্থগুলি আবিষ্কারের কিছুকাল পরে নেপালে কতগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থের সন্ধান পাওয়ার পর সেগুলি আলোচনা করে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্তে আসেন যে সিংহলী বৌদ্ধধর্ম ও নেপালী বৌদ্ধধর্ম ভিন্ন এবং বহুকাল আগে বৌদ্ধধর্ম যে দু-ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল তাঁর প্রমান এই দুটি ধারায় রয়েছে। সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে প্রচলিত বৌদ্ধমত 'হীনযান' আর নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া ও মঙ্গোলিয়াতে প্রচলিত বৌদ্ধমত 'মহাযান' নামে পরিচিত। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এই দুটি ভিন্ন মতের নাম দিয়েছেন – Northern School (উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম) ও Southern School (দক্ষিণী বৌদ্ধধর্ম)। একদল ইউরোপীয় পণ্ডিতরা হীনযানকে মূল বৌদ্ধমত ও মহাযানকে তাঁর অপভ্রংশ বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করলে আরেকদল তার বিরুদ্ধে মতপ্রচার করেছিলেন। উদীচ্য বা মহাযানী ও দক্ষিণী বা থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের এই পণ্ডিতি তর্কের থেকে ইতিহাসের আরও গভীরে গিয়ে সমালোচকেরা 'আদি মত'-এর সিধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে হীনযান ও মহাযানের ভিতর বৌদ্ধধর্মের একই মূলতত্ত্ব লভ্য এবং অন্যান্য বিষয়েও উভয় মতের সাদৃশ্য রয়েছে। এইরকম অনুমানসাধ্য যে একই আদি মত থেকে দুটি ভিন্ন শাখা আত্মপ্রকাশ করেছিল।[১১]

জন্মভূমি ভারতবর্ষ থেকে যখন বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন ভারতবর্ষের পূর্বসীমায় চট্টগ্রাম-আরাকান অঞ্চলে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বৌদ্ধধর্ম তাঁর অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছিল। স্বয়ং বুদ্ধদেব বাংলায় এসেছিলেন এবং তাঁর সময়েই এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল এমন জনশ্রুতিও বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে জনপ্রিয়। *ত্রিপিটক* গ্রন্থে 'বঙ্গীশ' (বঙ্গদেশে জাত) নামে একজন বৌদ্ধশ্রাবকের উল্লেখ রয়েছে। তৎকালীন বাংলায় (অধুনা বাংলাদেশে) বুদ্ধের স্মৃতিপূত স্থানে সম্রাট অশোক নির্মিত

চৈত্য, স্তূপ ও স্তম্ভের বহু নিদর্শন রয়েছে, যেমন – ঢাকার ধামরাই অঞ্চলে ধামরাই বা ধর্মরাজিক স্তম্ভ। কিংবদন্তী অনুযায়ী বুদ্ধদেব বগুড়ার মহাস্থানগড়, রাজশাহীর পাহাড়পুর, চট্টলের পণ্ডিতবিহার, চক্রশালা ও রামকোট, বর্মার ইরাবতী নদীর তীরবর্তী সেগাইন ও পেগান অঞ্চলে ঋদ্ধিবলে অবতরণ ও অবস্থান করেছিলেন। সম্রাট অশোকের সময়ে মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্যের নেতৃত্ব তৃতীয় মহাসংগীতির সিধান্ত অনুযায়ী যে সকল ভিক্ষুরা সমতটে এসেছিলেন বাংলার স্থবিররা তাঁদের উত্তরসূরী ছিলেন।[১২]

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইরেংজরা আনুষ্ঠানিকভাবে সমগ্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি পেয়ে দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করেন। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসন কায়েম না হওয়ায় খ্রিস্টধর্মের প্রচারের তেমন সুযোগ ছিল না। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর মীর মহম্মদ কাসেম খাঁ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের সর্বাধিকারিত্ব প্রদান করেন। এরই সঙ্গে চাক্‌মা রাজ্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম) ইংরেজদের অধীনস্ত হয়। সর্বপ্রথম ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে ‘লণ্ডন ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি’ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচারকার্য শুরু করেও ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত তেমন সুবিধা করতে পারেননি। শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬ – ১৫৩৩) বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে নতুন ভাবান্দোলন গড়ে তোলেন। পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যধর্মের গতিও ছিল অপ্রতিহত। বৈষ্ণবদের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীয়মাণ বৌদ্ধরাও কাজে-কর্মে ব্রাহ্মণ্য ধারা ও আদর্শ অনুসরণ করে নিজেরাই তাতে হারিয়ে গিয়েছিলেন।[১৩] এই প্রসঙ্গে বেণীমাধব বড়ুয়ার উক্তি প্রণিধানযোগ্য –

> ... অতীতের ... সর্বত্রই একটি মানবগৃহধর্মের ধারা রহিয়াছে এবং এই ধারার সহিত বিরোধ ও রফারফি করার ফলেই ব্রাহ্মণ্য, আজীবিক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতির উচ্চতর ধর্মের যুগে যুগে অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ... এ সকল উচ্চতর ধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যের ন্যায় আর কোনও ধর্ম মানবগৃহ্যধর্মকে আত্মস্থ করিতে পারে নাই, অপর কোন ধর্ম নিজের সঙ্কীনর্তা ও উদারতা, দর্শন ও কুসংস্কার, বিধি ও ব্যবস্থা, সত্য, শিব ও সৌন্দর্য দিয়া একটি পূর্ণায়তন হিন্দুধর্ম গঠন করিতে পারে নাই।[১৪]

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসমাজের অবস্থা শোচনীয় ছিল। তৎকালীন বৌদ্ধভিক্ষুরা *বিনয়পিটক*-এর নিয়মকানুন না জেনে বিনয়বিরুদ্ধ কাজ করতেন। যেমন – রাতে ভাত ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য পানীয় গ্রহণ করতেন, পরিধেয় বস্ত্র চীবর বিনয়-নিয়মানুসারে তৈরি হত না, উপসম্পদার নীতি মানতেন না, ভিক্ষুরা মাত্র দশশীল নীতি মানতেন এবং তাতেও গলদ ছিল। তাঁরা ভিক্ষুদের অবশ্য করণীয় ‘উপোসথ’ ‘পবারণা’ ইত্যাদি বিনয়কর্ম সম্পাদন করতেন না। চট্টগ্রাম এবং

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি ও চাকমা বৌদ্ধরা পৌরাণিক ও লৌকিক হিন্দুধর্মের বিশ্বাস ও লোকাচার পালন করতেন। হিন্দু-মুসলিম মিশ্রদেবতাদের প্রতি বিশ্বাস ছিল। মগধেশ্বরী নামক পরবর্তী তান্ত্রিক বৌদ্ধদেবীর পূজাও বৌদ্ধসমাজে বিশেষ প্রচলিত হওয়ায় তাঁর উদ্দেশে মাংসভোগ দেওয়া হত। তৎকালীন বৌদ্ধ পুরোহিত 'রাউলী'রা মহাযানী পুরোহিতদের মতো সংসারধর্ম করতেন। ভিক্ষুত্ব লাভের পর মাত্র সাতদিন তাঁরা দশশীল পালন করতেন। এঁদের তিনটি শ্রেণি ছিল – মাথের, কামে ও পাঞ্জাং। সম্ভবত পালি 'মহাথের' শব্দ থেকে 'মাথের' শব্দের উৎপত্তি হয়েছিল। চট্টগ্রামে 'পুংগ্রী' শ্রেণির বৌদ্ধ পুরোহিত থাকলেও কোন ধর্মগ্রন্থ ছিল না বলা চলে। বুদ্ধ-ধর্ম-সজ্ঘ – এই ত্রিরত্নের পূজা ও বন্দনায়, তিথি-শ্রাদ্ধাদি, বিবাহাদি সামাজিক কাজে বৌদ্ধরা পালি ও আরাকানী, পালি-সংস্কৃত মিশ্রিত মন্ত্র ব্যবহার করতেন। আমরা দুটি মন্ত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধার করছি –

ক) উং নাম্ম ভুদানুস্রেদি। (ওং নমো বুদ্ধানুস্‌সতি।)

উং নাম্ম ধর্ম্মানুস্রেদি। (ওং নমো ধম্মানুস্‌সতি।)

উং নাম্ম চাংকানুস্রেদি। (ওং নমো সংজ্ঘানুস্‌সতি।)

চাপাইংধারে উংনাচানংধু। (সব্বন্তরায়ে বিনাসমেন্তু।)

অর্থাৎ, বুদ্ধ, ধর্ম এবং সজ্ঘের অনুস্মৃতিকে নমস্কার। সকল প্রকার অন্তরায় বিনাশপ্রাপ্ত হোক।

খ) নামাতাস্‌সা ভাগাবাতো আরাহাতো সাম্মাসাম্বুদ্ধস্‌সা। (নমো তস্‌স ভগবোতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধসস।)

অর্থাৎ, সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার।

বাঙালি বৌদ্ধরা তাদের শাস্ত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। মূল শাস্ত্রের বিকৃত অবশেষ মাত্র তাঁরা ব্যবহার করতেন। আরাকনী ও মহাযানী বৌদ্ধদের প্রভাবে তাঁরা বুদ্ধকে 'ফরা' ধর্মকে 'তারা' এবং সজ্ঘকে 'চাংকা' বলতেন। তাঁদের মধ্যে মন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল। শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী বৌদ্ধধর্ম বাংলায় সব হারিয়ে তন্ত্র-মন্ত্র-বৈষ্ণব-আগম-সহজিয়া-আউল-বাউল-নাথের মধ্যে প্রায় বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন।[১৫]

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মরাজ বগিড্‌ ও ব্রিটিশপক্ষের মধ্যে 'য়্যাণ্ডবো সন্ধি' স্থাপিত হওয়ার ফলে আরাকান ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাংলা সরকারের অধীনস্থ হয়েছিল। অনেকটা স্থিতাবস্থার ফলে আরাকান আচার্য সারালঙ্কার মহাথের ও তাঁর শিষ্য সারমেধ মহাথেরের নেতৃত্বে এক আদর্শ বৌদ্ধ-রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। সারমেধ মহাথের চট্টগ্রাম ও আরাকানে সর্বত্র পর্যটন ও ধর্মপ্রচার করতেন। ব্রিটিশশাসনে আকিয়াব সমগ্র আরাকানের প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। আমদানী-রপ্তানীর

প্রধান কেন্দ্র আকিয়াবের প্রতিপত্তিশালী নাগরিকবৃন্দ, সরকারী কর্মচারী এবং বণিকদলের সহায়তায় স্থানীয় ভিক্ষুসংঘের চতুপ্রর্ত্যয় ও গ্রন্থাদি অনায়াসলব্ধ হয়েছিল। সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার ও বিনয়াকুল আচরণের জন্য আচার্য সারমেধের যশ ও প্রতিপত্তি দূর-দূরান্তরের বৃটিশ সাম্র্যাজ্যের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। আরাকানের প্রাচীন রাজন্যবর্গ সদ্ধর্মের উন্নতি ও দেশে শান্তিপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহাথেরদের নানা সম্মানজনক উপাধিতে বিভূষিত করতেন। মহারানি ভিক্টোরিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল সম্প্রদায়কে নিজ নিজ ধর্মপালনের সমানাধিকার দিয়েছিলেন। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্নিমায় রাজার প্রতি প্রজাপুঞ্জের আনুগত্য বৃদ্ধির জন্য আরাকানের জেলা জজ উঃ ফা-তা ঠোয়ে সারমেধকে এক বিরাট অনুষ্ঠানে রাজকীয় উপাধিসমন্বিত সীলমোহর 'সারমেধালঙ্কারাভিতিসাসনধর মহাধম্মরাজাধিরাজগুরু' প্রদান করা হয়েছিল। এই সময় তান্ত্রিক-রাউলী সম্প্রদায় বড়ুয়া ও চাক্‌মা সমাজের চট্টগ্রামী বৌদ্ধদের ধর্মগুরু থাকায় তাঁদের উপর সারমেধের তেমন প্রভাব ছিল না।[১৬]

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বৈদ্যপাড়ার রাধু মাথের (রাধাচরণ মহাস্থবির) ও সংঘরাজ সারমেধ কলকাতা থেকে বুদ্ধগয়ায় যাবার সময় উভয়ের দেখা ও আলোচনা হয়েছিল। তীর্থভ্রমণের পর সংঘরাজ রাধুমাথের সঙ্গে বৈদ্যপাড়া, পাহাড়তলির সীতাকুণ্ড থেকে চক্রশালা হয়ে মহামুনিমেলায় উপনীত হয়েছিলেন। মহামুনি বাংলার চাক্‌মা, বড়ুয়া, মান, বোমাং প্রভৃতি সকলশ্রেণির বৌদ্ধদের মিলনতীর্থ। সারমেধ চট্টগ্রামের বৌদ্ধভিক্ষু ও গৃহী উপাসকদের শোচনীয় দুরবস্থা দেখে সদ্ধর্মের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে একটি সামন্তরাজ্য রূপে চাক্‌মা রাজ্যের রানি কালিন্দীর সঙ্গে সংঘরাজ সারমেধ এবং হারবাঙের গুণামেজু ভিক্ষু দেখা করে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেন। রানি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগের পর থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সারমেধকে 'সংঘরাজ বিনয়ধর' উপাধিতে ভূষিত করেন। সংঘরাজের প্রভাবে গৃহীরা থেরবাদ মতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।[১৭]

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের ঊনাইনপুরায় সতের বছরের যুবক চন্দ্রমোহনকে (১৮৩৭ – ১৯১৪) উপসম্পদা[১৮] বা ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত করার পর কলকাতায় এসে বাঙালি বৌদ্ধদের প্রতিষ্ঠিত মহানগর বিহারে অবস্থান ও বিদ্যানুশীলন করেন। তিনি ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধধর্মে সুপণ্ডিত শ্রীলঙ্কার মি. পলের সঙ্গে কলকাতায় বৌদ্ধধর্ম ও পালি শিখেছিলেন। *ভিক্ষু পাতিমোক্ষ* সম্পর্কে সচেতন হয়ে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা থেকে আকিয়াবে গিয়ে সংঘরাজ সারমেধের কাছে থেরবাদী বিনয়ানুসারে ভিক্ষুধর্মে

পুনর্দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি ভিক্ষুত্ব ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়ে পুনরায় গৃহী হয়েছিলেন। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে মান্দালয়ে চন্দ্রমোহন, শ্রীলঙ্কার অম্বগহবত্তে সরণংকর প্রমুখ ভিক্ষু পৌঁছে ব্রহ্মদেশের প্রধান ভিক্ষুসংঘের প্রধান সংঘরাজের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। ছিয়াত্তর জন মহাস্থবিরের উপস্থিতে বিপুল সমারোহে চন্দ্রমোহন ও তাঁর সঙ্গীদের উপসম্পদা দেওয়া হয়েছিল। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে 'পুণ্ণাচার ধম্মধারী' উপাধিতে ভূষিত চন্দ্রমোহন এবং সরণংকর ইন্দাসভ-বরঞাণ শ্রীলঙ্কায় গিয়ে 'রামঞঞ-নিকায়' নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।[১৯]

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে সংঘরাজ সারমেধ ও কয়েকজন বিনয়ধর দক্ষ ভিক্ষু চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে চট্টগ্রামে এলে পাহাড়তলির মহামুনি মেলায় সাতজন রাউলী পুরোহিত সংঘরাজের কাছে থেরবাদধর্মে পুনর্দীক্ষিত হয়েছিলেন। ধর্মাধার মহাস্থবির এই অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়েছেন –

> বিনয় সমন্ধে আলোচনার পর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইল যে, চট্টগ্রামের "বড়ুয়া রাউলীরা" পুনরায় উপসম্পদা গ্রহন করিয়া দেশে থেরবাদের অনুগামী প্রকৃত ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠা করিবেন। যথাসময়ে উপসম্পদার আয়োজন হইল, মহামুনির পূর্বপাশের 'হাঞ্চার ঘোণা'-র এক পার্বত্য ছড়ায় সংঘরাজের স্বীয় ভাষায় "নদী সীমায়" শ্রদ্ধেয় জ্ঞানালঙ্কার [লালমোহন ভিক্ষু] প্রমুখ সাতজন মহাযানী পুরোহিত সর্বপ্রথম নূতনভাবে থেরবাদসম্মত উপসম্পদা গ্রহন করিলেন। এইবার শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ এক বৎসর চট্টগ্রামে অবস্থান করিয়া ভিক্ষুদিগকে ধর্ম-বিনয় শিক্ষা দিলেন। ইতিমধ্যে আরো অনেক মাথে সশিষ্যে তাঁহার নিকট উপসম্পন্ন হইলেন। এতদিনে মহাযানের তান্ত্রিক পুরোহিতদিগের মধ্যে প্রকৃত উপসম্পদা প্রতিষ্ঠিত হইল। নব উপসম্পন্ন ভিক্ষু-সংঘের নাম হইল – 'সংঘরাজ নিকায়'। কিন্তু কতিপয় প্রাচীনপন্থী মাথে ... কল্পিত মর্যাদা হানির ভয়ে সংঘরাজের নিকট উপসম্পদা গ্রহনের পূর্বাসিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া পৃথক রহিয়া গেলেন। তাঁহারা হইলেন – 'মাথের দল'-এর ভিক্ষু।[২০]

নব-দীক্ষিতেরা সংঘরাজ নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত হলে বাংলাদেশে তান্ত্রিক সহজিয়াদের মধ্যে যথার্থ থেরবাদধর্ম ও সংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে বৌদ্ধেধর্মের পুনরুজ্জীবনের যুগ সূচিত হয়েছিল। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের বৌদ্ধসংঘ প্রধান দুটি বিরোধী সম্প্রদায় সংঘরাজ ও মাথের দলে বিভক্ত হয়েছিল।[২১] ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে কৃপাশরণ মহাস্থবিরের উদ্যোগে এই বিরোধী সম্প্রদায়ের মিলনপ্রচেষ্টা অনেকদূর সফল হলেও শেষরক্ষা হয়নি।

কৃপাশরণ মহাস্থবির (১৮৬৫ – ১৯২৬) ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি পুনরুত্থানের নায়ক (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪৩০)। তিনি সুধনচন্দ্র মহাস্থবিরের কাছে প্রব্রজা ও থেরবাদী বিনয়ানুসারে আচার্য পুণ্ণাচার মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা লাভ করেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে আচার্য পুণ্ণাচারের সঙ্গে যখন বুদ্ধগয়া যান তখন সম্রাট অশোক নির্মিত বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরকে চিহ্নিত করে পূজা করেন এবং গোরক্ষপুর জেলার কুশীনগরে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ স্থান আবিষ্কারের সময় উপস্থিত থেকে এই আবিষ্কারবার্তা বৌদ্ধজগতে প্রচার করেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কৃপাশরণ কলকাতার বউবাজারে মহানগর বিহারে অবস্থান করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত অনাদপিণ্ডদের তৈরি জেতবন বিহার আবিষ্কার করেন।[২২]

কৃপাশরণ ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য হিমাচল প্রদেশের সিমলা (১৯০৭), উত্তরপ্রদেশের লখনউ (১৯০৭), আসামের ডিব্রুগড় (১৯০৮), বর্তমান ঝাড়খণ্ডের রাঁচী (১৯১৫), মেঘালয়ের শিলং (১৯০৮), পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং (১৯১৯), ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে (১৯২২) ধর্মাঙ্কুরের শাখা বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতায় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ধর্মাঙ্কুর বিহার প্রতিষ্ঠা করে এখানে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ‘বুদ্ধধাতু’[২৩] এবং ‘ভিক্ষুসীমা’[২৪] প্রতিষ্ঠা করে ধর্মপ্রচারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

কৃপাশরণ বিদ্যাশিক্ষার প্রসারের জন্য বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভায় গুণালঙ্কার লাইব্রেরি (১৯০৯) ও বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য ‘কৃপাশারন ফ্রি কণ্টিনেণ্টাল ইন্সটিটিউট’ (১৯১২) প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধ ছাত্রদের জন্য হোস্টেল (১৯১২) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। তৎকালীন চাহিদা অনুসারে স্বল্পশিক্ষিত নারীরা যাতে স্বনির্ভর হতে পারে, তাঁর জন্য সীবনশিল্প সহ ঘরে বসেই করা যায় এমন শিক্ষার কথা ভেবে ধর্মাঙ্কুরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয়ে দু’জন শিক্ষিকা নিয়োগ করেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেন। শিলক গ্রামে একটি স্কুল স্থাপন ও রাঙামাটি বালিকা বিদ্যালয়, রাঙামাটি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, নাইখাইন পালি বিদ্যালয় ও ঢাকাখালি বিদ্যালয়ে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছিলেন, মহামুনি অ্যাংলো পালি ইনস্টিটিউশন, কর্তালা বেলখাইন মহাবোধি স্কুল, সাতবাড়িয়া বালিকা বিদ্যালয়, এম. এ. রাহাত আলী স্কুল, পাঁচরিয়া মধ্য ইংরেজি স্কুল, আর্য মৈত্রেয় স্কুল, মংখেজারী উচ্চবিদ্যালয় প্রভৃতি বিদ্যাপীঠের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রাপ্তিতে কৃপাশরণের ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় কৃপাশরণের উদ্যোগে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পালি বিভাগ খোলা হয়েছিল। কৃপাশরণ অনক্ষর বয়স্ক ও শ্রমজীবীদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান আর শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে ধর্মাঙ্কুরে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে 'মহিলা সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠা করেন।[২৫]

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কৃপাশরণের পৃষ্ঠপোষকতার শিষ্য গুণালঙ্কার মহাস্থবির (১৮৭৪ – ১৯১৬) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি অধ্যাপক সমন পুণ্ণানন্দ স্বামীর (১৮৭৮ – ১৯২৮) সম্পাদনায় *জগজ্জ্যোতি* পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত *জগজ্জ্যোতি* প্রকাশনার ধারাবাহিকতায় মাঝে মাঝে ছন্দপতন ঘটেছে। প্রথম পর্যায় (১৯০৮ – ১৯২১), দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৫০ – ১৯৫৯), তৃতীয় পর্যায় (১৯৭০ – ১৯৭৭) এবং চতুর্থ পর্যায় (১৯৮০ থেকে অব্যাহত)। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চায় *জগজ্জ্যোতি* পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। কৃপাশরণ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে 'আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন'-এর আয়োজন করে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিবিধ সমস্যা ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা করেন। সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন বার্মার তৎকালীন সংঘনায়ক অগ্রমহাপণ্ডিত উ. জটিলা ছেয়াদ। এই ঐতিহাসিক সম্মেলন ভারতে বিশেষ করে বাংলার বৌদ্ধদের মধ্যে নবরূপে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনতে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিল।

কৃপাশরণ মহাস্থবিরের গুণমুগ্ধদের মধ্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সারদাচরণ মিত্র, হরিনাথ দে, চারুচন্দ্র বসু, নরেন্দ্রনাথ সেন, বিপিনবিহারী সান্যাল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব, বগুড়ার নবাব আবদুস সোবহান চৌধুরী, লর্ড রোনাল্ডসে, লর্ড কারমাইকেল, স্যার হরকোর্ট বাটলার প্রমুখ বৌদ্ধ সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে বিশেষ অবদান রেখেছেন। কৃপাশরণের সহযোগী কর্মীরূপে ভিক্ষু মহাবীর, ধর্মানন্দ কোসাম্বী, গুনালঙ্কার মহাস্থবির, সমন পুণ্ণানন্দ স্বামী, ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির, ভিক্ষু কালীকুমার, ভিক্ষু আনন্দ স্বামী, বোধানন্দ মহাস্থবির, বেণীমাধব বড়ুয়া, মহারাজ মহাজন, মং খেজারী প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।[২৯] আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুরূপে কৃপাশরণের ব্যাক্তিত্বকেই স্বীকৃতি দিয়ে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে লিখেছেন –

> What I have learnt from the books on Buddhism is very high, very noble and very generous. Once there was a feeling of hatred between the Hindus and the Buddhists but

that time has passed; the attitude of the people is rather different in this day of reawakening. If text books be written for the students in the light of the Buddhist idealism, it would do good. Everybody should accept Buddhist idealism. Buddhism is a generous religion. It is good if everybody obeys the rules and conducts of Buddhist Literature – in the very root of it stand Kripasaran Mahathera's intimacy with me. It is due to his association alone I was attracted to Buddhism and Buddhist Literature.[২৬]

প্রজ্ঞাবান কৃপাশরণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও কয়েকটি পত্র ছাড়া লিখিত কিছু পাওয়া যায় নি বা সংরক্ষিতও হয় নি। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তের আশ্চর্য সরল অনুভববেদ্য গদ্য আংশিক উদ্ধারযোগ্য –

"জেতবন বিহার" শ্রবণ করিয়াই প্রাণে একটা কি যে পুলক প্রবাহ ছুটিয়া যায়, আনন্দাশ্রু পতিত হয়, সুদূর অতীতের আড়াই হাজার বৎসরের সেই পূত কাহিনী হৃদয় মধ্যে উদয় হইয়া প্রাণ ব্যাকুল করিয়া তুলে। জেতবন বিহারে উপনীত হইয়া যে কি একটা ভাব আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল তাহা ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব। ভাবিলাম এই জেতবন বিহারে দেব নর শাস্তা তথাগত বুদ্ধ শিষ্য প্রশিষ্যগণ সহ বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। এখানে তিনি কত শোক-সন্তপ্ত ব্যক্তির হৃদয়ে যে শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়াছেন, কত শিষ্য প্রশিষ্য যে তাঁহার বদন হইতে নির্গত অমৃতময় মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়েছেন তাহার সংখ্যা কোথায়? আর মনে পড়িল সেই জগত বিখ্যাত দাতা ভগভ্ভক্ত মহর্ষি অনাথপিণ্ডিককে, যাঁহার দান গ্রহণ, যাঁহার নিকট পিণ্ডপাত করিয়া ভগবান প্রীতিলাভ করিতেন।[২৭]

সুনীতিকুমার পাঠক কৃপাশরণের সামগ্রিক জীবন ও চর্যার নিরিখে তাঁকে 'বোধিসত্ত্ব' আখ্যায়িত করেছেন –

ব্রহ্মবিহার বলতে মৈত্রী করুণা, মুদিতা উপেক্ষা। কৃপাশরণ মহাস্থবির কেবল ব্রহ্মবিহারে বিরাজামান ছিলেন তাই নয় বোধিসত্ত্ব চর্যার ধর্মমেঘ ভূমিতে বিহার করেছিলেন। তিনি বহুজনের হিত ও বহুজনের সুখের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। সদ্ধর্মের মঙ্গলবারি বর্ষণ করেছিলেন।[২৮]

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতাকেন্দ্রিক নবজাগরণের ফলে বাঙালি অতীত সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। এই সচেতনতা ভারতবাসীর ক্ষেত্রেও সংক্রমিত হয়, বৌদ্ধ পুনর্জাগরনের উদ্দেশ্যে কৃপাশরণ যেমন কলকাতাকে কর্মকেন্দ্র নির্বাচন করেছিলেন, তেমনি সিংহলী বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা আনাগারিক ধর্মপাল তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র হিসাবে কলকাতাকেই আশ্রয় করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চায় কৃপাশরণ এবং অনাগারিক ধর্মপালের কর্মসাধনা পরস্পরের পরিপূরক।[২৯] আনাগারিক ধর্মপাল[৩০] (১৮৬৪ – ১৯৩৩) ভারতবর্ষ তথা বিশ্বে বৌদ্ধ পুনর্জাগরণের অগ্রদূত। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ – ১৯০২) ছিলেন হিন্দু প্রতিনিধি এবং

অনগারিক ধর্মপাল ছিলেন থেরবাদী বৌদ্ধ প্রতিনিধি (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪৩০)। ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপাল শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে ‘The world's debt to Buddha’ শীর্ষক মহামূল্যবান বক্তৃতার জন্য তিনি বিশ্ববাসীর কাছে ধন্যবাদার্হ।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে একদিকে ঔপনিবেশিক শাসন এবং অন্যদিকে নানা গোষ্ঠীর খ্রিস্টান মিশনারীদের আক্রমণে বিপর্যস্ত সিংহলি বৌদ্ধদের খ্রিস্টান নাম রাখা বাধ্যতামূলক ছিল। পরে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে থিয়োসফিস্ট নেতা কর্নেল হেনরি স্টিল অলকটের চেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার এই নিয়ম বন্ধ হয়েছিল। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে অনাগারিক ধর্মপালের প্রথম জীবন ও পূর্বাশ্রমের নাম ‘ডন ডেভিড হেবাবিতরনে’ নাম ত্যাগ করে রেখেছিলেন ‘ধর্মপাল’। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা অলকট সাহেব ও মাদাম ব্লাভাটস্কি প্রাথমিক পর্বে ধর্মপালকে অনুপ্রাণিত করেছেন। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে অলকট এবং ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে অলকট ও ব্লাভাটস্কির সঙ্গে সিংহল ভ্রমণের সময় সিংহলের মানুষদের অবক্ষয়, হতদরিদ্র চেহারা ও পরিকাঠামো দেখে ব্যথিত ধর্মপাল ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে সিংহল তিনশ বছরের ঔপনিবেশিক হীনমন্যতাকে অপসারিত করে এক নতুন আত্মবিশ্বাসী জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থেকেও স্বাজাত্যবোধে দীপ্ত ধর্মপাল সমস্ত রকমের পরাধীনতা থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন। তাঁর দেশ-হিতৈষণার কার্যকলাপের জন্য ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে সিংহলের ব্রিটিশ সরকারের প্ররোচনায় কলকাতায় পাঁচ বছর অন্তরীণ করে রাখা হলেও তাঁর কর্মকাণ্ডকে কোনভাবেই দমিয়ে রাখা সম্ভবপর হয়নি।[৩] তিনি শ্রীলঙ্কা ও ভারতের বৌদ্ধধর্ম ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের পুরোধা রূপে শ্রদ্ধার্হ।

ধর্মপাল ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজের অ্যাডেয়ার থিয়োসফিকাল সোসাইটির সম্মেলন থেকে জাপানী বৌদ্ধসন্ন্যাসী কোজেনের সঙ্গে বৌদ্ধতীর্থ বুদ্ধগয়া ও সারনাথ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেইসব স্থানে বোধিবৃক্ষের ও মন্দিরের দৈন্যদশা, স্থানীয় মানুষজনের কাছে বুদ্ধ বিস্মৃত, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অপাংক্তেয়, মন্দির শৈব মোহান্তদের অধীনে হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বানিয়েছেন ইত্যাদি নানা সমস্যা। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীকে বুদ্ধ সম্পর্কে সচেতন করে তথাগতের মহিমা প্রচার করবেন। ধর্মপালের ভূমিকা বৌদ্ধধর্ম-দর্শন-আদর্শ প্রচারে সীমাবদ্ধ ছিল বা তিনি বুদ্ধদেবের স্মৃতিবিজরিত স্থানগুলি রক্ষা করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন শুধুমাত্র তা নয়, সাধারণ

বৌদ্ধধর্মালম্বী জনগন তাঁর উদ্দীপ্ত কর্মকাণ্ডে মনে সাহস ও শক্তি পেয়েছিল – এই অর্থে তিনি সাংস্কৃতিক অগ্রদূত। বৌদ্ধধর্মাদর্শের পুনরুজ্জীবনের জন্য দৃঢ়সংকল্প নিয়ে ধর্মপাল ভারত থেকে ব্রহ্মদেশ হয়ে সিংহলে প্রত্যাবর্তন করে কলম্বোতে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে 'বুদ্ধগয়া মহাবোধি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। সভাপতি ছিলেন সুমঙ্গল মহাস্থবির এবং সম্পাদক ধর্মপাল স্বয়ং। এরপর বুদ্ধগয়ায় গিয়ে বুদ্ধমূর্তি ও মন্দির সংক্রান্তি কাজকর্মের পরে তৎকালীন ভারতের রাজধানী, বাঙালিদের সাংস্কৃতিক ভূমি কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটির মূলকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কলকাতায় অ্যালবার্ট হলে *ইণ্ডিয়ান মিরর*-এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে ধর্মপালের প্রথম কলকাতায় বক্তৃতা বাঙালিদের মনকে স্পর্শ করেছিল। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে তিনি বৌবাজারে 'ভারতীয় মহাবোধি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার মাসেই বুদ্ধগয়াতে 'আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন'-এর আয়োজন করেন।[৩২]

ধর্মপাল ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে *The Maha Bodhi* পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৩৩] তিনি পালি ভাষাশিক্ষার অসীম গুরুত্বের কথা ভেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে পালিকে বিশেষ করে এফ. এ, বি. এ ও এম. এ পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মহাবোধি সোসাইটিতেও পালিভাষার শিক্ষা চালু হয়েছিল। সোসাইটির মূলকেন্দ্র বৌবাজার থেকে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ক্রীক রোডে এবং সেখান থেকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কলেজ স্কোয়ারে স্থানান্তরিত হয়ে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে রেজিস্ট্রিকৃত সংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এর সভাপতি ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদক ধর্মপাল। ধর্মপাল ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে এখানেই ধর্মরাজিক চৈত্যবিহার স্থাপন করেন।[৩৪] এই চৈত্যবিহারে বুদ্ধদেবের পূতাস্থি স্থাপন উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বুদ্ধবরণ' কবিতাটি আংশিক উদ্ধারযোগ্য –

> বঙ্গে এল বুদ্ধ-বিভা, কিন্তু সে নাই বেঁচে,
>
> নগর পুণ্ড্রবর্ধনও নেই – স্বপ্ন হয়ে গেছে!
>
> নেই বালিকা উপাসিকা, আমরা তারি হ'য়ে
>
> বরণ করি বুদ্ধবিভা চিত্ত-প্রদীপ লয়ে;
>
> চৈত্য দিয়ে যত্নে ঘিরি বুদ্ধ-বিভূতিরে।
>
> নিরঞ্জনা-তীরের স্মৃতি ভাগীরথীর তীরে।[৩৫]

ধর্মপালের উদ্যোগে এবং মহাবোধি সোসাইটির পরিচালনায় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে কলকাতায় প্রথম বৈশাখী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপাল আমেরিকাতেও বৈশাখী উৎসবের আয়োজন করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই ধর্মপাল সারনাথে মূলগন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রব্রজ্যার পর তিনি 'দেবমিত্ত ধর্মপাল' নামে পরিচিত হয়েছেন।[৩৬]

বৌদ্ধধর্ম প্রচারক বাগ্মী, সুলেখক ও তাত্ত্বিক ধর্মপালের বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে *The World's Debt to Buddha* [Anagarika Dhanrmapala's address in World Parliament of Religion held in Chicago in 1893] *Buddhism in its Relationship with Hinduism* (1918), *The Arya Dharma of Sakyamuni Gautama Buddha* (1917), *The Life and Teachings of Buddha* (4th Edition 1938) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা *The World's Debt to Buddha* থেকে তাঁর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অংশ উদ্ধার করেছি –

> In the religion of Buddha is found a comprehensive system of ethics, and a transcendental metaphysics embracing a sublime psychology. To the simpleminded it offers a code of morality, to the earnest student a system of pure thought. But the basic doctrine is the self-purification of man. Spiritual progress is impossible for him who does not lead a life of purity and compassion.[৩৭]

ধর্মপালের গুণে মুগ্ধ হয়ে কলকাতার বাঙালি বুদ্ধিজীবী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাজে আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের বাণী ও মহিমাকে বিশ্বের অঙ্গনে তুলে ধরবার ক্ষেত্রে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ বাংলায় নতুন করে বৌদ্ধবিদ্যাচর্চা সূচিত হয়েছিল।

ঔপনিষদিক ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার ফলে আত্মজিজ্ঞাসা এসেছে একথা স্বীকার্য, কিন্তু পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রেক্ষাপটে কৃপাশরণ ও ধর্মপালের কৃতিত্বের বিচার করতে হবে। রেনেসাঁসের অঙ্গরূপেই বহু সফল সিসৃক্ষু, জিজ্ঞাসু, মহোদ্যোগী, প্রতিভাবান ব্যক্তি রেনেসাঁসের সঙ্গে সঙ্গেই রিফর্মেশনেও ব্রতী ছিলেন। বিশেষত ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতি একান্তভাবেই ধর্মলগ্ন, বাংলা তথা ভারতে নবজাগরণের পথিকৃৎ রামমোহন রায়ের ক্ষেত্রেও এটি যেমন প্রাসঙ্গিক, তেমনি কৃপাশরণ ও অনাগারিক ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৌদ্ধসমাজে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার জন্য বৌদ্ধ তরুণদের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। পালিভাষা শেখা ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে জানার আগ্রহের সঙ্গে নিজেদের লব্ধ জ্ঞান সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেবার জন্য তাঁরা সাময়িকপত্র প্রকাশ শুরু করেন। ঊনবিংশ শতক থেকে অনেকগুলি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হলেও অধিকাংশই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। প্রকাশিত অনেক সাময়িকপত্রের তথ্য সংগৃহীত হয় নি বা সেগুলিকে সংরক্ষণ করার প্রয়াসও দেখা যায় নি।

সাতবেড়িয়াবাসী নাজির কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীর (১৮৪৪ – ১৯১০) পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালি বৌদ্ধদের সর্বপ্রথম প্রকাশিত পত্রিকা *বৌদ্ধবন্ধু* প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির (১৮৮৭) মুখপত্র *বৌদ্ধবন্ধু* কালীকিংকর মুৎসুদ্দি বিদ্যাবিনোদের সম্পাদনায় বাংলা ও ইংরেজিতে পরপর সংস্করণ বের হয়ে কয়েকবছর পরে বন্ধ হয়ে যায়। বেণীমাধব বড়ুয়া থেকে সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ বিশেষজ্ঞেরা প্রত্যেকেই একে বৌদ্ধদের প্রথম পত্রিকা হিসাবে চিহ্নিত করলেও কেউই এর প্রথম প্রকাশকাল সম্পর্কে জানাতে পারেন নি। সাময়িকপত্রটি অনেক অনুসন্ধানের পরেও আমরা পাই নি, সম্ভবত এটি লুপ্ত হয়েছে। শুধু এই ক্ষেত্রেই নয়, সূচনাপর্বের অধিকাংশ বৌদ্ধ সাময়িকপত্র সম্পর্কে এই কথা প্রযোজ্য। আমাদের অনুমান ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি প্রতিষ্ঠার দুই এক বছরের মধ্যেই এটি মুখপত্র রূপে প্রাকাশিত হয়েছিল।[৩৮] বিপিনচন্দ্র বড়ুয়ার সম্পাদনায় *বৌদ্ধ-পত্রিকা* (১৯০৬) প্রকাশের পরে এটি সর্বানন্দ বড়ুয়ার সম্পাদনায় দুই বছর প্রকাশিত হয়েছিল। সর্বানন্দ বড়ুয়ার *বৌদ্ধ-পত্রিকা*-র প্রত্যুত্তরে *বৌদ্ধ-বন্ধু* পত্রিকা সতীশচন্দ্র বড়ুয়ার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। আবার বৌদ্ধ ও ভারত-সংস্কৃতি বিষয়ক *জগজ্জ্যোতি* (১৯০৮) পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে *বৌদ্ধবন্ধু* (১৯১৫) সমন পুণ্ণানন্দ স্বামীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে কিছুদিন পরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। করলানিবাসী নগেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও বৈদ্যপাড়ানিবাসী নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরীর সম্পাদনায় *বৌদ্ধবাণী* (সময়কাল অজ্ঞাত), আবুরখিলবাসী নির্মলচন্দ্র বড়ুয়ার সম্পাদনায় *উদয়* (সময়কাল অজ্ঞাত) ও রায়বাহাদুর ধীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও গজেন্দ্রলাল চৌধুরীর সম্পাদনায় *সম্বোধি* (১৯২৪) প্রকাশিত হয়েছিল।

রেঙ্গুন থেকে নগেন্দ্রলাল বড়ুয়ার সম্পাদনায় *তরুণ বৌদ্ধ*-এর (১৯২৬) মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রেস থেকে আর্যবংশ ভিক্ষু, জ্যোতিঃপাল ভিক্ষু ও শীলালঙ্কার স্থবিরের

সম্পাদনায় *সঙ্ঘশক্তি* (১৯২৮) সাময়িকপত্রের সঙ্গে সঙ্গে বহু পালিগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ও বাংলা অক্ষরে বহু পালি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে বাঙালি বৌদ্ধসমাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করেছিল। বেণীমাধব বড়ুয়া ও নেপালবাসী ধর্মাদিত্য ধর্মাচার্যের সম্পাদনায় রেঙ্গুন প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে *বুদ্ধিস্ট ইণ্ডিয়া* (১৯৩৪) প্রকাশিত হয়েছিল।

কলকাতা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ মুৎসুদ্দির সম্পাদনায় বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতির মুখপত্র *জাগরণী* (১৯৩৯) ও তার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে জয়দ্রথ চৌধুরী ও প্রফুল্লকুমার বড়ুয়ার সম্পাদনায় *বৌদ্ধবন্ধু* (১৯৩৯) পুনর্জীবন লাভ করে এক বছরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। বাগিশবন্ধু মুৎসুদ্দি, জ্ঞানতিলক শ্রমন ও অরবিন্দ বড়ুয়ার সম্পাদনায় *বিশ্ববৌদ্ধ* (১৯৫৪); মহাবোধি সোসাইটির বাংলাভাষার মুখপত্র বনবিহারী গোস্বামীর সম্পাদনায় *নিরঞ্জনা* (১৯৫৬) প্রকাশিত হয়। নালন্দা বিদ্যাভবনের মুখপত্র ধর্মাধার মহাস্থবিরের সম্পাদনায় *নালন্দা* (১৯৬৬) প্রকাশিত হওয়ার পরে নানা সম্পাদকের হাতবদলের পর তা এখনো প্রকাশিত হয়ে চলেছে। কলকাতাবাসী বাঙালি বৌদ্ধ ছাত্র-যুবকদের প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র সুধাংশুবিমল বড়ুয়ার সম্পাদিত *বোধিভারতী*-এর (১৯৫৩) প্রকাশিত হয় যা এখনও সচল রয়েছে।

বাঙালির বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার প্রেক্ষাপট রচনায় বিদেশী পণ্ডিতদের অবদান অনস্বীকার্য। বৌদ্ধবিদ্যা চর্চায় তাঁদের গবেষণাকর্মের গতিপ্রকৃতি ও অবদান জানা খুব জরুরি। সেইসঙ্গে বাংলার পণ্ডিতদের গবেষণা কর্মের গতিপ্রকৃতি ও অবদান সম্পর্কে আমরা জানব। এই রূপরেখা আমাদের গবেষণার অভিমুখের দিক নির্দেশে সহায়ক হবে। বৌদ্ধবিদ্যায় বাঙালির মনন চর্চার দৃষ্টান্ত কাব্য ও কবিতা, নাটক, কথাসাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য আলোচনায় বিধৃত রয়েছে। সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব।

যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে আমরা দেখি তা মুখ্যত ঊনবিংশ শতকের মনীষার শ্রম ও স্বপ্নসন্ধানের জায়মান রূপকল্প। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধজীবন, বৌদ্ধদর্শন ও সংস্কৃতি চর্চার ধারাগুলিকে আমরা বুঝে নেওয়ার সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে ঘিরে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের বহুমাত্রিক গ্রহণ বর্জনের রাজনীতির চেহারা আমরা তুলে ধরতে চাই। বৌদ্ধধর্মের নানা অভিযান, তথ্য আবিষ্কারের উদ্যম, প্রশ্ন-পরিপ্রশ্ন, তর্ক-বিতর্কের নানা কথা সাময়িকপত্রের পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন, বুদ্ধজীবন, শিল্পকলা, ভাস্কর্য, নন্দনতত্ত্ব, ভ্রমণকাহিনি, বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থা, বৌদ্ধ ইতিহাসের নানা তথ্য,

পুস্তক পর্যালোচনা এই সাময়িকপত্রগুলিতে পাওয়া যাবে। হিন্দু বা ব্রাহ্মধর্মের নির্দিষ্ট প্রচারমূলক সাময়িকপত্রগুলিতে নিজেদের ধর্মমত বা আদর্শের প্রচারের জন্য বৌদ্ধধর্মকে কখনো পূর্বপক্ষ হিসাবে মতখণ্ডন করে নিজমত প্রতিষ্ঠার কাজে লাগানো, কখনোও তাকে আদর্শ করে সেই সিদ্ধিতে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছিল। বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে ঊনবিংশ-বিংশ শতকের সাময়িকপত্রগুলির ভূমিকাও তাৎপর্যময়। তাই গবেষণার বিষয় হিসাবে নির্বাচিত সাময়িকপত্রগুলিকে গ্রহণ করা হয়েছে।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সমন্বিত আমাদের নির্বাচিত বাংলা সাময়িকপত্রগুলি হল – ক) রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ* (১২৫৮ – ১২৬৮) (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪২২) ও খ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত *রহস্য সন্দর্ভ* (১২৬৯ – ১২৮০) (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪২৩), গ) শ্রীকৃষ্ণ দাস সম্পাদিত *জ্ঞানাঙ্কুর* (আশ্বিন, ১২৭৯ – অগ্রহায়ণ, ১২৮২) (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪২৪), ঘ) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত *আর্য্যদর্শন* (বৈশাখ, ১২৮১ – বৈশাখ, ১২৯২) (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪২৫), ঙ) বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* আদি পর্যায় (বৈশাখ, ১২৭৯ – মাঘ, ১২৯০) (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪২৬), চ) অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত *নবজীবন* (শ্রাবণ, ১২৯১ – আশ্বিন, ১২৯৫) (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪২৭), ছ) চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত *নারায়ণ* (অগ্রহায়ণ, ১৩২১ – ভাদ্র, ১৩২৯) (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪২৮) এবং ঞ) দীনেশচন্দ্র সেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত *বঙ্গবাণী* (ফাল্গুন, ১৩২৮ – মাঘ, ১৩৩৪) (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪২৯)।

গবেষণাপত্রে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে অনুসন্ধান করব –

প্রথম অধ্যায়: পাশ্চাত্য ও বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতিচর্চার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দ্বিতীয় অধ্যায়: নির্বাচিত সাময়িকপত্রে বুদ্ধদেব, বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি আলোচনার প্রস্থানভূমি

তৃতীয় অধ্যায়: বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন

চতুর্থ অধ্যায়: বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য

পঞ্চম অধ্যায়: বুদ্ধচরিত সাহিত্য

ষষ্ঠ অধ্যায়: শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও নন্দনতত্ত্ব

সপ্তম অধ্যায়: প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত ও ‘বৌদ্ধযুগ’-এর নির্মান: পুনর্বিবেচনা।

প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পরিপ্রশ্ন করার সৎ সাহস আছে বলেই সাময়িকপত্র প্রতিস্থানবিরোধী। এর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের গুরুত্বপূর্ণ অথচ গ্রন্থে অসংকলিত প্রবন্ধ 'ঘোষপাড়া' (*বঙ্গবাণী,* জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯)-এর উল্লেখ করা যায়। বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার গতিমুখ পরিবর্তনকামী সেই দ্রোহী প্রবন্ধ থেকে আংশিক উদ্ধারযোগ্য –

> ফাল্গুন মাসে যে দোল হয় তাহাতে একটি মেলা বসিয়া থাকে। সহস্র সহস্র লোক এই উপলক্ষে ঘোষ পাড়ায় উপস্থিত হয়, এই মেলা বঙ্গদেশের কুম্ভমেলা স্বরূপ। আশ্চর্য্যের বিষয় ইংরেজী পড়ুয়াগণ নিজেদের বিপুল বিপুল শ্লাঘায় অহঙ্কৃত হইয়া জনসাধারণের এই সকল বিরাট অনুষ্ঠানের কোনই খোঁজ রাখেন না। তাঁহারা যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া ঐ মেলায় উপস্থিত হইতেন, তবে তাঁহারা বিল, রিশ ডেভিস, এবং সিলভান লেভীর পদাঙ্ক স্মরণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোচনায় তৃপ্ত হইতে পারিতেন না। "সন্ধ্যা-ভাষা"র ব্যূহ ভেদ করিয়া কর্ত্তাভজাদের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারিলে মহাযানের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁহাদের চোখে জাজ্বল্যমান হইত।

আমাদের এই অনুসন্ধান ও গবেষণার মধ্যে দিয়ে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যাপনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

টীকা ও উৎস নির্দেশ

১। সরকার, দীনেশচন্দ্র। (২০০৯)। *পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত*। কলকাতা: সাহিত্যলোক। পৃ. ৮৯

২। ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ। (১৯৯৮)। চৌধুরী, প্রমথ। মুখপত্র। *বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ৮

৩। সেন, প্রবোধচন্দ্র। (২০১১)। *ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৫৩, ৫৮

৪। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৪৫ – ১৪৬

৫। রায়, শিবনারায়ণ। (২০০৯)। 'রেনেসাঁস ও ইতিহাসতত্ত্ব'। *প্রবন্ধ সংগ্রহ – ২*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৬১

৬। রায়, অন্নদাশঙ্কর। (২০০4)। 'বাংলার রেনেসাঁস'। *বাংলার রেনেসাঁস*। কলকাতা: বাণীশিল্প। পৃ. ১৯

৭। Sarkar, Susobhan. (2002). 'Notes on the Bengal Renaissance'. *On the Bengal Renaissance*. Papyrus. Kolkata. p. 11

৮। ত্রিপাঠী, অমলেশ। (২০০৯)। ইতালীর র‍্যানেশাঁস। *বাংলার র‍্যানেশাঁস বাঙালীর সংস্কৃতি*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১৬, ৩৬, ৩৭, ৬১

৯। ঘোষ, বিনয়। (২০০৯)। বাংলার নবজাগরণ: সমীক্ষা ও সমালোচনা। *বাংলার নবজাগৃতি*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান। পৃ. ১৮৫

১০। রায়, অন্নদাশঙ্কর। (২০০4)। বাংলার রেনেসাঁস। *বাংলার রেনেসাঁস*। কলকাতা: বাণীশিল্প। পৃ. ৬৫

১১। প্রমথ চৌধুরীর উদ্ধৃতিটির জন্য দ্রষ্টব্য: ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ। (১৯৯৮)। চৌধুরী, প্রমথ। মুখপত্র। *বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ১০

১২। মহাথেরো, প্রিয়ানন্দ। মহাথেরো, এস. ধর্মপাল। (১৯৮০), বাংলাদেশ ভিক্ষু মহাসভা, নব পণ্ডিত বিহার, কাতালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ: *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মে মহাস্থবিরদের অবদান*, অগ্রসার প্রকাশনা সিরিজ-১, পৃ. ৯

১৩। চৌধুরী, সুকোমল। (১৯৭৩)। *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী। পৃ. ১৭

১৪। বড়ুয়া, বেণীমাধব। (১৯২২)। *বৌদ্ধ-পরিণয় পদ্ধতি*। কলকাতা: পুলিনবিহারী চৌধুরী। সাঙ্গুভেলি টিকাকোম্পানী। কলকাতা। প্যারীমোহন চৌধুরী। লক্ষ্ণৌ। সুধীরচন্দ্র বড়ুয়া। বর্ম্মাষ্টেসনারি সাপ্লাই কোম্পানী। ২৪/৩ মির্জ্জাপুর ষ্টীট্। পৃ. ১৮

১৫। চৌধুরী, সুকোমল। (১৯৭৩)। *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী। পৃ. ১৮ – ২৩

১৬। মহাস্থবির, ধর্মাধার। (২০০৯)। *সদ্ধর্মের পুনরুত্থান*। কলকাতা: ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী। পৃ. ৭ – ৮

১৭। দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত। পৃ. ৮ – ১০ এবং চৌধুরী, সুকোমল। (১৯৭৩)। *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী। পৃ. ২৬

১৮। উপসম্পদা অর্থাৎ ভিক্ষুধর্মে প্রব্রজিত হওয়ার ন্যূনতম বয়স কুড়ি বছর।

১৯। চৌধুরী, সুকোমল। (১৯৭৩)। *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী। পৃ. ২৭ – ২৮

২০। মহাস্থবির, ধর্মাধার। (২০০৯)। *সদ্ধর্মের পুনরুত্থান*। কলকাতা: ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী। পৃ. ১১

২১। চৌধুরী, সুকোমল। (১৯৭৩)। *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী। পৃ. ২৯ – ৩০

২২। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত। পাঠক, সুনীতিকুমার। পালিভাষায় তিপিটকে 'বোধিসত্ত' প্রসঙ্গ ও কৃপাশরণ মহাস্থবির। পৃ. ১৬০; বড়ুয়া, রাজীবকান্তি। কালজয়ী আলোকিত মহামনীষী কৃপাশরণ। Chowdhury, Hemendu Bikash. (Edited). (2015). *Jagajjyoti*. 150 Birth Anniversary Tribute to Karmayogi Kripasaran Mahasthavir. Kolkata: Bauddha Dharmankur Sabha. পৃ. ১৭৭

২৩। 'বুদ্ধধাতু' বলতে বুদ্ধ শরীরের কোন অংশ, যেমন কেশ, দাঁত অস্থি ইত্যাদি বোঝায়।

২৪। 'ভিক্ষুসীমা' অর্থাৎ যেখানে বিনয়ানুসারে উপসম্পদা বা ভিক্ষুত্ব দেওয়া হয়।

২৫। বড়ুয়া, দীপংকর শ্রীজ্ঞান। শিক্ষা সম্প্রসারণে কর্মযোগী মহাস্থবির। Chowdhury, Hemendu Bikash. (Edited). (2015). *Jagajjyoti*. 150 Birth Anniversary Tribute to Karmayogi Kripasaran Mahasthavir. Kolkata: Bauddha Dharmankur Sabha. পৃ. ১৮৮ – ১৮৯

২৬। উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত। পৃ. ১৮৭

২৭। প্রাগুক্ত। মহাস্থবির, কৃপাশরণ। ভ্রমণ বৃত্তান্ত। পৃ. ২৯৪ – ২৯৫

২৮। প্রাগুক্ত। পাঠক, সুনীতিকুমার। পালিভাষায় তিপিটকে 'বোধিসত্ত' প্রসঙ্গ ও কৃপাশরণ মহাস্থবির। পৃ. ১৬১

২৯। ব্রহ্মচারী, শীলানন্দ। (১৯১৫)। *কর্মযোগী কৃপাশরণ*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

৩০। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মপালের জন্মশতবর্ষে একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছিলেন। দ্রষ্টব্য: বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। (১৯৬৪)। *হে মহাজীবন*। কলকাতা: মহাবোধি সোসাইটি অব্ ইণ্ডিয়া।

৩১। Chowdhury, Hemendu Bikash. (Edited). (2014). নিয়োগী, গৌতম। অনাগারিক ধর্মপাল: সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নবজাগরণের এক বিশিষ্ট অগ্রদূত। 150 Birth Anniversary Tribute to Anagarika Dharmapala & Sir Asutosh Mookherjee. Kolkata: *Jagajjyoti*. Bauddha Dharmankur Sabha. পৃ. ১০০ – ১০৩

৩২। প্রাগুক্ত। Chronology of Anagarika Dharmapala's Services. p. 27 এবং দত্ত, পঙ্কজকুমার। অনাগারিক ধর্মপাল: বুদ্ধের আলোর পথযাত্রী। পৃ. ৯৪

৩৩। প্রাগুক্ত। নিয়োগী, গৌতম। অনাগারিক ধর্মপাল: সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নবজাগরণের এক বিশিষ্ট অগ্রদূত। ১০৪

৩৪। প্রাগুক্ত। দত্ত, পঙ্কজকুমার। অনাগারিক ধর্মপাল: বুদ্ধের আলোর পথযাত্রী। পৃ. ৯৫

৩৫। দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ। (২০০৩)। রায়, অলোক। (সম্পাদিত)। *সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ১০৫

৩৬। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত। নিয়োগী, গৌতম। অনাগারিক ধর্মপাল: সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নবজাগরণের এক বিশিষ্ট অগ্রদূত। পৃ. ১০৩ – ১০৪ ও দত্ত, পঙ্কজকুমার। অনাগারিক ধর্মপাল: বুদ্ধের আলোর পথযাত্রী। পৃ. ৯২, ৯৪

৩৭। Ibid. Dharmapala, Anagarika. *The World's Debt to Buddha*. p. 18 – 19

৩৮। *বৌদ্ধবন্ধু*-এর প্রকাশকাল ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পত্রিকার প্রচ্ছদ বা সময় চিহ্নিত কোন আখ্যাপত্র তিনি দেন নি। দ্রষ্টব্য: দাস, প্রভাতকুমার। মিশ্র, সুবিমল। (মাঘ-চৈত্র, ১৪১৩), আশীষ খাস্তগীর, 'উনিশ শতকের ছাপাখানা ও পত্র পত্রিকা'। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*।

৩৯। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: চৌধুরী, সুকোমল। (১৯৭৩)। *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী। পৃ. ৪১, ৫৬ – ৬১; দাশ, আশা। (১৯৬৯)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। পৃ. ৬৬৭ – ৬৭৩ এবং Chaudhury, Sukomal. (1987). *Contemporary Buddhism in Bangladesh*. Calcutta: Atisha Memorial Publishing Society 39 – 42

প্রথম অধ্যায়

পাশ্চাত্য ও বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতিচর্চার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ভূমিকা

ভারতবর্ষের ইতিহাস-সংস্কৃতি সন্ধানে বৌদ্ধ প্রসঙ্গকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বৌদ্ধ ইতিহাসের সন্ধানে ভারতীয়দের উদ্যম দেখা গেছে অনেক পরে। 'বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে?' প্রবন্ধে (*নারায়ণ*, অগ্রহায়ণ, ১৩২১) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন –

> বৌদ্ধদের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা হিন্দুতে করে নাই, মুসলমানেরাও করে নাই, বৌদ্ধরাও বড়ো করে নাই; করিয়াছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, আর সেই ইউরোপীয়দিগের শিষ্য শিক্ষিত ভারতসন্তান।

ঊনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম-সংস্কৃতি চর্চায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই অগ্রবর্তী হয়েছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শ্রীলঙ্কায় প্রথম বৌদ্ধধর্ম দেখে ও পালিভাষা শিখে চর্চা করেছিলেন। তাঁদের এই অনুসন্ধিৎসা দেশীয় বিদ্যোৎসাহীদের প্রাণিত করেছিল। বৌদ্ধদের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা 'দক্ষিণী' বৌদ্ধধর্ম অর্থাৎ পালিকেন্দ্রিক বৌদ্ধধর্মের কথা বলেন। বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ *ত্রিপিটক* পালিভাষায় লেখা এবং দক্ষিণী বৌদ্ধধর্ম 'থেরবাদী' বৌদ্ধধর্মরূপেই পরিচিত ছিল। দক্ষিণী বৌদ্ধধর্ম বা থেরবাদী বৌদ্ধধর্মই প্রচলিত ধারায় পণ্ডিতদের কাছে পরিচিত ছিল। কিন্তু দক্ষিণী ধারার বিপ্রতীপে উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের আবিষ্কারের ফলে প্রচলিত ইতিহাস রচনার খাত অন্যদিকে বয়েছিল।

পাশ্চাত্যে বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি চর্চা

প্রবন্ধ

ভারতবর্ষে প্রায় বিস্মৃত বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য গবেষক পণ্ডিতেরাই পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁদের লিখিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন গবেষণামূলক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁদের গবেষণার সূত্র ধরেই প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ভারততত্ত্ব ও বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার সূচনা ঘটেছিল। আমরা বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার প্রতিনিধিস্থানীয় গবেষক-প্রাবন্ধিকদের গবেষণাকর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

ব্রায়ান হটন হজসন (১৮০০ – ১৮৯৪)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে?' (*নারায়ণ*, অগ্রহায়ণ, ১৩২১) প্রবন্ধে লিখেছেন যে ব্রায়ান হটন হজসন নেপালে সিংহলী বৌদ্ধধর্মের থেকে আলাদা বৌদ্ধধর্ম ও 'অতি গভীর' দর্শন আর অনেক গ্রন্থের সন্ধান পান। তাঁর বৌদ্ধপুথি আবিষ্কারের ফলে 'উদীচ্য' বৌদ্ধ সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য ও তত্ত্ব সামনে এসেছিল।[১] হজসনের প্রচেষ্টায় সংস্কৃত, নেওয়ারি এবং তিব্বতি ভাষায় লেখা অনেক পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়।

১৮৩৩ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত নেপালে ভারত সরকারের প্রতিনিধি থাকার সময়ে হজসনের সংগৃহীত পুথি বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটি, পারির সোসাইতে আশিয়াতিক, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ারল্যাণ্ড এশিয়াটিক সোসাইটি, অক্সফোর্ড বডলিয়ন লাইব্রেরিতে পাঠিয়েছিলেন। একাদশ শতাব্দীর আগের লেখা হজসন সংগৃহীত পুথির তালিকা তৈরি করেন স্যার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার (১৮৪০ – ১৯০০) আর হোরেস হেম্যান উইলসন (১৭৮৬ – ১৮৬০) হজসনের কাজকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে পারিতে হজসনের প্রেরিত ১৪৭টি পুথি পরীক্ষা করে ইউজীন বুর্নুফ (১৮০১ – ১৮৫২) 'উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম'-এর তত্ত্ব গড়ে তোলেন, যা বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যময়।[২] বুর্নুফ হজসনকে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য চর্চার প্রবর্তকরূপে আখ্যায়িত করেন।

হজসনের বৌদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি হল – *Illustrations of the Literature and Religion of the Buddhists* (১৮৪১), *Essays on the Languages, Literature and Religion of Nepal and Tibet* (১৮৭৪) প্রভৃতি।[৩] হজসনকে উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম আবিষ্কারের পথিকৃৎ বলা হয়।

আলেকজাণ্ডার চোমা দে কোরেশ (১৭৮৪ – ১৮৪২)

উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের সম্প্রাসারিত রূপ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আলেকজাণ্ডার চোমা দে কোরেশের নাম স্মরণীয়। নয়বছর বহু কৃচ্ছসাধনের পর তিনি তিব্বতী ভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র আয়ত্ত্ব করে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে বহু তিব্বতী পুথি নিয়ে কলকাতায় আসেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি হজসন সংগৃহীত পুঁথির তালিকা প্রস্তুত করেন। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে কোরেশের তিব্বতি

ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান *A Grammar of the Tibetan Language in English* প্রকাশিত হয়। তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ Asiatic Researches, Vol-20, ১৮৩৬-এ বেরোয়, তা *The Life and Teachings of Buddha* (১৯৫৭) নামে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ডি. রসের সম্পাদনায় কোরেশের *Tibetan Studies* প্রকাশিত হয়।[৪] তেঙ্গুর-কেঙ্গুর আবিষ্কার কোরেশের অন্যতম স্মরণীয় কীর্তি। তিব্বতি সাহিত্যের দ্বার উন্মুক্তির ফলে বহু অজানা তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।[৫]

ইউজীন্ বুর্ণুফ (১৮০১ – ১৮৫২)

ইউজীন্ বুর্ণুফ ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ক্রিষ্টিয়ান লাজেনের সহযোগিতায় পালিভাষা সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ পুস্তক *Essai sur le Pali* (১৮২৬) প্রকাশ করে ইউরোপে প্রায় অপরিজ্ঞাত ভাষা নিয়ে কাজের সূচনা করেন। অনেকে পালিভাষাকে পহ্লবী বা ঐ জাতীয় ভাষার নামান্তর বলে মনে করেন। বুর্ণুফ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের ধর্মশাস্ত্রের ব্যবহৃত পালিভাষা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে পালি ব্যাকরণ নিয়ে বুর্ণুফের *Observation Grammaticales sur quelques passages de le essai sur Le Pali* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্যারির এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত হজসন সংগৃহীত ৮৮টি বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক পুথি অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত হয়। বৌদ্ধধর্মের কাল নির্ধারণ ছাড়াও বহু অজানা তথ্যে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। কোনো দেশী বা বিদেশী পণ্ডিত তাঁর আগে তথ্যনির্ভর বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক বিশেষ আলোচনা করেন নি। রামদাস সেন (১৮৪৫ – ১৮৮৭) বুর্ণুফ-পরিবেশিত তথ্যগুলিকে বাংলাভাষায় রূপদান করেন। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে বুর্ণুফ পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ *সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীক*-এর ফরাসি অনুবাদ *Lotus de la Bonne Loi* প্রকাশ করেন। তিনি পালিভাষায় একটি ব্যাকরণ ও একটি অভিধান রচনা করেন, যা তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।[৬]

ফ্রীডরিখ ম্যাক্সমূলার (১৮২৩ – ১৯০০)

ভারতবর্ষে কোনদিন আসতে না পারলেও ফ্রীডরিখ ম্যাক্সমূলার ভাবৈক সূত্রে বাঁধা ছিলেন। তিনি যথার্থই ভারত-প্রেমিক। পাশ্চাত্যে তো বটেই, এদেশের শিক্ষিত সমাজে বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অনুপ্রেরণা তুলনারহিত। ভাষাবিজ্ঞানের মত তুলনামূলক-ধর্মতত্ত্ব (Comparative Religion) ও নানা জাতির পুরাণ

কথাসমূহের তুলনামূলক আলোচনার (Comparative Mythology) ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ। তিনি ঋগ্বেদের প্রকাশের অনতিবিলম্বে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে *Sacred Books of the East* গ্রন্থমালার পরিকল্পনা করেন ও স্বয়ং এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। প্রাচ্যের সকল ধর্মের বিশিষ্ট গ্রন্থগুলি বিশেষজ্ঞ কুড়ি জন পণ্ডিত (ম্যাক্সমূলার সহ) দ্বারা অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ৫১টি খণ্ডের মধ্যে ৪৮টি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল। বৌদ্ধগ্রন্থের খণ্ডের সংখ্যা ছিল ১০টি। পালি *ধর্মপদ* তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ *সুখাবতী ব্যূহ, বজ্রচ্ছেদিকা* ও *প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয় সূত্র*-ও তিনি অনুবাদ করেন।[৭]

জেমস্ প্রিন্সেপ (১৭৯৯ – ১৮৪০)

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬ – ১৭৯৪) কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে ভারতবিদ্যা চর্চার সূত্রপাত করেন। ভারতবিদ্যার একটি শাখারূপে জোন্স, হোরেস্ হেমান্ উইলসন (১৭৮৬ – ১৮৬০), হেনরী টমাস কোলব্রুক (১৭৭৫ – ১৮৩৭) প্রমুখ মনীষীরা সংস্কৃত ভাষা চর্চার সঙ্গে ভারতের পুরাতত্ত্ব-চর্চা করতে থাকেন। ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রিন্সেপ অশোকলিপির পাঠোদ্ধার করেন। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রিন্সেপ দিল্লির তোপরা স্তম্ভলিপিকে সফলভাবে পাঠোদ্ধার করেছিলেন। এই লিপিটির একটি অনুবাদ *Journal of the Asiatic Society of Bengal*-এর ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি অশোকচর্চায় আরো অগ্রগতি ঘটান। তিনি গিরনার ও ধৌলিলিপির তুলনামূলক আলোচনা করে লিপি, ভাষা ও বিষ্যবস্তুর সাদৃশ্য লক্ষ করে *Journal of the Asiatic Society of Bengal*-এর সপ্তম খণ্ডে প্রকাশ করেন।[৮]

আলেকজাণ্ডার কানিংহাম (১৮১৪ – ১৮৯৩)

আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সারনাথের ধ্বংসস্তূপ খনন করে প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যসমূহের প্রতিলিপি তৈরি করেন। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে গোয়ালিয়র স্টেটে পূর্তবিভাগের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি ভূপাল রাজ্যের সাঁচী ও মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি বৌদ্ধস্তূপ নিজ দায়িত্বে খনন করে লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *The Bhilsa Topes or Buddhist Monuments of Central India: Comprising a Brief Historical Sketch of the Rise, Progress and Decline of Buddhism* লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

এটি পুরাতত্ত্বের ভিত্তিতে লিখিত গ্রন্থ। গ্রন্থে স্তম্ভ ও বেষ্টনীগাত্রে খোদিত লিপিমালার পাঠোদ্ধার ও তার ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে *Ladak – Physical, Statistical and Historical, with Notices of the Surrounding Countries* লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর কাছে ভারতের পুরাতত্ত্ব উদ্ধার ও সংরক্ষণের প্রস্তাব অনুযায়ী কানিংহাম ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর পুরাতত্ত্ব সমীক্ষক পদ গ্রহণ করলে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রবর্তিত হয়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে এই বিভাগ লুপ্ত হলে তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে সুবিখ্যাত গ্রন্থ *The Ancient Geography of India*, Vol. I লেখেন, যা লণ্ডন থেকে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান ও চৈনিক পরিব্রাজকদের ভ্রমণ-বিবরণীর ভিত্তিতে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থানগুলির বর্তমান সংস্থান নির্ণীত হয়েছে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল লর্ড মেয়ো ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগকে পুনরুজ্জীবিত করলে কানিংহাম ভারতে এসে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে এর কর্মভার গ্রহণ করেন। কানিংহাম ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের তক্ষশীলা থেকে পূর্ব-ভারতের গৌড় পর্যন্ত অঞ্চল বহুবার পরিভ্রমণ করে বহু অজ্ঞাত পুরাবৃত্ত ও স্থান আবিষ্কার করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে তাঁর *Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. I (*Inscriptions of Asoka*) প্রকাশিত হয়। এতে এযাবৎ আবিষ্কৃত অশোকলিপিগুলির ফোটোচিত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডন থেকে বেরোয় *The Stupa at Bharhut* এবং ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে বেরোয় *The Book of Indian Eras*। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণের পর ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে সুবিখ্যাত গ্রন্থ *Mahabodhi or the Great Buddhist Temple under the Bodhi Tree at Buddha Gaya* ৩১টি চিত্রসহ প্রকাশিত হয়। বুদ্ধগয়া, সারনাথ, শ্রাবস্তী, সাঁচি, মথুরা, কৌশাম্বী প্রভৃতি প্রাচীন গৌরবের কথা জনসমাজে সর্বপ্রথম প্রচার করে কানিংহাম বৌদ্ধসংস্কৃতি চর্চার দিগন্ত উন্মোচন করেন।[৯]

এডোয়ার্ড বাইলস্ কাউয়েল (১৮২৬ – ১৯০৩)

এডোয়ার্ড বাইলস্ কাউয়েল ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় আসার পর এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে যুগ্ম সম্পাদক এবং কিছুদিন পর সম্পাদকরূপে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কার্যভার চালান।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্সী কলেজ, সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতার পর ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমৃত্যু তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। কাউয়েল বৌদ্ধ সাহিত্যের দুটি বিশিষ্ট সম্পদ *Divyavadana* (১৮৮৬) ও *Jātakalmala* (১৮৯৫) কাউয়েল সম্পাদনা করেন। পালি থেকে ইংরাজিতে ভাষান্তরিত একখন্ড বিষয়সূচিসহ *Jātaka*-র সাত খণ্ডের আংশিক অনুবাদও তাঁর কীর্তি। বাকি অংশটুকু আর চালমার্স, ডব্লিউ. এইচ. ডি. রাউস, এইচ. টি. ফ্রান্সিস ও আর. এ. নেইল অনুবাদ করেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ম্যাক্সমূলার সম্পাদিত *Sacred Books of the East* গ্রন্থমালার ৪৯ সংখ্যক খণ্ডে কাউয়েলের ইংরেজি অনুবাদ অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* প্রকাশিত হয়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* মহাকাব্যের সম্পাদন ও অনুবাদ *Anecdota Oxonensia*, Vol. VIII প্রকাশিত হয়েছিল। ইউরোপে কালিদাস-পূর্ববর্তী কবিরূপে অশ্বঘোষের পরিচিতিদান তাঁর মহৎ কীর্তিগুলির মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।[১০]

জর্জ টার্ণার (১৭৯৯ – ১৮৪৩)

সিংহলের সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী জর্জ টার্ণার পালিভাষা শিখে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ মূল *মহাবংশ* ইংরাজি অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। এটি প্রকাশের পর ঐতিহাসিকদের কাছে শিলালেখে উল্লিখিত 'পিয়দসি' ও সম্রাট অশোকের অভিন্নতা প্রমাণিত হয়। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রচিত *Epitome of the History of Ceylon, compiled from Native Annals* গ্রন্থ বৌদ্ধ ইতিহাস চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ।[১১]

জেমস ফার্গুসন (১৮০৮ – ১৮৮৩)

জেমস ফার্গুসন ভারতের স্থাপত্য শিল্পের ঐতিহাসিক বিচারের সূত্রপাত করেন। তাঁর মহামূল্যবান গ্রন্থরাজির মধ্যে বৌদ্ধ স্থাপত্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। গ্রন্থগুলির মধ্যে *Illustrations of the Rockcut Temples of India* (১৮৪৫), *Illustrations of various Styles of Architecture* (১৮৯৪), *On the Study of Indian Architecture* (১৮৬৭), *Tree and Serpent Worship in India* (১৮৬৮), *History of Indian and Eastern Architecture* (১৮৭৬), *Cave Temples of India* (জেমস্ বার্জেসের সঙ্গে) (১৮৮০, ১৮৮৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১২]

মাইকেল ভিগো ফৌসবোল (১৮২১ – ১৯০৮)

মাইকেল ভিগো ফৌসবোল ইউরোপে পালিভাষা চর্চার অন্যতম প্রবর্তক। ইউরোপে প্রথম মুদ্রিত পালি গ্রন্থ *Dhammapada* তাঁর সম্পাদনায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। *Suttanipata* (১৮৮৫ – ৯৪), *জাতক*-এর প্রথম থেকে সপ্তম খণ্ড (১৮৭৭ – ১৮৯৭) ইত্যাদি গ্রন্থ বৌদ্ধবিদ্যাচর্চায় তাঁকে মান্যতা দিয়েছে।[১৩]

ফিলিপ এডোয়ার্ড ফুকো (১৮১১ – ১৮৯৪)

ফিলিপ এডোয়ার্ড ফুকো প্যারীতে তিব্বতীয় ভাষাচর্চার উন্নতি ঘটান। তাঁর পরিচালনায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থের বিকৃত পাঠ শুদ্ধ হয়, অনেক লুপ্ত গ্রন্থকেও অনুবাদের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করেন। তাঁর সম্পাদিত তিব্বতীয় ভাষার ফরাসী অনুবাদসহ *Lalit Vistara* ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[১৪]

সেন্ট্ য়ুলস্ বার্থেলেমি (১৮০৫ – ১৮৯৫)

প্যারীর অন্যতম ভারতবিদ্যাচর্চার পুরোধা সেন্ট্ য়ুলস্ বার্থেলেমি (১৮০৫ – ১৮৯৫) বৌদ্ধ বিষয়ক দুটি গ্রন্থ লেখেন – *Du Bouddhismus* (১৮৫৫) এবং *Bouddha et sa Religion* (১৮৬০)।[১৫]

স্যামুয়েল বীল (১৮২৫ – ১৮৮৯)

ইংল্যাণ্ডের নৌবিভাগের ধর্মযাজক, পরে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে চীনাভাষার অধ্যাপক স্যামুয়েল বীল চীনা ভাষা থেকে বহু বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদ করে ভারতবিদ্যার উন্নতি ঘটান। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে চীনা থেকে অনূদিত *A Catana of Buddhist Scriptures* (১৮৭২), *Travels of Buddhist Pilgrims (Fa-hien and Sung Yun)* (১৮৬৯), *Romantic Legend of Buddha* (১৮৭৫), চীনা ভাষায় অনূদিত *Dhammapada* (১৮৬১), *Buddhism in China* (১৮৮৪), *Records of the Western World* (১৮৮৫), চীনা ভাষায় অনূদিত *The life of Hiuen Tsang* (১৮৮৮) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১৬]

জেমস্ বার্জেস (১৮৩২ – ১৯১৬)

বৌদ্ধ শিল্প-স্থাপত্য বিদ্যাচর্চায় জেমস বার্জেস আবিস্মরণীয়। পুরাতত্ত্বের সমীক্ষক ও পরে অধ্যক্ষ রূপে তিন কর্মক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত রেখেছেন। নামক সুবিখ্যাত গবেষণা পত্রিকা সম্পাদনা তাঁর অন্যতম কীর্তি। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা *Rockcut Temples of Elephanta* (১৮৭১), *Report on the Antiquities of the Kathiawad and Kach* (১৮৭৬), *The Buddhist Caves and Inscriptions* (১৮৮৩), *The Buddhist Stupas at Amaravati & Jaggayyapeta; Notes on the Amaravati Stupa* (১৮৮২), *Cave Tamples of India (with J. Fergussion)* (১৮৮০), *Buddhist Art in India* (১৯০১), *Epigraphica Indica (Ed.)* Vol. 1 & 2 (১৮৯২ – ৯৪) প্রভৃতি বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার আকর গ্রন্থরূপে বিবেচ্য।[১৭]

এমিল চার্লস মারি সেনার (১৮৪০ – ১৯২৮)

এমিল চার্লস মারি সেনার বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাত। তিনি কচ্চায়নের পালি ব্যাকরণ *Kaccyana et la Literature Grammaticale du Pali* নামে ফরাসিতে অনুবাদ করেন। *মহাবস্তু* সম্পাদনায় তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। *The Inscriptions of Piyadasi* ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। *Esaai sur la Legende du Buddha* (১৮৮২), *Lescales dans l' Inde* (১৮৮৯) প্রভৃতি গ্রন্থও উল্লেখের দাবি রাখে।[১৮]

ভিনসেন্ট স্মিথ (১৮৪৮ – ১৯২০)

ভারতের ইতিহাস, পুরাবস্তু ও শিল্পকলার অনুরাগী ভিনসেন্ট স্মিথ বৌদ্ধবিদ্যাচর্চায় অবদান রেখেছেন। তাঁর সম্রাট অশোক সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির মূল্য অপরিসীম। অশোক সম্পর্কিত প্রথম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ *Asoka, the Buddhist Emperor of India* (১৯০১)। *The Edicts of Asoka* ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। *A History of Fine Arts in India and Cylon* (১৯১১), *The Early History of India from 600 B.C.*

to the Muhammedan Conquest (১৯০৪), *The Oxford History of India from the Earliest Times to 1911* (১৯১৯) গ্রন্থগুলির মধ্যে বৌদ্ধবিষয়ক নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।[১৯]

টমাস উইলিয়ম রীজ ডেভিডস (১৮৪৩ – ১৯২১)

টমাস উইলিয়ম রীজ ডেভিডস বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে স্বয়ং প্রতিষ্ঠান। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনে Pali Text Society স্থাপন তাঁর অনন্য কীর্তি। তিনি London School of Oriental Studies-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বহু বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল – *Buddhism* (১৮৭৮), অনূদিত গ্রন্থ *Jātaka* (১৮৮১), *Buddhism – its History and Sikeravure* (১৮৯৬), *Early Buddhism* (১৯০৮), *Vinaya Texts* (১৮৮১), *Dīgha Nikaya* (১৮৯০), *Buddhist India* (১৯০২) ইত্যাদি।[২০]

ক্যারোলিন আগষ্টা ফলি রীজ ডেভিড্স (১৮৫৭ – ১৯৪২)

টমাস উইলিয়ম রীজ ডেভিডসের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ক্যারোলিন আগষ্টা ফলি রীজ ডেভিড্স Pali Text Society-র পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মচর্চায় নিবেদিত প্রাণ ক্যারোলিন বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর *Pslams of the Early Buddhist Brothers and Sisters*, *থেরগাথা* ও *থেরীগাথা*-র ইংরাজি অনুবাদ ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। *Buddhist* (১৯১৪), *Gotama the Man* (১২৯৮), *Outline of Buddhism* (১৯৩৪) প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। *অভিধর্ম পিটক*-এর ইংরাজি অনুবাদ গ্রন্থ *A Buddhist Manual of Psychological Ethics* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২১]

ফিডর ইপোলিটোভির শ্চেরবাট্স্কি (১৮৬৬ – ১৯৪১-৪২ (?))

মহাযান বৌদ্ধধর্মের রুশ পণ্ডিতপ্রবর ফিডর ইপোলিটোভির শ্চেরবাট্স্কি বহু গ্রন্থ প্রণেতা। বৌদ্ধদর্শন বিষয়ক *Theory of Knowledge and Logic in the Doctrine of the Later Buddhism*-এর মূল রাশিয়ান গ্রন্থ ১৯০৩-এ প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে দুই খণ্ডের *Buddhistic Logic* (১৯৩৫), *Nyaya Bindu* (Ed.) (১৯২৫), *Santanantarsiddhi – Abhisamayalamkara-*

Abhidharmakosa of Vasubandhu (Ed. & Tr.); *The Concept of Buddhist Nirvana* (১৯২৭), *Indian Logic* (১৯৩০-৩২), *Central Conception of Buddhism* (১৯২৩) উল্লেখযোগ্য।[২২]

সিসিল বেণ্ডেল (১৮৫৬ – ১৯০৬)

ব্রিটিশ অধ্যাপক সিসিল বেণ্ডেল দুইবার ভারত ও নেপাল ভ্রমণ করে বহু সংস্কৃত ও পালি পুথি সংগ্রহ করেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে শান্তিদেবের *শিক্ষাসমুচ্চয়* সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। তাঁর অন্যান্য গবেষণা কর্মের মধ্যে *Catalogue of Buddhist Sanskrit Mss. in the University Library of Cambridge* (১৮৮৩) এবং *Catalogue of Sanskrit Mss. in British Museum* (১৯০২) উল্লেখযোগ্য।[২৩]

স্যার জন হাবার্ট মার্শাল (১৮৭৬ – ১৯৫৮)

ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগীয় অধ্যক্ষ স্যার জন হাবার্ট মার্শাল ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় অবদান রেখেছেন। তিনি বৌদ্ধবিদ্যাকেন্দ্র তক্ষশীলা উৎখনন করান। তাঁর উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্প-বিষয়ক গ্রন্থগুলি হল – *A Guide to Sanchi* (১৯১৮), *A Guide to Taxsila* (১৯২১), *The Monuments of Sanchi* (১৯৫১), *The Buddhist Art of Gandhara* (১৯৬০) ইত্যাদি।[২৪]

লিয়োনেল ডেভিড বার্ণেট (১৮৭১ – ১৯৬০)

প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ ব্রিটিশ লিয়োনেল ডেভিড বার্ণেট-এর *Bodhicharyavatara of Santiveva* মূল্যবান অনুবাদ গ্রন্থ।[২৫]

সিলভ্যাঁ লেভি (১৮৬৩ – ১৯৩৫)

ফরাসী অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার স্বয়ং প্রতিষ্ঠান। বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চায় তাঁর অবদান অতুলনীয়। তিনি এক্ষেত্রে অন্য অনুগামীদেরও উৎসাহিত করেন। লেভির বিদ্যাবত্তা বিশ্বভারতীর আদর্শের পরিপূরক – এই একাত্মতার কথা চিন্তা করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশ্বভারতীর প্রথম পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে আমন্ত্রণ জানান। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে লেভি প্যারীর এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় অশ্বঘোষ

বিরচিত *বুদ্ধচরিত* কাব্যের প্রথম সর্গ (মূল সংস্কৃত) ফরাসী অনুবাদ সহ *Le Buddhacharita d' Asavaghosa* প্রকাশ করেন।

বৌদ্ধসাহিত্য ও বহির্ভারতে ভারত সভ্যতার বিস্তারের ইতিহাস তাঁর আগ্রহের বিষয় ছিল। বৌদ্ধ বিদ্যাচর্চায় সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, তিব্বতি ও চীনাভাষা চর্চার গুরুত্ব দেন। নেপালের রাজদরবার থেকে তিনি বহু অজ্ঞাত, মূল্যবান পুঁথি সংগ্রহ করে তিনখণ্ডে *Le Nepal* (১৯০৫ – ১৯০৮) প্রকাশ করেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে অসঙ্গ প্রণীত *মহাযান সূত্রালঙ্কার* নামক বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ *Mahajana Sutralankara d' Asanga* সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এই সংস্কৃত গ্রন্থটি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে *Mahajana Sutralankara* নামে প্রকাশ করেন। বৌদ্ধ যোগাচার দর্শনের এটি মূল্যবান গ্রন্থ। মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধধর্মবিষয়ক তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধ রয়েছে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে নেপালে প্রাপ্ত বসুবন্ধু রচিত বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের গ্রন্থ *Vijnaptimatrata Siddhi* সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম ও সভ্যতা প্রচারের জন্য তিনি Maison France Japanaise নামে একটি গবেষণা কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করে দুই বছর এই কেন্দ্র পরিচালনা করেন। তাকাসুকুর সহযোগিতায় তিনি বৌদ্ধ বিশ্বকোষ *Hobougirin* প্রকাশ করেন।[২৬]

মরিস উইন্ট্যরনিৎস্ (১৮৬৩ – ১৯৩৭)

অষ্ট্রিয়ার মরিস্ উইন্ট্যরনিৎস্ ভারতবিদ্যা চর্চায় পারঙ্গমতার পরিচয় দেন। তিনখণ্ডে প্রকাশিত *History of Indian Literature*-এর দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৩৩) বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনায় সমৃদ্ধ। তাঁর অন্যান্য বৌদ্ধধর্ম সম্পাদিত গ্রন্থগুলি হল *Die Fran in Brahmanismus* (১৯২০), *Der Mahajana Buddhism* (১৯৩০), *Der alter Biuddhismus nach Texten des Tripitaka* (এ. বার্থেলট সম্পাদিত, ১৯০৮)।[২৭]

হারমান ওল্ডেনবুর্গ (১৮৫৪ – ১৯২০)

বৌদ্ধধর্ম, সংস্কৃত ও পালিভাষা বিশেষজ্ঞ জার্মানির হারমান ওল্ডেনবুর্গ ম্যাক্সমূলার সম্পাদিত *Secret Books of the East*-এর ১৩, ১৭ ও ২০ নং খণ্ড অনুবাদ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে

Vinaya Pitaka (১৮৭৮ – ১৮৮৩), *Dipavansa* (Ed.) (১৮৭৯), *Buddha, Sein Leben, Seinlehre, sei Germeinde* (১৮৮১), *Die Lehre der Upanishaden und die Aufaurge des Buddhismus* (১৯১৫), *Die Religion de Buddha* (১৯১৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[২৮]

সেরজি ফিড্রোভিচ্ ওল্ডেনবুর্গ (১৮৬৩ – ১৯৩৪)

রাশিয়ার পণ্ডিত সেরজি ফিডরোভিচ্ ওল্ডেনবুর্গ বৌদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত *Bibliotheca Buddhica* গ্রন্থমালার প্রবর্তন করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য সংক্রান্ত তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে ১৯০৬ – ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মধ্য-তুর্কিস্তান, মঙ্গোলিয়া ও তিব্বতে প্রেরিত রুশ অভিযানের পরিচালক ছিলেন। তিনি ১৯০৯ – ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে একই উদ্দেশ্যে প্রেরিত দ্বিতীয় অভিযানেরও নেতৃত্ব দেন। দুই বারই ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত বহু পুঁথি ও প্রত্নদ্রব্য আহরিত হয়। তাঁর রচনার মধ্যে *Notes on Buddhistic Art* (১৮৯৭), *Buddhijskija Legendi* (১৮৯৪ – ১৮৯৫) উল্লেখযোগ্য।[২৯]

অন্যান্য বৌদ্ধবিশারদ

পাশ্চাত্যের অন্যান্য বৌদ্ধবিশারদদের মধ্যে স্টেন কোনো (১৮৬৭ – ১৯৪৮), ফিলিপ এডোয়ার্ড ফুকো (১৮১১ – ১৮৯৪), লুই দ্য লা ভাল পুশাঁ (১৮৬৯ – ১৯৩৯), কার্লো ফর্মিকি (১৮৭১ – ১৯৪৩), এডোয়ার্ড হ্যামিলটন জনস্টন্ (১৮৮৬ – ১৯৪২) প্রমুখের গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এশীয় বৌদ্ধ বিশারদদের মধ্যে মাসাহারু আনেসাকি (১৮৭৩ – ১৯৪৯), তাইকান কিমুরা (১৮৮১ – ১৯৩০), কেনিও কাসাহারা (১৮৫২ – ১৮৮৩), শ্যেন্ য়ূ য়াং (১৮৭১ – ১৯৪৩), তাই শ্যূ (১৮৯৯ – ১৯৪৭), ডিসেৎসু তাইতারো সুজুকি (১৮৭০ – ১৯৬৬) প্রমুখের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩০]

কাব্য

ভারতবর্ষে বুদ্ধ এবং তাঁর পার্ষদদের নিয়ে কাব্য রচিত হয়েছে। পালি ও সংস্কৃত ভাষাতেই তা মুখ্যত রচিত হয়েছিল। উনবিংশ শতকে এডুইন আর্ণল্ডের চেষ্টার মধ্যে দিয়ে তা ধর্মীয় গণ্ডীর এলাকা ছাড়িয়ে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে।

এডুইন আর্ণল্ড (১৮৩২ – ১৯০৪)

বাংলা তথা ভারতে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ ঔৎসুক্য সঞ্চারে তাত্ত্বিক মনীষীদের গবেষণা গ্রন্থগুলির থেকেও ইংরেজ কবি এডুইন আর্নল্ডের *The Light of Asia or the Great Renunciation (Mahabhinishkramana) being the Life and Teaching of Gautam Prince of India and Founder of Buddhism* গ্রন্থের ভূমিকা অনেক কার্যকরী ছিল। *The Light of Asia* (১৮৭৯) কাব্যগ্রন্থের 'কাব্যিক সুষমা ও মানবিক আবেদন' ইংরেজিশিক্ষিত রসজ্ঞদের হৃদয় জয় করে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। কবি নবীনচন্দ্র সেন এই কাব্যগ্রন্থ অবলম্বনে *অমিতাভ* কাব্যগ্রন্থ এবং কবি সর্বানন্দ বড়ুয়া এই ভাবানুবাদ অবলম্বনে *জগজ্জ্যোতি* কাব্যগ্রন্থ লেখেন। আর্নল্ড সাহেবের কাব্যগ্রন্থের প্রেরণায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাটক *বুদ্ধদেব চরিত* লেখেন। রবীন্দ্রনাথ *কল্পনা* (১৯০০) কাব্যগ্রন্থের 'বিদায়' কবিতাটি আর্নল্ডের কাব্যের সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমণ অবলম্বনে লিখিত।[৩১] কেবল প্রাচ্যে নয়, পাশ্চাত্যেও এই গ্রন্থ ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল, ফলে 'various authorized and unauthorized issues' নানা ক্ষেত্রেই পাওয়া যাচ্ছিল। Publishers Notice-এর সাক্ষ্যে এর জনপ্রিয়তার নমুনা মিলবে –

> By reason of its enormous popularity in the Christian world, and because it has become a religious guide-book for the pious Buddhist, the publishers are encouraged in the present issue to give the "Light of Asia" outwardly also a popular and artistic dress.[৩২]

আর্নল্ড তাঁর কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধে তাঁর কাব্য লিখনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে যা জানিয়েছেন, তার মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণ পাওয়া যেতে পারে –

> In the following poem I have sought, by the medium of an imaginary Buddhist rotary, to depict the life and character and indicate the philosophy of that noble hero and reformer, Prince Gautama of India, the founder of Buddhism.[৩৩]

জন্মভূমি ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্মের উধ্বার্য়ন ঘটলেও তা আধুনিক ব্রাহ্মণ্যবাদের উপর চিরস্থায়ী ছাপ ফেলে গেছে। কবি আরো লিখেছেন –

> I have put my poem into a Buddhist's mouth, because, to appreciate the spirit of Asiatic thoughts, they should be regarded from the Oriental point of view; and neither the miracles which consecrate this record, nor the philosophy which it embodies, could have been otherwise so naturally, reproduced.[৩৪]

কবি আর্নল্ডের কাব্য সুষমার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল –

> Carved his sweet words upon the rocks and caves:

And how-in fullness of the times – it fell
The Buddha died, the great Tathāgata,
Even as a man amongst men, fulfilling all:
And how a thousand thousand lakhs since then
Have trod the Path which leads whither he went
Unto NIRVÂNA, where the Silence lives.[৩৫]

বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতিচর্চা

প্রবন্ধ

পাশ্চাত্য গবেষক ও পণ্ডিতদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতীয় পণ্ডিতেরা বিশেষত বাংলার বুদ্ধিজীবীরা ভারততত্ত্ব এবং তারই অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বৌদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে আগ্রহী হন। ঊনবিংশ শতকে তথাকথিত নবজাগরণের পটভূমিকা এই ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিল। বাঙালিদের এই বৌদ্ধবিদ্যা চর্চার ধারা নানা খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে সমাজসংস্কার ও জাতীয়তাবাদ দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা ছিল। এছাড়াও ছিল শুদ্ধ সারস্বত চর্চার ধারা। এঁদের মধ্যে কোন জল অচল বিরোধ নেই, বরং অনেকসময়েই তা একে অপরের পরিপূরক। ব্রাহ্মপন্থী সমাজসংস্কারের ধারা, স্বাজাত্যাভিমান ও জাতীয়তাবাদী ধারা আর গবেষণাধর্মী ধারা – আমরা মোটামুটি ভাবে তিনটি ধারায় প্রবন্ধচর্চাকে বিন্যস্ত করছি।

ব্রাহ্মপন্থী ধারা

রামমোহন রায় (১৭৭৪ – ১৮৩৩)

ঊনবিংশ শতকের মহত্তম আদর্শ মানবকল্যাণের ভাবনার উদ্‌গাতা রামমোহন রায়। একদিকে ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী তাঁকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি ভারতীয় চিন্তাধারার বিশ্বজনীন ভাব এবং সর্বজীবে প্রসারিত মৈত্রীভাবনাও তাঁকে উদ্বোধিত করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কিশোরীচাঁদ মিত্র রামমোহনের চরিত্রে আধ্যাত্মজিজ্ঞাসা মৌল উপাদান এবং সমাজচিন্তা তারই আনুষঙ্গিক কিনা – এই প্রশ্ন তোলেন। আদৌ তিনি সমাজসংস্কারক? ধর্মসংক্রান্ত অনুসন্ধান ও আলোচনা কি তাঁরই মনের সেই বিশিষ্ট প্রবণতার পরিপূরক? ধর্মের সঙ্গে লোক-কল্যাণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর রামমোহন গুরুত্ব দিতেন। শ্রীমিত্র রামমোহনের ধর্মচিন্তার এই মতের নাম দিয়েছিলেন ‘theophilanthropy’ বা ঈশ্বর-

বিশ্বাসভিত্তিক মানবসেবাকর্ম।[৩৬] রামমোহন ভারতীয় ধর্মনীতিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির আলোকে বিচার করেছেন। নবযুগের সাধনা নরের মধ্যে নরোত্তমের প্রতিষ্ঠা। তাই অরণ্যচারী হয়ে নয়, সমাজ ও দেশের কল্যাণে আত্মাহুতি দিয়ে সকলপ্রকার অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন। তাঁর উদার মানবিকতা, প্রচণ্ড সংস্কার বিরোধিতা, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধতা এবং বিশ্বমৈত্রীর প্রতি গভীর আসক্তি প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ভাবনার নিবিড় পরিচয়বাহী।[৩৭]

দীননাথ সান্যাল 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধে (*মানসী ও মর্ম্মবানী*, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) লিখেছেন – তিনি বিভিন্ন ধর্মপ্রবক্তাদের বাণী পাঠ করে অতৃপ্ত হয়ে বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথা জানতে উৎসুক হয়েছিলেন। তিনি ভারতে বৌদ্ধমঠ ও শ্রমণ না থাকার জন্য দুর্গম তিব্বতে যাত্রা করেছিলেন এবং সেখানে বৌদ্ধমঠে থেকে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। রামমোহন থেকে সকল ব্রাহ্মধর্মান্দোলনকারীরাই বৌদ্ধধর্মের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের সর্বত্যাগী সংযত জীবন, উদার ধর্মনীতি, 'বর্ণাশ্রম খণ্ডকারী' বুদ্ধের জাতি-বিরোধিতা, জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সার্বিক প্রেমের বাণী, সর্বোপরি অহিংসা ও কল্যাণ-মৈত্রীর আদর্শ সংস্কারমুক্ত বাঙালি-চিত্তে এক বিপুল আলোড়ন জাগিয়েছিল। তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ, বিশেষত সনাতন ধর্মের আবিষ্কারক ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ এই আদর্শে প্রথম অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের অপৌত্তলিকতা, সংস্কারমুক্ততা, উদার মানবধর্ম ও অহিংসাবাদী নৈতিক আদর্শ তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের উপরেও অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল; ব্রাহ্মদের আদি জনক রাজা রামমোহন রায় ত্রিপিটক অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর প্রচারিত সনাতন ধর্ম ও সংস্কার-মুক্তির আদর্শে প্রাচীন বৌদ্ধমতের প্রভাব উপেক্ষনীয় নয়। রামমোহন-জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর জাতিভেদ বিরোধিতা সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, রামমোহন অনূদিত বৌদ্ধপুঁথি *বজ্রসূচী*-তে 'জাতিভেদের নিন্দা' রয়েছে।[৩৮] রামমোহনের ধর্মনীতি ত্রিস্তরীয় – ১. এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, ২. আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং ৩. মানবপ্রীতি প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ। খ্রিস্টধর্ম এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে এই সিদ্ধান্তত্রয় পরিপুষ্ট হয়। দিলীপকুমার বিশ্বাস মন্তব্য করেছেন –

> রামমোহনের ধর্মবিষয়ক সার্বভৌম সিদ্ধান্ত প্রধানত ঈশ্বরবিশ্বাসমূলক ধর্মগুলির পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মদ্বয় ঈশ্বরবর্জিত হওয়ার দরুণ স্বভাবত এর কোঠায় পড়বে না। উক্ত দুই ধর্মের সঙ্গে রামমোহনের কিছু পরিচয় ছিল–এমন অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে এই পর্যন্ত বলা যাবে যে, বৌদ্ধধর্মের

> বর্ণাশ্রমবিরোধী সামাজিক দৃষ্টি রামমোহনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল (*বজ্রসূচী* অনুবাদের মধ্যে যা প্রতিফলিত); কিন্তু তাঁর ধর্মতত্ত্বসমন্বয়ের ভূমিতে এগুলির কোনও স্থান ছিল না।[৩৯]

এই বক্তব্য সর্বাংশে মানা যায় না। ঊনবিংশ শতকের অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্য হল – দ্বিধা ও স্ববিরোধ। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে রামমোহনের দ্বিধা থাকাটাই স্বাভাবিক, যেখানে তিনি একটি যুগোপযোগী ধর্ম প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ, সেখানে তাঁর তিব্বত যাত্রা, পুথি অনুবাদ, বৌদ্ধদর্শনচর্চা ইতিবাচক কাজ রূপেই অভিনন্দনযোগ্য।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭ – ১৯০৫)

বাংলায় বৌদ্ধ বিদ্যাচর্চায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যক্ষ কোনো অবদান না থাকলেও পরোক্ষভাবে তাঁর অবদানের কথা স্বীকার্য। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ এবং পুত্র-প্রতিম কেশবচন্দ্র সেনকে নিয়ে সিংহল ভ্রমণ করেন। এই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসেন। পারস্পরিক আলোচনা-জাত ঔৎসুক্য তাঁদের মধ্যে জাগরিত হয়।[৪০] তাঁরা সিংহল থেকে বৌদ্ধধর্মের জীবন্ত আদর্শ নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। ঠাকুর পরিবারে বৌদ্ধধর্ম চর্চার ধারা নানাভাবে বাংলার বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশে সহায়তা দান করে।

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০ – ১৮৮৬)

অক্ষয়কুমার দত্ত *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র কৃতি সম্পাদক। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব নিয়ে তাঁর জ্ঞানস্পৃহা বিস্ময়কর। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (১৮৮২) রচনা করেন। এই গবেষণাগ্রন্থে ১৮২টি উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ আছে। টীকা-কণ্টকিত তথ্যপূর্ণ এই গ্রন্থ তাঁর মণীষা ও পরিশ্রমের চিহ্নবাহী। তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যে বৌদ্ধ ইতিহাস ও পুরাবৃত্তের পর্যালোচনায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়,* দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকা অংশটি ১৮০৪ শকাব্দ, ৮ চৈত্রে লিখিত হয়। এখানে বুদ্ধের জীবনী ও কর্মকৃতি, বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ, তন্ত্রাশ্রিত বিকৃত বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য ও পরিণাম অতি প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করেছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের তুলনা, অশোকের কৃতিত্ব, শিলাদিত্যের দানোৎসব ইত্যাদি বহুল তথ্যনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য আলোচনা এই অংশে রয়েছে। বৌদ্ধধর্ম ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা গভীর পাণ্ডিত্য এবং তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির পরিচয় বহন করছে। বৌদ্ধ উৎসবের জীবন্ত বর্ণনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল –

> সিংহল দ্বীপে বর্ষাকালে একটি উৎসব হইয়া থাকে, তাহাতে পালিভাষায় বিরচিত গ্রন্থ-বিশেষ পঠিত হয়। তাহাকে বনপাঠ বলে। ভিক্ষুরা একটি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বর্ষা তিন মাস তাহাতে অবস্থিতি করে এবং সেই সময়ে পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে বনপাঠ ভরিয়া থাকে। ঐ পাঠ শ্রবণোদ্দেশে মহা-সমারোহ হয়; মধ্যে মধ্যে বাদ্যোদ্যম হইতে থাকে, রাত্রিকালে দীপ-জ্যোতিতে সেই স্থান জ্যোতিষ্মান হইয়া যায় এবং বন্দুকের ধ্বনি ও অগ্নি ক্রীড়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐ বনপাঠের সময়ে যখন বুদ্ধের নাম উচ্চারিত হয়, তখন শ্রোতৃগণ সাধু সাধু বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে।[৪১]

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় তাঁর লিখনী তেমনই সাবলীল। বৌদ্ধ ও খ্রিস্টিয় ভাবনার সাদৃশ্য সম্পর্কে তাঁর লেখার অংশ প্রণিধানযোগ্য –

> বৌদ্ধমতে ও ঈশুর উপদেশে দান, দয়া, ক্ষমা, সত্যাদি স্বাভাবিক ধর্মের প্রাধান্য, এক-এক প্রকার ত্রিমূর্ত্তি স্বীকার গুরুসন্নিধানে আত্ম-পাপ অঙ্গীকার, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি ম্লেচ্ছ সকলকেই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তদীয় ফলভোগে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন, ঘণ্টা ও জপমালা ব্যবহার, নিজ নিজ দেবালয়ে দীপদান, লোবানাদি দাহ্য গন্ধদ্রব্য প্রদান, ধর্ম্ম-সঙ্গীত গান, কি স্বদেশ – কি বিদেশ সর্ব্বত্র ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয়ে বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম উভয়ের সাতিশয় সাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে।[৪২]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০ – ১৯২৬)

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের আলোচনায় বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে গভীর অনুধ্যান ও শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। *সাধনা – প্রাচ্য ও প্রতীচ্য* (১৮৯২) গ্রন্থে তিনি বুদ্ধদেবের নাস্তিক অপবাদ অপনোদন করে তাঁর আস্তিক্যবাদকে অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর মতে বুদ্ধদেব তৎকালীন লৌকিক প্রথা, কুসংস্কার, যাগ-যজ্ঞাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর সাধনা ভারতবর্ষের জাতীয় বন্ধনের সীমানা ছাড়িয়ে সর্বলৌকিক ও সর্বকালিক ধর্মে পরিণত হয়েছিল। অবশেষে ব্রাহ্মধর্মের বিরোধিতার ফলে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্মের নির্বাসন ঘটে। বুদ্ধদেব ও যিশুখ্রিস্ট – দুজনের প্রবর্তিত ধর্ম সর্বলৌকিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথের "আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত" (*তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ – অগ্রহায়ণ, ১৩০৬ শক এবং বৈশাখ, ১৩০৭) প্রবন্ধমালায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্বসহ দার্শনিক প্রস্থান অনুযায়ী দুই ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছে। প্রবন্ধটি

তাঁর ক্ষুরধার মেধা ও যুক্তিধর্মী মননশীলতার পরিচয়বাহী। বুদ্ধদেবকে তিনি পৃথিবীর সর্বোচ্চ শ্রেণির ধর্মবীরদের মধ্যে অন্যতম বলেছেন। মহাভারতের সময়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভাব এবং যাগ-যজ্ঞের বাহুল্যের প্রতিক্রিয়ার যুগে দেবানুগ্রহের পরিবর্তে আত্মশক্তির বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়ে তাঁর আবির্ভাব। ইন্দ্রিয়দমন, দুঃখের মূলোচ্ছেদের শ্রেয় পথেই নির্বাণমুক্তি সম্ভব। ঈশ্বরের প্রশ্নে তাঁর নীরবতার জন্যই পরবর্তী বৌদ্ধগণ নাস্তিকতা প্রচার করেন। বুদ্ধদেবের জীবনব্যাপী সাধনা সত্য প্রতিষ্ঠা, অহিংসা, দয়া, সত্যপরায়ণতা, অব্যভিচার এবং শুদ্ধাচারের প্রতি সর্বজাতির হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে মৌন থেকে মানুষের পুরুষকার এবং অনাদি কর্মকে তিনি ঈশ্বরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তার পরিণতি স্বরূপ পরবর্তীকালে বৌদ্ধরা একাধারে নিরীশ্বরবাদী, দেব-বিরোধী অথচ মনুষ্যপূজা ও মূর্তিপূজার আদি প্রবর্তকরূপে দেখা দিলেন। নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম কীভাবে 'সেশ্বর' হয়েছে লেখক মনননিষ্ঠ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনার সাহায্যে তা উপস্থাপিত করেছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের ভ্রষ্ট উপশাখারূপে তন্ত্রের আবির্ভাব, পঞ্চ-কামোপভোগের দ্বারা সিদ্ধিলাভের প্রচেষ্টা ও তার চরম পরিণতি এবং শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের উপর বৌদ্ধপ্রভাব আলোচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথের মুন্সীয়ানা লক্ষণীয়। তিনি বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধদর্শনকে যে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তা এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। আমরা তাঁর রচনার আংশিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি –

> বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর নাই – কিন্তু ঈশ্বর চাই। বৌদ্ধেরা প্রথমে মনুষ্যবুদ্ধকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিল, তাহার পরে তাহাদের মনে হইল যে, মনুষ্য-বুদ্ধকে ঈশ্বর বলিলে ঈশ্বরেতে অনিত্যতা দোষ পড়ে; এইরূপ মনে হওয়াতে পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা মনুষ্য বুদ্ধের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক জগতের তিনটি বিভিন্ন স্তরে তিনটি দেবতা বুদ্ধ বসাইলেন। নিচের স্তরে বসাইলেন অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ – মধ্যম স্তরে বসাইলেন অমিতাভ বুদ্ধ – তৃতীয় স্তরে বসাইলেন আদি বুদ্ধ; সর্বোচ্চ স্তরে বসাইলেন নির্ব্বাণমুক্তি।[৪৩]

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২ – ১৯২৩)

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে চর্চার অত্যল্পকাল পরে তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে (মার্চ, ১৮৬২) প্রসিদ্ধ ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিত ম্যাক্সমূলরের সংস্পর্শে আসার ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকর্ষণ আরও নিবিড় করে। সত্যেন্দ্রনাথ রচিত *বৌদ্ধধর্ম্ম* (১৯০১) গ্রন্থ বাংলাসাহিত্যে নানাদিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সত্যেন্দ্রনাথ

বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ (১০ ভাদ্র, ১৩০৭) বক্তৃতা দেন যা পরিষৎ দ্বারা প্রকাশিত হয়। তিনি বৌদ্ধধর্মকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের আলোকে দেখেছিলেন। পরে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বর্ধিত আকারে *বৌদ্ধধর্ম্ম* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে পালি সাহিত্যের থেরবাদ সহ মূলধর্মের মুখ্য তত্ত্বগুলি আলোচিত হয়েছে। সিংহল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও প্রভাব বইটি রচনার পিছনে সক্রিয় ছিল।[৪৪] সত্যেন্দ্রনাথ তথ্যাদি সংগ্রহে দেশী-বিদেশী পণ্ডিতদের গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন। রীস্ ডেভিডসের *Dialogues of the Buddha*, কার্ণের *Manual of Buddhism*, ভিণ্টসেন্ট স্মিথের *Ashoka*, ফ্রায়ারের ‘The Buddhist Discovery of America’ (Harpars Magazine, July, 1901), রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The Antiquities of Orissa* প্রভৃতি ইংরেজি এবং সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের *বৌদ্ধধর্ম্ম*, অক্ষয়কুমার দত্তের *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* প্রভৃতি বাংলা গ্রন্থের ঋণস্বীকার করেছেন।[৪৫]

বৌদ্ধধর্ম কি, বুদ্ধচরিত, বৌদ্ধ ইতিহাসের কাল নির্ণয়, বৌদ্ধধর্মের মত ও বিশ্বাস, বৌদ্ধ সঙ্ঘ, সঙ্ঘের নিয়মাবলী, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র, বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ও বিকৃতি, বৌদ্ধধর্মের উন্নতি, অবনতি ও পতন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণমণ্ডলী – ধর্মপ্রচার – জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনায় *বৌদ্ধধর্ম্ম* গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। পরিশিষ্টরূপে ধনিয়া সুত্ত [‘ধনিয়া সূত্ত’ (*ভারতী*, শ্রাবণ, ১৩১৫)] ও তেবিজ্জ সুত্তের অনুবাদ [‘তেবিজ্জ সূত্ত।’ (ব্রাহ্মণ সুখকের প্রতি বুদ্ধদেবের উপদেশ), (*ভারতী ও বালক*, আশ্বিন, ১৩০৭)] এই গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বুদ্ধত্বলাভ করে তিনি যে উদান গান করেছিলেন মূল পালি সহ লেখক নিজকৃত অনুবাদ দিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের পালি থেকে বাংলা ভাষার অনুবাদের দৃষ্টান্ত আমরা উদ্ধার করছি –

জন্মজন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ।
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর;
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তি চয়,
সংস্কার-বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।[৪৬]

ঈশ্বর, আত্মা, জন্মান্তর ইত্যাদি প্রশ্নে বুদ্ধদেবের নেতিবাচক উত্তর বা নীরবতা বৌদ্ধধর্মকে নিরীশ্বরবাদী করেছে। ধর্মের সার্বভৌম উদার সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় প্রচার, সময়োপযোগী যৌক্তিক অথচ সুবোধ্য

মর্মস্পর্শী মধুর ভাষণ এবং বুদ্ধদেবের অপূর্ব মোহিনী শক্তি বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় করেছিল। বৌদ্ধদর্শন, নীতি, পরকাল ও নির্বাণ আলোচনা করে সত্যেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন ধর্ম ও মানবজীবনে ঈশ্বরের আবশ্যকতাকে অস্বীকার করার পরিণামস্বরূপ 'অঙ্গহীন' বৌদ্ধধর্মকে ভারতভূমি থেকে নির্বাসিত হতে হয়েছে। নিরীশ্বরবাদের ভয়াবহ পরিণতিস্বরূপ বৌদ্ধধর্মে পরবর্তীকালে বুদ্ধকেই ঈশ্বর বানানো হয়েছে। প্রাতিমোক্ষ অনুযায়ী বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রায়শ্চিত্ত বিধান, বৌদ্ধধর্মে পূজাবিধি, বৌদ্ধতীর্থ সমূহের বর্ণনা, মহীয়সী স্থবিরাদের প্রসঙ্গ, সিগালবাদ সুত্তানুযায়ী বৌদ্ধ গৃহস্থ বা উপাসকদের কর্তব্য ইত্যাদির সংহত বর্ণনায় সত্যেন্দ্রনাথ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ইতিহাস ও তত্ত্বের দিক থেকে গ্রন্থকার যথাযথভাবে বৌদ্ধধর্মের অনুসরণ করেছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন তাঁর ঈপ্সিত হলেও তিনি জন্য বৌদ্ধমতের উপর হিন্দুমত আরোপের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিল।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮ – ১৮৮৪)

বাংলার জাতীয় চেতনায় ও সাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁর পরিচালিত 'নববিধান' আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে 'নববিধান' ধর্মান্দোলন সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে বিশ্বমানবের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এই আদর্শকে রূপায়িত করার লক্ষ্যে কেশবচন্দ্র অনুগামীদের বিভিন্ন ধর্মের অনুশীলনে উৎসাহিত করেন। সাধু অঘোরনাথ লুপ্ত বৌদ্ধধর্মের, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় হিন্দুধর্মের, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খ্রিস্টধর্মের এবং গিরিশচন্দ্র সেন ইসলাম ধর্মের অধ্যেতার পদে নিয়োজিত হন। একই পথে চিরঞ্জীব শর্মা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ও মহেন্দ্রনাথ বসু শিখধর্মের অনুশীলনে রত হন। বিভিন্ন ধর্ম চর্চার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের সচেতন প্রয়াস ও সমন্বয়-সাহিত্যের সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা যায়। ব্রহ্মসংগীতের মধ্যেও নববিধানের এই সমন্বয় সাধনার সুর ধরা পড়েছে। সিংহল যাত্রার আগেই বৌদ্ধধর্মের প্রতি কেশবচন্দ্রের আগ্রহ জন্মেছিল। সিংহলী বৌদ্ধদের ধর্মীয় জীবনযাপন তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। বৌদ্ধদের সমবেত প্রার্থনার অনুকরণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্রাহ্মসমাজে মণ্ডলীগত উপাসনার প্রচলন করেন। ব্রাহ্মদের সদাচার, জাতিভেদ বিরোধিতা প্রভৃতির মধ্যে বৌদ্ধ ভাবাদর্শের প্রভাব লক্ষণীয়। অনুগামীদের নিয়ে কেশবচন্দ্র বুদ্ধগয়ায়

তীর্থযাত্রা করে সকলে বোধিদ্রুমতলে ধ্যান ও প্রার্থনা করেন। বুদ্ধগয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'সাধু সমাগম' অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। এর তৃতীয় অনুষ্ঠান 'শাক্য-সমাগম'।[৪৭]

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র বুদ্ধদেবের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন। বুদ্ধদেবকে দুঃখ নিবৃত্তির অবতার বলে তিনি বুদ্ধদেবের করুণা, জাতিভেদের বিরোধিতা ও মানুষের দুঃখনিবৃত্তির পথ অনুসরণের বিষয়ে আলোকপাত করেন। কেশবচন্দ্র ঊনবিংশ শতকের বাংলায় বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসবের প্রবর্তক।[৪৮] কেশবচন্দ্রের গদ্যের আশ্চর্য সারল্য ও আকর্ষণী ক্ষমতা রয়েছে। আমরা তাঁর বক্তৃতা আংশিক উদ্ধার করছি –

> প্রভু, তোমার অপার লীলা কে বুঝিবে? বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে, বুদ্ধের বিরুদ্ধে কোটি কোটি লোক দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু বীর-পুরুষ তেজের সহিত বলিলেন, 'আমি বেদ ব্রাহ্মণ মানি না, জাতিভেদ মানি না'। বুদ্ধের আন্দোলনে হিন্দুস্থান টল্‌মল্‌ করিতে লাগিল। গৌতমের ধর্ম, ভেদাভেদ বিনাশ করিয়া সমস্ত একাকার নিরাকার করিল। ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ভেদ রহিল না। এক নতুন জাতি বৌদ্ধজাতি, চিন্তার জাতি, সমাধির জাতি, নতুন ইজরেল প্রস্তুত হইল। শাক্যের জয় হইল। নতুন সমাজ তিনি স্থাপন করিলেন।[৪৯]

কৃষ্ণবিহারী সেন (১৮৪৭ – ১৮৯৫)

কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ সহোদর কৃষ্ণবিহারী সেন বাংলায় অশোকচর্চার পথিকৃৎ। তাঁর *অশোকচরিত* (১৮৯২) বাংলা সাহিত্যে অশোক বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। তাঁর গ্রন্থে অশোকের ধর্মরাজ্য বিস্তার, ধর্মপ্রচারের উপায়, পালিভাষার প্রকাশ, ভাষার ইতিহাস, দেশের অবস্থা, মৌর্য্যবংশ, বৌদ্ধ অশোক, বৌদ্ধদের মহাসভা, প্রচারক প্রেরণ, শ্রীলঙ্কা, বোধিবৃক্ষ, স্তূপ এবং বিহার নির্মাণ, বিবিধ আদেশ প্রচার, প্রস্তর ফলকে ধর্মপ্রচার, বৌদ্ধ সংঘ ও শাস্ত্র, জীবে দয়া, বার্ধক্য এবং মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থ শেষে 'অশোক চরিত' নাটক স্থান পেয়েছে। *ভারতী ও বালক*-এ (পৌষ, ১২৯৯) কৃষ্ণবিহারীর গ্রন্থ সমালোচনায় লেখেন –

> সুযোগ্য লেখনীর অগ্রভাবে এই মহচ্চরিত্র অতি মনোহারীরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। "অশোক-চরিতের" প্রতি পত্র, প্রতিচ্ছত্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সে পাণ্ডিত্য নিতান্ত নিরাড়ম্বর সরলভাষা সরলভাবভূষিত মনোজ্ঞ রচনার মধ্য দিয়া অশোকের আদর্শজীবনের আদর্শভাব সাধারণের আয়ত্তমধ্যে আনিয়া পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

আমরা কৃষ্ণবিহারীর গ্রন্থ থেকে তাঁর গদ্যের নমুনার কিয়দংশ উদ্ধার করছি –

খ্রীঃ অব্দের আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে অশোক মনুষ্য এবং পশুদিগের জন্য প্রথম হাঁসপাতাল পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা একটি আশ্চর্য্য কথা যে ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশে কেহ কখন পশুদিগের প্রতি কর্ত্তব্য ব্যবহার দেখাইয়া দেন নাই।[৫০]

সুনীতি দেবী (১৮৬৪ – ১৯৩২)

কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা মহারানী সুনীতি দেবীর রচিত *The Life of Pirncess Yashodhara* (১৯২৯) গ্রন্থটি উল্লেখের দাবি রাখে।[৫১]

অঘোরনাথ গুপ্ত (১৮৪১ – ১৮৮১)

সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত কেশবচন্দ্রের কাছে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি কেশব-প্রবর্তিত ‘অধ্যেতা ব্রত’ (১৮৭৯) কার্যে নিযুক্ত হন। তিনি সংস্কৃত, পালি ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত বিভিন্ন বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন করে দুই বছর পর *শাক্যমুনিচরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব* রচনা করেন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ফিরবার পথে তাঁর মৃত্যু হলে কেশবচন্দ্রের নির্দেশে গৌরগোবিন্দ রায় গ্রন্থটির সম্পাদনা করে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। *শাক্যমুনি চরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব* নববিধান সমন্বয়-সাহিত্যমালার সূচনা গ্রন্থ, আবার সমগ্র বাংলাসাহিত্যে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক প্রথম সার্থক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর *Calcutta Gazette* এই গ্রন্থের সমালোচনা করে লেখে –

> This is a new memoir of the founder of Buddhism, based chiefly upon Lalita-Vistara. The Author’s treatment of his subject is methodical, and resembles that adopted in such works by European writers. His style is clear, concise and sufficiently easy. In this part is given an account of Sakyamuni, from his birth to his leaving home for the purpose of spiritual meditation.[৫২]

এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের জীবনী অঘোরনাথের ব্যক্তিগত অনুভূতিমিশ্রিত হয়ে ব্যক্ত হয়েছে। বুদ্ধদেবের নির্বাণতত্ত্ব ধ্যান ও প্রজ্ঞার অনুশীলনকারী অঘোরনাথ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিয়েছেন। লক্ষণীয় বিষয় হল, লেখক বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় সম্পর্কে মন্তব্য থেকে বিরত থেকেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত বেদনাবোধ ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হয়। ‘গ্রন্থকারের প্রস্তাবনা’য় তাঁর ব্যক্তিগত অনুভববেদ্যতায় রঞ্জিত বুদ্ধভাবনা প্রকাশিত হয়েছে –

> সেই মুনিরত্ন আমার আত্মার ভূষণ। তিনি আমার জীবনের মূলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার সমাধি ধ্যান বৈরাগ্য ও নির্ব্বাণ পবিত্রতা ও দয়া আমার হৃদয়কে বশীভূত করিয়াছে। ... যিনি রাজপুত্র হইয়াও ভিক্ষুবেশে পথে পথে নগরে নগরে দয়ার্দ্রচিত্তে জীবগণের মুক্তি ও দুঃখ নির্ব্বাণ করিবার জন্য ভ্রমণ করিলেন, যিনি অতুল ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া ভিক্ষান্নই পরম সুখ জ্ঞান করিলেন, যিনি রাজসিংহাসন ছাড়িয়া তরুতলে বাস সার করিলেন, তাঁহার এরূপ দয়া ও বৈরাগ্যের কথা মনে হইলে হৃদয় বিগলিত হয়, অশ্রুবেগ সংবরণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে। এমন মহানুভবের প্রতি হৃদয় চিরকৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারে না।[৫৩]

কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫১ – ১৯৩৬)

কেশবমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কৃষ্ণকুমার মিত্র *সঞ্জীবনী* পত্রিকার সম্পাদনার জন্য খ্যাত। তাঁর বৌদ্ধবিদ্যাচর্চায় অবদান *বুদ্ধদেব-চরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ* (১৮৮৩) গ্রন্থটি। গ্রন্থে বুদ্ধের জন্ম থেকে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত সমগ্র জীবনই সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। রচনার উৎস *ললিত বিস্তর*। কৃষ্ণকুমার পালি ও সংস্কৃতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি *সুত্তনিপাত, মহাপরিনির্বাণসুত্ত, ধম্মপদ, ক্ষুদ্দক পাঠ* প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। বৌদ্ধনীতি, সমাজ, গল্প, ধর্মের প্রসার ও অবনতি বিষয়ে লেখকের মতামত নিরপেক্ষ, উদার, ইতিহাসনিষ্ঠ ও তথ্যপূর্ণ। শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তের প্রতি বুদ্ধদেবের বিশ্বাসের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধদেব নির্গুণ, নির্বিকার ও জাগতিক বিষয় সমূহকে মায়া বলতেন। তিনি আত্মায় অবিশ্বাসী এবং 'সোহং' মতবাদে বিশ্বাসী। বুদ্ধদেব নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না এবং খ্রিস্টধর্ম বহুলাংশে তার কাছে ঋণী – ঔপনিবেশিক শাসনে থেকে এমন সাহসী মন্তব্য তাঁর গ্রন্থকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্পর্কে কৃষ্ণকুমার যা ব্যক্ত করেছেন তা বুদ্ধের সময় শুধু নয়, ঊনবিংশ শতকের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ যুগভাষ্য তৈরি করেছে –

> বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হওয়াতে ব্যক্তিগত আত্মোৎকর্ষ ও আত্মনির্ভর ও স্বাধীনভাব প্রবল হইল, পাপ করিলে তাহার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়া নৈতিক উন্নতি সাধন করিল, হিংসাদ্বেষ তিরোহিত হইয়া সর্ব্বজীবে প্রেম বিস্তৃত হইল, বাহ্য জগতের উপর অন্তর্জ্জগৎ জয় লাভ করিল। নিরামিষ ভোজন, মদ্যপান নিবারণ, দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ, আধ্যাত্মিক উন্নতি, বিরোধী ক্রিয়া-কলাপের ব্যর্থতা প্রতিপাদন, পৌরহিত্য ও জাতিবিচ্ছেদ বিনাশ, বহুবিবাহ নিবারণ, স্ত্রীজাতির ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা, ভারতে একতা ও জাতীয়

> শক্তির উদ্দীপনা, দাক্ষিণাত্যে আর্য্য আধিপত্য বিস্তার, অসভ্যদেশে সভ্যতার প্রবেশ প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মের সুমহান ফল।[৫৪]

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তি সত্ত্বেও বুদ্ধদেবের 'প্রেমশাস্ত্র'-এর প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে কৃষ্ণকুমারের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। বুদ্ধদেবের 'নীতি' এবং 'প্রেম' শাশ্বত – এই বিশ্বাসে কৃষ্ণকুমার গ্রন্থ সমাপ্তিতে লিখেছেন –

> বুদ্ধদেব নশ্বর পৃথিবী হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তাঁহার প্রচারি ধর্ম্ম এখন কলঙ্কিত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার অতুলনীয় নীতিশাস্ত্র কেহই অদ্যাপি পরাভব করিতে সমর্থ হয় নাই। যতকাল সৃষ্টি থাকিবে বুদ্ধদেবের প্রেমশাস্ত্র কেহ বিলুপ্ত করিতে সক্ষম হইবে না।[৫৫]

জাতীয়তাবাদী ধারা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ – ১৮৯৪)

ঊনবিংশ শতকের বাংলার শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর জীবনব্যাপী উপলব্ধিকে শুধু প্রকাশ করে ক্ষান্ত না থেকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বিচার, ইতিহাস ও দর্শনের সাক্ষ্য দ্বারা তাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক তাঁর বিস্তৃত কোনো রচনা নেই। তাঁর কাছে জগৎ ও জীবন প্রত্যক্ষ সত্য–অবভাষ নয়। মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণতির লক্ষ্যে তিনি 'অনুশীলন ধর্ম'-র প্রস্তাব দেন। বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধচিত্রের মহনীয়তা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হলেও বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জটিল ও অস্থির। তাঁর মূল প্রকল্প 'অনুশীলন ধর্ম' ও তার আদর্শায়িত চরিত্র হিসেবে *কৃষ্ণচরিত্র*-কে গড়ে তোলা। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঙ্কিম *কৃষ্ণচরিত্র*-কে ঐতিহাসিকতা দানের জন্য বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মকেই পূর্বপক্ষ বানিয়ে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির পথে হেঁটেছেন। তাঁর কাছে বৌদ্ধধর্ম কখনোবা ঊনবিংশ শতকের প্রেক্ষিতে পরিত্যাজ্য বলে মনে হয়েছে, কখনো আবার তার গৌরবকে হিন্দুধর্মের গৌরব হিসাবেই গণ্য করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র *সাম্য* (১৮৭৯), *কৃষ্ণচরিত্র* (১৮৯২), *ধর্মতত্ত্ব* (১৮৮৮) গ্রন্থত্রয়ে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও *বিবিধ প্রবন্ধ* – প্রথম ভাগ (১৮৮৭) এবং *বিবিধ প্রবন্ধ* – দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯২)-এর 'সাংখ্য দর্শন', 'ভারত কলঙ্ক', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি', 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার', 'লোকশিক্ষা' প্রভৃতি প্রবন্ধে বুদ্ধদেব, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গ এসেছে। ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগ সর্বাপেক্ষা গৌরবমণ্ডিত যুগ একথা স্বীকার করেও তিনি দ্বন্দ্বমুখর –

> সহস্র বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত মধ্যে যে সময়টি সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র এবং সৌষ্ঠব-লক্ষণযুক্ত, সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম্ম এই ভারতভূমির প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত হইয়া সিংহলে, নেপালে, তিব্বতে, চীনে, ব্রহ্মে, শ্যামে এই ধর্ম্ম অদ্যাপি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সেই বৌদ্ধধর্ম্মের আদি এই সাংখ্যদর্শনে। বেদে অবজ্ঞা, নির্ব্বাণ এবং নিরীশ্বরতা, বৌদ্ধধর্ম্মে এই তিনটি নূতন; এই তিনটিই ঐ ধর্ম্মের কলেবর। ... তিনটিরই মূল্য সাংখ্যদর্শনে। নির্ব্বাণ, সাংখ্যের মুক্তির পরিমাণ মাত্র। ... যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনুষ্যমধ্যে কে সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন, তখন আমরা প্রথমে শাক্যসিংহের নাম করিব। কিন্তু শাক্যসিংহের সঙ্গে সঙ্গে কপিলেরও নাম করিতে হইবে।[৫৬]

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭ – ১৮৯৪)

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঊনবিংশ শতকের আগ্রাসী হিন্দুধর্মের প্রচারক রূপে তিনি খ্যাত চিন্তক। তিনি বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক কোন প্রবন্ধ বা গ্রন্থ না লিখলেও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য বৌদ্ধধর্মকে তিনি আলোচনায় এনেছেন। *সামাজিক প্রবন্ধ* (১৮৯২) তাঁর ভাবনার আকরগ্রন্থ। এই গ্রন্থের 'জাতীয় ভাব – ভারতবর্ষে খৃষ্টানাদি' অংশে তিনি অদ্ভূত 'জাতীয়' প্রকল্পের কথা বলেছেন। তাঁর প্রকল্পে বৌদ্ধ, জৈন ধর্মমত সমালোচনাযোগ্য হলেও হিন্দুই, এমনকী ভাবনাবিশেষে এদেশীয় খ্রিস্টান, মুসলমানদেরও হিন্দুভুক্ত করতে তিনি ছাড়েননি। তাঁর রচনার কিছু অংশ উদ্ধারযোগ্য –

> খৃষ্টান ভিন্ন বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী যেসকল লোক ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বাস করেন তাঁহাদিগের মধ্যে একমাত্র পার্সি ভিন্ন অপর সকলেই আপনাদিগকে হিন্দুসমাজের শাখাবিশেষ বলিয়াই জানেন এবং সম্পূর্ণরূপে জাতীয় সহানুভূতিসম্পন্ন।[৫৭]

ভূদেব 'জাতীয় ভাব–উহা সম্বর্দ্ধনের পথ' অধ্যায়ে ভারতীয়দের মধ্যে 'স্বভাবসিদ্ধ জাতীয়ভাব'-এর সন্ধানে বৌদ্ধ ইতিহাসের কথা বলেছেন। কিন্তু হিন্দু-বৌদ্ধের পারস্পরিক স্বজাতিবিদ্বেষে সম্মিলন স্থায়িত্ব লাভ করে নি। তিনি কৌশলী ভাষায় বৌদ্ধ কৃতিত্বকেও ম্লান দেখিয়ে বিলোপের অংশে গুরুত্ব দিয়েছেন, হিন্দু-স্বাজাত্যপ্রীতিও সেইসঙ্গে ফুটে উঠেছে –

> প্রাচীন জনপদগুলিতে কতকটা আকারাদির বৈলক্ষণ্য ন্যূন হইয়া গেলে বৌদ্ধেরা অভ্যুত্থিত হইয়া হঠাৎকারে বর্ণভেদের বিলোপ চেষ্টা, কর্মকাণ্ডের দোষোদেখাষণ এবং জ্ঞান ও উপাসনার গুণকীর্ত্তন করেন। ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-সম্রাট্‌দিগের অধীনে একচ্ছত্রপ্রায় হইয়া একপ্রকার দেখিয়াছিল, আপনার বীর্য এবং প্রভাবশালিতা এবং মহিমা কেমন অপরিমেয়। ... শ্রীমৎ শঙ্কর স্বামী কর্তৃক বৌদ্ধ নিরসন দ্বারা প্রমাণীকৃত

> হইল যে, তখনও ভারতবর্ষের তাদৃশ একতাসাধন হইবার কাল উপস্থিত হয় নাই। প্রমাণিত হইল যে, বৌদ্ধেরা এমন কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিল, যাহা মনে উঠিবার বিষয় মাত্র হইয়াছিল, কার্য্যে সম্পাদিত হইবার বিষয় হয় নাই। এইজন্য বৌদ্ধ স্বয়ং হীনতেজঃ হইয়া বিনষ্ট হইল।[৫৮]

ভূদেব 'সাম্যবাদের আভ্যন্তরিক গূঢ় ভেদ' সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েও বুদ্ধদেবকে যীশু ও মহম্মদের মত 'সাম্যবাদী' বলতে অস্বীকার করেছেন। বুদ্ধের সাম্যবাদকে ব্রাহ্মণ্যবিদ্বেষের ফল বলে তিনি আখ্যায়িত করেন – বুদ্ধদেবের ধর্মমতবাদ 'ভাবিক নয়, প্রাকৃতিক'; সুতরাং তাতে সামাজিক সাম্যবাদের বীজমাত্র থাকতে পারে না। বুদ্ধদেব সামাজিক সাম্যের কোন কথাই বলেন নি; প্রত্যুত পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে ক্রমোৎকর্ষ ও ক্রমাবনতির নিয়ম স্বীকার করিয়া মনুষ্যের মধ্যে সাহজিক উৎকর্ষাপকর্ষের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তবে বৌদ্ধ মতবাদে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের প্রতি যথেষ্ট বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়ে আছে এবং এদেশে ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ করলেই সাম্যবাদ রক্ষা করা হচ্ছে বলে অনেকে বোধ করেন। নব্য গ্রন্থকর্তৃরা এরকম ভ্রান্ত হয়েই বুদ্ধদেবকে সাম্যবাদীর মধ্যে ধরেছেন। তিনি ভারতে 'ধর্মবিপ্লবের স্রোত'-এর ছিদ্র দ্বারে দেখানোর জন্য তিনি 'সংঘ' বা আত্মসম্প্রদায়কে নিরতিশয় ভক্তি এবং প্রীতি শিক্ষাদানকারী বুদ্ধদেবকেই অভিযুক্ত করেন। খ্রিস্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় আর্যধর্মকে অর্থাৎ হিন্দু ধর্মকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছেন – 'মানব মাত্রের প্রতি অনুরাগ – সরলমনা যিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের দৃষ্টির এই সীমা'। 'জীব মাত্রের প্রতি অনুরাগ' – এটি 'আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আসন' – আর্য্যেরা তারও 'উপরে, অবাঙ্‌মানসগোচরে আত্মনিমজ্জন' করতে চান।[৫৯] উল্লেখ্য যে বৌদ্ধধর্মও আর্যধর্ম। ভূদেব অনেকাংশেই একদেশদর্শীতার দ্বারা চালিত হয়ে অন্ধভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মনীষা ও প্রতিভাদীপ্ত পাণ্ডিত্য তাঁর গবেষণাকর্মকে গৌরবান্বিত করলেও, রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বুদ্ধদেবের মহনীয় আদর্শের যথাযোগ্য মূল্যায়ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন (১৮৪৮ – ১৯২৩)

মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন নাতিদীর্ঘ তাত্ত্বিক জটিলতামুক্ত প্রাঞ্জল ভাষায় *বুদ্ধদেব-চরিত* রচনা করেন। ঋজু, একমুখী ও সহজপাঠ্য হওয়ায় গ্রন্থটি উপভোগ্য হয়েছে। জন্ম থেকে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে এই গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। বুদ্ধদেবকে এখানে হিন্দুদের বিষ্ণু অবতার রূপে চিহ্নিত করা

হয়েছে। *বুদ্ধচরিত*-কে মধ্যযুগীয় চরিতকাব্যের ধরণে লেখা হয়েছে। স্বভাবতই এক্ষেত্রে আমাদের চৈতন্যচরিতের কথা স্মরণে আসবে। চৈতন্যচরিতের মতই বুদ্ধচরিতকে আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলায় বিভক্ত করে বিদ্যারত্ন উপস্থাপিত করেছেন। 'ভগবানের বুদ্ধরূপে আবির্ভাব'-এর কারণ গীতা অনুযায়ী ব্যাখ্যাত –

> অধর্ম্মে জগৎসংসার পরিপূর্ণ হইয়াছে। অতএব এই সময়ে মরধামে অবতীর্ণ হইয়া মানবগণকে কল্যাণপথে প্রবর্ত্তিত না করিলে জগৎসংসার উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। ত্রিলোকপালক অখিলনিয়ন্তা ভগবান মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া "বুদ্ধ"রূপে অবতীর্ণ হইতে কৃতসংকল্প হইলেন।[৬০]

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ – ১৯০২)

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবের উত্তরসাধক রূপে যিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। বুদ্ধচর্চার ক্ষেত্রে স্বামীজীর অসীম শ্রদ্ধা এবং উৎসাহ থাকলেও বৌদ্ধধর্ম ও সম্প্রদায় অনেকসময়ই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। তিনি নিছক পুরাতত্ত্ব বা দর্শন আলোচনা নয়, বুদ্ধদেবের ভাবনাকে তাঁর যাপনে রূপদান করতে চেয়েছিলেন। ধর্মীয় মতবাদে বেদান্তপন্থী বিবেকানন্দের বুদ্ধপ্রীতি একইসঙ্গে অসেতুসাধ্য অথচ অপ্রতিরোধ্য ছিল। নিরীশ্বরবাদ বৌদ্ধধর্ম তাঁকে স্বভাবতই আকর্ষণ করে নি, কিন্তু বুদ্ধদেবকে তিনি ব্যক্তিগত ঈশ্বর বানিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতামালায় বুদ্ধদেবের এবং বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রসঙ্গ বারেবারেই এসেছে। তিনি বৌদ্ধ চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্যের অনুরাগী ছিলেন। ভারত শিল্পের চরমোৎকর্ষকাল রূপে বৌদ্ধযুগের প্রতি তাঁর অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ ছিল। নিবেদিতা, ওকাকুরা প্রমুখদের এক্ষেত্রে তিনি উৎসাহিত করেন। স্বামী অখণ্ডানন্দকে ফেব্রুয়ারি ১৮৯০-তে বিবেকানন্দ বুদ্ধ সম্পর্কে লিখেছেন –

> বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই – তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি।[৬১]

বুদ্ধচরিত্রের যে দিকগুলি বিবেকানন্দের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল, যা বারংবার তাঁর বক্তৃতায় উঠে এসেছে, সেগুলি হল–রাজপুত্র সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য ও আত্মত্যাগ, চারিত্রিক পবিত্রতা, মহৎ ও সর্বজনীন হৃদয়, অনন্ত সহিষ্ণুতা, সুগভীর মানবপ্রেম, করুণা ও মৈত্রী, সাংগঠনিক শক্তি, নারী-স্বাধীনতার ভাবনা, যুক্তিনিষ্ঠা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, গণতন্ত্রের পক্ষে ভাবনা। শিকাগো ধর্ম মহাসভায় ছয়টি ভাষণের মধ্যে একটির শিরোনাম 'Buddhism, The Fulfillment of Hinduism'। সম্মেলনের ষোড়শ দিন ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩-এ এই বিষয়ে বক্তৃতা দেন। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে তাঁকে বিদেশে আরো পাঁচবার বক্তৃতা করতে হয়েছে। তারিখহীন একটি আলোচনার শিরোনাম 'Buddhism and Vedanta'; আমেরিকার

ডেট্রয়েটে প্রদত্ত তারিখহীন ভাষণের শিরোনাম ‘On Lord Buddha’; ক্যালিফোর্ণিয়ায় ২ ফেব্রুয়ারি ১৯০০-য় প্রদত্ত ভাষণের শিরোনাম ‘Buddhistic India’; ১৮ মার্চ, ১৯০০ সানফ্রান্সিসকোর ভাষণটির শিরোনাম ‘Buddha’s Message to the Wrold’ এবং তারিখহীন ক্লাসনোটের শিরোনাম ‘Are Buddha and Christ Identical?’। তাঁর ইংরেজি রচনাবলীতে এই ভাষণগুলি ছাড়াও অন্যান্য লেখা ও বক্তৃতায় বুদ্ধ ও বুদ্ধসংস্কৃতির প্রসঙ্গ বারম্বার এসেছে।[৬২] বৌদ্ধধর্ম প্রায়শই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য; বিশেষত অবক্ষয়কালীন তন্ত্রাচার সমন্বিত বৌদ্ধধর্ম। তবুও মাঝে মধ্যেই তার বন্দনাও বিবেকানন্দের ভাবনায় ধরা পড়েছে –

> বৌদ্ধধর্মই জগতের সার্বভৌম ধর্মের প্রথম অভিব্যক্তি। সুতরাং এর অনুশীলন স্বতই বিশেষ আকর্ষণীয়।[৬৩]

বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের চরম পরিণতি রূপে স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে হিন্দুধর্মকেই গৌরবান্বিত করার প্রচেষ্টায় তাঁর লেখনী প্রায়শই মুখর হয়ে উঠেছে। আংশিক উদ্ধৃতি উদ্ধারযোগ্য –

> ... শাক্যমুনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে নয়; তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও যুক্তিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত – ন্যায়সম্মত বিশ্বাস।[৬৪]

বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও চিঠিপত্রে এই বিষয়ে প্রচুর আলোচনা রয়েছে। আমরা তিনটি আংশিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি যা স্পষ্টতই বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্ম হিসাবে দাবি করেছে –

> ক) Buddha came to whip us into practice. Be good, destroy the passions. Then you will know for yourself whether Dvaita or Advaita philosophy is true – whether there is one or there are more than one. Buddha was a reformer of Hinduism.[৬৫]

> খ) Buddha was a great Vedantist (for Buddhism was really only an offshoot of Vedanta), and Shankara is often called a “hidden Buddhist”. Buddha made the analysis, Shankara made the synthesis out of it. Buddha never bowed down to anything neither Veda, nor caste, nor priest, nor custom. He fearlessly reasoned so far as reason could take him. Such a fearless search for truth and such love for every living thing the world has never seen.[৬৬]

> গ) Shakya Muni was a Hindu … Shakya Muni came not to destroy, but he was the fulfillment, the logical conclusion, the logical development of the religious of the Hindus.[৬৭]

গবেষণাধর্মী ধারা

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২ – ১৮৯১)

বাংলায় বৌদ্ধসংস্কৃতি আলোচনার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পথিকৃৎ। তিনি ঊনবিংশ শতকের বাংলার একজন দিক্‌পাল পণ্ডিত ও পুরাতত্ত্ববিদরূপে বাংলায় বা ভারতেই শুধু নয়, পাশ্চাত্যের বিদ্বজ্জন সমাজেও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য, সম্পাদক, সহ-সভাপতি, ভাষাতত্ত্ব বিভাগীয় সম্পাদক ও সভাপতিরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি।[৬৮]

প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ রাজেন্দ্রলাল বৌদ্ধবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রেখে গেছেন। ১৮৬৮ – ৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারত সরকারের অনুরোধে উড়িষ্যার স্থাপত্য-ভাস্কর্যের সন্ধানে উড়িষ্যা ভ্রমণ করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণরের অনুরোধে বুদ্ধগয়ায় প্রাচীন স্থাপত্য-ভাস্কর্যের সন্ধানে বুদ্ধগয়া ভ্রমণ করে গভর্ণমেন্টকে পুরাকীর্তি রক্ষার উপায় সম্পর্কে মতামত দেন। তাঁর উড়িষ্যা ও বুদ্ধগয়া সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি হল – *The Antiquities of Orissa;* 2 Vols, (১৮৭৫, ১৮৮০) এবং *Buddha Gaya: The Hermitage of Sakya Muni* (১৮৭৮)। রাজেন্দ্রলাল উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস ও বুদ্ধগয়ার ইতিহাস লিখনকালে এই সব স্থান ফোটোগ্রাফার এবং নক্সা অঙ্কনকারীদের সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করতেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অধীত সংস্কৃত গ্রন্থাদির সাক্ষ্য, শিলালেখাদির পাঠোদ্ধার ইত্যাদির দ্বারা তাঁর বক্তব্যকে তিনি দৃঢ়ীভূত করতেন। এশিয়াটিক সোসাইট প্রবর্তিত *বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা* গ্রন্থমালার ১২টি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে মহাযানী বৌদ্ধগ্রন্থ *ললিত বিস্তর* (১৮৫৩ – ১৮৭৭) এবং *অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা* (১৮৫৩ – ১৮৭৭) গ্রন্থ রয়েছে। মূল গ্রন্থ সম্পাদনা ব্যতীত তিনি *Bibliotheca Indica* গ্রন্থমালার *ললিত বিস্তর*-এর আংশিক অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর *An Introduction to the Lalit Vistara* (১৮৭৭) নামক মৌলিক তথ্যবহুল রচনাটির উল্লেখ করা যায়। রাজেন্দ্রলাল দুষ্প্রাপ্য পুঁথিসমূহের বিবরণীমূলক তালিকা সংকলন করে বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থকে চির বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছেন। নেপালের বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্য *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* (১৮৮২) তাঁর বিশেষ চেষ্টাতেই প্রকাশ লাভ করে।[৬৯] তাঁর এই অনুবাদ দ্বারা কেবল পণ্ডিত গবেষকরাই নন, সাধারণ পাঠকও এর থেকে রসাস্বাদন করে উপকৃত হয়েছেন। *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থে ৮৫টি নেপালি বৌদ্ধ-সংস্কৃত রচনার পরিচয় দিয়েছেন।

রাজেন্দ্রলাল *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ* (১৮৫১) এবং *রহস্য সন্দর্ভ* (১৮৬৩) মাসিক পত্রের সম্পাদনা করেন। এই মাসিক পত্রদ্বয়ে কয়েকটি বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ভারতীয় পণ্ডিতদের জন্য বৈজ্ঞানিক রীতির গবেষণা পদ্ধতি সর্বপ্রথম রাজেন্দ্রলাল প্রবর্তন করেন।

রামদাস সেন (১৮৪৫ – ১৮৮৭)

বৌদ্ধশাস্ত্রানুরাগী রামদাস সেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব আলোচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে বহরমপুর লিটারারি সোসাইটির উদ্যোগে 'On Modern Buddhistic Researches' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধারকল্পে ব্রায়ান হটন্ হজসন ও ইউজিন বুর্ণুফের বিপুল অধ্যবসায় ও মনীষার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেন। বক্তৃতাটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়ে দেশ-বিদেশের পণ্ডিতদের প্রশংসা অর্জন করে। জীবনের শেষভাগে তিনি প্রাচীন সংস্কৃত ও পালিসাহিত্য-লব্ধ তথ্যাবলীর ভিত্তিতে বুদ্ধদেব সম্পর্কে একটি সুবৃহৎ ও মৌলিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর *বুদ্ধদেব – তাঁহার জীবন ও ধর্ম্মনীতি* নামে তা ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত করা হয়েছিল। রামদাস বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য বিশেষভাবে ভাষা শিক্ষা করেন এবং নানা বৌদ্ধস্তূপ-চৈত্যাদি পরিদর্শন করেন। *বুদ্ধদেব – তাঁহার জীবন ও ধর্ম্মনীতি* গ্রন্থে তিনি বৌদ্ধদর্শনকে প্রাচীন হিন্দুদর্শনেরই একটি শাখা বলে উল্লেখ করেন। তাঁর 'শাক্যসিংহের আবির্ভাব কাল' (*আর্য্যদর্শন*, ভাদ্র ও আশ্বিন, ১২৯২); 'শাক্যবংশের উৎপত্তি' (ফাল্গুন, ১২৯২), 'শাক্যসিংহের মাতামহকুলের ইতিহাস' (*ভারতী ও বালক*, বৈশাখ, ১২৯৩); 'শাক্যসিংহের কৌমার জীবনের কথা' (*ভারতী ও বালক*, ভাদ্র, ১২৯৩); 'শাক্যসিংহের উদ্যানযাত্রা' (*ভারতী ও বালক*, ফাল্গুন, ১২৯৩); 'বুদ্ধচরিত। গোপার স্বপ্নদর্শন' (*নবজীবন*, পৌষ, ১২৯৩); 'বুদ্ধচরিত।' (*নবজীবন*, আষাঢ়, ১২৯৪); 'শাক্যসিংহের মগধ বিহার' (*ভারতী ও বালক*, কার্তিক, ১২৯৪) প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। ইংরেজি ভাষায় পারঙ্গমতা সত্ত্বেও তিনি বাংলাভাষায় তাঁর প্রধান রচনাগুলি লেখেন। তাঁর লিখিত *ঐতিহাসিক রহস্য* তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় ভাগ (১৮৭৬)-এর মধ্যে 'শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়', 'বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন', 'পালিভাষা ও তৎসমালোচন', 'বুদ্ধদেবের দন্ত'; তৃতীয় ভাগ (১৮৭৮)-এর

মধ্যে 'বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ' প্রবন্ধ রয়েছে।[৭০] আমরা *বুদ্ধদেব – তাঁহার জীবন ও ধর্ম্মনীতি* গ্রন্থ থেকে তাঁর তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব চর্চার একটা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি –

> নির্ব্বাণ। – বুদ্ধের নির্ব্বাণ ও হিন্দু যোগীদিগের কৈবল্য একই তত্ত্ব। বুদ্ধ যাহাকে নির্ব্বাণ আখ্যায় অভিহিত করিতেন, হিন্দু যোগীরা তাহাকেই কৈবল্য (কেবল ভাব) বলিতেন। অতএব বুদ্ধের নির্ব্বাণ নিতান্ত অভিনব পদার্থ নহে।[৭১]

রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯ – ১৯০০)

বাঙালির ইতিহাস চর্চায় রজনীকান্ত গুপ্তের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র প্রথম সম্পাদক (১৩০১ – ১৩০৩)। তাঁর *ভারতকাহিনি* (১৮৮৩) গ্রন্থের অন্তর্গত 'অশোক', 'ভারতে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য', 'চিনা পরিব্রাজকদের ভারতভ্রমণ' প্রভৃতি বৌদ্ধ ভারতের একটি উজ্জ্বল চিত্রকে উপস্থাপন করেছে।[৭২]

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮ – ১৯০৯)

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮ – ১৯০৯) *Civilization of India* (১৯০০) গ্রন্থটির চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তাঁর বৌদ্ধ ইতিহাস বিশ্লেষণ জাতীয়তাবাদী হিন্দু প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

শরচ্চন্দ্র দাশ (১৮৪৯ – ১৯১৭)

বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে শরচ্চন্দ্র দাশ কিংবদন্তী চরিত্র। প্রখ্যাত পরিব্রাজক, আবিষ্কারক এবং তিব্বতীয় গবেষণা বা 'ভোটবিদ্যা' চর্চার পথিকৃৎ। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ এবং ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি তিব্বতের রাজধানী লাসায় যান। প্রথমবারের সময় লাসায় বিদেশীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সেখানে প্রাচীন পুথিপত্র এবং ধর্ম ও পৌরাণিক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য তাঁকে বিপজ্জনক ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। দ্বিতীয়বার তিনি ত্রয়োদশ দলাই লামার দর্শন লাভ করেন। বাংলা সাময়িক পত্রগুলিতে তাঁর তিব্বত যাত্রার ও বৌদ্ধধর্মবিষয়ক নানা কথা প্রকাশিত হয়েছে। বৌদ্ধ ভ্রমণকাহিনি রচনার তিনি পথিকৃৎ। তিব্বত ভ্রমণকালে তিনি হিমালয়, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তিব্বতের বহু অজানা ভৌগোলিক তথ্য ও বহু বৌদ্ধ পুথিপত্র সংগ্রহ করেন। ১৮৮৭

খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়নের জন্য তিনি শ্যামদেশে যান। ১৮৮১ – ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাংলা সরকারের তিব্বতি ভাষার অনুবাদক ছিলেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে *Tibetan-English Dictionary* গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনের ‘রয়াল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি’-তে তাঁর রচিত *তিব্বত ভ্রমণ বৃত্তান্ত* গ্রন্থ প্রকাশ করেন।[৭৩]

শরচ্চন্দ্রের বৌদ্ধবিদ্যাসংক্রান্ত গ্রন্থগুলি হল – *Journey to Lhasa and Central Tibet* (১৯০২), *বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা*-র (১৩১২ – ১৩২২) অনুবাদ, *Avadana Kalpalata* (১৮৮৮), *Indian Pandits in the Land of Snow* (১৮৯৩), *The Doctrine of Trans Migration* (১৮৯৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর উদ্যোগে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় Buddhist Text Society স্থাপিত হয়। বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি নবজাগ্রত আগ্রহের ফলে সৃষ্ট এই প্রতিষ্ঠান বৌদ্ধবিদ্যাচর্চায় যুগান্তকারী ঘটনা।[৭৪]

বিনয়েন্দ্রনাথ সেন (১৮৬৮ – ১৯১৩)

বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের *Intellectual Ideal* (১৯০২) নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বৌদ্ধ ও শঙ্কর দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে। তাঁর *আরতি* (১৯১০) গ্রন্থটিতেও বৌদ্ধধর্মের বিষয় সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে।[৭৫]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩ – ১৯৩১)

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার স্বয়ং প্রতিষ্ঠানস্বরূপ। বাংলায় বৌদ্ধসংস্কৃতির গবেষণাকর্মে তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সার্থক উত্তরসাধক। রাজেন্দ্রলাল মিত্র নেপাল থেকে আনীত সংস্কৃত-বৌদ্ধ পুথিসমূহের তালিকা প্রস্তুতের কাজে সহায়করূপে হরপ্রসাদকে পান। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত হয়ে নানা অঞ্চলে ভ্রমণ করে অজস্র পুথি সংগ্রহ করেন। এই কার্যে তিনি চারবার নেপাল রাজ্যে গিয়ে (১৮৯৭, ১৮৯৮ – ১৮৯৯, ১৯০৭, ১৯২১) বহু দুষ্প্রাপ্য ও লুপ্ত-পুথি উদ্ধার করেন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর হরপ্রসাদ প্রথম পর্যায়ের দশম খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ করেন, এতে ১০২৫টি পুথির বিবরণ ছিল, এছাড়া তিনি দশটি খণ্ডের বিবরণীর সূচি আর একটি খণ্ডে প্রকাশ করেন। নবপর্যায়ের চারটি খণ্ডে ১৪৭৩টি পুথির বিবরণ লিপিবদ্ধ করে পুথি সংগ্রহ বিষয়ে

কয়েক খণ্ড প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। নেপাল রাজপরিবারের পাঠাগারে রক্ষিত তালপত্র ও অন্যান্য কাগজে লিখিত ১৩৮৮টি গ্রন্থের তালিকা *A Catalogue of palm leaf Mss. and selected paper Mss. belonging to the Darbar Library of Nepal* (2 Vols.) প্রকাশ করেন। তাঁর সংগৃহীত পুথির তালিকা বিষয়ক প্রথম খণ্ড বৌদ্ধ বিষয়ক – *Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss. in the Govt. collections under the care of Asiatic Society*, Vol-I. (১৯১৭)। হরপ্রসাদ নিজের আবিষ্কৃত অনেকগুলি দুর্লভ ও অপ্রকাশিতপূর্ব গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন, যার মধ্যে অনেকগুলি বৌদ্ধবিদ্যা সম্পর্কিত। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সম্পাদিত অশ্বঘোষের *সৌন্দরানন্দ* (*Bibliotheca Indica*, No. 192) এবং *Six Buddhist Nyaya Tracts* (Bibliotheca Indica, No.185) প্রকাশিত হয়। রত্নকীর্তি, পণ্ডিত অশোক ও রত্নাকর শান্তি রচিত বৌদ্ধ ন্যায়ের পুথি থেকে প্রমাণ করেন যে ন্যায় সূত্রগুলি এক ব্যক্তি বা কোনো এক সময়ের রচনা নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির চেষ্টায় এটির পরিণতি ও বিকাশপ্রাপ্তি ঘটেছে। বৌদ্ধ ন্যায় হিন্দু ন্যায়ের মতো ধর্মদর্শনের অন্তর্গত নয়, তা বিশুদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত তর্ক ও যুক্তিবিদ্যা – হরপ্রসাদ এই মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধ দর্শনের প্রাচীন পুথি আর্যদেবের *চতুঃশতিকা* (*Memories of Asiatic Society*, Vol III) ও ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে *অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ* (Gaekwadis Oriental Series, No. 40) সম্পাদনা করেন। *অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ* গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শন বিশেষত বজ্রযান মতবাদ ২১টি নিবন্ধে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তিনি নেপাল থেকে সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতম সুভাষিত সংগ্রহের খণ্ডিত পুথি আবিষ্কার করে নাম দেন *কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়*। এই পুথির আখ্যাপত্র, পুষ্পিকা ও আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত যে সংস্কৃত ভাষার এই আদিতম সুভাষিত সংগ্রহটি পালরাজ যুগে উত্তরবঙ্গের (বরেন্দ্রভূমি) জগদ্দল মহাবিহারের অধিবাসী বিদ্যাকর পণ্ডিত এই বিহারেই সঙ্কলিত করেছিলেন। এই সংগ্রহ বাঙালির কীর্তি এবং এর লিপি প্রাচীন বঙ্গলিপিরই একটি বিশেষ অভিব্যক্তি।

হরপ্রসাদ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নেপাল থেকে প্রাপ্ত অপভ্রংশে লিখিত রচনাগুলিকে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন রূপে চিনতে পারেন। তিনি পুথিগুলির মধ্যে সংস্কৃত টীকাসহ *চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরোজবজ্রের দোহা, কাহ্নপাদের দোহা* ও *ডাকার্ণব* – এই গ্রন্থগুলি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলীর ৫৫ সংখ্যক গ্রন্থরূপে *হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা* নামে প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত আবিষ্কার হরপ্রসাদকে কিংবদন্তী করে তুলেছে। বাংলা

ভাষা যে অন্তত দশম শতাব্দী থেকে প্রচলিত ছিল নিজের আবিষ্কৃত দশটি সংস্কৃত ভাষায় বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুথি থেকে তিনি তা প্রমাণ করেন। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত লিপিকৃত এই পুথিগুলির নাম – *হেবজ্রতন্ত্র, রামচরিত, রামচরিত টীকা, দোহাকোষপঞ্জী, অদ্বয়বজ্র* ও *অপোহসিদ্ধি*। বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়িত রূপ ধর্মঠাকুরের মধ্যে বিবর্তিত হয়েছে বলে তাঁর ধারণা, যদিও এই মত এখন পরিত্যক্ত হয়েছে। ধর্মপূজা সম্পর্কিত *শূন্য-পুরাণ* পুথিটি হরপ্রসাদের আবিষ্কার। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ বসু এটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাস, জীবন চর্যা, প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার, বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শন প্রভৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-সভাপতি, সভাপতি, বিভিন্ন সম্মেলনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার 'বুদ্ধিস্ট টেক্সট্ অ্যাণ্ড রিসার্চ সোসাইটি'-র সম্পাদক পদে তিনি বৃত হন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে গভর্ণমেন্ট তাঁকে বুদ্ধগয়ার মন্দির সংক্রান্ত কমিশনের সদস্য মনোনীত করেন। তাঁর অন্যান্য বৌদ্ধবিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে *Discovery of Living Buddhism in Bengal* (১৮৯৭), ১৯২০ – ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ছয়টি ভাষণের সংকলন *Magadhan Literature*, *প্রাচীন বাংলার গৌরব* (১৩৪৬) এবং *বৌদ্ধধর্ম* (১৩৪৮) উল্লেখযোগ্য।[৭৬]

আমাদের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচ্য প্রবন্ধগুলি ব্যতীত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত সরাসরি বৌদ্ধ বিষয়ক প্রবন্ধগুলি হল – 'আমাদের গৌরবের দুই সময়' (*বঙ্গদর্শন*, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৪), 'ভারতের লুপ্ত রত্নোদ্ধার' (*বিভা*, আষাঢ়, ১২৯৪), 'জাতিভেদ' (*বিভা*, আশ্বিন ও কার্তিক, ১২৯৪), 'কুশীনগর' (*বিভা*, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ, ১২৯৪), 'রামাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল' (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, প্রথম সংখ্যা, ১৩০৪), 'বৌদ্ধ-ঘণ্টা ও তাম্রমুকুট' (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩১৭), 'বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম' (*উদ্বোধন*, আষাঢ়, ১৩২৪), 'বাংলার পুরানো অক্ষর' (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, প্রথম সংখ্যা, ১৩২৭), 'পালবংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা' (*প্রবর্ত্তক*, কার্তিক, ১৩৩০), 'হিন্দু বৌদ্ধে তফাত' (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৩১), 'বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন' (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৩৩), 'বাংলার বৌদ্ধ সমাজ: হিন্দু ও বৌদ্ধ' (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৬), 'রত্নাকর শান্তি' (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৮), 'বৃহস্পতি রায়মুকুট' (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৩৮), 'পুরুষোত্তমদেব' (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৯), 'ভারতবর্ষের

ধর্মের ইতিহাস' (*বঙ্গশ্রী,* মাঘ, ১৩৩৯), 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের মূল সূত্র' (*মাসিক বসুমতী,* ফাল্গুন, ১৩৫৬), 'ভারতের ভক্তি সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব' (*শারদীয়া বসুমতী,* ১৩৫৭), 'Buddhism in Bengal since the Mohammadan Conquest' (*Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1885), 'Bengali Buddhist Literature' (*The Calcutta Review*, 1917)।

হরপ্রসাদের অধিকাংশ অভিভাষণগুলির মধ্যেও বৌদ্ধপ্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। বৌদ্ধপ্রসঙ্গ যুক্ত অভিভাষণগুলি হল – 'সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ' (*মানসী,* বৈশাখ, ১৩২১), 'অভিভাষণের পরিশিষ্ট' (*মানসী,* আষাঢ়, ১৩২১), 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ' (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* প্রথম সংখ্যা, ১৩২১), 'অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির সম্বোধন' (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অষ্টম অধিবেশনের কার্য-বিবরণ ১৩২১), 'সম্বোধন: সাহিত্য-পরিষৎ ১৩২২' (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩২২), 'মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা' (*নারায়ণ,* ভাদ্র, ১৩২৪), 'সভাপতির অভিভাষণ: সাহিত্য-পরিষৎ ১৩২৯' (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* প্রথম সংখ্যা, ১৩২৯), 'খানাকুল-কৃষ্ণনগর পঞ্চদশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর মূল সভাপতির সম্বোধন' (*মানসী ও মর্ম্মবাণী,* কার্তিক, ১৩৩১) 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সভাপতির অভিভাষণ: ১৩৩৫' (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৫)।

হরপ্রসাদ লিখিত গ্রন্থের ভূমিকাগুলির মধ্যে তিনটি বৌদ্ধ বিষয়ক। সেগুলি হল – বিমলাচরণ লাহা অনূদিত *সৌন্দরনন্দ কাব্য* (১৩২৯), বিমলাচরণ লাহা রচিত লিচ্ছবি জাতি (১৩২১), মুনীন্দ্র দেবরায় রচিত *সিংহল ভ্রমণ* (*পঞ্চপুষ্প,* কার্তিক, ১৩৩৯)।

উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের নানা তথ্য ও তত্ত্বের আবিষ্কারে অনলস হরপ্রসাদ দৃষ্টান্ত রেখেছেন। তাঁর কৃতিত্বের মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যার সাধনা হাল্কা ও বুদ্ধির ক্ষীণ তপস্যায় মনীষা বা মনের চরিত্রবলের অভাবের দৈন্যের সময়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'সঙ্গীবিরল সার্থকতার শিখরে' আজও বিরাজমান।[৭৭]

রামচন্দ্র বড়ুয়া (১৮৪৭ – ১৯২২)

রামচন্দ্র বড়ুয়া সর্বপ্রথম অভিধর্মের উপর *অভিধর্ম সংগ্রহ* (১৮৯১) রচনা করে বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ দর্শন ও মনস্তত্ত্ব চর্চায় অসামান্য অবদান রাখেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল – *শ্রমণ কর্তব্য, নির্বাণ কর্মস্থান* এবং অপ্রকাশিত গ্রন্থ *মহাসতিপট্‌ঠানসূত্র*। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রচিত *চট্টগ্রামের মগের ইতিহাস* গ্রন্থে

চট্টগ্রাম অঞ্চলের দেড়শো বছরের পূর্বের বৌদ্ধধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়, যা ইতিহাসচর্চার 'একটি অনন্য দলিল' রূপে বিবেচ্য হতে পারে।[৭৮]

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১ – ১৯৪২)

বিজয়চন্দ্র মজুমদার বৌদ্ধ বিদ্যাচর্চায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। *বঙ্গবাণী* পত্রিকার সম্পাদক রূপে (১৩২৮ – ১৩৪২ বঙ্গাব্দ) তাঁর অবদান রয়েছে। তাঁর কয়েকটি বুদ্ধ বিষয়ক প্রবন্ধ হল – ক) *সাহিত্য* – 'নির্ব্বাণ' (বৈশাখ, ১৩১৬); খ) *নব্যভারত* – 'অশ্বঘোষ' (ফাল্গুন, ১৩১১), 'অশ্বঘোষ' (বুদ্ধচরিত) (চৈত্র, ১৩১১), 'একটি জাতক-কথা (সুসীম জাতক)' (চৈত্র, ১৩১৩), 'পালি সাহিত্য' (মাঘ, ১৩২৭); গ) *বঙ্গবাণী* – 'চর্যা ও দোহার রচনার সময়' (ফাল্গুন, ১৩৩২), 'চর্যার ও দোহার রচয়িতাদের পরিচয়' (মাঘ, ১৩৩২), 'বৌদ্ধগণ ও দোহা' (পৌষ, ১৩৩২), 'বৌদ্ধগণ ও দোহার ভাষা' (চৈত্র, ১৩৩২), 'বৌদ্ধগানে কাহ্নুর রচনা' (কার্তিক, ১৩৩৩) প্রভৃতি।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (১৮৭০ – ১৯২০)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা-র ভূতপূর্ব সম্পাদক সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বৌদ্ধদর্শন ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত। লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য সতীশচন্দ্রের বহু প্রবন্ধ এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণাপত্রে বেরিয়েছিল। বৌদ্ধসাহিত্যে তাঁর অধিকারের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'ত্রিপিটক বাগীশ্বর' উপাধিতে অলঙ্কৃত করা হয়। তাঁর কয়েকটি বুদ্ধ বিষয়ক প্রবন্ধ হল – ক) *অবসর* – 'বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়' (চৈত্র, ১৩১৪); খ) *ভারতী* – 'প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম প্রচারকগণ' (আষাঢ়, ১৩০৮), 'মগধের প্রাচীন ইতিহাস' (ভাদ্র, ১৩০৮), 'ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধ্বংস' (অগ্রহায়ণ, ১৩০৮), 'অঙ্গুত্তর নিকায়' (শ্রাবণ, ১৩০৯), 'প্রাচীন ভারতের লিচ্ছবিজাতি' (মাঘ, ১৩০৯), 'প্রাতিমোক্ষ' (চৈত্র, ১৩১০), 'কুমারজীব' (বৈশাখ, ১৩১১), 'শূন্যবাদ' (আষাঢ়, ১৩১১), 'প্রজ্ঞাপারমিতা' (কার্তিক, ১৩১১), 'অমোঘ বজ্র (বৌদ্ধ প্রচারক – খৃঃ অব্দ ৭০৪ – ৭৭৪' (বৈশাখ, ১৩১২), 'তিব্বতদেশের বজ্রভৈরব' (আশ্বিন, ১৩১২), 'বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়' (বৈশাখ, ১৩১৫), 'সিকিম ভ্রমণ: ভূমিকা' (মাঘ, ১৩১৫), 'লঙ্কায় বুদ্ধের দন্ত' (ভাদ্র, ১৩১৭), 'মিহিনতালে পাহাড়ের গাত্রস্থিত শিলালিপি' (বৈশাখ, ১৩৩০) ; গ) *সাহিত্য* – 'তিব্বতের

ষোড়শ মহাস্থবির' (বৈশাখ, ১৩১২), 'তিব্বতীয় বৌদ্ধ চিত্রফলক' (আষাঢ়, ১৩১২), 'তাসিলামার ভারত ভ্রমণ' (শ্রাবণ, ১৩১৩) 'শূন্যপুরাণ' (আশ্বিন, ১৩২১), 'শূন্য' (কার্তিক, ১৩২১)।

সতীশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য এবং পরিশ্রমের মেলবন্ধন ঘটেছে *বুদ্ধদেব* (১৯০৪) গ্রন্থে। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ পুরাতত্ত্ব ও বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে আলোচনাকালে প্রাচীন পালি সাহিত্য, বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য ও গাথার উপাদান ব্যাপকভাবে তিনি ব্যবহার করেন। টীকা-কণ্টকিত গ্রন্থে লেখকের পাণ্ডিত্যের প্রকাশ রয়েছে। *ললিত বিস্তর, বুদ্ধচরিত, মহাবর্গ, মহাপরিনির্বাণ সূত্র, জাতক* প্রভৃতি গ্রন্থ, চিনা, জাপানি, তিব্বতী প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি *বুদ্ধদেব* রচনা করেন। গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে বুদ্ধ বন্দনামূলক উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। শাক্যসিংহকে পুরাণকারগণ 'বিষ্ণুর অবতার' রূপে স্বীকৃতি দিয়ে বৌদ্ধধর্মের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করেন। বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মবিষয়ক বৃত্তান্ত, শাক্যবংশের পরিচয়, বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ থেকে বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত সংকলন করে গ্রন্থকে তথ্যসমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় করেছেন। কিছু কিছু নতুন তথ্য এসেছে, যেমন *ললিত বিস্তর* মতে বুদ্ধদেবের একমাত্র পত্নী গোপা বা যশোধরা। অথচ চীনা গ্রন্থে বুদ্ধদেবের পত্নী সংখ্যা তিন – যশোধরা, গোতমী এবং মনোহরা। সতীশচন্দ্র *ললিত বিস্তর*-কেই সমর্থন করেছেন। তিনি বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত মারবিজয়ের সঙ্গে *কুমারসম্ভব* ও *শিবপুরাণ* বর্ণিত কন্দর্পজয়ের সৌসাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। তাঁর সুলিখিত ও তথ্যবহুল গ্রন্থে *ললিত বিস্তর* গ্রন্থের মত অনুযায়ী বুদ্ধদেবের পূর্বজন্ম, শাক্যবংশ, বুদ্ধদেবের জীবনচরিত; *বুদ্ধচরিত* অনুযায়ী মারবিজয়, বুদ্ধত্বলাভ ও ধর্মচক্র প্রবর্তন, বুদ্ধদেবের শেষ জীবন, বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচার, বৌদ্ধ রমণীগণ, বুদ্ধের উপদেশ প্রণালী, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, বৌদ্ধজীবনের আদর্শ, পাতিমোক্ষ বিশেষ যত্ন সহকারে আলোচিত হয়েছে। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পদ্ধতি অনুসারে পাতিমোক্ষ বিশ্লেষণে তাঁর মুন্সীয়ানা আমরা উদ্ধার করছি –

> যীশু খৃষ্টের জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ পাপ খ্যাপনের (Confession of sin) উৎকৃষ্ট প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। মনু পাপ খ্যাপনের উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু উহার বিস্তারিত প্রণালী নির্দ্দেশ করেন নাই। খৃষ্টান জাতির বাইবেল গ্রন্থে পাপ খ্যাপনের সামান্য উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রোমান ক্যাথোলিক খৃষ্টানগণ এই প্রথার সম্যক পরিপুষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মযাজকের নিকটে গোপন পাপ খ্যাপন করিলেই হয় কিন্তু বৌদ্ধগণের মতে ইহা সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীর সমক্ষে ব্যক্ত করিতে হইবে। রোমান্ ক্যাথোলিকগণ বৌদ্ধগণের অনুকরণে খ্যাপন প্রথার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান হয়।[৭৯]

অন্যান্য চিন্তক

বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি চর্চায় বাঙালি চিন্তকদের অবদান অনস্বীকার্য। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫ – ১৮৮৬), ঈশানচন্দ্র ঘোষ (১৮৫৮ – ১৯৩৫), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১ – ১৯৩০), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ – ১৯৪১), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪ – ১৯১৯), দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬ – ১৯৩৯), হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮ – ১৯৪২), প্রমথনাথ তর্কভূষণ (১৮৬৫ – ১৯৪৪), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮ – ১৯৪৬), মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৬৮ – ১৯৩০), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০ – ১৮৯৯), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১ – ১৯৫১), বিধুশেখর শাস্ত্রী (১৮৭৮ – ১৯৫৯), রাধাগোবিন্দ বসাক (১৮৮৫ – ১৯৮২), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫ – ১৯৩০), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫ – ১৯৬৯), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০ – ১৯৭৭), অসিতকুমার হালদার (১৮৯০ – ১৯৬৪), বিমলাচরণ লাহা (১৮৯১ – ১৯৬৯), নলিনাক্ষ দত্ত (১৮৯৪ – ১৯৭৩), বিনয়তোষ ভট্টাচার্য (১৮৯৭ – ১৯৬৪), প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৮৯৮ – ১৯৫৬) প্রমুখের অবদানে বৌদ্ধসংস্কৃতি চর্চা সমৃদ্ধ হয়েছে। বৌদ্ধদের মধ্যে প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির (১৮৭৮ – ১৯৭০), বংশদীপ মহাস্থবির (১৮৮০ – ১৯৭১), অগ্রসার মহাস্থবির (১৮৮৩ – ১৯৪২), ভিক্ষু শীলভদ্র (১৮৮৪ – ১৯৫৫), বেণীমাধব বড়ুয়া (১৮৮৮ – ১৯৪৮), ধর্মাধার মহাস্থবির (১৯০১ – ২০০০), জ্যোতির্মালা চৌধুরী (১৯০৩ – ১৯৮১), ভূপেন্দ্রনাথ মুৎসুদ্দি (১৯০৬ – ১৯৮৬), শিলাচার শাস্ত্রী (১৯১৪ – ১৯৮৯) প্রমুখের রচনা এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।[৮০]

কাব্য ও কবিতা

গৌতম বুদ্ধের জীবন, বৌদ্ধ-ভারতের অবিস্মরণীয় কীর্তি এবং বৌদ্ধযুগের সম্রাট, শ্রাবক প্রভৃতি সমসাময়িক চরিত্রদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কাব্য ও কবিতা কম লেখা হয় নি। *চর্যাপদ* ও রামচন্দ্র কবিভারতীর *ভক্তিশতকম্* এবং *বৃত্তমালাখ্যা*-র উত্তরাধিকার এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। সেই ধারা আজও অব্যাহত।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭ – ১৯০৯)

নবীনচন্দ্র সেন ১৮৮০ থেকে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিহারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর থাকাকালীন বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন স্থানসমূহ দর্শন করেন। এছাড়াও চট্টগ্রামের ভূমিপুত্র নবীনচন্দ্রের সঙ্গে বাঙালি বৌদ্ধদের যোগ ছিল। তাঁর *আমার জীবন* পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত (১৯০৮ - ১৯১৩) স্মৃতিমূলক গদ্যে জানিয়েছেন –

> ... প্রায় সর্বত্র এমন কি – এডুইন আর্ণল্ডের 'লাইট অফ এশিয়া'য় পর্যন্ত বুদ্ধ-চরিত্র অতিরঞ্জিত, অতিমানুষকভাবে চিত্রিত। তাহাতে ঠিক রক্ত-মাংসের বুদ্ধকে দেখিতে পাই না। ... অতএব আমরা যেভাবে বুদ্ধকে চক্ষের উপর দেখিতে পাই, তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি, সেভাবে চিত্র করাই আমার উদ্দেশ্য।[৮১]

সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি বৌদ্ধসাহিত্য এবং *The Light of Asia* অবলম্বনে নবীনচন্দ্র *অমিতাভ* (১৮৯৫) কাব্য রচনা করেন। উনিশটি সর্গে বিভক্ত এই কাব্যে বাংলাভাষায় প্রথম বুদ্ধদেবের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ধারাবাহিক জীবনী কাব্য। কাব্যের ভূমিকাস্বরূপ 'অমিতাভ' গদ্যরচনায় নবীনচন্দ্র বলেন তিনি বুদ্ধদেবকে 'মানুষিক ভাবাপন্ন' করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, 'প্রচলিত হিন্দুধর্ম বৌদ্ধমতে অনুপ্রাণিত'। আবার 'বুদ্ধ-মত সর্ব্বভৌম হিন্দুধর্ম্মের একটি মত মাত্র।'[৮২] গদ্যের শেষে তিনি জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষিতে হিন্দু অবতারবাদের প্রশ্ন টেনেছেন –

> আবার ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। কাল পূর্ণ, এখন সেই মহা-প্রতিজ্ঞা আমাদিগের একমাত্র আশা – "সম্ভবামি যুগে যুগে।" এস! এই মহা আশা-স্রোতে জাতীয় তরণী ভাসাইয়া দিয়া তাঁহার আবাহনের জন্য আমরা ভারতসন্তানগণ অগ্রসর হই।[৮৩]

অবতার রূপে কল্পনার ফলে বুদ্ধদেবের মানবিকতা খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বুদ্ধদেব এখানে 'নর-নারায়ণ'। পয়ার ও ত্রিপদী বন্ধে রচিত এই কাব্যে নবীনচন্দ্রের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, কল্পনাশক্তি ও আন্তরিক আবেগের প্রকাশ ঘটেছে। কৃষ্ণবিরহে যোগিনী রাধার আদলে সিদ্ধার্থ বিরহে যশোধরাকে চিত্রিত করা হয়েছে –

খুলি আপনার বসনভূষণ,
কাটিয়া অলক-দাম,
যৌবনে যোগিনী সাজিয়া করিলা
বেদি-পদমূলে দান।[৮৪]

ফুলচন্দ্র বড়ুয়া (সময়কাল অজ্ঞাত)

বাংলার বৌদ্ধ সাহিত্যিকদের মধ্যে ফুলচন্দ্র বড়ুয়ার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি রানি কালিন্দীর (মৃত্যু ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ) সমসাময়িক। তাঁর আগে বাঙালি বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত পালাগান জাতীয় কয়েকটি রচনার সন্ধান পাওয়া গেলেও সময়কাল জানা যায় নি। বেণীমাধব বড়ুয়া 'বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান' প্রবন্ধে (*বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ*, ১৩৫২) লিখেছেন–

> গুরুঠাকুরী যুগে 'মঘা খমুজা'র অজ্ঞাত রচয়িতার অব্যবহিত পরেই যশস্বী লেখক ফুলচন্দ্রের অভ্যুদয় হয়। ... পালি ও বাংলা, এই দুই ভাষায় সমান অধিকার লইয়া তাঁহার সমকক্ষ পণ্ডিত ঐ অন্ধকার-যুগে এ দেশে দ্বিতীয় আর কেহ ছিল না। ... তারপর তিনি (রানী কালিন্দী) ভাবিলেন, কি উপায়ে রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায়, নিত্য পাঠ করিতে পারে, বাংলায় এরূপ অমিয় বুদ্ধচরিত রচনা করাইয়া বিতরণ করা যায়। ... পালি ধাতুবংসের সরল পদ্যানুবাদ করাই স্থির হইল। উহার রচনাকার্যে ফুলচন্দ্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এবং ... নীলকমল দাস গণেশের কার্য করিলেন। অনুবাদ গ্রন্থকে 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' নাম দেওয়া হইল। কেহ কেহ বলেন, ফুলচন্দ্রের গদ্য অনুবাদ এবং নীলকমলের পদ্যরচনার ফলেই 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' রচিত হয়, যাহা চট্টগ্রামবাসী বড়ুয়াদের ঘরে ঘরে 'তাধুয়াইং পুথি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে ...।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে *বৌদ্ধরঞ্জিকা* কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়। এই বছরই চট্টগ্রামের রানি কালিন্দীর মৃত্যুতে গ্রন্থটির প্রকাশ বিলম্বিত হয়ে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কেউ কেউ মনে করেন, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে হরগোবিন্দ মুৎসুদ্দি ও পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র বড়ুয়ার রচিত *পাদিমুখ* বাংলা ভাষায় রচিত বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। আবার অনেকে অজ্ঞাত লেখকের *মঘা খমুজাই*-কে বাংলা ভাষায় রচিত বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ বলে দাবি জানান।[৮৫]

ধর্মরাজ বড়ুয়া (১৮৬০ – ১৮৯৪)

বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে বৌদ্ধ সংস্কৃত ও বুদ্ধবাণী প্রচারের ক্ষেত্রে প্রথিতযশা ধর্মরাজ বড়ুয়ার অবদান অনস্বীকার্য। শ্রীলঙ্কা ও শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বিদ্যালাভ করে ধর্মদর্শন বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সংকলিত *হস্তসার* (১৮৯৩) গ্রন্থটি মূল্যবান। এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ সব সময় কাছে রাখতেন। *নটীর পূজা, চণ্ডালিকা* প্রভৃতি নাটকের অধিকাংশ মন্ত্র এই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। *হস্তসার* বাংলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্মের মহিমা ও উন্নত নৈতিকতা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর প্রথম বৌদ্ধগ্রন্থ *সূত্রনিপাত* (১৮৮৭) পালি *সুত্তনিপাত*-এর সরল বাংলা পদ্যানুবাদ। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ *ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত, সিঙ্গালকসুত্ত, শ্যামাবতী* প্রভৃতি।[৮৬]

নবরাজ বড়ুয়া (১৮৬৬ – ১৮৯৬)

নবরাজ বড়ুয়া বাংলাভাষায় বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। বেণীমাধব বড়ুয়া 'বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান' প্রবন্ধে (*বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ*, ১৩৫২) নবরাজের *বৌদ্ধালঙ্কার, শিক্ষাসার, প্রকৃত সুখী কে, প্রসন্নজিতোপাখ্যান, বুদ্ধ-পরিচয়, নীতিরত্ন, প্রাথমিক বৌদ্ধশিক্ষা, পালি ব্যাকরণ, উবুকলীল* ও *অভিধর্ম দীপিকা*-র বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ – ১৯৪১)

বুদ্ধদেব, বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর কীভাবে বর্তেছিল তা স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের *কথা* (১৯০০) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত বৌদ্ধ আখ্যানমূলক কবিতাগুলিতে বৌদ্ধযুগের ও বৌদ্ধ চিন্তনের পরিচয় সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'নগরলক্ষ্মী', 'মস্তকবিক্রয়', 'পূজারিনী', 'অভিসার', 'পরিশোধ', 'সামান্য ক্ষতি', 'মূল্যপ্রাপ্তি' প্রভৃতি কবিতায় বৌদ্ধযুগ ভাষা পেয়েছে। *পরিশেষ* (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থের 'বোরোবুদুর' ও 'সিয়াম' কবিতায় বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্মের পরিপূর্ণ বিকাশে ধর্ম, স্থাপত্য, শিল্প-ভাস্কর্যেরকথা প্রকাশ পেয়েছে। *পুনশ্চ* (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থের 'শাপমোচন', *পত্রপুট* (১৯৩৬) কাব্যগ্রন্থের সতেরো সংখ্যক কবিতা, *নবজাতক* (১৯৪০) কাব্যগ্রন্থের 'বুদ্ধভক্তি', *জন্মদিনে* (১৯৪০) কাব্যগ্রন্থের চার সংখ্যক কবিতা প্রভৃতিতে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তন ও ভাবাবেগের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

সর্বানন্দ বড়ুয়া (১৮৭০ – ১৯০৮)

এডুইন আর্নল্ড The Light of Asia কাব্যগ্রন্থে বুদ্ধকে এশিয়ার আলো আখ্যা দেন। সর্বানন্দ বড়ুয়া বুদ্ধকে জগতের আলো রূপে দেখতে চেয়ে নিজের সম্পাদিত *বৌদ্ধ পত্রিকা*-য় *জগজ্জ্যোতিঃ* নামে কাব্য প্রকাশ করেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন *জগজ্জ্যোতিঃ*-র পাণ্ডুলিপি পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, সর্বানন্দ জগজ্জ্যোতি লিখবেন জানলে তিনি *অমিতাভ* লিখতেন না। *জগজ্জ্যোতি* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি, তার পাণ্ডুলিপিরও অন্তর্ধান ঘটেছে।*জগজ্জ্যোতি* কাব্য সাধারণ পাঠকের উপযোগী সংস্করণ *শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত*।

সর্বানন্দ রিচার্ড চিল্ডার্স ডিক্সানারী অবলম্বনে পালি বর্ণমালার ক্রম সাজিয়ে একটি পালি অভিধান সংকলন করেন। বুদ্ধকীর্তন রচনায় তিনি বৌদ্ধসমাজের পথিকৃৎরূপে বিবেচ্য হতে পারেন।[৮৭] ছোটো ছোটো ভাবদর্শনকে অর্থবহ ও সুন্দর অভিব্যক্তিতে ধরার কৌশল কবির আয়ত্তাধীন ছিল। বুদ্ধের আবির্ভাবে অনাগত কালের অভয় ও আশার বাণী তিনি শুনিয়েছেন –

ওহে মৃতগণ!
যাদের বাঁচিতে হবে-হে জীবিতগণ!
যারা আছ মৃতপ্রায়, সকলেই ওঠ,
শোন, আশা আছে-ভয় নাই আর,
আসিলেন বুদ্ধ দেখ তোমাদের তরে।।[৮৮]

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১ – ১৯৪২)

বৌদ্ধযুগের ঐতিহাসিক কাহিনি ও কিংবদন্তী অবলম্বন করে রচিত গাথা কবিতা ও গল্পগুলি *কথা ও বীথি* (১৮৯৩) এবং *কথানিবন্ধ* (১৯০৫) গ্রন্থদ্বয়ে স্থান পেয়েছে। ‘কল্যাণী’, ‘চপলা’, ‘মণিমালা’ প্রভৃতি গল্পে বৌদ্ধযুগ ও বৌদ্ধধর্মের সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটেছেন। শ্রমণ বসুমিত্রের প্রতি মিথিলার বণিক কন্যা সুনন্দার সানুরাগের বিষয় নিয়ে রচিত ‘সুনন্দা’ গাথাকবিতাটি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, প্রেম ও আত্মত্যাগের দীপ্তিতে প্রকাশিত। তাঁর *যজ্ঞভস্ম* (১৯০৪) কাব্যগ্রন্থে ‘সুজাতা’, ‘খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি’, ‘পান্থের প্রতি’ কবিতাগুলি অন্তর্ভুক্ত। *পঞ্চকমালা* (১৯১০) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘সুগতপঞ্চক’-এ ‘মায়াদেবীর দেবপূজা’, ‘দেবশিশু’, ‘জাগরণ’, ‘নির্বাণ’ ও ‘সুসমাচার’ – এই ক্রমান্বয়ে বুদ্ধদেবের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। বিজয়চন্দ্রের *থেরগাথা* ও *থেরীগাথা* ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি *উদান*-এর স্বচ্ছন্দ পদ্যানুবাদ ও অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* কাব্যগ্রন্থের প্রথম পাঁচটি সর্গের পদ্যানুবাদ করেন। *বুদ্ধচরিত*-এর প্রথম সর্গ ও ধনিয় সুত্তের পদ্যানুবাদ *হেঁয়ালি* (১৯১৫) কাব্যগ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত। তিনি নানা পালিগ্রন্থ থেকে কিছু কিছু কবিতা অনুবাদ করেছিলেন।[৮৯]

অন্যান্য কাব্য ও কবিতা

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিষয়ক কাব্য ও কবিতা রচনায় শ্যামাচরণ শ্রীমাণীর (? – ১৮৭৫) *সিংহলবিজয় কাব্য* (১৮৭৫) উল্লেখ্য। *মহাবংস*-এর সংক্ষিপ্ত মূল কাহিনির সঙ্গে কবির স্বকীয় চিন্তা ও কল্পনার মিশ্রণে এই কাব্যগ্রন্থ লিখিত। এছাড়াও রামদাস সেনের (১৮৪৫ – ১৮৮৭) ‘শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়’; অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর (১৮৫০ – ১৮৯৮) ‘বুদ্ধদেবের প্রতি’; সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮২ – ১৯৩৪)-এর ‘চণ্ডালী’; করুণাবিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৭ – ১৯৫৫) ‘কুণালকাঞ্চন’, ‘জীবনভিক্ষা’; সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২ – ১৯২২) ‘বুদ্ধপূর্ণিমা’, ‘বুদ্ধবরণ’, ‘মহানাম’, ‘ঘুমগুম্ফায়’, ‘সুরার কাহিনী’, ‘পরিব্রাজক’, ‘সিংহল’, ‘আমরা’, ‘ভারতের আরতি’, ‘বারানসী’, ‘যৌবন সীমান্তে’, ‘অম্বপালী’; কুমুদরঞ্জন মল্লিকের (১৮৮৩ – ১৯৭০) ‘বুদ্ধপূর্ণিমা’, ‘পতিতবুদ্ধ’, ‘বিদ্রোহী বুদ্ধ’, ‘বৌদ্ধকৃষ্টি’, ‘মল্লিকা’; মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮ – ১৯৫২) ‘বুদ্ধ’; কালিদাস রায়ের (১৮৮৯ – ১৯৭৫) ‘ভিক্ষু আনন্দ’, ‘বোধি’, ‘রাজা হর্ষবর্ধন’ উল্লেখযোগ্য। এই সব কবিতায় মহাকারুণিক বুদ্ধের জীবনের নানা দিক, বুদ্ধ অনুগামীদের ও বৌদ্ধযুগের চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রসঙ্গত *জগজ্জ্যোতি* (১৯০৮) পত্রিকায় প্রকাশিত বৌদ্ধ কবিতা বিষয়বৈচিত্রে এবং রচনাসংখ্যায় উল্লেখযোগ্য।

নাটক

বাংলা সাহিত্যের আদি কাব্য চর্যাগানে বাঙালির নাট্যাভিনয়ের কথা পাওয়া যাচ্ছে। চর্যার সহজিয়া সাধকদের গানে নাট্যাভিনয়ের একাধিক দৃষ্টান্ত মিলেছে। ১৭ সংখ্যক চর্যাগান পটমঞ্জরী রাগে গীত হত –

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী।।
বাজই অলো সহি হেরুঅবীণা।
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা।।
... ...
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।।[৯০]

অর্থাৎ সূর্য, লাউ শশী লাগল তন্ত্রী, অনাহত দণ্ড–এক এক করল অবধূতী। আলো সখি, বাজে হেরুক-বীণা; শূন্যতার তন্ত্রীধ্বনি করুণ (করুণায়) ব্যাপ্ত হচ্ছে। বজ্রাচার্য নাচে, গায় দেবী – এইভাবে বুদ্ধনাটক

বিষম (বিপরীত) হচ্ছে। এখানে বুদ্ধনাটক অভিনয়ের পন্থা বজ্রগুরু এবং দেবীর নৃত্যগীত, এর জন্য একটি লাউয়ের খোল, দণ্ড ও তন্ত্রী সহযোগে প্রস্তুত জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্রটি বাংলা দেশে দেখা যায়। তখনকার দিনেও প্রথা ছিল পুরুষ গান গাইতেন আর নারী নৃত্য করতেন। কিন্তু এই গানে বুদ্ধনাটক বিপরীত ভাবে (বিষম) অভিনীত হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত অনুমান করেছেন যে দশম থেকে দ্বাদশ শতকে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রভাবের সময়ে বুদ্ধদেবের চরিত্রের বিশেষ বিশেষ দিক বা তাঁর ভাবকে নারী পুরুষে মিলে নৃত্যগীত সহযোগে অভিনীত করতেন। 'বুদ্ধনাটক' কথাটিকে লক্ষ রেখে তিনি বলেছেন –

> এইরূপ নৃত্যগানের ভিতর দিয়া এই সব গায়ক-গায়িকা কোন বিশেষ ঘটনাকে নাট্যরূপ দান করিতেন। এই নাচগানের সাহায্যে নাটক-করার ভিতর দিয়াই কি বাঙলা নাটকের উৎপত্তি? সংস্কৃতেও তো 'নৃত্ত' হইতেই 'নাট' এবং 'নাটক' হইয়াছে অনুমান করা হয়।[৯১]

তৎকালীন সিদ্ধাচার্যদের সাধনসঙ্গিনী ডোম রমণীরা সমাজে অস্পৃশ্য হলেও নৃত্য ও সঙ্গীতকলায় পটিয়সী ছিলেন। অস্পৃশ্যা ডোম রমণী একটি চৌষট্টি দলযুক্ত পদ্মের উপর অতি লঘু পদক্ষেপে নৃত্য করছেন দেশাখ রাগের ১০ সংখ্যক চর্যাগানে তার উল্লেখ পাই –

> একসো পদমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী।
> তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।।[৯২]

এই গানে 'নড়এড়া'-র (হরপ্রসাদ 'নড় এট্টা' ছাপিয়েছেন) উল্লেখ আছে। 'নড়পেড়া'; টীকার্থ 'নটবৎ সংসার পেটকং'; পেটক> পেড়া> এড়া। এই নটপেটিকায় নট-নটীদের নাট্যাভিনয়ের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রসাধন সাজসরঞ্জম রাখা হত।[৯৩]

নাটকের সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতির যোগ প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যমান। ঊনবিংশ-বিংশ শতকে বৌদ্ধযুগের প্রতিবেশে এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের আখ্যান অবলম্বনে নাটক রচিত হয়েছিল।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সময়কাল অজ্ঞাত)

বৌদ্ধ বিষয় নিয়ে নাটক রচনায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঊনবিংশ শতকের প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রণীত ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য *যৌবনে যোগিনী* (১২৯০) নাটকে শঙ্করাচার্য নামক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে অবনমিত বৌদ্ধধর্মের বিপথগামী আদর্শের প্রতীক বানানো হয়েছে। দেশদ্রোহিতা ও

ভিক্ষুজীবনী আদর্শবিরোধী কাজ – পৃথ্বীরাজের প্রতি শত্রুতা, যবনসম্রাট মহম্মদ ঘোরীর পক্ষাবলম্বন, কন্যাহরণে সহায়তা, দিল্লীর রাজসিংহাসনে প্রার্থী হওয়া ইত্যাদি করে আদর্শভ্রষ্টতার দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের যুগচিত্রে কল্যাণকর ও মহত্তম আদর্শ এখানে নাটককার আনেননি।[৯৪]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪ – ১৯১২)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ *বুদ্ধদেব-চরিত* নাটকের মাধ্যমে বাংলায় এক অপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। এটির প্রথম অভিনয় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে বৌদ্ধসংস্কৃতি চর্চা ঊনবিংশ শতকের শিক্ষিত এলিট অনুসন্ধিৎসুদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এই নাট্যাভিনয় জনমানসের সঙ্গে সেতু তৈরি করে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। এই নাটকের পূর্বে বা পরে বুদ্ধজীবনী নিয়ে বাংলায় পূর্ণাঙ্গ সার্থক নাটক রচিত বা অভিনীত হয়নি। আর্ণল্ডের *The Light of Asia* অবলম্বনে রচিত এই নাটক গিরিশচন্দ্র আর্ণল্ডকেই উৎসর্গ করেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনয়ের দিন দর্শকরূপে ছিলেন স্বয়ং আর্ণল্ড। গিরিশচন্দ্র নাটকে বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতাররূপেই চিত্রিত করেছেন। তিনি সিদ্ধার্থের জন্ম, বিবাহ, গৃহত্যাগ, সাধনা, বোধিজ্ঞান লাভ ইত্যাদি বর্ণনায় বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ ও ঐতিহাসিকতার প্রতি অনুগত থেকেছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নরপতি অশোকের জীবনকাহিনি অবলম্বনে রচিত *অশোক* (১৯১১) নাটকটি বাংলায় রচিত অশোক সম্পর্কিত নাটকগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। *অশোকাবদান*-এর কাহিনি অবলম্বনে রচিত এই নাটকে ক্ষমা ও অহিংসার বাণীই কীর্তিত হয়েছে।[৯৫] *বুদ্ধদেব-চরিত* নাটকে সত্যার্থী সিদ্ধার্থ নৃপতি বিম্বিসারকে পশুবলি প্রদানের অযৌক্তিকতা বুঝিয়ে নিজ হৃদয়ের অপ্রমেয় করুণায় নিজের আত্মোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন –

> প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে।
> বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণে,
> কাতর প্রাণের তরে মানব যেমতি।
> মানবের প্রায়,
> অস্ত্রাঘাতে ব্যথা লাগে কায় –
> বেদনা জানাতে নারে। ...
> কিন্তু যদি বলিদান বিনা
> তুষ্টা নাহি হন ভগবতী –

দেহ মোরে বলিদান।[৯৬]

কৃষ্ণবিহারী সেন (১৮৭৪ – ১৮৯৫)

কৃষ্ণবিহারী সেন বাংলার প্রথম অশোক বিষয়ক নাটক *অশোকচরিত* (১৮৯২) লেখেন। *দিব্যাবদান* থেকে বিষয় উপকরণ সংগৃহীত হয়েছিল। অশোকের পূর্ণাঙ্গ জীবন নয়, অশোকের উপাসক জীবনের উপাখ্যানে নাটকের সূচনা এবং ভিক্ষুব্রত গ্রহণে নাটকের সমাপ্তি। শরচ্চন্দ্র সরকার *শাক্যসিংহ প্রতিভা* বা *বুদ্ধদেব চরিত* (১২৯৫ বঙ্গাব্দ) নাটক লিখে প্রাচীন ঐতিহ্যধারারই অনুবর্তন করেছেন। আর্নল্ডের *The Light of Asia*, গিরিশচন্দ্র ঘোষের *বুদ্ধদেব চরিত*, অঘোরনাথ গুপ্তের *শাক্যমুনি চরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব*, তারকেশ্বর চৌধুরীর *শাক্যসিংহ* প্রভৃতি গ্রন্থ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। নাটককার নাটকে বুদ্ধদেবকে ‘কমলাপতি বৈকুণ্ঠবিহারী’র মানব অবতাররূপে বর্ণনা করেছেন। শিশু সিদ্ধার্থের উপরও অলৌকিত্ব আরোপিত হয়েছে। পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য বহির্ভূত নানা বিষয় লেখকের অন্তরের ভক্তি ও কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধের জীবন আখ্যানেও নাটককার হিন্দু-বৌদ্ধমতের সমন্বয়কারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।[৯৭]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩ – ১৯২৭)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ সমকালীন মঞ্চসফল নাট্যকার। তিনি পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের বিদুরথের কাহিনি অবলম্বনে *বিদুরথ* (১৯২২) নাটক রচনা করেন। এই নাটকে পালি সাহিত্যের বিভিন্ন সূত্র, গাথা ও কাহিনি প্রায় অবিকলভাবে স্থান পেয়েছে। তিনি হিন্দু-বৌদ্ধ সমন্বয়ের আদর্শে *অশোক* নাটক রচনা করেন। এই নাটকে সংস্কৃত ও পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে বিবৃত অশোকের পরিচয় তত স্পষ্ট হতে পারেনি। নাটকটি মূলানুগ না থেকে নাটককারের কল্পনার অংশীদার হয়েছে।[৯৮]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩ – ১৯১৩)

স্বাজাত্যবোধে দীক্ষিত নাটককার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বৌদ্ধ কাহিনি অবলম্বনে *সিংহল বিজয়* (১৯২৫) নাটক রচনা করেন। নাটকের নায়ক বঙ্গবীর বিজয়সিংহ। বিজয়সিংহের কীর্তিকলাপই নাটকে প্রধান। সম্রাট অশোকের পুত্রকন্যা মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার সিংহলে সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্মের বাণীর প্রচারক। কিন্তু নাটকে

সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রচারক বিজয়সিংহ। তিনি বঙ্গের বৌদ্ধধর্মকে সিংহলে পরিচিতি দেন। বৌদ্ধধর্মের মহিমায়, বিজয়ের অবদানে বিজয়ের বঙ্গে থেকে বিশ্বে উত্তরণ ঘটেছে, তেমনি বুদ্ধ বঙ্গ থেকে বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছেন।দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সুবিখ্যাত *চন্দ্রগুপ্ত* (১৯১১) নাটকের কাহিনি রচনায় শুধু ইতিবৃত্ত, হিন্দু পুরাণ ও কিংবদন্তীর উপর নির্ভর না করে *মহাবংস, দিব্যাবদান, মহাপরিনির্বান সুত্ত* প্রভৃতি পালি গ্রন্থ থেকেও উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন।[৯৯] *সিংহল বিজয়* নাটকে বাঙালির গৌরবকেই নাটককার রূপদান করেছেন –

> বঙ্গের বিজয় নহে – বিশ্বের বিজয়।
> বঙ্গের গৌতম নহে – বিশ্বের গৌতম।
> ঐ দেখ অহিংসায় মোক্ষের সোপান,
> দুঃখ ও মৃত্যুর রাজ্য আজি অবসান।
> সুখমায়া, দুঃখভ্রান্তি, নিত্য মোক্ষ, নিত্য শান্তি
> লও লঙ্কাবাসী। আমি করিতেছি দান।[১০০]

অনুরূপা দেবী (১৮৮২ – ১৯৫৮)

মহিলা নাটককার অনুরূপা দেবীর *কুমারিল ভট্ট* নামকরণেই হিন্দু তার্কিকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। অবনমিত বৌদ্ধধর্মের চরমাবস্থায় কুমারিল ভট্ট কর্তৃক আর্যাবর্তে পুরাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাহিনি এখানে লিখিত হয়েছে। নাটকে ধর্মদ্বন্দ্ব দেশের তৎকালীন রাজনীতিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল তা দেখানো হয়েছে। কুমারিল ভট্টের বৌদ্ধমত খণ্ডন এবং আর্যাবর্তে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিজয়বাণী পুনঃপ্রচার হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবনারই প্রবাহ বলে মনে হয়। জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের *সিংহল বিজয়* নাটকে মহাবংস প্রভৃতি সিংহলী সাহিত্যের প্রভাব স্পষ্ট। লঙ্কাদ্বীপে অশোক প্রেরিত মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা নন, বিজয়সিংহ বুদ্ধের বাণী প্রচার করেছিলেন – এই ভাবনা নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। বিজয়সিংহের লঙ্কাজয়ের বিজয়ীর দর্পের থেকেও বৌদ্ধধর্মপ্রচারকের আকুতি অধিকতর প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সিংহবাহুর দ্বিতীয় পুত্র সুমিত্র ব্রাহ্মণ্যপন্থী ছিলেন। তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্জাগরণ চেষ্টিত হয়। বৌদ্ধভিক্ষুদের লালদেশ ত্যাগ করে লঙ্কায় উপনীত হতে হয়ছে।[১০১]

অসিতকুমার হালদার (১৮৯০ – ১৯৬৪)

অসিতকুমার হালদার *কুণাল* (১৯৩০) নামক একাঙ্কিকায় বৌদ্ধসাহিত্য বর্ণীত অশোক ও কুণালের কাহিনিকে রূপদান করেছেন। রাজমহিষী তিষ্যরক্ষিতার নিষ্ঠুরতার বিপ্রতীপে মহাথের অন্ধ কুণালের কল্যাণ আদর্শের জয় ঘটেছে। কুণাল দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। করুণার মহাধারায় তিষ্যরক্ষিতার নৃশংসতা নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেছে।[১০২]

১.২.৪ কথাসাহিত্য

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যেই আধুনিক কথাসাহিত্যের প্রথম অঙ্কুরোদ্‌গম হয়েছিল বলে মনে হয়। *কথাসরিৎসাগর, বেতালপঞ্চবিংশতি, পঞ্চতন্ত্র, জাতক* ও *অবদান*-এর মধ্যে কথাসাহিত্যের মৌলিক উপাদানসমূহ নিহিত আছে। ঊনবিংশ-বিংশ শতকে কথাসাহিত্যে বৌদ্ধকাহিনি নবনির্মাণের প্রয়াস লক্ষণীয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩ – ১৯৩১)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা কথাসাহিত্যে বৌদ্ধকাহিনির নবনির্মাণের পথিকৃৎ। তাঁর *কাঞ্চনমালা* (১৯১৬) এবং *বেনের মেয়ে* (১৯২০) এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সময়কাল অজ্ঞাত)

ঊনবিংশ শতকের কথাসাহিত্যিক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *বীরবরণ* (১২৯০) উপন্যাসটিতে 'বৌদ্ধ পরিপ্লাবিত জন্মভূমির' উদ্ধার সাধন করে সনাতন আর্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা মহারাজ বীরসেনের সংকল্প রূপে দেখা গেছে। পূর্ববঙ্গের আদিশূরের সঙ্গে গৌড়েশ্বর বৌদ্ধ পালরাজার যুদ্ধ এবং পালরাজার পরাজয়ের ইতিবৃত্ত এর বিষয়বস্তু। যে অসাম্প্রদায়িকতা ও ক্ষান্তির অনুপ্রেরণায় পালযুগের রাজাও প্রকৃতিপুঞ্জ ধর্মবিষয়ে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে কর্মে ও যাপনে হিন্দু বৌদ্ধ সমন্বয়পন্থী হয়েছিলেন – এই বিষয়ে উপন্যাসে অনুদ্ঘাটিতে থেকেছে। পালবংশের অবক্ষয়ের সময়ে শৈবরাজের দ্বারা বৌদ্ধ গৌড়েশ্বর পালরাজার পরাজয় ও বৌদ্ধধর্মের চরম পরিণতি দেখানোই উপন্যাসের উদ্দেশ্য।[১০৩] সংকীর্ণ

হিন্দুজাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত কথাসাহিত্য ঊনবিংশ শতকের শেষপাদ ও বিংশ শতকের সূচনাপর্বের একটা প্রবণতা ছিল।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫ – ১৯৩০)

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি উপন্যাস *শশাঙ্ক* (১৯১৪), *ধর্মপাল* (১৯১৫) ও *করুণা*-য় (১৯১৭) বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি তিনি সুবিচার করেছেন এমনটি বলা যায় না। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বকে আলম্বন করে তিনি স্বপ্নসৌধ রচনা করতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রাক্-মুসলিম যুগে বাঙালির জাগরণে বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাসের নায়কত্ব শশাঙ্ককেই দিতে চেয়েছেন। *শশাঙ্ক* উপন্যাসে হিন্দু-বৌদ্ধ বিদ্বেষকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় গ্রহণ করে ইতিহাসের সঙ্গে মোটামুটি যোগ রেখে কাল্পনিক চরিত্রের সমাবেশ করেছেন যা ঐতিহাসিক না হলেও ইতিহাস-বিরোধীও নয়। বজ্রযান আচার্যদের যতটা হীন ও অভিসন্ধিপরায়ণ করে চিত্রিত করা হয়েছে তা পুরোপুরি ইতিহাস সম্মত নয়। শশাঙ্ককে নিয়ে গৌড়দেশের যে স্বতন্ত্র ইতিহাসের সূচনা হয়েছে এবং ধর্মপাল থেকে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় এই জন্য শশাঙ্কের পর ধর্মপাল লিখিত হয়েছে বলে গ্রন্থকার জানিয়েছেন। বৌদ্ধ পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালের কীর্তিকলাপই উপন্যাসের মূল বিষয়। এখানেও ঔপন্যাসিকের বজ্রযান বৌদ্ধদের সম্বন্ধে 'একটু অনুদার ও সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয়' আছে।[১০৪]

করুণা উপন্যাসে গুপ্ত সম্রাটদের হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন প্রভৃতি সর্বধর্মে সমদর্শিতা, বৈদিশিক আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সাম্রাজ্যে অন্তর্দ্রোহিতা প্রভৃতি ঐতিহাসিক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। একদিকে দেশপ্রেমিক স্কন্দগুপ্তের আদর্শ ও আত্মত্যাগ, অন্যদিকে বৌদ্ধ ভিক্ষু হরিবলের গোপন ষড়যন্ত্রের মধ্যে বৈষ্ণব স্কন্দগুপ্তের মহিমা ভাস্বর হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে ধর্মের থেকেও দেশাত্মবোধকে উর্ধ্বস্থান দেওয়া হয়েছে। উত্তরাপথের সঙ্ঘস্থবির বুদ্ধভদ্র ও বৌদ্ধ কল্যাণীর বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় ধর্মের আদর্শ চমৎকার ফুটেছে। বৌদ্ধধর্মের চরম অবনতি, তার প্রতিক্রিয়া, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্বন্দ্ব তৎকালীন ইতিহাসের চিত্রকল্পনার মেলবন্ধনে উপস্থাপিত হয়েছে।[১০৫]

জনৈক উদাসীন (সময়কাল অজ্ঞাত)

জনৈক উদাসীন রচিত *রাজগৃহে ইন্দ্রগুপ্ত* (১৯০৪) উপন্যাসে মৌর্য সম্রাট অশোকের বিশ্বস্ত সেনাপতি ইন্দ্রগুপ্তের বৌদ্ধধর্ম ও প্রব্রজ্যা গ্রহণের কাহিনি বর্ণিত। ইন্দ্রগুপ্তের সংসার বৈরাগ্য, অশোকযুগের প্রতিবেশ রচনা, অশোকপুত্র কুণাল প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। লেখক *ধর্মপদ অর্থকথা, সুত্তনিপাত অর্থকথা, জাতক* এবং *জাতকার্থকথা* প্রভৃতি মূল গ্রন্থ অবলম্বনে 'ভাগিনেয় সঙ্ঘরক্ষিতের বস্তু', 'সোমাদেবীর বস্তু', 'ভেরিবাদক জাতক', 'কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত', 'মৃদুলক্ষণাজাতক', 'নন্দজাতক', 'কুন্তলকেশী স্থাবিরার বস্তু', 'সিরিমা বা শ্রীমতীর কথা' ইত্যাদি বৌদ্ধগল্প রচনা করেছিলেন।[১০৬]

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১ – ১৯৪২)

বিজয়চন্দ্র মজুমদার *কথা-নিবন্ধ* (১৯০৫) গ্রন্থের 'কল্যাণ', 'চপলা', 'মণিমালা' গল্পগুলির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের সংসার বৈরাগ্য এবং অনাগরিক জীবনের থেকে হৃদয়বেদনা ও তার মাধুর্য লেখককে অধিকতর প্রণোদিত করেছে।[১০৭]

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০ – ১৯২১)

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির গল্পগ্রন্থ *সাজি*-র (আষাঢ়, ১৩০৭) মধ্যে দুটি বৌদ্ধগল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[১০৮] তাঁর সম্পাদিত সুরেশচন্দ্র *সাহিত্য* পত্রিকায় 'দুটি বৌদ্ধ গল্প' ('শোকবিজয়' এবং 'লালসা এবং সংযম', কার্তিক, ১২৯৮) প্রকাশিত হয়েছিল।

অনুরূপা দেবী (১৮৮২ – ১৯৫৮)

অনুরূপা দেবীর *রামগড়* (১৯১৮) ও *ত্রিবেণী* (১৯২৮) উপন্যাসদ্বয়ে বৌদ্ধভারতের কাহিনি স্থান পেয়েছে। *রামগড়* উপন্যাসে স্বয়ং বুদ্ধদেব চরিত্র। কিন্তু উপন্যাসে তার প্রভাব তেমন লক্ষণীয় নয়। বৌদ্ধধর্মের মহান আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সরলতাকে যথাসাধ্যভাবে উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। *ত্রিবেণী* (১৯২৮) উপন্যাসে পালবংশীয় মহীপালদেবের অত্যাচার ও কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রজাশক্তির

অভ্যুত্থানের ও কৈবর্তরাজ ভীম কর্তৃক সিংহাসন অধিকারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। রামপাল কর্তৃক পালবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সঙ্গে হিন্দু-বৌদ্ধের সহাবস্থানের চিত্র উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে।[১০৯]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪ – ১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮ – ১৯৭১) ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯ – ১৯৭০)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মেঘমল্লার* (১৩৬৫) গল্পগ্রন্থের 'মেঘমল্লার' গল্প ও *মৌরীফুল* (১৩৬৩) গল্পগ্রন্থের 'প্রত্নতত্ত্ব' গল্প বৌদ্ধযুগের প্রতিবেশ রচনায় অসামান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাঁর জীবনের অন্তিম গল্পটি বৌদ্ধ বিষয়ক। মুখ্য চরিত্র বুদ্ধ এবং নন্দ। অপ্রকাশিত এই গল্পটি 'শেষ লেখা' নামে প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধ পটভূমিকায় লেখা গল্প হিসাবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিষপাথর' গল্পটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জাতিস্মর* (১৩৫১) গল্পগ্রন্থের 'অমিতাভ' ও *বিষকন্যা* (১৩৫২) গল্পগ্রন্থের 'চন্দনমূর্তি' ও 'মরু ও সঙ্ঘ' গল্পগুলি তাঁর ঐতিহাসিক গল্পমালার উজ্জ্বল রত্ন। বাস্তব আর কল্পনার নিপুণ যুগলবন্দীতে গল্পগুলি বাঙলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ।

বিংশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত বৌদ্ধ বিষয়ক কথাসাহিত্য তেমন ভাবে পাওয়া যায় নি। কিন্তু সত্তরের দশক থেকে বৌদ্ধ বিষয়ক কথাসাহিত্য নতুন নতুন আঙ্গিকে ফিরে এসেছে।

উপসংহার

ঊনবিংশ-বিংশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের চিন্তনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে বৌদ্ধ সংস্কৃতি কখনোওবা প্রকট আবার কখনোওবা প্রচ্ছন্ন থেকে কালের কপোলতলে চিহ্ন রেখে গেছে। বাঙালি বুদ্ধজীবীদের বুদ্ধজীবন, বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি চর্চার মোটামুটি তিনটি ধারা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

ক) ব্রাহ্মপন্থী ধারা – রামমোহন রায় এই ধারার পথিকৃৎ। দেবেন্দ্রনাথ নিজে সরাসরিভাবে বৌদ্ধধর্ম চর্চায় নিযুক্ত না থাকলেও উৎসাহদানে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব লক্ষণীয়। কেশবচন্দ্র সেন এই ধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের নৈকট্যের কারণে যে তাঁদের বৌদ্ধধর্ম চর্চায় এত আগ্রহ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্রাহ্মধর্মের আদর্শের ভিত্তি সন্ধানের প্রশ্নেই বৌদ্ধধর্মের কাছাকাছি তাঁরা এসেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের সামাজিক ও মানবিক দিকটি এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁদের এই চর্চা

অনেকক্ষেত্রেই ধর্মীয় গণ্ডিকে অতিক্রম করে গবেষণাধর্মী হয়ে উঠেছে। সত্যানুসন্ধিৎসাই এক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল বলে মনে হয়। এর মধ্যে আবার অনেকের ব্যক্তিগত বিশেষ প্রবণতা বৌদ্ধধর্মের প্রতিগ্রহণে বিশেষ বৈচিত্র্য দান করেছে।

খ) হিন্দু জাতীয়তাবাদী ধারা – জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষিতে কখনওবা আগ্রাসনবাদী নীতিতে বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতিকে হিন্দুধর্মের বিদ্রোহী ধারা বা হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত বা সম্প্রসারিত রূপ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা ধরা পড়েছে। এই ধারার পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমপন্থীরা যে অনেকেই অজ্ঞতাপ্রসূতভাবে এই নীতি অনুসরণ করছেন এমনটা নয়, বরং এটিকে তাঁদের সমকালীন অভিপ্রায়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখাটা জরুরি।

গ) গবেষণাধর্মী ধারা – তথ্যনিষ্ঠ থেকে একটা স্বতন্ত্র বিদ্যাচর্চা বা সাংস্কৃতিক যাপন হিসাবে বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতিকে স্বীকৃতিদান এবং তদনুরূপ অনুসন্ধিৎসা। এই ধারার পথিকৃৎ রূপে রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্মরণযোগ্য। রাজেন্দ্রলালপন্থী অনুসন্ধিৎসুরা ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

আমাদের এই ভাগ কোনও জল-অচল ভাগ নয়, এর প্রত্যেক ভাগের মধ্যে নানা বৈচিত্র থাকতে পারে। আবার এদের মধ্যে জটিল-অস্থির সম্পর্কও রয়েছে। যাই হোক না কেন, ঊনবিংশ-বিংশ শতকের পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা তো বটেই, বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বৌদ্ধবিদ্যাচর্চায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। এই কারণে অনুসন্ধিৎসু বাঙালি বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হয়েছিলেন। এই অনুসন্ধিৎসা, গ্রহণ-বর্জনের বহুমাত্রিকতা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে।

টীকা ও উৎস নির্দেশ

১। হরপ্রসাদ লিখেছেন যে সম্রাট অশোকের সময় (রাজত্বকাল ২৬৯ – ২৩২ খ্রিস্টপূর্ব) থেকেই নেপালে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের আগের 'প্রত্যেক' যান ও 'শ্রাবক' যান – দুটি শাখা বৈশালীর মহাসংগীতির সময় 'স্থবিরবাদ' ও 'মহাসাংঘিক' – এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। স্থবিরবাদীদের ভিত্তি পালি *ত্রিপিটক*, মূলত শ্রীলঙ্কা ও বার্মায় এঁদের অবস্থান, এঁরা 'দক্ষিণী' বৌদ্ধ। অন্য শাখা মহাসাংঘিকরা মহাযানী, এঁরা 'উদীচ্য' বৌদ্ধ। পালি নয়, মিশ্র সংস্কৃতে লেখা *মহাবস্তু অবদান, অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক* প্রভৃতি পুথি দ্বারা তাঁদের ধর্মীয় আচরণ নির্ধারিত হত। থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের তুলনায় মহাযানীরা উন্মুক্ত স্বভাবের হওয়ায় স্থানীয় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রভাবিত করে নিজেরাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফলে, মহাযান থেকে সহজযান, বজ্রযান প্রভৃতি সৃষ্টির সঙ্গে তন্ত্রসাধনাও শুরু হয়েছিল। প্রাক্-মধ্যযুগে উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম উত্তর-পূর্ব ভারত, নেপাল হয়ে তিব্বতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

২। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। (২০১৩)। *উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম ও অনান্য প্রসঙ্গ*। কলকাতা: সাহিত্যশ্রী। পৃ. ১৫ – ১৭

৩। সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল। (১৯৭৭)। *বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক*। কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৩০২

৪। তিব্বতের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সম্পর্ক। একাদশ শতকে তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জন্য তিব্বতের রাজা য়ে-শেস্-হওদ বাংলার অতীশ দীপঙ্করকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দূত প্রেরণ করেছিলেন যা ব্যর্থ হয়। যে-শেসের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যঙ্-ছুব-হওদ অতীশকে তিব্বতে আনতে প্রতিনিধি নগ্-ছো লো-চা-বা-কে পাঠান। ১০৪২ খ্রিস্টাব্দে অতীশ নেপাল হয়ে তিব্বত যান। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের সংস্কারের পাশাপাশি তিনি ১৯৪টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিব্বতী ভাষায় বহু ভারতীয় পুথি অনুবাদ করেন। তিনি *বোধিপত্র-প্রদীপ* গ্রন্থে হীনযান ও মহাযান তান্ত্রিক দর্শন ও শাসন পদ্ধতির সমন্বয়সাধন করতে সচেষ্ট হন। অতীশ সহ বহু ভারতীয় পণ্ডিতের পুথি তিব্বতী অনুবাদের মধ্যে দিয়ে রক্ষিত হয়েছে। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৪১। কোরেশ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: Bhattacharya, Bela. (Edited). (1999). Barua, Dipak Kumar. 'Indological Resesrches and Alexander Csoma De Koros'. *Journal of the Department of Pali*. Volume: 9. Kolkata: University of Calcutta. p. 15 – 25

৫। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। (২০১৩)। *উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম ও অনান্য প্রসঙ্গ*। কলকাতা: সাহিত্যশ্রী। পৃ. ২১

৬। সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল। (১৯৭৭)। *বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক*। কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৬৭ – ৬৮

৭। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০১ – ১১৭

৮। সেন, অমূল্যচন্দ্র। (২০১৬)। সুমনপাল ভিক্ষু। (সম্পাদক)। ভূমিকা, *অশোকলিপি*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ. (১৩) – (১৪)

৯। সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল। (১৯৭৭)। *বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক*। কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৭৪ – ৮১। কানিংহাম সম্পর্কে বিশদে জানার জন্য দ্রষ্টব্য – Thero, Dodamgoda Rewatha. (Edited). (2007).

Dharmadoot. Kartik Purnima Issue. Sir Alexander Cunningham Commemorative Number. Sarnath: Maha Bodhi Society of India. Mulagandha Kuty Vihara.

১০। পূর্বোক্ত। পৃ. ১২৬ – ১৩২

১১। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৪৫

১২। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৫৩ – ২৫৪

১৩। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৫৩

১৪। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৫৫

১৫। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৬১

১৬। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৫৯

১৭। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৫৯ – ২৬০

১৮। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৯৮। সেনার সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: বিশ্বাস, দিলীপকুমার। (২০০৮)। 'বৌদ্ধধর্ম ও যোগ: এমিল সেনার'। *ইতিহাস ও সংস্কৃতি*। প্রবন্ধ সংগ্রহ: ৩য় খণ্ড। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী।

১৯। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩০০ – ৩০১

২০। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৪৭

২১। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৪৭ – ২৪৮

২২। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৯৩ – ২৯৪

২৩। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৬৬

২৪। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৯৮

২৫। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৬১ – ২৬২

২৬। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮৪ – ১৯৬

২৭। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৯৭ – ২০৯

২৮। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৩০

২৯। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৩১

৩০। উক্ত বৌদ্ধ বিষয়ক পণ্ডিতদের কর্মকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: পূর্বোক্ত। পৃ. ২২৫, ২৩৩, ২৩৫, ২৪২, ২৫১, ২৫২, ২৫৫, ২৪২, ২৯৪, ২৯৭

৩১। বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল। (১৩৯৫)। *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ২৪, ৪২ – ৪৩

৩২। Arnold, Edwin. (2010). Publishers' Note. *The Light of Asia or The Great Renunciation (Mahâbhinishkramana) Being The Life and Teaching of Gautama Prince of India and Founder of Buddhism*. New Delhi: Low Price Publication. p. viii

৩৩। Ibid. p. ix

৩৪। Ibid. p. xii

৩৫। Ibid. p. 238

৩৬। বিশ্বাস, দিলীপকুমার। (১৯৮৩)। *রামমোহন-সমীক্ষা*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী। পৃ. ৫৫

৩৭। চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার। (১৯৫৬)। *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালির উত্তরাধিকার*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরি। পৃ. ২৭২, ২৭৫

৩৮। বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। (১৯৮৯)। *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস। পৃ. ৪৯৫ ও চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ। (১৯৭৪)। *মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ২০২

৩৯। বিশ্বাস, দিলীপকুমার। (১৯৮৩)। *রামমোহন-সমীক্ষা*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী। পৃ. ৩৭১

৪০। বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল। (১৯৮৮)। *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ৪১

৪১। দত্ত, অক্ষয়কুমার। (২০১৩)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*। দ্বিতীয় ভাগ। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ২৮৫

৪২। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৮৮

৪৩। ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ। (২০০২)। চক্রবর্তী, বরুণকুমার। (সম্পাদিত)। *আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত ও সজ্ঘাত*। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। পৃ. ২০৮

৪৪। বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল। (১৯৮৮)। *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ৪১; ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ। (১৯৯৮)। ভূমিকা। ঘোষ, বারিদবরণ। *বৌদ্ধধর্ম্ম*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ২২ – ২৩

৪৫। ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ। (১৪০৫)। *বৌদ্ধধর্ম্ম*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ৩৬

৪৬। বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল। (১৯৮৮)। *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ১৯ – ২০

৪৭। দাশ, আশা। (১৯৬৯)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। পৃ. ২৭৬

৪৮। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯৮

৪৯। গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ। (১৯৩৬)। *কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য*। কলকাতা: ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। পৃ. ১৪৪ – ১৪৫

৫০। সেন, কৃষ্ণবিহারী। (২০০৪)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। *অশোকচরিত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশন। পৃ. ৭৩

৫১। বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল। (১৯৮৮)। *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ২০

৫২। গুপ্ত, অঘোরনাথ। (১৯৯২)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। সম্পাদকীয় নিবেদন।*শাক্যমুনিচরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ii – iii এবং বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল। (১৯৮৮)। *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২১। উদ্ধৃত অংশটির উৎস হল – গুপ্ত, অঘোরনাথ। (১৯৯২)। প্রাগুক্ত। পৃ. v। অঘোরনাথের জীবনী ও সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: রায়চৌধুরী, সুব্রত। (২০১২)। *অঘোরনাথ গুপ্ত*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৫৩। গুপ্ত, অঘোরনাথ। (১৯৯২), ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। *শাক্যমুনিচরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ৮

৫৪। মিত্র, কৃষ্ণকুমার। (১৯৯৮)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। *বুদ্ধচরিত ও বৌদ্ধধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ৯৮

৫৫। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯৯

৫৬। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। (১৯৬৪)। *বঙ্কিম রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ২২২

৫৭। মুখোপাধ্যায়, ভূদেব। (২০১০)। সান্যাল, মনস্বিতা। বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন। (সম্পাদিত)। জাতীয় ভাব – ভারতবর্ষে খৃষ্টানাদি। *সামাজিক প্রবন্ধ*। *প্রবন্ধ সমগ্র*। কলকাতা: চর্চাপদ। পৃ. ১৩৮

৫৮। পূর্বোক্ত। জাতীয় ভাব – উহা সম্বর্দ্ধনের পথ। পৃ. ১৪২ – ১৪৩

৫৯। দ্রষ্টব্য: পূর্বোক্ত। 'পাশ্চাত্য ভাব – সাম্য', 'ভবিষ্যবিচার – ভারতবর্ষের কথা' এবং 'উপসংহার'। পৃ. ১৭৮, ২৩২, ২৮০

৬০। বিদ্যারত্ন, কালীপ্রসন্ন। (২০১১)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। *বুদ্ধদেব-চরিত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ১৬

৬১। বিবেকানন্দ, স্বামী। (২০০৬)। *পত্রাবলী*। কলকাতা: উদ্বোধন কার্য্যালয়। পৃ. ৩২

৬২। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: চৌধুরী, হেমেন্দুবিকাশ। (সম্পাদিত)। (২০১৪)। *জগজ্জ্যোতি*। সিংহ, মুরারি। 'বিবেকানন্দের চোখে বুদ্ধ'। *বিবেকানন্দ মননে বুদ্ধ*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা। পৃ. ৩০

৬৩। বিবেকানন্দ, স্বামী। (২০০৫)। *স্বামী বিবেকান্দের বাণী ও রচনা*। ১০ খণ্ড। কলকাতা: উদ্বোধন কার্য্যালয়। পৃ. ১৬৭

৬৪। বিবেকানন্দ, স্বামী। (২০১৩)। *স্বামী বিবেকান্দের বাণী ও রচনা*। ১ খণ্ড। কলকাতা: উদ্বোধন কার্য্যালয়। পৃ. ২৪

৬৫। Vivekananda, Swami. (2006). Notes teken down in Madras, 1892 – 93. *The Complete Works of Swami Vivekananda*. Vol – VI. Kolkata: Advaita Ashrama. p. 116

৬৬। Vivekananda, Swami. (2006). Inspired Talks. Friday, July 19, 1895. *The Complete Works of Swami Vivekananda*. Vol – VII. Kolkata: Advaita Ashrama. p. 59

৬৭। Vivekananda, Swami. (2007). Buddhism, the Fulfilment of Hinduism. 26th September, 1893. At the Parliament of Religions. *The Complete Works of Swami Vivekananda*. Vol – I. Kolkata: Advaita Ashrama. p. 21

৬৮। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। (১৯৮২)। *রাজেন্দ্রলাল মিত্র*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। পৃ. ৫ ও সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল। (২০১১)। *স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা সাধক*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ৩১। দাশ, চিত্তরঞ্জন। (সম্পাদিত)। (শ্রাবণ, আশ্বিন ও ফাল্গুন; ১৩২৩)। রাজেন্দ্রলাল মিত্র। *নারায়ণ*।

৬৯। রায়, অলোক। (১৯৬৯)। *রাজেন্দ্রলাল মিত্র*। কলকাতা: বাগর্থ। পৃ. ৩১ – ৩২, ৩৪, ৭৩, ৭৬

৭০। সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল। (২০১১)। *স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা সাধক*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ৪৮ – ৫০

৭১। সেন, রামদাস। (১৯৯৭)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। *বুদ্ধদেব তাঁহার জীবন ও ধর্ম্মনীতি*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ১৬০

৭২। দ্রষ্টব্য: সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র। (সম্পাদিত)। (২০১০)। *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*। প্রথম খণ্ড। সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। পৃ. ৬১৮ ও বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল। (১৯৮৮)। *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ২৩

৭৩। সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র। (সম্পাদিত)। (২০১০)। *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ৬৯৭

৭৪। সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল। (২০১১)। *স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা সাধক*। সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। পৃ. ৬৩ – ৬৪

৭৫। বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল। (১৯৮৮)। *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ৩০

৭৬। সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল। (২০১১)। *স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা সাধক*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ৭৩ – ৭৪, ৭৮ ও সেনগুপ্ত, সুব্রত। (২০১০)। *দেড়শো বছরের (১৮০১ – ১৯৫০) বাংলা সাময়িক-পত্রে বৌদ্ধপ্রসঙ্গ*। কলকাতা: সেনগুপ্ত, কৃষ্ণা। (ব্যক্তিগত উদ্যোগ)। পৃ. ৮৮

৭৭। চৌধুরী, সত্যজিৎ। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। (সম্পাদক)। (১৯৭৮)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক গ্রন্থ*। কলকাতা: সান্যাল প্রকাশনী। পৃ. ১৭৫

৭৮। বড়ুয়া, প্রণবকুমার। (২০০৭)। *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। পৃ. ১৮৬

৭৯। বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। (২০০৬)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। ভূমিকা। *বুদ্ধদেব অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সম্পূর্ণ জীবন চরিত ও উপদেশ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. 'র', ২৭১

৮০। এঁদের সাহিত্য কীর্তি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: চৌধুরী, হেমেন্দুবিকাশ। (সম্পাদিত)। (১৯৯৫)। *জগজ্জ্যোতি*। পাঠক, সুনীতিকুমার। 'বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্য (১৩৫১ – ১৪০০) এক বিহঙ্গম পরিচারণা'। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা। পৃ. ৭৪ – ৮৪

৮১। সেন, নবীনচন্দ্র। (১৯৫৯)। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। দাস, সজনীকান্ত। (সম্পাদিত)। *নবীনচন্দ্র রচনাবলী*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। পৃ. ২৪২

৮২। সেন, নবীনচন্দ্র। (১৯৫৬)। *অমিতাভ*। কলকাতা: প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী। পৃ. ১, ৫

৮৩। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬

৮৪। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৮

৮৫। বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল। (১৯৮৮)। *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ২৩ ও বড়ুয়া, প্রণবকুমার। (২০০৭)। *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। পৃ. ১৮৪

৮৬। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৪ ও পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮৫

৮৭। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: বড়ুয়া, বেণীমাধব। (২০১১)। চৌধুরী, হেমেন্দুবিকাশ। (সম্পাদিত)। বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান। *বেণীমাধব বড়ুয়া নির্বাচিত রচনাবলী*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা। পৃ. ৮৩; বড়ুয়া, প্রণবকুমার। (২০০৭)। *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। পৃ. ১৮৫ – ১৮৬ এবং বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল। (১৩৯৫)। *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ২৪।

৮৮। *জগজ্জ্যোতি* পত্রিকার ১১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত, দ্রষ্টব্য: দাশ, আশা। (১৯৬৯)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। পৃ. ৬৫১

৮৯। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল। (১৯৮৮)। *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ৩০; দাশ, শিশিরকুমার। (সংকলিত ও সম্পাদিত)। (২০০৩)। *সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ১৪৩ এবং বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল। (১৯৮৮)। *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ৩১।

৯০। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (সম্পাদিত)। (২০১৫)। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পৃ. ৩০

৯১। দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। (২০০৪)। *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। পৃ. ৯৪ দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। (১৩৭২)। বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রা.) লিমিটেড। পৃ. ২০৫

৯২। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (সম্পাদিত)। (২০১৫) *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পৃ. ১৯

৯৩। চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার। (২০০৪)। *চর্যাগীতির ভূমিকা*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরি। পৃ. ২০৮ দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। (১৯৬৫)। বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রা.) লিমিটেড। পৃ. ২০৬

৯৪। দাশ, আশা। (১৯৬৯)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। পৃ. ৩৭৬

৯৫। বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল। (১৯৮৮)। *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ২৫

৯৬। ঘোষ, গিরিশচন্দ্র। (১৯৭৯)। ভট্টাচার্য, দেবীপদ। (সম্পাদিত)। *বুদ্ধদেব চরিত*। *গিরিশ রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ২৬৯

৯৭। দাশ, আশা। (১৯৬৯)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। পৃ. ৩৯৮ – ৪০৪

৯৮। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪০৪ – ৪০৫, ৪১২

৯৯। দাশ, আশা। (১৯৬৯)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। পৃ. ৪১৯

১০০। রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল। (১৯৯৬)। রায়, রথীন্দ্রনাথ। (সম্পাদিত)। *সিংহল বিজয়*। *দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ৩৬২

১০১। দাশ, আশা। (১৯৬৯)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। পৃ. ৪২০ – ৪২২

১০২। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪২৩ – ৪২৪

১০৩। দাশ, আশা। (১৯৬৯)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। পৃ. ৪৩৩ – ৪৩৪

১০৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। (২০০১)। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ। (সম্পাদিত)। *রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী*। প্রথম খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ২, ৮, ১২, ১৫, ১৯

১০৫। দাশ, আশা। (১৯৬৯)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। পৃ. ৪৩৩ – ৪৩৯

১০৬। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৪৬ – ৪৪৭

১০৭। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৪৬

১০৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। (১৯৯৭)। *সুরেশচন্দ্র সমাজপতি*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। পৃ. ১৪

১০৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। (২০১১ – ২০১২)। *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। কলকাতা: মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। পৃ. ১৬৪ ও দাশ, আশা। (১৯৬৯)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। পৃ. ৪৩৩ – ৪৪৮, ৪৫০

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাময়িকপত্রে বুদ্ধদেব, বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি আলোচনার প্রস্থানভূমি

ভূমিকা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বের যে যুগপরিচয় পাই তা বাংলা দেশ ও বাঙালি সমাজের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ যুগ। পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে ইংরেজ শাসনের ফলে তখন বাঙালির জীবনে ও চিন্তাধারায় পাশ্চাত্য প্রভাব প্রবেশ করতে আরম্ভ করলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে বাঙালির সমাজ বা চিন্তাধারায় ইউরোপের প্রভাব দেখা যায় নি। এর পরেই বাঙালি শুধু ইংরেজের চাকরিই নয়, চিন্তাধারা এবং শিক্ষাও গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। তখন থেকেই বাঙালি জীবনে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তা আজও অব্যাহত। বাঙালির সমাজে এবং চিন্তাধারায় নতুন প্রভাবের সূচনাকাল নির্দেশ করা সম্ভবপর নয়, কারণ সে সূচনা কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে হঠাৎ দেখা দেয় নি, ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনটি ঘটনা নির্দেশক প্রসঙ্গের কথা বলেছিলেন – ক) রামমোহন রায়ের কলকাতায় আগমন এবং ধর্মান্দোলনের প্রবর্তন (১৮১৫), খ) হিন্দু কলেজ স্থাপন (১৮১৭) এবং গ) প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ (১৮১৮)। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সাময়িকপত্র *সমাচার দর্পন* প্রকাশ এবং তার সমাদর এই নূতন ভাবধারা প্রবর্তনের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।[১]

ইউরোপে রেনেসাঁসের সময়ে ঈশ্বরকেন্দ্রিকতা থেকে মানুষের মন হয়ে উঠেছিল মানবকেন্দ্রিক। হাতে লেখা পুথির বদলে ছাপাখানায় মুদ্রিত গ্রন্থ রেনেসাঁসের চেতনা বিকাশে কার্যকারী ভূমিকা করেছিল। ছাপাখানার গ্রন্থ মানুষের চিন্তনকে স্থায়ী আকার দিয়ে তাকে একই সঙ্গে বহুজনের কাছে নিমেষে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থাপনের সময় থেকেই বাংলা দেশে অনেকগুলি ইংরেজি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। হিকি সাহেব কলকাতা থেকে *বেঙ্গল গেজেট* নামে ইংরাজি একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী ইংরেজি সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে *ক্যালকাটা গেজেট, বেঙ্গল হরকরা, গবর্মেন্ট গেজেট, ক্যালকাটা মন্থলী জার্ণাল, ক্যালকাটা জার্ণাল, বেঙ্গল হেরাল্ড, রিফর্মার, ইন্ডিয়া গেজেট, ক্যালকাটা কুরিয়ার, এশিয়াটিক অ্যানুয়েল রেজিস্টার* ও *এশিয়াটিক জার্ণাল* উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্র বিষয়ে একটু সংশয়ের অবকাশ আছে। শ্রীরামপুরের *সমাচার*

দর্পণ (১৮১৮) ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের *বাঙ্গাল গেজেট* (১৮১৮) – দুইই এই সম্মানের দাবিদার। দুইটি পত্রিকার মধ্যে প্রথম প্রকাশকালের ব্যবধান দশ-পনের দিনের বেশি হওয়ার সম্ভাবনা কম, *বেঙ্গল গেজেট* বছর খানেক চলে বন্ধ হয়ে যায়। *সমাচার দর্পণ* ইংরেজ মিশনারী পরিচালিত কাগজ হওয়ায় সেখানে নব্যপন্থীদের কথা থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়াও এই সাময়িকপত্র একান্তই একদেশদর্শী ছিল না, এতে প্রাচীনপন্থীদের সাময়িকপত্রাদি থেকে পত্র, আপত্তি ও বিবিধ সংবাদের সংকলন প্রভৃতিও স্থান পেত। ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ সম্বন্ধে তৎকালীন আন্দোলনের নানা প্রসঙ্গ এখানে প্রকাশিত হয়েছিল।

সমাচার দর্পণ-এর হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণের জবাব দিতে রামমোহন *ব্রাহ্মণ সেবধি* (১৮২১) প্রকাশ করেন। খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার বা পরধর্মের হীনতা প্রতিপন্ন করা *সমাচার দর্পণ*-এর উদ্দেশ্য না হলেও এই প্রত্রিকায় প্রকাশিত কতগুলি 'প্রেরিত পত্র'-এ হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতা, কুলীনদের প্রতি কটাক্ষ ছিল। বাঙালি পরিচালিত বাঙালি সাময়িকপত্রের অভাব মেটানোর উদ্দেশ্যে দেওয়ান তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে মিলে *সম্বাদ কৌমুদী* (ডিসেম্বর, ১৮২১) প্রকাশ করেছিলেন। পাঠকদের প্রতি নিবেদনে বলা হয় যে ধর্মনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক আলোচনা, অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী, দেশবিদেশের সংবাদ ও জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত প্রেরিত পত্রাবলী প্রকাশ, সামগ্রিক অর্থে লোকহিত সাধনই এর লক্ষ্য। পত্রিকার পরিচালক তারাচাঁদ ও ভবানীচরণ হলেও রামমোহন রায়ই ছিলেন প্রাণপুরুষ। পত্রিকায় রামমোহন প্রগতিশীল ভাবনার পক্ষে সহমরণ বিষয়ক প্রথার বিরুদ্ধে লিখলে তারাচাঁদ ও ভবানীচরণের সঙ্গে তাঁর মত ও পথের পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। ভবানীচরণ রক্ষণশীল মতের সাপ্তাহিক *সমাচার-চন্দ্রিকা* (মার্চ ১৮২২) প্রকাশ করে *সম্বাদ কৌমুদী*-র সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন।

প্রথম পর্বের সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে *বঙ্গদূত* (মে, ১৮২৯), *সংবাদ প্রভাকর* (জানুয়ারি, ১৮৩১), *জ্ঞানান্বেষণ* (জুন, ১৮৩১), *সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়* (জুন, ১৮৩৫) এবং *সম্বাদ ভাস্কর* (মার্চ, ১৮৩৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও জীবজন্তু বিষয়ক *পশ্বাবলী* (১৮২২), *সংবাদ তিমির নাশক* (১৮২৩), বিজ্ঞানবিষয়ক *বিজ্ঞান-সেবধি* (১৮৩২)-র নাম করা যায়। হিন্দু কলেজের প্রগতিশীল ছাত্ররা যাঁরা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত, তাঁরা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *জ্ঞানান্বেষণ* (জুন, ১৮৩১) নামক সাময়িকপত্র প্রকাশ করে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার সূত্রপাত করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় বাঙালির জনপ্রিয় সাময়িকপত্র *সংবাদ প্রভাকর* (জানুয়ারি, ১৮৩১) মাসিক, দ্বিসাপ্তাহিক, দৈনিক আকারেও

প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদ, রাজনৈতিক মন্তব্য, ইংরেজ শাসন সমালোচনা ও আধুনিক শিক্ষাপ্রচার, বাংলার সমাজ, সাহিত্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত রচনা এই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়ে বিস্ময়কর প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছিল।

ঊনবিংশ শতকের সাময়িকপত্রে ধর্ম, সমাজ ও রীতিনীতি নিয়ে যে সমস্ত আলোচনা প্রকাশিত হত তার থেকে তৎকালীন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের চালচিত্র পাওয়া যায়। ভবানীচরণের রক্ষণশীল হিন্দু জীবনাদর্শ, রামমোহনের প্রগতিশীল ভারতসংস্কৃতিতে বিশ্বাস এবং আধুনিক ইয়ং বেঙ্গল-দের উগ্র মতবাদ তৎকালীন পত্রিকায় বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের চালিকাশক্তি ছিল। এই মতানৈক্যের মধ্যে সর্বশ্রেণির বাঙালির সুখবোধ্য সাময়িকপত্রের প্রচলন করেন ঈশ্বর গুপ্ত। সামাজিক ও সাময়িক চিন্তা আন্দোলনের সঙ্গে সাহিত্যরস পরিবেশনও এর লক্ষ্য ছিল। রামমোহন-সমকালীন সাময়িকপত্রগুলি বাংলা গদ্য-বিবর্তনের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য। সাময়িকপত্র প্রকাশের আগে সমকালে রচিত বাংলা গদ্যে জড়তা ছিল, কিন্তু সাময়িকপত্রে ব্যবহারের ফলে গদ্যের চাল অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। সাময়িকপত্রের পাঠক সাধারণ স্বল্পশিক্ষিত বাঙালিকে আকর্ষণের জন্য পত্রিকার ভাষাও সরল ও চিত্তাকর্ষী হয়। উপরন্তু সাময়িকপত্রে ধর্ম ও সমাজ নিয়ে বাদানুবাদের জন্য ভাষা হালকা, বোধ্য, তীক্ষ্ণ ও দ্বন্দ্বোপযোগী করা হয়। তাই সে যুগের বাগযুদ্ধ, বিতর্কের ভাষা আশাতীতভাবে সরল হয়ে পড়েছিল। বাংলা গদ্যের সরলীকরণে প্রাথমিক পর্বের সাময়িকপত্রগুলির অবদান অনস্বীকার্য।[২]

ঊনবিংশ শতকের বাংলায় সাময়িকপত্রের প্রকাশনা ও সম্পাদনা বাঙালির চিন্তন ও ভাবপ্রবাহের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠে এক বৈপ্লবিক চরিত্র ধারণ করেছিল। এর আলোচনায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, সমাজে ইংরাজি শিক্ষা ও ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার, দেশের তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিয় অবস্থার ক্রম পরিবর্তন অর্থাৎ সমকালীন বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব দিক সম্বন্ধেই সে যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে বহু অমূল্য উপকরণ বিক্ষিপ্ত থাকে। সমকালীন বিশিষ্টজনেরা সাময়িকপত্রের পাতায় সাহিত্যের রূপ-রীতি বিষয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন, চিন্তনের ক্ষেত্রেও আসে অভূতপূর্ব প্রণোদনা।

বুদ্ধদেব বসু 'সাহিত্যপত্র' প্রবন্ধে (*দেশ*, বৈশাখ, ১৩৬০) সাময়িকপত্রের চরিত্রকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন –

> এটি কখনো মন জোগাতে চায়নি, মনকে জাগাতে চেয়েছিল। চেয়েছিল নতুন সুরে নতুন কথা বলতে; কোনো-এক সন্ধিক্ষণে যখন গতানুগতিকতা থেকে অব্যাহতির পথ দেখা যাচ্ছে না, তখন সাহিত্যের ক্লান্ত শিরায় তরুণ রক্ত বইয়ে দিয়েছিলো – নিন্দা-নির্যাতন বা ধনক্ষয়ে প্রতিহত হয়নি। এই সাহস, নিষ্ঠা, গতির একমুখিতা, সময়ের সেবা না করে সময়কে সৃষ্টি করার চেষ্টা – এইটেই লিটিল ম্যাগাজিনের কুলধর্ম। ... আজকের দিনে যাদের কণ্ঠ লোকের কানে পৌঁচচ্ছে না, যারা পাঠকের পুরোনো অভ্যাসের তলায় প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে, তাদের এগিয়ে আনা, ব্যক্ত ক'রে তোলাই সাহিত্যপত্রের কাজ।

সাময়িকপত্রের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে এক একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ আদর্শে চালিত শিল্প সাহিত্য সমাজ সম্পর্কে ভুয়োদর্শী, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, যুগমানস সম্পর্কে সচেতন প্রভাবশালী সাহিত্যিক বা তাত্ত্বিকের নেতৃত্বে সাময়িকপত্রের একটি বিশেষ চেহারা ও লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। অনেক সময় লেখক সম্পাদক হতে পারেন, অনেকক্ষেত্রে অনুঘটকেরও কাজ করতে পারেন। সমভাবাপন্ন একদল চিন্তক বা লেখক কোন ভাবনা বা প্রোপাগাণ্ডাকে সামনে রেখে একত্রিত হতে পারেন। মতবাদে, আদর্শে, রুচিতে, প্রতিক্রিয়ায় – যেভাবেই হোক না কেন সাময়িকপত্র তৎকালীন সাহিত্য বা চিন্তনের পরিবেশে নতুন ভাবের আমদানি করে। এই জায়মান চিন্তনপ্রবাহ সমকালে বা পরবর্তী সাহিত্যকে প্রভাবিত করে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গতিপথ বা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। তা বিষয় বা আঙ্গিকের দিক থেকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধানের পাশাপাশি সমকালীন সাহিত্য সংস্কৃতির গতিপরিবর্তনে সহায়তা করে, ভবিষ্যতকে সম্ভাবিত করার ক্ষেত্রেও এর অবদান কম নয়। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙালির চিন্তা চেতনায় নতুন প্রশ্ন ও দ্বন্দ্বের প্রকাশ সাময়িকপত্রগুলিকে সচল রেখেছিল।

ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্ররূপে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*

ব্রাহ্মসমাজের ধর্মপ্রচার সংগঠন 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মুখপত্ররূপে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র (অগষ্ট, ১৮৪৩) প্রকাশ ঘটেছিল। প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চেয়েছিলেন যে পত্রিকাটি ধর্মমূলক হোক, কিন্তু সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের দূরদর্শিতায় তা কেবল ধর্মতত্ত্ব ও সাধনার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে শিক্ষিত

বাঙালি মধ্যবিত্তের চিন্তা-চেতনা, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারের ধারক-বাহক হয়ে উঠেছিল। স্বদেশানুরাগ এর প্রেরণাস্থল হওয়ায় নব্য শিক্ষিত শ্রেণির বিজাতীয় ভাবধারা, আচার-আচরণ ও ধ্যান-ধারণা অনভিপ্রেত ছিল। বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে, বহুবিবাহ ও কৌলিন্যপ্রথার বিরুদ্ধে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, সুরাপান নিবারণের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার এই সাময়িকপত্রের উদ্দেশ্য ছিল। বিজ্ঞান, দর্শন, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় এটি সমৃদ্ধ ছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রীর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রয়েছে –

> তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষত: দেশীয় সংবাদপত্র সকলের অবস্থা কি ছিল এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে, তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না।[৩]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের বাইরে উল্লেখযোগ্য ও অবশ্যপাঠ্য সাময়িকপত্রের মর্যাদামণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। ধর্মবিষয়ে একটা শালীনতার ধারণা গড়ে তোলা, মননশীল সংস্কৃতির প্রসারে অগ্রসরমানতা এবং একটা সাহিত্যিক পরিমণ্ডল রচনা করে সামাজিক দায়িত্ব পালনের আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ। বাংলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারে ‘কুঠারাঘাত’ করার ব্যাপারেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। উমেশচন্দ্র সরকার এবং তাঁর স্ত্রীকে জোর করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাদানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকার মাধ্যমে ধর্মান্তকরণকে আঘাত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।[৪] অশ্লীলতা ও ব্রীড়াজনক লেখার জন্য ঘৃণাতে দেশীয় সাময়িকপত্র স্পর্শ না করলেও ডিরোজিওপন্থিরা *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* দেখে পুলকিত হয়েছিলেন। ‘বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা’-প্রকাশক তত্ত্ববোধিনী রুচির ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল। ধর্মপ্রচার বিষয়ে এর অবস্থান সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন –

> ... ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের প্রতি গোলাগুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। খ্রীষ্টানগণও ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম বিশ্বাসকে ভিত্তিহীন বলিয়া আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তত্ত্ববোধিনী আপনার অবলম্বিত ধর্ম্মকে বেদান্তধর্ম ও বেদকে তাহার অভ্রান্ত ভিত্তি বলিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৫]

ব্রাহ্মনির্ভর অবস্থান থাকা সত্ত্বেও এই সাময়িকপত্রটিতে অনেক বৌদ্ধ বিষয়ক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছিল যা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে অতীব তাৎপর্যময় ভূমিকা পালন করেছিল।

নির্বাচিত বাংলা সাময়িকপত্রের বৈশিষ্ট্য

গ্রন্থপ্রকাশ একটি ব্যয়সাপেক্ষ ও দীর্ঘ প্রস্তুতি-পর্বের কাজ। গ্রন্থে লেখকের বহুদিনের চিন্তাধারার একটি ধারাবাহিক ও সুসংহত অভিব্যক্তি ধরা থাকে, অনেক আকাঁরা চিন্তাভাবনা পরিমার্জিত হওয়ার সুযোগ থাকে, ব্যষ্টি বা সমষ্টির চিন্তাচেতনা দৃষ্টিভঙ্গির ক্রম বোঝা যায়। অন্যদিকে সাময়িকপত্র তুলনামূলকভাবে ভাবনা প্রকাশের ক্ষেত্রে সহজতর মাধ্যম। দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, বাৎসরিক নানা ধরণের সাময়িকপত্র তাদের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হয়। অনেকের ভাবনাকে একসঙ্গে একটি সাময়িকপত্রের মধ্যে স্থান দেওয়া যায়, অনেকে মিলে কোন বিষয়েও আলোচনার সুযোগ থাকে। এক বা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্নজনের মতপ্রকাশের ক্ষেত্র তৈরি হয়। 'সাময়িক' প্রয়োজনটাও এর একটি বিশেষ দিক হওয়ায় সমসাময়িক বা তাজা প্রতিক্রিয়া সাময়িকপত্রেই ধরা থাকে। একটা জায়মান ভাবপ্রবাহের ধারক এবং বাহক সাময়িকপত্রে সমকালীন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, প্রতিক্রিয়া, বিতর্ক, চিন্তনপ্রবাহ ধরা থাকে। সাংস্কৃতিক বিদ্যাচর্চার অন্যতম উপাদান জোগায় সাময়িকপত্র।

বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতিকে ঘিরে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের আগ্রহ ঊনবিংশ শতকের সাময়িকপত্রগুলিকে সমৃদ্ধ করেছিল। খ্রিস্টিয়, হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের প্রচারমূলক সাময়িকপত্রেও বৌদ্ধপ্রসঙ্গ নিজেদের ধর্মমত বা আদর্শ প্রচারের জন্য কখনো পূর্বপক্ষরূপে, কখনো তাকে খণ্ডন করে নিজমত প্রতিষ্ঠার সহায়ক রূপে, কখনোবা তার আদর্শ ও মতকে আত্তীকৃত বা অনুসরণ করে নিজেদের সমৃদ্ধির কাজে লাগানো হয়েছিল। কোন কোন সাময়িকপত্রে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনার মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও ঔদার্য, কখনো ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে, কখনোওবা নিছক জ্ঞানকাণ্ডচর্চার ক্ষেত্রেই তা নিয়োজিত থেকেছে। সাময়িকপত্রগুলিতে বৌদ্ধবিষয়ক রচনাগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারেই স্থান দেওয়া হয়েছিল তা সামগ্রিক বিচারেই তাৎপর্যময়।

এক একটি সাময়িকপত্র বিশেষ বিশেষ চরিত্রের অধিকারী। আমাদের আলোচ্য সাময়িকপত্রগুলি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল –

বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ

সাময়িকপত্র সংক্রান্ত চিন্তন ও বাঙালি জীবনকে অনুবিশ্ব থেকে মহাবিশ্বের প্রতি আগ্রহী করে তোলার ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলাল মিত্র পথিকৃৎ। স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটির (বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ) আনুকূল্যে তাঁর সম্পাদনায় *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ* (১৮৫১) ও *রহস্য সন্দর্ভ* (১৮৬৩) সাময়িকপত্র প্রকাশিত হওয়ার ফলে বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং রচনারীতিতে তাঁর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না। বাংলা গদ্যের বিবর্তনে *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ*-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ অর্থাৎ ‘পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র’-এর ভূমিকায় (কার্তিক, ১২৫৮) সম্পাদকের অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে –

> জগদীশ্বরের কি অনুপম মহিমা! তাঁহার ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কি আশ্চার্য্য অনির্বচনীয় ব্যাপার সকল অবিরত নিষ্পন্ন হইতেছে। ... জগৎপিতার বর্ণনাতীত কৌশল সর্ব্বত্রই সমরূপে ব্যক্ত আছে, সকল জীবই স্ব স্ব অসাধারণ গুণ দ্বারা পরমেশ্বর মহিমার সাক্ষ্য দিয়েছে। ... এতদ্বিষয়ের যথার্থ বর্ণনা প্রকাশ করা আমাদিগের অভিপ্রায়, এবং তদভিপ্রায়ে এই পত্র স্থাপিত হইল।

কেবল সমকালে নয়, বহুকাল পর্যন্ত ‘শুদ্ধজ্ঞান ও প্রমোদজনক সদালাপদ্বারা’ পাঠককে সন্তুষ্ট রাখা এই সাময়িকপত্রের উদ্দেশ্য ছিল। এর লিখন প্রণালী বিষয়ে পণ্ডিতদের অসন্তুষ্টির সম্ভবনা থাকা সত্ত্বেও যাতে সাধারণ জনগণ ‘সকলেই অনায়াসে পাঠ’ করে ‘অনায়াসে বিদ্যালাভ’ করতে পারেন কর্তব্যনিষ্ঠ সম্পাদক তাই চেয়েছিলেন। জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার প্রসার রাজেন্দ্রলালের লক্ষ্য হওয়ায় তিনি সর্বজনবোধ্য গদ্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ-এ ব্যবহৃত ভাষা প্রসঙ্গে দুটি বিষয় বিবেচ্য – (ক) রাজেন্দ্রলালের লক্ষ্য ছিল ‘সুকঠিন সাধুভাষা’র পরিবর্তে ‘অপভ্রংশ মিশ্রিত প্রচলিত ভাষা’ যা ‘ভদ্রসমাজের কথোপকথনে’ ব্যবহারযোগ্য। (খ) ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি এই প্রস্তাব দিয়েছেন, তখনকার ভাষাদর্শে পণ্ডিতদের ‘অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা’ সত্ত্বেও এই প্রকল্প নিয়েছিলেন। এর ‘ভূমিকা’য় (বৈশাখ, ১২৬৪) বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ তথা সাধারণ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখে বলা হয়েছে যে বঙ্গদেশের মানুষ মানসিক ক্ষমতায় কোন জাতির থেকে ন্যূন নন, বিদ্যাবুদ্ধির অনুশীলনেও তাঁদের যথেষ্ট ক্ষমতা, অতএব ‘সৎপথাবলম্বন’ করে তাঁদের ‘প্রয়োজনীয় ও হিতজনক বিবিধার্থ চিত্তাকর্ষক সরল ভাষায় রচিত’ হয়ে অল্পব্যয়ে প্রচারিত হলে তাঁরাও বিলাতি পাঠকদের মত নিঃসন্দেহে ‘সদ্গ্রন্থের সমাদর’ করবেন, এই

কারণে তাঁদের 'সদ্বিবেচনা ও প্রযত্নের প্রয়োজন' রয়েছে। বৌদ্ধবিদ্যাচর্চায় প্রথমদিকের বাংলা সাময়িকপত্র হিসাবে *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ* কৃতিত্বের অধিকারী।

বৌদ্ধশিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলা-মূর্তিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা; ভারতসহ শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, চীন, তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ধর্ম, আচার, দর্শন প্রভৃতি সকলক্ষেত্রেই সামগ্রিক অর্থে বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার পথিকৃতের সম্মান সাময়িকপত্রদ্বয়ের সম্পাদক রূপে রাজেন্দ্রলালেরই প্রাপ্য।

রহস্য-সন্দর্ভ

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত *রহস্য-সন্দর্ভ* নাম পদার্থসমালোচক মাসিকপত্রের (১২৮০) ভূমিকায় জানানো হয়েছে –

> সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত লৌকিক সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হয়, সুতরাং তন্নিবারণে যত্ন না করিয়া অনুসরণ করাই জ্ঞানীর কর্ম্ম।

'সহৃদয় পাঠকবৃন্দের সন্তোষসাধন' এই সাময়িকপত্রের উদ্দেশ্য। 'ভূমিকা'য় (১২৭৮) জগৎপিতার 'অপূর্বকৌশল জ্ঞাপক' যে কোন পদার্থকে লক্ষ্য করে তার সংগ্রহ ও 'প্রকৃত সৃষ্টি মাত্র'-কেই এর 'ক্ষেত্র' রূপে নির্বাচন করা হয়েছিল। *রহস্য-সন্দর্ভ*-এ বুদ্ধচরিত, আশোকচরিত সম্পর্কে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল।

বঙ্গদর্শন

বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ-এর পর কথ্যভাষাকে আদর্শ করে মহিলাদের জন্য প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সাময়িকপত্র হল প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদার সম্পাদিত *মাসিক পত্রিকা* (১৮৫৪)। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* ও *মাসিক পত্রিকা* উভয়ের সমন্বয় ঘটিয়ে *বঙ্গদর্শন* (১৮৭২) পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র নতুন ভাষাদর্শের সূচনা করেছিলেন। সাধারণ পাঠকের সঙ্গে সংযোগের একটা বড় মাধ্যম সাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে বঙ্কিমের উচ্চধারণা ছিল। *প্রচার* (শ্রাবণ, ১২৯১) সাময়িকপত্রের সূচনায় তিনি লিখেছেন–

> আমাদের বিবেচনায় সভ্যতা-বৃদ্ধির এবং জ্ঞানবিস্তারের সাময়িক সাহিত্য একটি প্রধান উপায়। যে সকল জ্ঞানগর্ভ এবং মনুষ্যের উন্নতিসাধক তত্ত্ব, দুস্পাপ্য এবং দুর্ব্বোদ্ধ্য এবং বহু পরিশ্রমে অধ্যয়ণীয় গ্রন্থ সকলে, সাগর-গর্ভ-নিহিত রত্নের ন্যায় লুক্কায়িত থাকে, তাহা সাময়িক সাহিত্যের সাহায্যে সাধারণ সমীপে

অনায়াসলভ্য হইয়া সুপরিচিত হয়। এমন কি, সাময়িক পত্র যদি যথাবিধি সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে সাময়িক পত্রের সাধারণ পাঠকের অন্য কোন গ্রন্থ পড়িবার বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। আর সাময়িক পত্রের সাধারণ সমকালীন লেখক ও ভাবুকদিগের মনে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবির্ভূত হয়, তাহা সমাজে প্রচারিত করিবার সাময়িক পত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

বাংলা দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থে মাতৃভাষার ব্যাপক চর্চা প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন বলে বঙ্কিমচন্দ্র অনুধাবন করেছিলেন। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা প্রকাশের মাসখানেক আগে *Mookrjee's Magazine*-এর (মার্চ, ১৮৭২) সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষা ব্যবহারের আবশ্যকতা সম্পর্কে বলেছেন –

I have myself projected a Bengali Magazine with the object of making it the medium of communication and sympathy between the educated and the uneducated classes. You rightly say that the English for good or for evil has become our vernacular; and this tends daily to widen the gulf between the higher and the lower ranks of Bengali society. This, I think, is not exactly what it ought to be; I thing that we ought to disanglicise ourselves, so to speak, to a certain extent, and to speak to the masses in the language which they understand.[৬]

১৮৭০ ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় Bengal Social Science Association-এ তাঁর প্রদত্ত লিখিত ভাষণে (A Popular Literature for Bengali) *বঙ্গদর্শন* সাময়িকপত্রের পূর্বাভাস লক্ষ করা যায়।

বঙ্গদর্শন মাসিকপত্র ও সমালোচন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বৈশাখ, ১২৭৯ থেকে চৈত্র, ১২৮২ পর্যন্ত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১২৮৩ বঙ্গাব্দে এর প্রকাশ বন্ধ থাকে। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বৈশাখ, ১২৮৪ থেকে চৈত্র, ১২৮৫; বৈশাখ, ১২৮৭ থেকে আশ্বিন, ১২৮৮ এবং বৈশাখ, ১২৮৯ থেকে চৈত্র, ১২৮৯ প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও সমকালীন বিভিন্ন সাক্ষ্যানুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্রই প্রকৃতপক্ষে এর সম্পাদনার প্রায় সকল দায়িত্ব নির্বাহ করতেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় এটি কার্তিক, ১২৯০ – মাঘ, ১২৯০ এবং রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় বৈশাখ, ১৩০৮ – চৈত্র, ১৩১২ প্রকাশিত হয়েছিল। তার পরেও শ্রীশচন্দ্রের সম্পাদনায় এটি জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিম-সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন-কে* প্রথম পর্যায়, শ্রীশচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন*-কে দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্পাদনাকাল বলা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের *বঙ্গদর্শন* বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মোহিতলাল মজুমদারের সম্পাদনায় তৃতীয় পর্যায়ের *বঙ্গদর্শন* (শ্রাবণ, ১৩৫৪ – ফাল্গুন, ১৩৫৫) পর্যন্ত এই পত্রিকা স্থায়িত্ব পেয়েছিল।[৭]

বঙ্গদর্শন-এ বঙ্কিমচন্দ্র নিছক আত্মতৃপ্তির জন্য সাহিত্যচর্চা করেন নি। তিনি একে একটি সুপরিকল্পিত সুগঠিত জীবনতত্ত্বের বাহন হিসাবে, মাতৃভাষার সাহায্যে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণির মধ্যেকার ভেদ ঘোচাতে চেয়েছিলেন। মাতৃভাষার সাহায্যেই দুই শ্রেণির মধ্যে সমপ্রাণতা জন্মাবার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় তিনি ইংরাজিভাষা থেকে পাওয়া বিদ্যাকে বাংলাভাষার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে নতুন যুগ ও নতুন সংস্কৃতির বাণী শোনাতে চেয়েছিলেন। একটা মূল্যমান, যা বাঙালির পরিবর্তিত সমাজ ও জীবনের এমন এক অভূতপূর্ব আদর্শ, বাঙালির নতুন যুগের উপযুক্ত হয়ে উঠবার দিকনির্দেশ এর মধ্যে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

বঙ্গদর্শন-এর (বৈশাখ, ১২৭৯) 'পত্র-সূচনা'য় তিনি লিখেছেন – ক) এই পত্র সুশিক্ষিত বাঙালির 'পাঠোপযোগী' হোক। খ) কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হাতে 'বার্তাবহস্বরূপ' বাঙালি সমাজে এটি তাঁদের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, চিত্তোৎকর্ষ ও জ্ঞানের পরিচয় দিক। গ) যাতে নব্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্ধিত হয়, সাধ্যানুসারে তার অনুমোদন করা সাময়িকপত্রের উদ্দেশ্য। সাময়িকপত্রের ক্ষণিক জীবনও নিস্ফল নয়। যে সকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হয়ে থাকে, এইসকল সাময়িকপত্রের জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু তারই প্রক্রিয়া। হরপ্রসাদ 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে (*নারায়ণ*, আষাঢ়, ১৩২৫) লিখেছেন, 'জ্ঞানবিস্তার' করাই *বঙ্গদর্শন* প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল।

বঙ্গদর্শন বলতে একটা বিশেষ চিন্তাপ্রকৃতি, একটা দৃষ্টিভঙ্গি, যেটি সেকালের অন্য সাময়িকপত্র থেকে ভিন্ন, এমন-কী পরবর্তীকালের রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নবপর্যায় *বঙ্গদর্শন* থেকেও তা স্বরূপত আলাদা ছিল। ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব-দর্শন-বিজ্ঞান মিলিয়ে বাঙালির জীবনের একটা মূল্যমান প্রস্তুত করার জন্য একদিকে জাতীয় জীবনকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা, ইউরোপীয় ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির তুল্যমূল্য বিচার করে স্বদেশের গৌরব এবং অগৌরব বুঝে নেওয়া, তেমনি সমাজ ও জাতির পুনর্গঠন করে জড়তা এবং নৈতিক কলুষতা থেকে মুক্তির ঈপ্সা এই প্রকল্পের অঙ্গীভূত ছিল। এতে বাঙালির উদ্যমহীনতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে জীবন মূল্যমানে উপযোগিতা বা ইউটিলিটির তত্ত্ব গুরুত্ব পেয়েছিল।[৮]

বঙ্গদর্শন-এর প্রথম পর্যায়ে সূচিত হলেও ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন, তার ভৌগোলিক ব্যাপ্তি ও সীমা ইত্যাদি প্রশ্নের সূচনা তার গঠনমূলক চিন্তা দ্বিতীয় পর্বকে বিশিষ্ট করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে সমাজপরিবর্তনের পালা সূচিত হওয়ার পাশাপাশি একটা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাও জেগে উঠেছিল। বিংশ

শতাব্দীর সূচনাপর্বে *বঙ্গদর্শন*-এ রবীন্দ্রনাথ এ দিকে আলোকপাত করেছিলেন। একদিকে দেশাত্মবোধের জাগরণ, আরেকদিকে রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন – দুইয়ের মিলিত একটি ভাবান্দোলনে রাষ্ট্রচেতনায় বাঙালি সমাজ প্রবুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।[৯]

বঙ্গদর্শন-এর উদ্দেশ্য বিচারে রচনাগুলিকে তিনশ্রেণিতে ভাগ করা যায়। ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাখ্যামূলক রচনা প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির আধুনিক প্রণালীতে পর্যালোচনা, নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববিশ্লেষণ, ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোচনা, অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাখ্যা ও সূত্র ইত্যাদি আলোচনার সূত্রে বাঙালির কর্মগৌরবকে উদ্দীপিত করে নবজাগ্রত উৎসাহ উদ্দীপনা ও আশা আকাঙ্ক্ষা জাগানো দ্বিতীয় শ্রেণির রচনায় উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির রচনা সম্পাদনার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিকে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মশক্তিতে চেতিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তৃতীয় শ্রেণির রচনায় বঙ্কিমী আদর্শবাদ উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি রচনার মধ্যে ফুটে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সংস্কৃতির জীবন্ত, বিকাশশীল নিত্যনবীয়মান তত্ত্বটিকে জানতে চেয়েছিলেন যা আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারবে। হিন্দুধর্মের পক্ষে তিনি সওয়াল করে লিখেছেন – ধর্মের শিক্ষাপ্রদ অংশ চিরকাল হিন্দুধর্মে রয়েছে। মানবপ্রকৃতি হিন্দুধর্মের ভিত্তি হওয়ায় তার মর্মভাগ অমর, চিরচলিষ্ণু, মনুষ্যের হিতসাধনকারী; তবে বিশেষ বিধিগুলি সকল ধর্মেই সময়োচিত হওয়ায় তা কালভেদে পরিহার্য বা পরিবর্তনীয়।[১০]

'হিন্দুধর্ম্মের নব সংস্কারের' বঙ্কিমীভাষ্য গতিশীল এবং যুগোপযোগী ভারতসংস্কৃতির পক্ষপাতী। তিনি নতুন কোন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না করে প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিশেষ রূপের একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাকে খাড়া করতে চেয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয়ে একটা জাতীয়তাবাদী কাঠামো তৈরি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। উপনিবেশের পক্ষে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন স্বাভাবিক ঘটনা হওয়ায় জাতিস্বাতন্ত্রকামী বঙ্কিমচন্দ্র এই সামগ্রিক আগ্রাসনের প্রতিরোধকল্পে একজন আদর্শ পুরুষ বা নায়করূপে *মহাভারত*-এর বীর রসাত্মক কৃষ্ণকে মর্যাদা দান করলেন। *কৃষ্ণচরিত্র*-এর 'দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন'-এ তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন না করে তিনি তাঁর মানব চরিত্রের সমালোচনা করেছেন। তিনি নিজে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করলেও পাঠককে সে মতাবলম্বী করার চেষ্টা থেকে দূরে থেকেছেন।

তাঁর *ধর্ম্মতত্ত্ব* প্রবন্ধের 'অনুশীলন' অধ্যায়ে (*নবজীবন*, আশ্বিন, ১২৯১) অনুশীলন ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এই ধর্মের দুটি দিকের আলোচনায় বলা হয়েছে – ক) 'মানুষের সুখ, মনুষ্যত্ব' ও খ) 'এই মনুষ্যত্ব, সকল বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্য সাপেক্ষ'। মানুষের সমুদায়শক্তি চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত – ১) শারীরিকী – ব্যায়ামাদি দ্বারা শারীরিকী বৃত্তিগুলির পুষ্টি; ২) জ্ঞানার্জনী – উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ; ৩) কার্যকারিণী – কাজে প্রবর্তনায় প্রবৃত্তি; ৪) চিত্তরঞ্জিনী – যেগুলি আনন্দ বা আহ্লাদ অনুভূত করায়। ঈশ্বরই সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ।

'ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধের 'মনুষ্যত্ব' অধ্যায়ে (*নবজীবন*, ভাদ্র, ১২৯১) অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় আদর্শ হতে পারেন না। ঈশ্বরের অনুকারী মানুষরা অর্থাৎ যাঁদের গুণাধিক্য দেখে ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায় অথবা যাঁদেরকে 'মানবদেহধারী ঈশ্বর' মনে করা যায়, তাঁরাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হতে পারেন। এইজন্য যিশুখ্রিস্ট খ্রিস্টানের এবং শাক্যসিংহ বুদ্ধ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মপরিবর্ধক আদর্শ'-এর শ্রেষ্ঠত্ব হিন্দুশাস্ত্রকেই দিয়েছেন। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি – সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রা আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। এর বিপ্রতীপে 'খ্রীষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্ম্মল ধর্ম্মবেত্তা'; সর্বগুণবিশিষ্ট – এঁদের মধ্যেই সর্ববৃত্তি সর্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্তি পেয়েছে। কিন্তু, এইসকল আদর্শের উপর 'হিন্দুর আর এক আদর্শ' রয়েছে যাঁর কাছে আর সকল আদর্শই খাটো হয়ে যায় – যিনি যুধিষ্ঠিরের ধর্মশিক্ষক, স্বয়ং অর্জুন যাঁর শিষ্য, রাম ও লক্ষণ যাঁর অংশমাত্র, যাঁর তুল্য 'মহামহিমময় চরিত্র' কখনও মানুষের ভাষায় কীর্তিত হয়নি – সেই তত্ত্ব প্রমাণের জন্যই কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ ছিল।

বুদ্ধের মহাজীবনের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবনত থাকলেও যুগ-প্রয়োজনে কৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন তাঁর কাছে আদর্শ পুরুষ। ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় স্বভাবতই বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ এসেছে। বৌদ্ধধর্ম ঊনবিংশ শতকের বাংলা তথা ভারতের প্রেক্ষাপটে খণ্ডিত, এই কথাই তিনি প্রমাণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কার্যত যুগ-প্রয়োজনে তিনি বুদ্ধচরিত্রকে অস্বীকারই করতে চাইলেও বুদ্ধজীবন সম্পর্কে তাঁর মুগ্ধতাই প্রকাশ পেয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রেও ঊনবিংশ শতকের দ্বিধা ও স্ববিরোধিতা লক্ষ করা যায়। তিনি সনাতনপন্থী, হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কট্টর সমর্থনকারী এবং প্রচারক। তাঁর ব্রাহ্মধর্ম বিরোধী অবস্থানও অপরিচিত নয়। তিনি ব্রাহ্ম মতবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ মতবাদের সদর্থকতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি নিজে *বঙ্গদর্শন*-এ বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বিশেষ কিছু না লিখলেও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক নানা লেখাকে স্থান দিয়েছিলেন। বঙ্কিম-সুহৃদ রামদাস সেন ও বঙ্কিমপন্থ্ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধ-বিষয়ক চর্চা এইক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা কথাসাহিত্যে বৌদ্ধধারার প্রবর্তনের কৃতিত্ব *বঙ্গদর্শন*-এর প্রাপ্য। বঙ্কিম তাঁর সুহৃদ ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর (*প্রচার,* আশ্বিন, ১২৯১ – মাঘ, ১২৯১ এবং বৈশাখ, ১২৯২ – আষাঢ়, ১২৯৩) ভাবনাকে তেমনভাবে সঞ্চারিত করতে পারেন নি। কৃষ্ণচরিত্রের তাত্ত্বিক কাঠামো বঙ্কিমের মধ্যেই পূর্ণতা ও লয়প্রাপ্ত হয়েছে। অন্যদিকে, *বঙ্গদর্শন* যে বৌদ্ধ বিষয়ক চর্চার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে, সেই পথেই পরবর্তীকালে সাহিত্য-সংস্কৃতি সমালোচনার অভিনব পথ নির্দেশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমপন্থ্ সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির *সাহিত্য* ও চিত্তরঞ্জন দাশের *নারায়ণ* সাময়িকপত্রের অবদান স্মরণযোগ্য। *নবজীবন* (শ্রাবণ, ১২৯১) সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার *বঙ্গদর্শন*-এর মূল্যায়নে যথার্থই বলেছেন, বাঙালি জীবনে ও বাংলা সাহিত্যে 'যুগ প্রলয়'কারী *বঙ্গদর্শন* 'উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক'। এর যুগব্যাপী উপদেশের ফলে বাঙালি পুরাণ, ইতিহাস, দেবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, কবিত্ব, সাহিত্য ইত্যাদি সকল বিষয়েরই 'অন্তঃস্তর দর্শন'-এর ব্যগ্রতায় 'যুগান্তর' উপস্থিত হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে শ্রীশচন্দ্র মজুদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মোহিতলাল মজুমদার এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।

জ্ঞানাঙ্কুর

শ্রীকৃষ্ণ দাস সম্পাদিত 'সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র ও সমালোচনা' *জ্ঞানাঙ্কুর* (ভাদ্র, ১২৭৯) রাজশাহী বোয়ালিয়া জ্ঞানাঙ্কুর পত্রালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয় বৈচিত্রে ভরা দ্বিভাষিক এই পত্রিকাটির গুণগত মান সারস্বত সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। *বঙ্গদর্শন* (পৌষ, ১২৭৯) পত্রিকায় *জ্ঞানাঙ্কুর* সম্পর্কে প্রশংসা রয়েছে –

> এই পত্র (*জ্ঞানাঙ্কুর*) খানির কলেবর দেখিয়া অনেকের ভক্তির অভাব জন্মিবে। মন্দ কাগজে মন্দ ছাপা দেখিয়া অশ্রদ্ধা হইবে; কিন্তু যে পরিমাণে অশ্রদ্ধা হইবে, ভিতরে পড়িয়া সেই পরিমাণে ভক্তি এবং সুখের উদয় হইবে। যদি অন্যান্য সংখ্যা প্রথম সংখ্যা তুল্য হয়, তবে ইহা যে বাঙ্গালা পত্রের মধ্যে এক খানি

অত্যুৎকৃষ্ট পত্র হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। দেখা যাইতেছে যে লেখকেরা কৃতবিদ্য, চিন্তাশীল এবং লিপিপটু। ভরসা করি পত্র খানি স্থায়ী হইবে।

জ্ঞানাঙ্কুর-এর মধ্যে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রস্তাবগুলি সন্নিবেশিত হয়েছিল। *Indian Mirror* (জানুয়ারি, ১৯৭৩) সমকালীন *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার সঙ্গে *জ্ঞানাঙ্কুর* পত্রিকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ধারণ করে লিখেছে –

> Among the other publications of the New Year the Jnanankura deserves more than a passing attaintion. Along with its contemporary the Banga dursun, this periodical marks an important period in this history of Bengalee literature asshewing that the taste for solid reading has entered largely into the constitution.

ইংরেজি এবং বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে 'the result entirely of extensive thought and reflection' নিয়ে এই পত্রিকার আবির্ভাব গুরুত্বময়। *বঙ্গদর্শন*-এ (পৌষ, ১২৭৯) সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *জ্ঞানাঙ্কুর* সম্পাদকের কাছে পত্রিকাটি কলকাতায় ছাপাতে অনুরোধ করেছিলেন। পরের বছর (২ খণ্ড) কলকাতার ভবানীপুর, সাপ্তাহিক সংবাদযন্ত্রে *জ্ঞানাঙ্কুর* মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতে থাকে।[১০] সূচনা পর্বের বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এই পত্রিকার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আর্য্যদর্শন

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত মাসিক পত্র ও সমালোচন *আর্য্যদর্শন* (বৈশাখ, ১২৮১) এগারো বছর ধরে রচনাগুণের জন্যই বিশেষ সম্মান অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। 'জ্ঞান ও নীতির চর্চ্চা এবং প্রচার' এই সাময়িকপত্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সম্পাদক 'অবতরণিকা'য় এই সাময়িকপত্রের আদর্শ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। লঘু ও গুরু বিষয়ের সঙ্গে নীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শন, কাব্য কলা, উপাখ্যানের সঙ্গে নব্যসমাজ এবং নব্যসম্প্রদায়ের অভাব ও কর্তব্য, প্রাচীন সময় ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে এর সম্বন্ধ ও সাপেক্ষতা বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছিল। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা স্বীকার করে পত্রিকায় রচনা, জ্ঞান ও নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল।

আর্য্যদর্শন 'দেশ, কাল ও পাত্রের অবিসম্বাদী' বিষয় প্রচার, পাশ্চাত্যের অনুকরণের বদলে দেশীয় পুরাতন ইতিহাস, দৃষ্টান্ত ও সমাজপদ্ধতিকে মূল করে জাতির উন্নতিবিধানে যত্নবান ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে – 'শাক্যসিংহের কীর্তি আমাদের নিকট যেরূপ দেদীপ্যমান, লুথারের দৃষ্টান্ত সেরূপ নয়'।

‘স্বজাতির সভ্যতার ভিত্তিভঙ্গ-নিবন্ধন’ না করে পূর্বপুরুষদের কীর্তিকে স্বীকরণ করে এগোনোর পাশাপাশি বিদেশী ভাষা থেকে অমূল্য তত্ত্বসংগ্রহ করে তা প্রচারের জন্য মাতৃভাষাকে অবলম্বন করতে উৎসাহিত হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী ভাবধারা *আর্য্যদর্শন*-এর প্রধান চালিকাশক্তি, এখানে প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়ের সুর লক্ষিত হয়েছে –

> ... পূর্ব পুরুষের উপকরণ সামগ্রী লইয়া আমাদের জাতীয় সভ্যতা একতা ও চরিত্রের কেবল ভিত্তিটি মাত্র নির্ম্মিত হইতে পারে। তাহাও ইউরোপীয় কৌশল ও মসলা ব্যাতিরেকে হইবে না।

মুখ্যত অতীত গৌরব ও ঐতিহ্য সন্ধানের প্রশ্নেই *আর্য্যদর্শন* বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতিচর্চায় আগ্রহী হয়েছিল।

নবজীবন

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় *নবজীবন* মাসিকপত্র (শ্রাবণ, ১২৯১) প্রকাশিত হয়। *নবজীবন* প্রকাশের পনের দিন ব্যবধানে প্রকাশিত *প্রচার* (শ্রাবণ, ১২৯১) সাময়িকপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলন তত্ত্বের ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করলে অক্ষয়চন্দ্র ‘একপ্রকার সাহিত্যজগতের দায়িত্বভার গ্রহণ’ করেছিলেন। ব্রাহ্মণের পুনরুভ্যুদয় ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের জন্য তিনি নানাভাবে সচেষ্ট ছিলেন।[১১]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ, বঙ্গদর্শন-এর ঐতিহ্যানুসারী *নবজীবন*-এ (শ্রাবণ, ১২৯১) সাময়িকপত্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে সকল প্রকার স্তরের ভিতরে ভিতরে একটি সাধারণ স্তর রয়েছে। মানবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, পুরাণ, ইতিহাস, কবিত্ব, সাহিত্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি – সকল স্তরের অন্তরে একটি মহান ও বিশাল স্তর, সকলের আধার রূপে, আশ্রয়স্বরূপ হয়ে, আলম্বনভাবে বিরাজ করছে। কোন বিষয়েই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের জন্য সেই আধারের সঙ্গে আধেয়র সম্বন্ধ বোঝা, জীবতত্ত্ব ইত্যাদির আলম্বন উপলব্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। চিন্তাশীল বাঙালি এই অন্তর স্তরের আভাস পেয়েছেন। এই মূলীভূত সার স্তরের কথা উপেক্ষা করে সাম্যবাদ বা বৈষম্যবাদ, বিতর্কবাদ বা স্থিতিবাদ কিছুই বোঝা সম্ভব নয়। সেই ‘বিশাল মহান্ আশ্রয়-স্তরের নাম-ধর্ম্ম’। ‘ভারতবাসী চিরদিনই ধর্ম্মব্রত’। নবযুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ধর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বাঙালির উন্নতি সম্ভব। ‘ধর্ম্মের বিশ্বোদর ভাব’ সম্পর্কে ‘সম্যক উপলব্ধি’র স্পর্ধা না রাখলেও, কেবল ‘ভাবের আভস’ পেয়েই *নবজীবন* তার দায়িত্ব স্বীকার করেছে –

> নিয়মিত রূপে সাময়িক পত্রে এই বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া, আমরা আপনারাও বুঝিব, এবং সাধারণকে বুঝাইব, এ আশা আমাদের হৃদয়ে আছে। ... সিদ্ধি মানবের সাধ্যায়ত্ব মধ্যে নহে। তবে সাধনা করিতে আমরা পারি বটে।

'বঙ্গভাষায় আর একখানি উচ্চ-অঙ্গের সাময়িকপত্র' প্রকাশের তাগিদ থেকেই *নবজীবন*-এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'অক্ষয়চন্দ্র সরকার' (*ভারতী*, ভাদ্র, ১৩২৯) প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্রকে 'বাংলাময়' আখ্যায় ভূষিত করেন। 'বাঙালিয়ানা, বাঙালিত্ব, আমি বাঙালি' এই বোধ তিনি বাঙালির মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। হরপ্রসাদ সমকালীন প্রেক্ষাপটে *নবজীবন*-এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন যে 'নবজীবন মানে হিন্দুর নবজীবন অর্থাৎ Hindu Revival'।

প্রমথনাথ বসুর 'হিন্দুধর্ম্মের নবজীবন' (*নবজীবন*, চৈত্র, ১২৯৯) প্রবন্ধে এই পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা পরিপুষ্ট হয়েছে। হিন্দুসমাজে বর্ণভেদের মূল এতদূর প্রসারিত যে তা উৎপাটন করা দুঃসাধ্য। অনেক সমাজ সংস্কারক এর বিনাশে প্রবৃত্ত হলেও সেটি 'সতেজ' রয়েছে। এই বর্ণভেদ বিলুপ্ত না হওয়ার কারণ রূপে তিনি সমাজ সংস্কারকদের হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্থাপন করাকে দায়ী করেছেন অর্থাৎ জাতির সংখ্যা বাড়লেও হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ আরও বদ্ধমূল হয়। ঔপনিবেশিক শাসন এই বর্ণভেদকে শিথিল করেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে সকল ভারতবাসীর মনে একজাতি, একদেশ – এই 'নূতন এবং মহৎ ভাব'ও এসেছে। এই অবস্থায় প্রাবন্ধিক *নবজীবন*-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক প্রস্তাব দিয়েছেন –

> বর্ণভেদ থাকিতে হিন্দু ধর্ম্মের বল বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। যদি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কেহ হিন্দু ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণেচ্ছুক হয়, হিন্দু ধর্ম্ম কেন না তাহাকে আশ্রয় দিবে? প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের শাখা মাত্র; বৌদ্ধদিগকে হিন্দুর মধ্যে গণ্য করায় হিন্দু ধর্মের কোন ক্ষতি নাই, বরঞ্চ লাভের সম্ভাবনা।

নবজীবন পত্রিকার বিজ্ঞাপনে এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে –

> ... নূতন ধরণে লিখিত, নূতন ধরণে চালিত, আকৃতি নূতন, বিষয় নূতন, উদ্দেশ্য নূতন। ... আমরা মহতের উত্তরসাধকতায় উচ্চব্রত, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দৃঢ় সংকল্প লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম। আশা করি বঙ্গীয় পাঠক নবযুগে নবোৎসাহে যোগ দিয়া বাঙ্গালায় এই নবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন।

স্বপন বসু 'নবজীবন সম্পর্কে দু-চার কথা' প্রবন্ধে (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ১৪০৯) লিখেছেন যে *নবজীবন*-এ প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' ও অন্যান্য লেখকদের ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি গোঁড়া রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থীদের এবং অনেক ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের মনোক্ষুন্ন করেছিল। এই সাময়িকপত্রের উদ্দেশ্য

নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। হিন্দু পুনরুত্থান আন্দোলন অনেক স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত। এই মতানৈক্যে একদল ধর্মের নামে প্রচলিত সবকিছুর সংরক্ষণে পক্ষপাতী আর অন্যদল কালোপযোগিতার স্বার্থে হিন্দুধর্মে সংস্কার অপরিহার্য বলে মত পোষণ করতেন। পরস্পর মতবিরুদ্ধ দলের সম্পর্ক মধুর ছিল না। সংরক্ষণপন্থীরা *প্রচার* বা *নবজীবন*-এর মতামত পছন্দ করতেন না। হিন্দুধর্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য কীর্তন করার লক্ষ্যে *বেদব্যাস* (বৈশাখ, ১২৯৩) পত্রিকা আসরে অবতীর্ণ হয়েছিল।

পঞ্চম বর্ষজীবী *নবজীবন* সংকীর্ণ হিন্দুত্ববাদকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হলেও অল্পদিনের মধ্যে বাংলার নবজাগরণের ভাবধারাকে আত্তীকৃত করে সর্বজন পাঠ্য উন্নতমানের সাময়িকপত্রে উন্নীত হতে পেরেছিল। *বঙ্গদর্শন*-এর মত *নবজীবন*-এ বৌদ্ধ বিষয়ক প্রধান লেখক ছিলেন রামদাস সেন। সমকালীন পাঠক সমাজে বৌদ্ধ-বিষয়ক রচনার চাহিদাকে অক্ষয়চন্দ্র গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র হিন্দু-মাহাত্ম্য প্রচারক *নবজীবন*-এ বৌদ্ধ-বিষয়ক প্রবন্ধ স্থান দিয়েছিলেন। অক্ষয় অনুগামীরা বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের শাখারূপে বিবেচনা করতেন।

নারায়ণ

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে একই বছরে দুটি বিপরীত ভাবনার সাময়িকপত্র প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় *সবুজপত্র* ও চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় *নারায়ণ* প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পুরনো বিরোধীরা, অতীতে নিবন্ধদৃষ্টি পণ্ডিতেরা, ঈর্ষালুরা এবং 'হঠাৎ-ডিমক্রসির' নকলনবীশেরা – সকলে একজোট হয়ে *সবুজপত্র*-এর প্রতিপক্ষরূপে *নারায়ণ* পত্রিকার ছত্রতলে সমবেত হয়েছিলেন। *সবুজপত্র*-কে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হল – প্রথম চৌধুরীর ভাষা অর্থাৎ চলিত ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথের ভাব। *সবুজপত্র* রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্য-শুভেচ্ছা পেয়েছিল বলেই হয়তো তৎকালীন প্রধান লেখকেরা এর সঙ্গে ছিলেন। *নারায়ণ*-এ প্রথম থেকেই নব্য লেখকরা অগ্রাধিকার পেয়েছিল। এর লেখকগোষ্ঠী কখনো রবীন্দ্রনাথের আর্শীবাদ প্রত্যাশা না করেই সরাসরি রবীন্দ্র-বিরোধিতা করেছে। পাঠক মহলে জনপ্রিয় *নারায়ণ* ছাড়া তৎকালীন সাহিত্য ধারার মূল্যায়ন সম্ভব নয়।[১২]

নারায়ণ অগ্রহায়ণ, ১৩২১ থেকে ভাদ্র, ১৩২৯ একটানা প্রকাশিত হয়েছিল। *নারায়ণ*-এর আশ্বিন, ১৩২৯ সংখ্যা যথাসময়ে প্রকাশিত না হয়ে বিলম্বে যুগ্ম সংখ্যা আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৯ প্রকাশিত হয়েছিল।

এরপর আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *নারায়ণ*-এর নামকরণ সম্পর্কে 'বাঙলা সাহিত্য চিত্তরঞ্জন' (*মাসিক বসুমতী*, শ্রাবণ, ১৩০২) ও 'নারায়ণের প্রথম সংখ্যা' (*বাঙ্গালার কথা*, আষাঢ়, ১৩৩৫) প্রবন্ধদুটিতে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে এত নাম থাকতে ঠাকুর-দেবতার নামে মাসিকপত্রের নাম *নারায়ণ* হল কেন? রাজদ্রোহের অপরাধে আলিপুর জেলে আটক অরবিন্দ ঘোষকে চিত্তরঞ্জন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আদালতে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময়ে একদিন অরবিন্দ বলেছিলেন, 'যেন নারায়ণ স্বয়ং' এসে তাঁর 'পক্ষ সমর্থন' করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন *নারায়ণ* পত্রিকা বের করলে হরপ্রসাদ 'যেন এই দুইটি ঘটনার একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ' খুঁজে পেয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনের সম্ভবত বিশ্বাস ছিল, 'নারায়ণ' দেশ রক্ষা করবেন। ব্যারিস্টার ও বিলাত ফেরত মহলে *নারায়ণ* বিশেষ প্রচারিত হয়েছিল। *নারায়ণ*-এর প্রথম সংখ্যার সূচনায় চিত্তরঞ্জন লিখিত স্তব 'নমস্তে নারায়ণ'-এ নারায়ণের মহিমা বর্ণনা হয়েছে। লেখায় প্রার্থনা-স্তব-স্তুতি নেই, নারায়ণকে পাবার একটা গভীর আশা, প্রখর চাঞ্চল্য ছিল। প্রবন্ধটি আংশিক উদ্ধারযোগ্য –

> সকল ভোগ্যের তুমি ভোক্তা, সকল রসের তুমিই আস্বাদনকারী ... নারায়ণ তোমার কথা যখন ভাবি, অতীতের সমস্ত যবনিকা উত্তোলিত হয়; তখন বুঝিতে পারি ইতিহাস শুধু তোমারই লীলা পরিপূর্ণ পুণ্য কাহিনী। সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব আর তুমি, তুমি আর জীব। তুমি এক, তুমিই দুই – এই দুই মিলিয়াই তুমি এক। ইহাই বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য ইহাতেই বিশ্বের রস-স্ফূর্তি। ধন্য জীব ধন্য তুমি, ধন্য তোমার লীলা!

চিত্তরঞ্জন সম্পাদক রূপে *নারায়ণ*-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরাসরি কিছু না বললেও *বঙ্গদর্শন*, *প্রচার*, *নবজীবন* অনুসারী হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুধর্মের নবজীবনের কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

নারায়ণ পণ্ডিতী সাধুভাষার বিরুদ্ধে সহজ সাধুভাষার পক্ষে দাঁড়িয়ে সাফল্য পেয়েছিল। 'বাংলা ভাষাকে খাঁটি বাংলা' করার ক্ষেত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য। গল্প উপন্যাসের থেকেও প্রবন্ধচর্চায় এর অবদান গুরুত্বময়। মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশের ক্ষেত্রে *নারায়ণ*-এর কর্তৃপক্ষ বেশি উৎসাহী ছিলেন। কিছুটা বঙ্কিমী পন্থায় আস্থা থাকলেও চিন্তায় চেতনায় *নারায়ণ*-এর ব্যতিক্রমী প্রবন্ধগুলি নতুনতর ভাবনায় সমৃদ্ধ ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাঙলা সাহিত্য চিত্তরঞ্জন' প্রবন্ধে এর সবদিক বিবেচনা করে নিরপেক্ষ সমালোচনার কথা স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেছেন –

> অনেক লোকের উপাস্য দেবতাকে অসার বলিয়া উল্লেখ করিতে নারায়ণ ভয় পাইত না। ... অনেক অজানা লেখককে নারায়ণ জানাইয়া গিয়াছে।

নারায়ণ-এর 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ পত্রিকার ঋজু আদর্শ সম্পর্কে জানানো হয়েছে –

> ... আমরা বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবীদের নিকট বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা বলিয়া আসিতেছি। ... নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও বাঙ্গালা আবার তাহার স্বভাবধর্ম্মে ফিরিয়া আসিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ... বাঙ্গালা একদিন তাহার স্বভাবধর্ম্মে ফিরিয়া আসিবেই আসিবে। বাঙ্গালী তাহার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, জীবনে ও সাহিত্যকে নব নব রূপের সৃষ্টি করিতে পারিবে। বাঙ্গালীর জীবন ও সাহিত্যকে আমরা স্ব-ভাবে ফিরাইয়া আনিতে চাহি। ... পাশ্চাত্যের বিষ আমাদের গত শতাব্দীর সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কাজেই এই শ্রেণীর সাহিত্যও জীবনকে আমরা 'নারায়ণে'র পৃষ্ঠায় প্রতিবাদ করিতে ত্রুটি করি নাই, ভীতও হই নাই।

সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে অভূতপূর্ব গবেষণা যে *নারায়ণ*-এ প্রকাশিত হয়েছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিজের কথায় তার প্রমাণ রয়েছে –

> আমি যখন বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখি, তখন তরুণ ইতিহাসবাগীশগণ, তাঁহার কাছে (চিত্তরঞ্জন) শুনিয়াছি নালিশ করে যে, উনি ফুট নোট দেন না, উনি অথরিটি দেন না, উঁহার কথার বিশ্বাস কী? ... আমি এই সব ইতিহাসবাগীশদের হাঙ্গামার শেষে অথরিটি দিতে লাগিলাম সব বৌদ্ধপুথি, তাহার নামও বাগীশমহাশয়দের জানা নাই। আমার নোটবুকে আছে। ... নারায়ণ এই সব ইতিহাসবাগীশদের হাত হইতে আমায় রক্ষা করিয়াছেন।

নারায়ণ পত্রিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তা বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিল। বিশেষ করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধগুলি ও *বেনের মেয়ে* উপন্যাসের জন্য এই পত্রিকার সুনাম অম্লান থাকবে। অনালোকিত দিকের বৌদ্ধ-বিষয়ক চর্চার জন্য স্বল্পায়ু অথচ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল *নারায়ণ* অবিস্মরনীয়।

বঙ্গবাণী

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দুই পুত্র রমাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় আর দীনেশচন্দ্র সেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদারের যৌথ সম্পাদনায় *বঙ্গবাণী* (ফাল্গুন, ১৩২৮) প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সংখ্যার 'বঙ্গবাণী' শীর্ষক প্রবেশক কবিতায় পত্রিকার ভাবনা বিলসিত হয়েছে –

> ... হসিত মাধুরী-ভূষিত নিত্য তুমি গো বঙ্গবাণী।
>
> ... সঙ্গীত রসে উৎসবময়ী, তুমি গো বঙ্গবাণী,
>
> ... স্ফুরিত জীবনে তোমারই মহিমা, ওগো ও বঙ্গবাণী।

... প্রলয়ে শাসিয়া বাজাও হাসিয়া অভয়-শঙ্কা, জানি।

মৃত্যু আমারে অমৃত-দায়িনী তুমি গো বঙ্গবাণী।

... চন্দন সম গন্ধে ফুটিব, ক্ষয় করি মোরে ভবে;

দুঃখ গলিয়া গয়াহিব করুণ রবে।

বিতরে নিত্য অমৃত অত্য, তোমার সঙ্গ, রাণী।

ঢাল গো ভূতলে আলোক, শান্তি, ওগো ও বঙ্গবাণী।

এই সাময়িকপত্রে 'খাঁটি জাতীয় জীবনের ও জাতীয় সাহিত্যের উদ্বোধন' ঘটেছে, একথা স্বীকার করে জানানো হয়েছে –

> নূতন যুগ আসিয়াছে; দেশের নূতন উৎসাহ ও নূতন উদ্দীপনা দেখা গিয়েছে। এটি ইতিহাসসিদ্ধ যে, নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার যুগে অনেক নূতন বিপদ আসিয়া উন্নতির বাধা হইয়া দাঁড়ায়; ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় সেই বিপদ এড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুবুদ্ধির পরিচালনা না থাকিলে হিতৈষণার মোহ, কেবল অন্ধকার সৃষ্টি করে, ও উচ্ছৃঙ্খল উৎসাহ সমাজে আত্মদ্রোহ ও আত্মহত্যা টানিয়া আনে। ... উৎসাহ-পীড়িত কর্ম্মীদলের নায়কদিগকে পরোক্ষভাবে নিয়মিত করিবার জন্য চিন্তাশীলদিগের অভিজ্ঞতার বাণী নিরন্তর প্রচার করিবার প্রয়োজন। আমরা এদিনে হিতৈষীমন্ত্র-দ্রষ্টাদের মন্ত্রণা ভিক্ষা করিতেছি। ... শোভন সাহিত্য বা সহযোগজাত মন্ত্র এক হউক।

বঙ্গবাণী-র শিরোটীকায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের *মেবার-পতন* নাটকের (১৯০৮) 'আবার তোরা মানুষ হ' গানটির পঙক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যার থেকে পত্রিকা পরিকল্পনার একটা আঁচ পাওয়া যায়। *সংবাদ প্রভাকর* থেকে *বঙ্গবাণী* প্রকাশের আগে পড়ে যে সব সাময়িকপত্র বেরিয়েছিল, সেগুলিকে ঘিরে অচিরেই এক একটি লেখক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। *বঙ্গবাণী* প্রথম থেকে গোষ্ঠীতন্ত্রের বিরোধিতা করে ব্যাতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের রচনা সাদরে সানন্দে গৃহীত হওয়ার পাশাপাশি বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জনের লেখা এখানে স্থান পেয়েছিল। নিজস্ব লেখক গোষ্ঠী তৈরি ও গোষ্ঠীভুক্ত লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতার কোন উদ্দেশ্য *বঙ্গবাণী*-র না থাকায় দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা উদারতা ও সততা একে সমকালীন সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে এক সম্ভ্রমের আসন দিয়েছিল।[১৩]

১৯২১ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়কালের মধ্যে তিনি ঊনত্রিশটি বক্তৃতা দেন। এর মধ্যে আঠাশটি *বঙ্গবাণী*-তে প্রকাশিত হয়েছিল যার মধ্যে বৌদ্ধশিল্প বিষয়ক অনেক তথ্য ও উপাদান রয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রথম দুই বছর যৌথভাবে সম্পাদনার পর দীনেশচন্দ্র ব্যক্তিগত কারণে সম্পাদকের পদ থেকে সরে গেলে

বিজয়চন্দ্রের একক সম্পাদনায় *বঙ্গবাণী* প্রকাশিত হয়েছিল। হরপ্রসাদের চর্যাপদ সংক্রান্ত তত্ত্বের বিরোধিতা করে বিজয়চন্দ্র বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেগুলি সমালোচনার ইতিহাসের ক্ষেত্রে জরুরি। সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে নিজস্বতার স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল *বঙ্গবাণী* যাবতীয় সংকীর্ণতা, গোষ্ঠীতন্ত্রের ঊর্দ্ধে উঠে এক বিশুদ্ধ সাহিত্য-পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করেছিল যা ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা রূপে সম্মানার্হ।

উপসংহার

আমাদের গবেষণা অনুযায়ী ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রেস থেকে বালক-বালিকাদের জন্য খ্রিস্টমাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত মাসিক সাময়িকপত্র *সত্যপ্রদীপ*-এ (জানুয়ারি, ১৯৬০) প্রকাশিত 'বৌদ্ধ ধর্ম্ম' (জুলাই, ১৮৬০; ফেব্রুয়ারি, ১৮৬১) প্রবন্ধদুটিকে প্রথম বৌদ্ধ-বিষয়ক প্রবন্ধ বলা যায়। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* (১৮৪৮), *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ* (১৮৫১), *রহস্য-সন্দর্ভ* (১৮৬২), *বঙ্গদর্শন* (১৮৭২), *ভারতী* (১৮৭৭), *সাহিত্য* (১৮৯০), *মানসী* (১৯০৮-১৯০৯), *মর্ম্মবাণী* (১৯১৫), *মানসী ও মর্ম্মবাণী* (১৯১৫), *বালক* (১৮৮৫), *জ্ঞানাঙ্কুর* (১৮৭২), *আর্য্যদর্শন* (১৮৭৪), *নব্যভারত* (১৮৮৩), *নবজীবন* (১৮৮৪), *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* (১৮৯৪), *নারায়ণ* (১৯১৪), *সবুজপত্র* (১৯১৪), *উদ্বোধন* (১৮৮৩), *প্রবাসী* (১৯০১), *ভারত মহিলা* (১৯০৫), *প্রবর্তক* (১৯১৫), *বঙ্গবাণী* (১৯২১), *মাসিক বসুমতী* (১৯২১), *দাসী* (১৮৯২), *প্রদীপ* (১৮৯৭), বিচিত্রা (১৯২৭), *ভারতবর্ষ* (১৯১৩), *পরিচয়* (১৯৩১) প্রভৃতি সাময়িকপত্রে নানাভাবেই বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির পরিচয় ধরা পড়েছে। বৌদ্ধ সংস্কৃতিমূলক কয়েকটি সাময়িকপত্র ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যায় থেকে বেরোতে শুরু করে বিংশ শতকে প্রসার লাভ করেছিল। কেবলমাত্র বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে আলোকপাত করা যে সব সাময়িকপত্রের উদ্দেশ্য ছিল তাদের মধ্যে *বৌদ্ধবন্ধু* (১৮৮৮), *বৌদ্ধ পত্রিকা* (১৯০৬), *জগজ্জ্যোতি* (১৯০৮), *সম্বোধি* (১৯২৪), *তরুণ বৌদ্ধ* (১৯২৬), *ছাত্রসঙ্ঘ* (১৯২৭), *সঙ্ঘশক্তি* (১৯২৮), *বুদ্ধিষ্ট ইণ্ডিয়া* (১৯৩৪), *জাগরণী* (১৯৩৯), *বৌদ্ধবাণী* (সময়কাল অনুল্লিখিত), *উদয়* (সময়কাল অনুল্লিখিত), *বোধিভারতী* (১৯৫৩), *বিশ্ববৌদ্ধ* (১৯৫৪), *নিরঞ্জনা* (১৯৫৬) *নালন্দা* (১৯৬৬), *বুদ্ধবাণী* (১৯৭০) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমাদের নির্বাচিত সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ* ও *রহস্য-সন্দর্ভ*-এর আদর্শ মোটামুটি এক। *বঙ্গদর্শন, জ্ঞানাঙ্কুর* ও *আর্য্যদর্শন* সাময়িকপত্রের আদর্শ যাই হোক না কেন, মোটামুটি ভাবে

এগুলিকে একটি গুচ্ছ রূপে ধরতে পারি। হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শকেই তা অনুসরণ করেছে। *বঙ্গদর্শন* এগুলির মধ্যে দিক নির্দেশক সাময়িকপত্র হিসাবে নন্দিত। *বঙ্গদর্শন*-এর আদর্শ অনুসরণ করে সেই ধারণাই আরও সম্পসারিত হয়েছে *নবজীবন*-এ। এই সাময়িকপত্রগুলি নিছক শুদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার মধ্যে তার লক্ষ্যকে সীমাবদ্ধ না রেখে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিশেষ ধর্মীয় ভাবনায় উজ্জীবিত হয়েছিল। সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় সামগ্রিকভাবে বাঙালির যাপনকে বিশেষ অনুশীলনের আওতায় এনে মানুষের রুচিবোধ ও সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সাময়িকপত্রগুলি সচেষ্ট ছিল। লোকশিক্ষার ধারক-বাহক রূপে এই সাময়িকপত্রগুলির বৌদ্ধ বিদ্যাচর্চা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তা সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রূপে বিবেচিত হতে পারে। অন্যদিকে *নারায়ণ* ও *বঙ্গবাণী* বিংশ শতকের সাময়িকপত্র। বৌদ্ধ বিষয়ক আলোচনা ও সমাজ বিবর্তনের রূপ এই পত্রিকাগুলির মধ্যে ধরা পড়েছে। লোকশিক্ষা দানের তাগিদ বিংশ শতকে সাময়িকপত্রে বিশেষ লক্ষিত হয় নি। বরং, একটা ক্রমোত্তরণের তাগিদ লক্ষ করা যায়। *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ* থেকে *বঙ্গবাণী* সাময়িকপত্রে বিবর্তনের সুরটিও লক্ষনীয়। সাময়িকপত্রগুলিতে লেখকগোষ্ঠীর চরিত্র ও আদর্শ এক থাকে নি। *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ* ও *রহস্য-সন্দর্ভ*-এর বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার আদর্শ *বঙ্গদর্শন*, *জ্ঞানাঙ্কুর*, *আর্য্যদর্শন* ও *নবজীবন*-এ পরিবর্তিত হয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদী লোকশিক্ষার ধারাকে অনুসরণ করেছে। লেখকগোষ্ঠীও ছিলেন মোটের উপর প্রাচীনপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী প্রবীণেরা। এই আদর্শের কিছুটা অনুবর্তন *নারায়ণ*-এ দেখা গেলেও ভাবনার দিক থেকে তা অনেক প্রগতিশীল। লেখকগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কিছু প্রবীণ ছিলেন ঠিকই, কিন্তু নবীনদের জন্য অবারিত দ্বার ছিল। বিশেষ ব্যক্তি বা আদর্শচালিত না হয়ে একটা ঔদার্যের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। *বঙ্গবাণী* এই ভাবনাকে আরো এগিয়ে নিয়ে গিয়ে কোনো লেখকগোষ্ঠীর ভেদাভেদ রাখে নি। ফলে চিন্তনের ক্ষেত্রে একটা মুক্তির, প্রাচীনকে চ্যালেঞ্জ জানাবার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। এই পথেই পরবর্তীকালে *পরিচয়*-এর (শ্রাবণ, ১৩৩৮) মত শুদ্ধ বৌদ্ধিকচর্চার সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। আমাদের নির্বাচিত সাময়িকপত্রগুলি সমকালের প্রতিনিধিস্থানীয় স্বাতন্ত্রমণ্ডিত জনমানসের দর্পণস্বরূপ।

টীকা ও উৎস নির্দেশ

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। (সংকলিত ও সম্পাদিত)। (২০০৮)। *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*। প্রথম খণ্ড। ১২১২ – ১২৩০। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। পৃ. ৵৶৹

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। (২০০০ – ২০০১)। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মডার্ন। পৃ. ২৯৫

৩। শাস্ত্রী, শিবনাথ। (২০০৯)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। অষ্টম পরিচ্ছেদ। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। কলকাতা: নিউ এজ। পৃ. ১৩১

৪। দেবেন্দ্রনাথের *আত্মজীবনী*-র ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে খ্রিস্টানদের ধর্মান্তরিতকরণ সম্পর্কে তাঁর অবস্থান ব্যক্ত হয়েছে –

> ... ইহা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ হইল ও দুঃখ হইল। অন্ত:পুরের স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান করিতে লাগিল। তবে রোস্, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। ... আমি তখন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম, এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইল। 'অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না!

দ্রষ্টব্য: জানা, নরেশচন্দ্র। জানা, মানু। সান্যাল, কমলকুমার। (সম্পাদিত)। (১৯৮১) ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ। *স্বরচিত জীবন-চরিত*, কলকাতা: অনন্য প্রকাশন। পৃ. ২৭

৫। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভূমিকা দ্রষ্টব্য: ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (সম্পাদিত)। (২০১৩), ঘোষ, বারিদবরণ। ভূমিকা। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংগ্রহ ১*। ১৮৩৩ শক। ১৩১৮ সাল। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। পৃ. ৪ – ৫

৬। দত্ত, ভবতোষ। সরকার, বিজলী। (২০০৬)। *বঙ্গদর্শন পরম্পরা*। নৈহাটি: বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র। পৃ. ৩৬

৭। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। (২০০৮)। *বঙ্গদর্শন পত্রিকা ও বঙ্কিমচন্দ্র*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১২, ২৫ ও দত্ত, ভবতোষ। সরকার, বিজলী। (২০০৬)। *বঙ্গদর্শন পরম্পরা*। নৈহাটি: বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র। পৃ. ৬৩, ২৬৭

৮। দত্ত, ভবতোষ। সরকার, বিজলী। (২০০৬)। *বঙ্গদর্শন পরম্পরা*। নৈহাটি: বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র। পৃ. ২৮

৯। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩০ – ৩১

১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। (সংকলিত ও সম্পাদিত)। (২০০৮)। *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*। প্রথম খণ্ড। ১২১২ – ১২৩০। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। পৃ. ১৩

১১। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। (২০০৮)। *অক্ষয়চন্দ্র সরকার*। *রামগতি ন্যায়রত্ন*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। পৃ. ৮ – ১০

১২। সেন, সুকুমার। (২০০২)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ২৫৮ ও গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ। (২০১০)। *সাময়িকপত্র প্রসঙ্গে*। কলকাতা: পারুল। পৃ. ৫০

১৩। গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ। (২০১০)। *সাময়িকপত্র প্রসঙ্গে*। কলকাতা: পারুল। পৃ. ৫৮ – ৫৯

তৃতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন

ভূমিকা

বুদ্ধদেব বোধিজ্ঞান লাভের পরে প্রাথমিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে এই সত্য বহুজনের হিতের ও সুখের জন্য প্রচার করেন। তাঁর অমোঘ জ্ঞানের বাণী জনসাধারণের মনে অপূর্ব সাড়া ফেলেছিল। ত্রিপিটক গ্রন্থে এই সত্য বা তাঁর শিক্ষা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই জটিল ধর্মতত্ত্বের জ্ঞান লাভ অতিশয় দুরূহ ব্যাপার, তা কেবল উচ্চ সাধকদেরই উপলব্ধিগম্য। পরবর্তীকালে এই দুরধিগম্য তত্ত্বের মর্ম উপলব্ধির জন্য বহু টীকা বা ভাষ্য রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থগুলি বুদ্ধের চিন্তাধারাকে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বুদ্ধদেব সবসময় তাঁর শিষ্যদের আত্মনির্ভর হতে, জ্ঞানসঞ্চয় করতে ও সর্বজীবের প্রতি মৈত্রীভাব দেখাতে উপদেশ দিতেন। তাঁর উচ্চ আদর্শ, বিশ্বজনীন প্রেম, সহনশীলতা ও দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক জ্ঞান মানুষের জীবনে সুখ ও শান্তি আনতে সহায়তা করে। নানা অসেতুসাধ্য ভাবনা ও প্রকৃতির মধ্যে বৌদ্ধদর্শন সর্বজনীন চর্যাচর্যকে ধারণ করে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের সেতু রচনা করেছে।

বৌদ্ধধর্মের উৎস সন্ধান

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বৌদ্ধধর্ম কোথা হইতে আসিল?' (*নারায়ণ*, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২১) প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্মের আদি উৎসের অনুসন্ধান রয়েছে। প্রাবন্ধিক কয়েকটি প্রচলিত মতের পুনর্বিবেচনা করেছেন –

ক) বহুকাল ধরে প্রচলিত মত অনুযায়ী বুদ্ধদেব যজ্ঞে হাজার হাজার পশুবধ দেখে 'দয়া'[১] করে তা নিবারণের জন্য 'অহিংসা পরমধর্ম' মত প্রচার করেছিলেন। ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র কবিভারতী (ত্রয়োদশ শতক) বাংলা থেকে সিংহলে গিয়ে রাজার কাছে 'বৌদ্ধাগম চক্রবর্তী' উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর মতে, বুদ্ধদেব সকল বেদের নিন্দা না করে শুধু সেই সকল শ্রুতির নিন্দা করেছিলেন যাতে পশুবধের কথা আছে। কবি জয়দেবের মতে, বুদ্ধদেব মাত্র যজ্ঞবিধির শ্রুতিগুলির নিন্দা করেছিলেন।

খ) 'অদ্বয়বাদী' বুদ্ধদেব প্রচলিত উপনিষদের অদ্বৈত মতকে আশ্রয় করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তাঁর নির্বাণ আর উপনিষদের অদ্বয়বাদে বিশেষ কিছু তফাৎ নেই। এই বিষয়ে হিন্দু রামানুজী আর

শঙ্করবাদীদের মধ্যে বাদানুবাদ রয়েছে। রামানুজীরা বলেন যে শঙ্কর বৌদ্ধমত গ্রহণ করে অদ্বৈতবাদী হয়েছিলেন আর শঙ্করবাদীরা বলেন যে উপনিষদের প্রাচীন অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করে বুদ্ধদেব অদ্বৈতবাদী হয়েছিলেন।

গ) বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত সাংখ্যমতের পরিণাম। সাংখ্যমতের মতো বৌদ্ধমতেও দর্শন সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি গুণে সংখ্যা করা হয়। সাংখ্যের অষ্টবিকৃতি, তিনপ্রমাণ, পঞ্চভূত, একাদশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, অষ্টসিদ্ধি ইত্যাদির মতো বুদ্ধেরও সেইরকম পঞ্চস্কন্ধ, চতুরার্যসত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রভৃতি রয়েছে। ত্রিতাপনাশের জন্য রচিত দুটি দর্শনের পার্থক্য এখানে যে সাংখ্য আত্মাকে কেবল অর্থাৎ অন্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য স্বীকার করে, অন্যদিকে বৌদ্ধ অনাত্মবাদের পক্ষপাতী।

ঘ) বুদ্ধদেব আপামর সকলকে মুক্তির উপদেশ দিতেন। ব্রাহ্মণ্য দ্বেষই তাঁর ধর্মপ্রচারের কারণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ও প্রাধান্য দমনের জন্যই বৌদ্ধমত সূচিত হয়েছিল।

ঙ) বুদ্ধদেব শাক্যবংশে জন্মেছিলেন। 'শাক্য' শব্দ 'শক' থেকে উৎপন্ন। সুতরাং তিনি শক ছিলেন এবং শকদের ধর্মপ্রচার করেছিলেন।

চ) কোনো কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিত বুদ্ধদেবের কাহিনির সত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে এটি সূর্যসম্বন্ধীয় প্রাচীন কল্পিত আখ্যায়িকামাত্র। শালগাছে ভর করে মা মায়াদেবী দাঁড়ালেন এবং মায়ের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে সিদ্ধার্থের জন্মের ঘটনা পূর্বদিকে সূর্যোদয় এবং দুটি শালগাছের মাঝখানে গালে হাত দিয়ে বুদ্ধদেবের নির্বাণ প্রাপ্তি সূর্যাস্তের ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সমালোচকরা আখ্যায়িকা সজ্জাকারীদের 'সুবিধিরচনার বাহাদুরি' দেখিয়েছেন।

ছ) যাঁরা ভারতবর্ষের যা কিছু সবই গ্রিকদের কাছ থেকে নেওয়া মনে করেন, তাঁরাও বুদ্ধদেব গ্রিকদের কাছ থেকে কিছু নিয়েছেন এইকথা বলতে পারেন না। কেননা, তখনো গ্রিকেরা ভারতবর্ষের দিকে আসে নি। কিন্তু ভারতবর্ষের নিজস্ব কিছু থাকাতে তাঁদের আপত্তি থাকায় তাঁরা বলেন যে বুদ্ধদেব ও মার জোরোয়াস্টারের মতের অহুরমজদা ও আহরিমান মাত্র।

জ) যেখানে প্রায় ২৫০০ বছর আগে (বর্তমানে ২৫৬০) সিদ্ধার্থের জন্ম হয়, এখন সেখানে থাড়ু (চোরো বা থেড়ো) নামে এক জাতি বাস করে। অতি প্রাচীনকালে বঙ্গ, মগধ ও চের নামে তিনটি জাতি আর্যদের শত্রু ছিল। এদের ধর্মই বুদ্ধদেব সংস্কার করে উত্তর ভারতে প্রচার করেছিলেন।

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে প্রচলিত মতগুলির প্রতিবাদ করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, কেবল কতরকমের ভিন্ন ভিন্ন মত আছে তা দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু বিচারের পন্থা সম্পর্কে তিনি কিছু প্রস্তাবনা করেছেন। যেমন – বুদ্ধদেব আর্য কি না তা বিচার করতে হবে। বুদ্ধদেব ইক্ষ্বাকুবংশ-জাত। গোতম গোত্রের কপিলমুনি শাক্যবংশের আদিগুরু। গোতমের নাম থেকেই শাক্যসিংহকে গৌতম বলে ডাকা নয়। বুদ্ধদেবের পূর্বপুরুষরা অন্য জাতীয় লোক হয়ে তৎকালীন রীতি অনুযায়ী গুরুর গোত্র নিয়ে গৌতম হয়েছিলেন। বৈমাত্র ভাইয়ের উপকারের জন্য তাঁদের ইক্ষ্বাকু রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলেও শাক্যরা ইক্ষ্বাকু বলে গর্ব করতেন। সুতরাং, ভরতবংশের মত শাক্যবংশ 'পাকা আর্য' কিনা এ বিষয়ে প্রাবন্ধিক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

আর্য ও বঙ্গ-বগধ জাতির সন্ধিস্থলে শাক্যবংশের রাজধানী ছিল। এইরকম নানা কারণে প্রাবন্ধিক শাক্যরা 'পাকা আর্য' কিনা সেই বিষয়ে 'যেন একটু সন্দেহ' করেছেন, যাগযজ্ঞে পশুহিংসা দেখে বুদ্ধদেবের অহিংসা ধর্মের উদ্রেক হয় – *ললিতবিস্তর, মহাবস্তু-অবদান, বুদ্ধচরিত* প্রভৃতি বুদ্ধের কোনো জীবনচরিতে একথা বলা নেই। অহিংসা পরম ধর্ম – একথা তাঁর আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। উপনিষদের অদ্বৈতবাদ থেকে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি একথা স্বীকার করা কঠিন। প্রাবন্ধিক প্রশ্ন তুলেছেন – বৌদ্ধধর্ম কি গোড়ায় অদ্বৈতবাদ ছিল? নাকি সেটা মহাযানীরাই ফুটিয়ে তুলেছেন? শকেরা শুদ্ধরাজাদের সময় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ভারতবর্ষে আসে। কাজেই, শকজাতি থেকে শাক্যজাতির উদ্ভব, একথা প্রাবন্ধিক অস্বীকার করেছেন। তিনি শাক্য শব্দের আরেকপ্রকার ব্যুৎপত্তির দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। অশ্বঘোষ অনুযায়ী তিনি লিখেছেন যে শাক (শাল) গাছে ঘরা জায়গায় বাস করতেন বলে বুদ্ধদেবের পূর্বপুরুষদের শাক্য বলা হত। যদি সাংখ্য থেকেই বৌদ্ধমতের উৎপত্তি হয়, তাহলে বৈদিক আর্যমত থেকে তার উৎপত্তি বলা যায় না। প্রাবন্ধিক সিদ্ধান্তে এসেছেন যে পূর্বাঞ্চলে বঙ্গ, বগধ ও চের নামে তিনটি সভ্যজাতির পূর্বসীমার সঙ্গে আর্যদের পশ্চিমসীমার মেলামেশার ফলে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল।

ঐতরেয় আরণ্যক অনুযায়ী বঙ্গ-বগধ-চেরজাতিকে পক্ষীবিশেষ বলা হত। তাদের ধর্ম নেই এবং তারা নরকগামী হবে। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ ভারতবর্ষ অথবা আর্যভূমির অথবা আর্যজাতির বসতি বিস্তারের সীমা নির্ধারিত হয়েছিল। আর্যরা এলাহাবাদ পর্যন্ত এসেছিলেন, তার ওদিকেই আর্যদের শত্রু বঙ্গ-বগধ-চেরজাতি। আর্যরা পূর্বদেশের বাংলার লোককে পাখি বলতেন। বুদ্ধদেব পূর্বাঞ্চলের সেই 'পাখির দেশেই

জন্মান’। পশ্চিমাঞ্চলের আর্যরা যখন যাগযজ্ঞ, দেশ দখল, শৌতসূত্র রচনা, শূদ্রদের আয়ত্ত করে দাস বানাতে ব্যস্ত তখন পূর্বাঞ্চলে বঙ্গ-বগধ-চেররা পরকাল নিয়ে, জন্ম-জরা-মরণের হাত থেকে কীভাবে এড়ানো যায় তা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বুদ্ধের আগে আরও তেইশ জন বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। নেপালি বৌদ্ধরা চারযুগে আটজন মানুষবুদ্ধের কথা বলেছেন। বিপশ্যী ও শিখী সত্যযুগে, কাশ্যপ ও বিশ্বভু ত্রেতাযুগে, ক্রকুচ্ছন্দ ও কণকমুনি দ্বাপরে এবং শাক্যসিংহ এবং মৈত্রেয় কলিযুগে আবির্ভূত হন। বুদ্ধদেবের সময়ে ছয়টি ধর্ম প্রচার হয়েছিল। সেগুলি হল – আজীবক (গোশালা মংখালিপুত্রের পুত্রের ধর্ম), নির্গ্রন্থ (মহাবীরের ধর্ম), অক্রিয়াবাদী (পূর্ণ কাশ্যপ), উচ্ছেদবাদী (অজিত কেশকম্বল), বিক্ষেপবাদ (সঙ্গয় বা সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত) এবং অন্যোনোবাদী (পকুধ কচ্চায়ন)। পূর্বাঞ্চলে বহু ধর্মমতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রচিকিৎসা, ন্যায়শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, সাংখ্যশাস্ত্র সূচিত হয়েছিল। মাথা কামানো, আহারের নিয়ম, স্বর্ণরৌপ্য ত্যাগ, উচ্চাসন মহাসন ত্যাগ, মদ্য ত্যাগ প্রভৃতি বৌদ্ধদের আচার ব্যবহার আর্যদের থেকে তাদের ভিন্ন করেছে।

বুদ্ধদেবের পূর্বেও সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষু হওয়া, ভিক্ষু হয়ে অহিংসা, অস্তেয় প্রভৃতি শীল গ্রহণ, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বুদ্ধদেব ভিক্ষুদের শাসনের জন্য যে সকল নিয়ম করেছিলেন বা বিহার ও সংঘারামের ব্যবস্থা করেছিলেন তা তাঁর নিজের অবদান। একস্থানে অনেক ভিক্ষুর অবস্থান, জনশিক্ষার জন্য সুন্দর সুন্দর গল্প রচনা, সকলকে নিয়ে সুন্দরভাবে কর্মসম্পাদন, গৃহস্থ বৌদ্ধদের জন্য পঞ্চশীল ও অষ্টশীলের ব্যবস্থা করা বুদ্ধদেবের অবদান। মধ্যমা প্রতিপৎ অর্থাৎ ‘মাঝামাঝি চলো, বাড়াবাড়ি কোরো না’ – এই আদর্শের জন্য ‘বুদ্ধের ধর্ম এত বড়ো’, ‘বুদ্ধের নাম এত বড়ো’, ‘বুদ্ধের সংসারে এত সম্মান’, ‘সকল ধর্ম অপেক্ষা’ তাঁর ‘ধর্ম এত উদার’। বুদ্ধের দর্শন সম্পর্কে প্রাবন্ধিক প্রাঞ্জলভাবে সার কথাটি উপস্থাপিত করেছেন –

> ভোগও করিবে না, কঠোরও করিবে না, তবে করিবে কী? অশ্বঘোষ বুদ্ধের মুখে বলাইয়াছেন, “আহারঃ প্রাণযাত্রায়ৈ ন ভোগায় নদৃপ্তয়ে।” এই যে মধ্যমা প্রতিপৎ এইটিই বৌদ্ধধর্মের মজ্জা, সার, নিগূঢ় কথা উপনিষৎ।

বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক প্রস্থান

অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ ‘বুদ্ধদেব ও তদুদ্ভাবিত ধর্ম্ম-প্রণালী’ (*আর্য্যদর্শন,* আষাঢ়, ১২৮১) ও রামদাস সেনের ‘বৌদ্ধ ধর্ম্ম’ (*বঙ্গদর্শন,* ৪ বর্ষ, ২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২) প্রবন্ধদুটির বুদ্ধদেবের জীবনী আলোচনার সঙ্গে তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। রামদাসের ‘বৌদ্ধ মত ও তৎ সমালোচন’ (*বঙ্গদর্শন,* ৪ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১২৮২) প্রবন্ধেও বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন দৃষ্টান্তসহ আলোচিত হয়েছে।

বুদ্ধদেবের উপদেশাবলীর একটি অংশ হল ‘ধম্ম’ বা ‘ধর্ম’ অন্যটি হল ‘অভিধম্ম’ বা ‘অভিধর্ম’। তিনি সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধর্ম সাধারণের জন্য এবং অভিধর্ম বা দর্শন উন্নত মননশীল ব্যক্তিদের উদ্দেশে দেশনা করেছিলেন। বুদ্ধদেবের ধর্ম ও দর্শনকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে –

১) মধ্যম পন্থা, চতুরার্যসত্য ও আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ

বুদ্ধদেব বারাণসীর মৃগদাবে (সারনাথ) পঞ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ শিষ্য – কৌণ্ডিণ্য, ভদ্রজিৎ, বপ্র, মহানাম ও অশ্বজিৎকে উদ্দেশ করে যে উপদেশ দেন তা ধর্মচক্রপ্রবর্তনসূত্র নামে পরিচিত। এতে চতুরার্যসত্য বা শ্রেষ্ঠসত্য নামে খ্যাত গভীর তত্ত্ব সন্নিবেশিত – দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও নিরোধগামী মার্গ। *দীঘনিকায়*-এর ‘মহাপরিনিব্বান সুত্ত’-এ বৌদ্ধধর্মের এই মূলসূত্রটির উল্লেখ রয়েছে।[২] চতুরার্যসত্যে যে সাধকের জ্ঞানলাভ হয়েছে তাঁকে আর্য বলা হয়। পালি সাহিত্যে নির্বাণ লাভের চারটি স্তরের কথা জানা যায়। যথা – স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব।

প্রথম সত্য – জীবন দুঃখময়। জাগতিক সুখ দুঃখ সবই ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং ক্লেশদায়ক। জগতের সকলপ্রকার দুঃখকে বুদ্ধদেব আটশ্রেণিতে ভাগ করেছেন – ১) জন্ম দুঃখ, ২) জরা দুঃখ, ৩) ব্যাধি দুঃখ, ৪) মৃত্যু দুঃখ, ৫) অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, ৬) প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ, ৭) ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ এবং ৮) পঞ্চোপাদান স্কন্ধময় এই দেহ ও মন দুঃখময়। *অভিধম্ম-পিটক*-এ ব্যাধি দুঃখের পরিবর্তে রয়েছে ‘সোকপারিদেব-দুক্খ-দোমনস্স-উপায়াসা দুক্খা’। এই আটপ্রকার দুঃখ দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত – ১) শারীরিক – জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু। ২) মানসিক – প্রিয়বিচ্ছেদ, অপ্রিয়সংযোগ, ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি এবং পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। তাই বারংবার প্রতিসন্ধি বা জন্মগ্রহণ করাই দুঃখ। পুনর্জন্ম রোধ করলে দুঃখের অবসান হয়। তাই নির্বাণ উপলব্ধি করে পুনর্জন্ম রোধই যুক্তিযুক্ত।

দ্বিতীয় সত্য অর্থাৎ সমুদয় সত্য বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণনীতি থেকে উদ্ভূত। জগতের সবকিছুই অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ জীবের দুঃখ কারণসম্ভূত। সাংসারিক জীবনের প্রতি আসক্তিই পুনর্জন্মের কারণ। এই আসক্তি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন – এই ষড়েন্দ্রিয় থেকে আসে। কারণ এই ষড়েন্দ্রিয় কোন বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। এই জ্ঞানের অভাবেই জগতে বস্তুর প্রতি আসক্তি এসে দৃষ্টি বিপর্যয় ঘটায় যা দর্শনে অবিদ্যা বা অজ্ঞান নামে পরিচিত। সুতরাং অবিদ্যার অভাবই দুঃখ উৎপত্তির কারণ।

তৃতীয় বা নিরোধ সত্য দ্বিতীয় বা দুঃখ কারণসম্ভূত। দুঃখ নিরোধের একমাত্র উপায় পুনর্জন্ম নিরোধ বা নির্বাণ। চতুর্থ সত্য বা মার্গসত্যের জ্ঞান যখন লাভ হয়, তখন দুঃখ উপলব্ধির কারণসমূহের জ্ঞান হয়।

চতুর্থ আর্যসত্য মধ্যম মার্গ বলে কথিত। চূড়ান্ত বিলাস সুখ বা অসংযত ভোগ এবং চূড়ান্ত কৃচ্ছ্রসাধন বা কঠোর তপস্যা – এই দুই অন্ত বা চরমপন্থাকে পরিত্যাগ করে বুদ্ধ প্রব্রজিতদের 'মজ্ঝিমা পটিপদা' বা মধ্যম পন্থা অনুসরণ করতে বলেছিলেন। এই মধ্যম পন্থাই আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ বা সত্যমার্গ। আটটি অঙ্গ বা করণ বা উপকরণ হল – সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। সম্যক দৃষ্টি হল চতুরার্যসত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদের জ্ঞান। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও কামগুণ পরিহার করা এবং মৈত্রীভাব ও করুণা ভাব উৎপাদন করাই সম্যক সংকল্প। মিথ্যেকথা, কটুভাষণ, মর্মচ্ছেদী বাক্য ও নিরর্থক আলাপ থেকে বিরত থাকাই সম্যক বাক্য। জীবহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার থেকে বিরতি সম্যক কর্ম। সৎজীবিকার দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই সম্যক জীবিকা। অনুৎপন্ন পাপ পরিহার ও কুশলের উৎপাদন এবং উৎপন্ন কুশলের স্থিতি ও বৃদ্ধি সম্যক প্রচেষ্টা। কায় ও মনের ধর্মসমূহ সর্বদা স্মরণ রাখাই সম্যক স্মৃতি। চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি। সম্যক সমাধি মনের চঞ্চলতা দূর করে। প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি ভেদে এই মার্গ তিনভাগে বিভক্ত। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলনে জীবের তৃষ্ণা ও অবিদ্যা বিদূরিত হয় এবং পরিশেষে নির্বাণ উপলব্ধি করা যায়।

বৌদ্ধধর্মে দুঃখ সত্য বলে প্রজ্ঞাপিত হলেও বুদ্ধোপদেশ দুঃখবাদ নয়, অতিমাত্রায় আশাবাদ। পৃথিবী দুঃখময় হলেও দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ কিংবা দুঃখ নিরোধের উপায় জানা থাকলে দুঃখের স্বরূপ জানার প্রচেষ্টা উৎসাহব্যঞ্জক এবং আশাবাদের দ্যোতক।[৩]

২) শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা

থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম মতে মানুষ মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম[৪] গ্রহণ করে। মানুষ মৃত্যুর পর যদি মনুষ্যলোকেই জন্মগ্রহণ করে, তবে কোন কোন মানুষ পুনর্জন্মের কথা (এক, দুই বা বহুজন্ম) স্মরণ করতে পারে। কিন্তু গত এবং বর্তমান মনুষ্যজন্মের মধ্যে ব্যবধান থাকতে পারে অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষ আবার মনুষ্যলোকেই জন্ম নেবে একথা সবক্ষেত্রে সত্য নাও হতে পারে। মনুষ্যলোকে মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের মাঝখানে মানুষ কোথায় জন্মগ্রহণ করে? যতদিন না তারা পুনরায় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে, এই অন্তর্বর্তী সময়ে তারা চার অপায়লোকে জন্মগ্রহণ করে বহুকাল অতিবাহিত করতে পারে। চার অপায়লোক হল – ক) তির্যকলোক বা যোনি অর্থাৎ পশুপাখি, সরীসৃপ প্রভৃতি; খ) প্রেতলোক বা যোনি – পৃথিবীর যেকোন নিভৃত স্থান প্রেত বাসভূমি; গ) অসুরলোক বা যোনি – সুমেরু পর্বতের পাদদেশ অসুর বাসভূমি; ঘ) নিরয়লোক বা নরকযোনি। লোকে কুশল বা অকুশল কর্ম অনুসারেই মানুষ চার অপায়লোকে পরিভ্রমণ করতে করতে আবার মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হয়। মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করা দুষ্কর এবং দুর্লভ।

ভবচক্র বা সংসার দুঃখ থেকে মুক্তির অভিলাষী ব্যক্তিকে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন বা কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে হয়। শীল আচরণের ক্রমগুলি হল – ১) পঞ্চশীল – জীবহত্যা, চুরি, পরকীয়া ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ এবং মদ্যপান থেকে বিরত থাকা। ২) অষ্টশীল – পঞ্চশীলসহ মধ্যাহ্নের পর খাদ্যগ্রহণ, নৃত্যগীতিবাদ্য শ্রবণ-দর্শন-ব্যবস্থাপনা, মাল্যগন্ধপুষ্পের ব্যবহার ও প্রসাধনাদির অনুলেপন, উচ্চ সুখাসনে উপবেশন ও শয়ন থেকে বিরত থাকা। ৩) নবশীল – অষ্টশীলসহ সদিচ্ছা ও সপ্রেম করুণায় অপরের হৃদয় জয়ের নির্দেশ। ৪) দশশীল – নবশীলের সঙ্গে সোনা ও রূপা নেওয়া থেকে বিরত থাকা। ৫) 'আজীবট্ঠমক' শীল বা সদাচরণ নীতি – জীবহিংসা না করা, চুরি না করা, পরকীয়া ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা, মিথ্যাভাষণ থেকে বিরত থাকা, অসাক্ষাতে কারো নিন্দা না করা, রূঢ় ও কঠোর বাক্য প্রয়োগ বর্জন করা, অযথা আস্ফালন থেকে বিরত থাকা এবং জীবিকার জন্য অসদুপায় অবলম্বন না করা। ৬) চতুপারিশুদ্ধ শীল বা পবিত্রতার নীতি – প্রাতিমোক্ষ সংবরণ, ইন্দ্রিয় সংবরণ, জীবিকা পরিশুদ্ধি, কুৎসিত আনন্দ ত্যাগ করে শুদ্ধ চিত্তে বিষয় সম্পত্তি উপভোগ করা।[৫]

গৃহীদের অবশ্য পালনীয় পঞ্চশীল এবং আজীবট্ঠমক শীল পালনের দ্বারা পরিবারে, সমাজে এবং দেশে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি সুরক্ষিত হয়। অবশিষ্ট শীলগুলি ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাধারণের অবশ্য পালনীয় শীলগুলি বিষয়ে পালি *দীঘনিকায়*-এর 'ব্রহ্মজাল সুত্ত' এবং 'সামঞ্ঞফল সুত্ত'-এ বিশদে বলা হয়েছে।[৬] শীলসমূহকে ক্ষুদ্র শীল, মধ্যম শীল ও মহা শীল রূপে তিনভাগে ভাগ করা যায়। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকের সঙ্গে সামাজিক সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে এগুলির ভূমিকা অপরিসীম।

অবিচলিতভাবে কোন একটি চিন্তনীয় বিষয়ে মনঃসংযোগ করার নাম 'চিত্ত' বা 'সমাধি'। সমাধির চল্লিশপ্রকার পদ্ধতিকে সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় – ১) কৃৎস্ন, ২) অশুভ, ৩) অনুস্মৃতি, ৪) অপ্রমন্যা, ৫) সংজ্ঞা, ৬) ব্যবস্থান এবং ৭) অরূপ্য।[৭] সৃষ্টিমাত্রই ধ্বংসশীল, তাই আমৃত্যু অনবিচ্ছিন্নভাবে নিষ্ঠা সহকারে শীল, সমাধির পর ও প্রজ্ঞা অর্জন করতে হবে। এই পথেই নির্বাণের পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

৩) ব্রহ্মবিহার বা মহৎ নৈতিক গুণাবলী

হিংসা-দ্বেষ-ঈর্ষা প্রভৃতি ঘৃণ্য চিত্তবৃত্তি থেকে পরিত্রাণ পেয়ে অমলিন শুদ্ধ শান্ত ব্রহ্মের মতো অবস্থানকে ব্রহ্মবিহার বলে। 'ব্রহ্ম' বা 'নৈতিক' অর্থে উৎকৃষ্ট অবস্থা ব্রহ্মবিহার। ভাবনার দ্বারা যে মানসিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধনে এটি সম্ভব হয় তা হল মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। এই চারপ্রকার অপ্রমেয় ধ্যানের নিরন্তর অনুশীলন করলে ব্যক্তির মানসিক অবস্থা উন্নততর নৈতিকতার পর্যায়ে উন্নীত হয়।[৮] ব্রহ্মবিহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ' প্রবন্ধে (*তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* পৌষ, ১৩১৮) লিখেছেন –

> মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
>
> এবম্পি সব্বভুতেসু মানসম্বাবয়ে অপরিমাণং।
>
> মেত্তঞ্চ সব্ব লোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং
>
> উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।
>
> তিট্ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো
>
> এতং সতিং অধিট্ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধবাহু।[৯]

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্বদিকে অধোদিকে চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে

অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কী দাঁড়াইতে কী চলিতে, কী বসিতে কী শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে এই মৈত্রীভাব অধিষ্ঠিত থাকিবে – ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

ক) মৈত্রী: মৈত্রীর অর্থ মিত্রতা, বন্ধুত্ব, জীবের প্রতি প্রেম বা ভালোবাসা যার লক্ষ্য ক্রোধ ও হিংসা ত্যাগ করে ক্ষমা ও প্রেমের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এটি সকল প্রাণির মঙ্গল ও সুখ কামনায় বিশ্বগত ভালোবাসা। মৈত্রী চিত্তের বিকাশে বিদ্বেষের অবসান ঘটে। এটি ঘৃণা, ক্ষোভ, পরশ্রীকাতরতা, অস্থিরতা, অহংকার ও অবিদ্যার প্রতিপক্ষ।

খ) করুণা: করুণা সকল প্রাণির দুঃখ দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে তার উপশম কামনা করে। মাৎসর্যের আমিত্বময়ের বিপরীতে করুণা চিত্তকে প্রসারিত করে আমিত্বহীন করে।

গ) মুদিতা: অন্যের সুখ সমৃদ্ধিতে, সম্পদ সৌভাগ্যে আনন্দিত হওয়াই মুদিতা। শত্রুভাব ও ঈর্ষার ধ্বংস করে অন্যের সৌভাগ্যের অনুমোদন করা এর লক্ষণ। এই ভাবনার জন্য ব্যক্তিগত প্রয়াস এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন।

ঘ) উপেক্ষা: উপেক্ষা মনের সমতা, চিত্তের 'লীন' ও 'ঔদ্ধত্য' দুই বিষম অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা বলে একে 'তত্রমধ্যস্থা' বলা হয়। 'অট্‌ঠলোক-ধম্ম' বা আটটি পার্থিব অবস্থা যেমন – লাভ, অলাভ, যশ, অপযশ, প্রশংসা, নিন্দা, সুখ ও দুঃখের দ্বারা মানুষ দুঃখ বা আনন্দ পায়। শারীরিক সুখ-দুঃখহীন অনুভূতিকে অসুখ-অসুখ বেদনা এবং মানসিক সুখ-দুঃখহীন বেদনাকে উপেক্ষা বলা যায়। উপেক্ষা ভাবনার দ্বারা আসক্তি ও বিরোধ ত্যাগ করা যায়। এটি বেদনাজ নয়, জ্ঞানজ। সকল জীবের প্রতি সাম্যভাব বা অনুরাগ-বিরাগহীনতাই উপেক্ষা।

মৈত্রী সকল জীব, করুণা সকল দুখী, মুদিতা সকল উন্নতিশীল ব্যক্তি এবং উপেক্ষা ভালো-মন্দ, প্রিয়-অপ্রিয়, সুখী-দুঃখী সকল জীবের প্রতি স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষভাবে বিস্তৃত ও প্রসারিত।[১০] আচার্য বুদ্ধঘোষ *বিশুদ্ধিমগ্‌গ* গ্রন্থে ব্রহ্মবিহারের চার ভাবনাকে ক) মায়ের শিশুপুত্রের যৌবন কামনাকে 'মৈত্রী'স্বরূপ, খ) রুগ্ন সন্তানের আরোগ্য কামনাকে 'করুণা'স্বরূপ, গ) যুবকপুত্রের যৌবনের চিরস্থিতি কামনাকে 'মুদিতা'স্বরূপ এবং ঘ) আত্মনির্ভরক্ষম উপযুক্ত পুত্রের জন্য নিরুদ্বিগতাকে 'উপেক্ষা'স্বরূপ বলেছেন।[১১]

৪) 'পারমী' বা পারমিতা

‘পারমী’ বা পারমিতা শব্দের আক্ষরিক অর্থ যা অতিক্রমকারী, অপেক্ষাকৃত অধিকতর অগ্রবর্তী, উৎকৃষ্ট অথবা নৈতিক পূর্ণতা। অর্থাৎ পারমি = পারং + ই, যা কোন ব্যক্তিকে অন্য পারে বা তীরে যেতে (বোধিজ্ঞান লাভে) সহায়তা করে। বুদ্ধত্ব লাভের আগে প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধত্ব লাভে প্রয়াসীকে সম্যক সম্বুদ্ধত্ব লাভের জন্য দশটি নৈতিক গুণাবলী অনুশীলন করতে হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘হীনযান ও মহাযান’ (*নারায়ণ,* আষাঢ়, ১৩২২) বলেছেন যে ব্যাকরণের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন যে ‘প্রজ্ঞাপারমিতা’ ব্যাকরণদুষ্ট নয়, যেহেতু ‘পারমিতা’ও স্ত্রীলিঙ্গ, ‘প্রজ্ঞা’ও স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু, ‘শীলপারমিতা’ ব্যাকরণদুষ্ট, ‘শীল’ ক্লীবলিঙ্গ, ‘পারমিতা’ স্ত্রীলিঙ্গ। অন্য ব্যাখ্যা অনুযায়ী, মিশ্রভাষায় পরমস্য ভাবঃ – ‘পারম্যং’ শব্দটি ‘পারমি’ হয়ে যায়। পারমিতার অর্থ – পরম বা সর্বোৎকৃষ্টের ভাব। ‘পারমিতা’ সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য দেওয়া হল –

ক) দুঃখমুক্তির পারে উত্তীর্ণ হবার (‘ই’ ধাতু গমনে) চর্যা বা সাধনার কথা পালি জাতক-এর কাহিনিসমূহ আধারিত। বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক অবস্থায় দশপ্রকার পারমিতার উল্লেখ রয়েছে। পালি *বুদ্ধবংস*-এ দশপ্রকার এবং *চারিয়া পিটক*-এ সাতপ্রকার পারমিতার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মহাযান গ্রন্থগুলিতে ছয়প্রকার পারমিতার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২]

খ) ছয়প্রকার পারমিতা হল – দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা; পরবর্তী কালে এর সঙ্গে উপায়কৌশল্য, প্রণিধান, বল ও জ্ঞান চারটি পারমিতা যুক্ত করে পারমিতার সংখ্যা হয়েছে দশ। ‘পারমিতা’ শব্দের মূল অর্থ ‘পূর্ণতাপ্রাপ্ত’ (পারমিংগতো অথবা পারমিপ্রতো); দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা প্রভৃতি গুণের পূর্ণতা লাভ হলেই একে একে উচ্চভূমি লাভ হতে থাকে। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ‘বাদ’ রূপে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে পারমিতাবাদের উৎপত্তি হয়েছিল।[১৩]

গ) বজ্রযানে দশ পারমিতার সঙ্গে দুটি পারমিতা রত্ন এবং বজ্রকর্ম যোগ করে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দ্বাদশ পারমিতা।[১৪]

ঘ) সম্ভবতঃ খ্রিস্টপরবর্তী প্রথম শতকে রচিত *মিলিন্দ পঞ্হো*-তে মিলিন্দ ও নাগসেনের উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে পারমিতাবাদের উল্লেখ পাই, এই গ্রন্থের মেন্দক প্রশ্ন অধ্যায়ের ভূমিকম্পের কারণ অংশে ভদন্ত নাগসেন মিলিন্দকে বলেছেন যে এই জগতে যতপ্রকার অসদৃশ ও পরম দান করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে রাজা বেস্সন্তের মহাদানই সর্বোত্তম। তিনি দান দেবার সময়ে পরলোকে উত্তম জন্মলাভের আশায়

বা দানময় পুণ্যের বিনিময়ে ধনলাভের জন্য দান করতেন না। তিনি দীর্ঘ আয়ু, সৌন্দর্য, সুখ, শান্তি ও যশের লালসায় দান করতেন না। তিনি পুত্র-কন্যা কামনায়ও দান করতেন না। কিন্তু তিনি সর্বজ্ঞতা রত্নের জন্য অতুল, বিপুল, অনুত্তর ও অদ্বিতীয় দানসমূহ প্রদান করেছিলেন।[১৫]

ঙ) *নিষ্পন্নযোগাবলী* গ্রন্থে বজ্রযানী দ্বাদশ পারমিতার মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে। এই পারমিতা দেবীদের কুলেশ রত্নসম্ভব ধ্যানীবুদ্ধ। দানপারমিতা রূপকল্পনায় বলা হয়েছে–দেবীর একটি মুখ, দুইটি হাত। ইনি শ্বেতমিশ্রিত রক্তবর্ণা। বাম হাতে চিন্তামণি রত্নাঙ্কিত একটি ধ্বজা এবং দক্ষিণ হাতে নানা প্রকারের ধান্যমঞ্জরী দেবী ধারণ করে রয়েছেন।[১৬]

পারমীর অনুশীলন যেমন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি সমাজ বা রাষ্ট্রের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[১৭]

৫) প্রকৃত পার্থিব মঙ্গল

বুদ্ধের দেশনায় বা ধর্মে মানবজাতির কল্যাণার্থে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য বুদ্ধ শিষ্যদের দেশনা করেছিলেন। *সুত্তনিপাত*-এর 'মঙ্গল-সুত্ত' মানবজাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে দেওয়া বুদ্ধদেশনা। দেবতারা বুদ্ধকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি দেব-মানুষের হিতের জন্য আটত্রিশ প্রকার স্বস্তিকামী মঙ্গলবিষয় ব্যাখ্যা করেছিলেন। নিছক ধর্মোপদেশ নয়, কীভাবে এবং কোন পরিবেশের মধ্যে থাকলে জীবন মঙ্গলময় হবে তা বিবৃত হয়েছে। মঙ্গলসুত্তের মতো আরো অনেক সুত্ত বা বুদ্ধোপদেশের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের তাত্ত্বিক রূপ সাদামাঠা ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে *ধম্মপদ*-এর সূত্রগুলির কথা বলা যায়।

মঙ্গলসুত্তের মূল বক্তব্য হল – মূর্খের অনুসরণে বিরতি, পণ্ডিতের অনুসরণ এবং পূজনীয়ের পূজা; প্রতিরূপ স্থানে বাস, অতীতের সুকৃতি এবং সম্যক আত্মপ্রণিধান; বহুশ্রুতি, শিল্পনৈপুণ্য, সুশিক্ষিত বিনয় এবং সুভাষিত বাক্য; মাতাপিতার সেবা, স্ত্রীপুত্রের স্বযত্ন প্রতিপালন এবং শান্তিপূর্ণ জীবিকা; দান, ব্রহ্মচর্য, জ্ঞাতিদের পালন এবং নির্দোষ কর্মের অনুষ্ঠান; পাপে অরতি এবং বিরতি, মদ্যপানে অনাসক্তি এবং কর্তব্যে তৎপরতা; ভক্তি ও বিনয়, সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতা, উপযুক্ত সময়ে ধর্মশ্রবণ; ধৈর্য, প্রীতিপদ বাক্য, শ্রমণের দর্শন এবং উপযুক্ত সময়ে ধর্মচর্চা; তপ, ব্রহ্মচর্য, আর্যসত্যের দর্শন এবং নির্বাণের উপলব্ধি;

পার্থিব বস্তু দ্বারা স্পৃষ্ট হয়েও অকম্পিত চিত্তের অশোক, বিরজ ও শান্ত অবস্থাই সর্বোত্তম মহামঙ্গল। এইরকম ভাবে যাঁরা সর্বত্র অপরাজিত, সর্বস্থানে স্বস্তিপ্রাপ্ত, তাঁরাই সর্বোত্তম মঙ্গলের অধিকারী হন।[১৮]

আরো কয়েকটি বৌদ্ধদর্শনের উপাদান বিষয়ে আলোচনা করা হল –

প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব

প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ নীতি ভারতীয় দর্শনে সার্থক বৌদ্ধ অবদান। প্রতীত্যসমুৎপাদ শব্দের ধাতুগত অর্থ – একটির উপর নির্ভর করে আরেকটির উৎপত্তি। ধর্মস্থিততা, ধর্মনিয়ন্তা, তথতা, অবিতথতা ও ইদপ্রত্যয়তা বলেও এটি খ্যাত। নাগার্জুনের মাধ্যমিক সূত্রের চন্দ্রকীর্তি রচিত প্রসন্নপদা ভাষ্যে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব সূক্ষ্ম দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। দ্রব্য মাত্রেই তার উৎপত্তির জন্য কতকগুলি কারণসমষ্টির উপর নির্ভর করে। উৎপন্ন দ্রব্যের নিজের স্বতন্ত্র উৎপত্তির কোন ক্ষমতা না থাকায় তার তখন সত্ত্বাও থাকে না। সুতরাং তা অশাশ্বত এবং দুঃখের কারণ। প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ নীতির বারোটি অঙ্গ বা পদ – অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরাব্যাধিমরণশোক। অবিদ্যা বা অজ্ঞানের দূরীকরণে দুঃখের সম্পূর্ণ অবসান হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রতীত্যসমুৎপাদকে চক্রাকারে দেখানো হয়। এই বারোটি পদের কোনোটিকেই আদি বা অন্ত বলা চলে না। চক্রের যেকোন পদ থেকে শুরু করে এর কাজ লক্ষ করা যায়।

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি চারভাগে বিভক্ত – চারটি সংক্ষেপ, তিনটি কাল, কুড়িটি আকার ও তিনটি সন্ধি। চারটি সংক্ষেপ – ১) অবিদ্যা ও সংস্কার; ২) বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা; ৩) তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব এবং ৪) জন্মমরণ একটি সংক্ষেপ। তিনটি কাল – ১) অবিদ্যা ও সংস্কার অতীত; ২) বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব বর্তমান এবং ৩) জন্মমরণ ভবিষ্যৎকালের। কুড়িটি আকার – ১) অবিদ্যা, ২) সংস্কার, ৩) তৃষ্ণা, ৪) উপাদান ও ৫) ভব অতীতকালের কর্মাবর্ত। ৬) বিজ্ঞান, ৭) নামরূপ, ৮) ষড়ায়তন, ৯) স্পর্শ ও ১০) বেদনা বর্তমানকালের বিপাকবর্ত। ১১) তৃষ্ণা, ১২) উপাদান, ১৩) ভব, ১৪) অবিদ্যা ও ১৫) সংস্কার বর্তমান কর্মবর্ত। ১৬) বিজ্ঞান, ১৭) নামরূপ, ১৮) ষড়ায়তন, ১৯) স্পর্শ, ২০) বেদনা ভবিষ্যৎ বিপাকবর্ত। তিনটি সন্ধি – ১) সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন ও স্পর্শ; ২) বেদনা ও তৃষ্ণা এবং ৩) ভব ও জন্ম । প্রতীত্যসমুৎপাদ

ও ধর্মের অন্যোন্যনির্ভর সম্বন্ধ অভেদ ও প্রকৃত জ্ঞানস্বরূপ। পরবর্তীকালে নাগার্জুনের মাধ্যমিক দর্শন এই নীতির উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল।[১৯]

রামদাস সেনের 'বৌদ্ধ ধর্ম্ম' প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা না করলেও তাঁর শিষ্যরা উপদেশগুলির অর্থবিস্তার করে প্রকাশ করতেন। এই প্রসঙ্গে ধর্মকীর্তি বলেছেন, 'তদ্বিনেয়াঃ প্রচক্রিরে'। রামদাস উদ্ধৃত দীর্ঘ পালিবচনের নির্যাস হল – রচয়িতাহীন বিশ্বের তত্ত্ব প্রমাণের জন্য বুদ্ধ শিষ্যদের কাছে জগতের কার্যকারণের উপদেশ দিয়েছিলেন। বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই প্রতীতিনিষ্পন্ন, তার জন্য কার্যমাত্রই 'প্রতীত্য' নামে ব্যবহৃত হয়। সকল কাজে দুইপ্রকার কারণ দেখা যায় – একটি হেতুপনিবন্ধ: কার্যোৎপত্তি কালে যাতে মাত্র হেতুভাব থাকে, যেমন – অঙ্কুরোৎপত্তির প্রতি বীজে হেতুভাব। অপরটি প্রত্যয়োপনিবন্ধ: কার্যোৎপত্তির পূর্বে কারণ দ্রব্যের সমবায় (সংযোগ) থাকে, যেমন – উক্ত অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্বে পার্থিব প্রভৃতি কার্যদ্রব্যে সমবায় ছিল।

হেতুপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ নামক কারণ দুটি বাহ্য জগতে আছে, আধ্যাত্মিক কাজেও আছে। তার মধ্যে বাহ্য প্রতীত্য সমুৎপত্তি বিষয়ে এইরকম নিয়ম দেখা যায়। প্রথমত: বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে পত্র, ক্রমে কাণ্ড, ফুল, ফল ইত্যাদি জন্মায়। এই একটি থেকে আরেকটির জন্ম হওয়াকে হেতুপনিবন্ধ বলা যায়।

বীজ না থাকলে অঙ্কুর জন্মায় না, ফুল থাকলে ফল হতে পারে, বীজ থাকলে অঙ্কুর হতে পারে; কিন্তু বীজ যে অঙ্কুরকে জন্মায়, তাতে বীজের এমন জ্ঞান হয় না যে আমি অঙ্কুরকে জন্মাচ্ছি। অঙ্কুরেরও এমন জ্ঞান লাভ হয় না যে আমি বীজ থেকে জন্মলাভ করেছি। ফুল ফল সকলের ক্ষেত্রেই এক, অতএব বীজ ইত্যাদির চৈতন্য না থাকলেও, চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকলেও কার্য-কারণ ভাবের ব্যাঘাত নেই, বরং তা নিয়মিতরূপেই রয়েছে। অঙ্কুর কার্যের হেতুভাবের মতো প্রত্যয়ভাবের পক্ষেও সেইরকম দেখা যায়।

পৃথিবীধাতু, জলধাতু, বায়ুধাতু, তেজোধাতু, আকাশধাতু ও রূপধাতু (বৌদ্ধমতে মূল পদার্থ ধাতু), এই ছয়টি ধাতুর সমবায় অর্থাৎ সংযোগে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে পৃথিবীধাতু সংগ্রহ কার্য (অঙ্কুরের কাঠিন্য জন্মায়) করে, জলধাতু অঙ্কুরের স্নেহভাব (সরস) সম্পাদন করে, তোজোধাতু বীজকে পরিপাক (অঙ্কুর ভাব) করে, বায়ুধাতুর ফলে অঙ্কুর বীজ থেকে বেরিয়ে আসে, আকাশধাতু বীজকে অনাবরণ করে,

রূপধাতুর প্রভাবেই অঙ্কুর দেখা যায়, এইরকম ষড়ধাতুর সমবায়ে অঙ্কুর কার্যে আত্মলাভ করে। এখানেও পৃথিবীধাতুর এমন জ্ঞান হয় যে আমি অঙ্কুরিত করবার নিমিত্ত বীজকে সংগ্রহ করছি। বাহ্য প্রতীতসমুৎপাদ মধ্যেও (বাইরের কার্যসমূহের মধ্যে) রূপভাব কোথাও দেখা যায় না। যেমন বাহ্য কার্যের জ্ঞানপূর্বক উৎপত্তি নেই, তেমনই আধ্যাত্মিক কার্যেরও নেই।

আধ্যাত্মিক কার্য সমুৎপাদেরও দ্বিবিধ কারণ রয়েছে। অবিদ্যা, সংস্কার, যাবজ্জাতি, জরামরণ প্রভৃতি উত্তরোত্তর হেতু হেতুমদ্ভাব, আর পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞান, এই ষড়বিধ কারণদ্রব্যের সমবায় ছাড়া দেহের উৎপত্তি হতে পারে না। অবিদ্যা ছাড়া সংস্কার জন্মায় না, সংস্কার ছাড়া যাবজ্জাতি, যাবজ্জাতি ছাড়া জরামরণ হয় না। এখানেও যখন অবিদ্যা সংস্কার জন্মায়, তখন অবিদ্যার জ্ঞান হয় না যে আমি সংস্কার উৎপন্ন করছি, সংস্কারেরও জ্ঞান হয় না যে আমি অবিদ্যা থেকে জন্মলাভ করেছি বা করছি। অতএব বীজ প্রভৃতির মতো অবিদ্যা প্রভৃতির চৈতন্য, অন্য চেতনাবান পুরুষের অধিষ্ঠান না থাকলেও সংস্কার প্রভৃতির জন্মলাভ দেখা যায়।

আধ্যাত্মিক হেতুপনিবন্ধের মতো প্রত্যয়োপনিবন্ধের ক্ষেত্রেও ষড়ধাতুর সমবায়েই শরীরের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীধাতু শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করে, জলধাতু স্নেহিত করে, তেজোধাতু ভুক্তান্ন পানীয় প্রভৃতি পরিপাক করে, বায়ুধাতু শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করে, আকাশধাতু ছিদ্রভাব জন্মায়। পঞ্চস্কন্ধাত্মক বিজ্ঞানধাতু নাম রূপ ইত্যাদির কারণ। এই ষড়ধাতু অবিকলভাবে সংহত হলেই শরীরের উৎপত্তি হয়, নয়তো হয় না। এইক্ষেত্রেও পৃথিবীধাতুর কখনোই জ্ঞান হয় না যে আমি শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করছি। শরীর থেকেই বিজ্ঞানের বা বিজ্ঞানান্তরের উৎপত্তি হয়। কিন্তু শরীর কখনোই জানে না যে আমি বিজ্ঞানের উৎপত্তি করছি। অতএব পৃথিবী ইত্যাদি সমস্ত ধাতু স্বয়ং অচেতন হলেও চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকলেও শরীরের উৎপত্তি হয়, অন্যরকম হয় না। এটি প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় অন্যরকম হওয়ার পথ নেই। উক্ত ষড়ধাতু সমবায় ভাবকে লোকে দেহ, পিণ্ড, নিত্য, সুখ, সত্ত্ব, পুদ্গল, মনুজ ইত্যাদি নানা নাম ব্যবহার করে তাকে তার স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, কন্যা ইত্যাদি নানা নাম কল্পনা করে। তাকে অনর্থ শতসম্ভার সংসার বলে। এই সংসারের মূল কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা থেকে বিষয়ের প্রতি রাগ, দ্বেষ, মোহ জন্মায়। বস্তু আকারধারী বিজ্ঞান বিষয়। বিজ্ঞান চারপ্রকার। রূপবিশিষ্ট উপাদান স্কন্ধ নাম প্রভৃতিকে গ্রহণ করে উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানদুটির একীভাব, নাম রূপের আশ্রয়। শরীরের কল্লোল ও বুদ্বুদের অবস্থা,

নামরূপ, মিশ্রিত ইন্দ্রিয়সকল, ষড়ায়তন, নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগকে স্পর্শ বলে। স্পর্শ থেকে বেদনা (অনুভব শক্তি), বেদনা থেকে তৃষ্ণা (এই সুখ পুনশ্চ করব ইত্যাদি ভাবনা) জন্মগ্রহণ করে।

রামদাস সেনের 'বৌদ্ধ মত ও তৎ সমালোচন' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বৌদ্ধধর্মের সারাংশ উপস্থাপিত করেছেন। বুদ্ধদেব তাঁর প্রধান বিহারের স্থান শ্রাবস্তী থেকে সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন বলে সেই স্থানের নাম 'ধর্মপত্তন'। এইখানে সকলে তাঁর 'উপদেশ-কদম্ব' শ্রবণে মুগ্ধ হয়েছিলেন, এমনকি দেবতারাও তাঁর ধর্ম ঘোষণা শ্রবণে আনন্দে মগ্ন হয়ে তাঁর স্তব করেছিলেন বলে শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। আমরা তাঁর আংশিক উদ্ধার করছি –

ভগবান্ জিতসংগ্রামঃ পূর্ণৈঃ পূর্ণ মনোরথঃ।

সম্পূর্ণৈঃ শুক্ল ধর্ম্মৈশ্চ জগন্তি তর্পয়িষ্যসি।

(আপনি ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন, কামজয়ী, পূর্ণ মনোরথ এবং আপনি এই জগত শুক্লধর্ম[২০] দ্বারা পরিতৃপ্ত করবেন।)

বুদ্ধদেব জীবলোকের কষ্ট (জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি) অনুভব করে দুঃখস্কন্ধ থেকে উত্তরণের পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, জাতিসত্তাকেই জরামরণের কারণ। জাতির মূল সন্ধানে ভব অর্থাৎ উৎপত্তিকে জাতির মূল, উৎপত্তির বীজ উপাদান, উপাদানের মূল তৃষ্ণা, তৃষ্ণার মূল বেদনা, বেদনার মূল স্পর্শ, স্পর্শের বীজ ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের বীজ নামরূপ, নামরূপের বীজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানোৎপত্তির বীজ সংস্কার, সংস্কারের বীজ অবিদ্যা। দুঃখস্কন্ধের নিরোধের নাম নির্বাণ। নির্বাণ হলে সুখ দুঃখ আত্মা থাকে না, একেবারে অভাব হয়ে যায়। বুদ্ধদেব দুঃখের নিদান দিয়েছিলেন বলে 'জরা মরণ বিঘাতী ভিষগ্বর' বলে খ্যাত হয়েছিলেন।

প্রাচীন বৌদ্ধদের মতে জগতের মূল তত্ত্ব দুটি, চিত্ত ও ভূত। চিত্ত থেকে পঞ্চ স্কন্ধাত্মক চৈত্তপদার্থ, ভূত থেকে ভৌতিক পদার্থ, এই উভয় পদার্থ দ্বারা বাইরের ও ভিতরের সমস্ত ব্যবহার ঘটছে। বুদ্ধদেবের মতে, ভূত অর্থাৎ পরমাণুর সত্ত্বা চারটি। সেই অনুসারে পৃথিবীধাতু, আপ্যধাতু, তেজোধাতু, বায়ুধাতু। আবরণাভাব অর্থাৎ যেখানে কিছু নেই তার নাম আকাশ, তা কোনও পদার্থ নয়। চার প্রকার ধাতুর স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন রকমের। পৃথিবীধাতু খরস্বভাব, আপ্যধাতু স্নেহস্বভাব, তেজোধাতু উষ্ণস্বভাব, বায়ুধাতু চলনশীল। এই ধাতুর আকর্ষণ, বিকর্ষণ, বিক্রিয়া, ধর্মবত্তা ইত্যাদির অন্যপ্রকার স্বভাব আছে। এই প্রকার পরমাণুরাশির কমবেশি ও পার্থক্যে সংহত হওয়ার নাম স্থূল সৃষ্টি, তা ভূত থেকে জন্মলাভ করে বলে ভৌতিক। এইভাবে ভূত ভৌতিক সমুদায় জগতের এক অবয়ব, অবশিষ্ট অবয়ব পঞ্চ স্কন্ধাত্মক চৈত্ত

পদার্থ দ্বারা পূরণ হয়। পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে বিজ্ঞানস্কন্ধের অন্য নাম চিত্ত এবং আত্মা, অপর চারটির নাম চৈত্ত। এই মতে আত্মার নিত্যতা ও স্থিরতা নেই। জগতের সকল ভাবই ক্ষণিক, তবে প্রবাহের শক্তিতে তা স্থির বলে প্রতীতি হয়। বর্তমান দেহে প্রতিক্ষণেই স্রোতের ন্যায় বিজ্ঞানধাতুর উৎপত্তি বিনাশ হচ্ছে। যদি মধ্যে ব্যবধানকাল থাকত তা হলেই প্রতীতি হত যে ব্যবধান নেই বলেই যেন বাল্য থেকে মরণ পর্যন্ত এক আত্মাই ভোগ করছেন। আর্যদের মতে ভাববিকার ছয়টি, বৌদ্ধদের মতে ভাববিকার কুড়িটিরও বেশি।

ক্ষণিক বস্তুতে স্থিরত্ব বুদ্ধির নাম অবিদ্যা। জগতের সকল পদার্থই ক্ষণিক। এই অবিদ্যায় রাগ, দ্বেষ, মোহ, সংস্কার জন্মায়। সেই সংস্কার বিজ্ঞানকে জন্মায়। গর্ভস্থ আলয় বিজ্ঞান, তা ক্রমশ শরীরের চারপ্রকার ধাতু উপযুক্ত তাপে সংহত, পরস্পর পরস্পরের স্বভাব প্রকাশের পরে পরস্পরকে পরিপাক, তারপরে রূপ নিষ্পত্তি অর্থাৎ শুক্র শোণিতের নিষ্পত্তি হয়। এইরূপে 'নামরূপ' শব্দে 'গর্ভস্থ সকল বুদবুদ অবস্থা' পর্যন্ত বুঝতে হবে।

তারপর ষড়ায়তন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, চারটি ধাতু ও রূপ এই দুটির সংযোগ উৎপন্ন হয় বলে এর নাম ষড়ায়তন। নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয় এই তিনের সংযোগ হওয়ার নাম স্পর্শ। স্পর্শ থেকে সুখাকার বেদনা, বেদনা থেকে বিষয়তৃষ্ণা, বিষয়তৃষ্ণা থেকে প্রবৃত্তি, এই প্রবৃত্তি অনুসারে ধর্মাধর্ম, এই ধর্মাধর্ম থেকে জাতি অর্থাৎ নানা দেহোৎপত্তি। উৎপন্ন পঞ্চস্কন্ধের পরিপাককে বার্ধক্য বা জরাস্কন্ধ বলে। তারপর নাশ অর্থাৎ যে বলে স্কন্ধ সমুদয় সংহত ছিল সে বলের শেষ হলে সমস্ত শেষ হয়ে মূল ধাতুমাত্র থাকে। সেইরকম নাশ হলে তার প্রতি স্নেহ ভাবাপন্ন জীবের অন্তর্দাহ শোক জন্মানোর ফলে যে বিলাপ তার নাম পরিবেদনা। যা ইষ্ট অর্থাৎ মনের অনুকূল নয়, তার অনুভব হওয়ার না দুঃখ। এই দুঃখ থেকে দুমনস্থা অর্থাৎ মনোব্যথা ও মান-অপমান প্রভৃতি বিকারান্তর জন্মায়। এইগুলি পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের হেতু সম্ভাবে অবস্থান করছে অর্থাৎ যেমন অবিদ্যা সংস্কার উৎপত্তির প্রতি হেতু, তেমনি সংস্কারও অবিদ্যান্তর উৎপত্তির হেতু। এইভাবে প্রাচীন বৌদ্ধেরা জগতপরীক্ষা সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করেছেন।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের মতে ভোক্তা আত্মা নেই। বিজ্ঞানই আত্মার ভোগ্য। বিজ্ঞান ব্যতীত পদার্থান্তর এই জগতে নেই। এই বিজ্ঞান নিরোধের নামই মুক্তি। ক্ষণিকত্ব বুদ্ধি জন্মাবার নিমিত্ত বৌদ্ধেরা ধ্যান করে থাকেন।

বৌদ্ধদর্শনে 'নির্বাণ' ভাবনার অভিনবত্ব

রামদাস সেনের 'বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম' ও 'বৌদ্ধ মত ও তৎসমালোচন' প্রবন্ধ দুটিতে নির্বাণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা রয়েছে। মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করে নির্বাণ লাভ করাই বৌদ্ধজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'বৌদ্ধ মত ও তৎসমালোচন' প্রবন্ধে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ দৃশ্য কাব্যসুষমা সমন্বিত নাটকীয়ভাবে সূচিত হয়েছে –

> কুশী নগরের সন্নিকটস্থ কানন মধ্যে শাক্যসিংহ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার বদনমণ্ডল প্রশান্ত এবং তাহাতে মৃত্যু যন্ত্রণার লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। চতুর্দ্দিকে স্থবিরমণ্ডলী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, সকলেরই মুর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর দৃশ্যটি দেখিলে বোধ হয় যেন দেবতাগণ কোন অলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কানন নিস্তব্ধ, চরাচর নিস্তব্ধ, চতুর্দ্দিক গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ, এমত সময়ে বুদ্ধদেব কহিলেন "ভিক্ষুগণ। যদি তোমাদিগের বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম, সঙ্ঘ এবং মার্গ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে তবে তাহা এই সময় ভঞ্জন করিয়া লও," ভগবান বারত্রয় এই কথা বলিলেন কিন্তু কেহই তাহার প্রত্যুত্তর করিল না, ভিক্ষুবৃন্দ নিস্তব্ধে উপবেশন করিয়া রহিলেন। বুদ্ধদেব পুনর্ব্বার বলিলেন, "হে ভিক্ষুবৃন্দ! আমি তোমাদিগকে এই শেষবার উপদেশ দিতেছি যে পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর এজন্য তোমরা নির্ব্বাণ কামনায় জীবনক্ষেপ কর।" তিনি এই শেষ বাক্য বলিয়া ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে সংসার পরিত্যাগ করিলেন।[২১]

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর অর্হতেরা তাঁর নির্বাণ প্রাপ্তির কথা বলেছিলেন। বহু পরে আচার্য নাগসেন মহারাজ মিনিন্দকে (মিলিন্দ)[২২] বলেছিলেন যে বহুগুণসম্পন্ন ভগবান জীবিত রয়েছেন। তাতে তিনি প্রত্যুত্তর করলেন, তবে তিনি কোথায়? নাগসেন বললেন, ভগবান নির্বাণপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁকে আর জন্মগ্রহণ করে ভবযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। তিনি অগ্নি নির্বাণের মতোই এখানে বা সেখানে বা অন্য কোন স্থানে থাকেন না, কিন্তু তিনি তাঁর ধর্মচক্রে এবং প্রদর্শিত ধর্মের মধ্যে সজীব ও বর্তমান রয়েছেন। নির্বাণ লাভের জন্য ভিক্ষুরা নানা কষ্ট স্বীকার করে থাকেন। বুদ্ধদেব বারবার জন্মগ্রহণের কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য একমাত্র নির্বাণ লাভ করতে বিবিধ উপদেশ দিয়েছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা 'নির্বাণ' (*নারায়ণ*, পৌষ, ১৩২১) এবং 'নির্বাণ কয় রকম?' (*নারায়ণ*, মাঘ, ১৩২১) প্রবন্ধ দুটিতে বৌদ্ধধর্মের মূল দার্শনিক বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। 'নির্বাণ' অর্থাৎ নিভে যাওয়া। অনেকে মনে করেন যে বুদ্ধদেব আত্মার বিনাশকেই নির্বাণ শব্দের অর্থ করেছিলেন। এইজন্য পাদরিরা

বৌদ্ধদের নিহিলবাদী বা বিনাশবাদী বলেছেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পাঁচশ বছর পরে কণিষ্কের গুরু অশ্বঘোষ বৌদ্ধধর্মের কঠিন মতগুলি কাব্যের আকারে লিখে সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে *বুদ্ধচরিত* রচনা করেছিলেন। নির্বাণ সম্পর্কে বুদ্ধের কথার অনুরণন না করে তিনি তাঁর নিজের কথা বলেছিলেন –

> প্রদীপ যেমন নির্বাণ হওয়ার পর পৃথিবীতে যায় না, আকাশেও যায় না, কোনো দিক্‌বিদিকেও যায় না; তেলেরও শেষ, প্রদীপটিরও শেষ; সাধকও তেমনি ভাবে, নির্বাণ হওয়ার পর, পৃথিবীতেও যান না, আকাশেও যান না, তাঁর সব ক্লেশ ফুরিয়ে যায়। যা ফুরিয়ে সব শান্ত হল।

অশ্বঘোষও নির্বাণের পর আর কিছু থাকল কিনা সে সম্পর্কে কিছুই বললেও উদ্ধৃত অংশটির সঙ্গে আরও তিনটি কবিতা পড়লে নির্বাণ যে অস্তিত্বের লোপ তা বোধ হয় না। তিনটি কবিতার মূলকথা হল – ক) নানাবিধ জন্মের হেতুস্বরূপ তৃষ্ণা প্রভৃতি বুঝে মুক্ত হতে তৃষ্ণাকে ছেদ করো। কারণের ক্ষয় হলে, কাজেরও ক্ষয় হবে। খ) তৃষ্ণা ইত্যাদি হেতুর ক্ষয় হলে দুঃখেরও ক্ষয় হবে। অতএব, তৃষ্ণার উপর বিরাগকারী শান্তি ও মঙ্গলময় 'ধর্ম'কে প্রত্যক্ষ কর। এটি সর্বধর্মের নিরোধস্বরূপ, সনাতন ধর্ম, পরিত্রাণস্বরূপ, হরণযোগ্য নয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। গ) এটি চরম ও অচ্যুত পদ। এতে জন্ম-জরা-মৃত্যু-ব্যাধি-শত্রুসমাগম, নৈরাশ্য, প্রিয়বিরহ নেই, এটি পাওয়ার মত জিনিস। অশ্বঘোষ নির্বাণ শব্দে অস্তিত্বের লোপ না বুঝে বুঝেছেন যে নির্বাণের পর আর কোনরূপ পরিবর্তন ও অস্তিত্বেরও লোপ হবে না।

পালিগ্রন্থে নির্বাণের পর কী থাকবে এই প্রসঙ্গ রয়েছে। ক) নির্বাণের পর কিছু থাকবে কি? খ) থাকবে না কি? গ) থাকা-না-থাকার মাঝামাঝি কোনো অবস্থা হবে কি? ঘ) কিছু থাকা-না-থাকা – এই দুইয়েরই বাইরে কোনো বিশেষ অবস্থা হবে কি? প্রত্যেকবারেই একই উত্তর – 'না'। অর্থাৎ এই অবস্থা 'অস্তি' বা 'নাস্তি', এই দুইয়ের কোনো অবস্থা বা এর অতিরিক্ত কোনো অবস্থাও নয়। এটি কথায় অপ্রকাশযোগ্য, বাক্যাতীত, ফাঁকা নয়, মানুষের জ্ঞানের বাইরে 'অনির্বচনীয় অবস্থা' যাকে মহাযানে 'শূন্য' বলে বর্ণনা করা হয়েছে – 'অস্তিনাস্তিতদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যম্'। শংকরাচার্য তর্কশাস্ত্রে শূন্যবাদীদের ঠাট্টা করে 'বিনাশবাদী' বলেছেন। মহাকবি হর্ষও গৌতমকে নিয়ে ঠাট্টা করেছেন।

অশ্বঘোষ নির্বাণকে বাক্যাতীত, মানুষের ধারণারও অতীত অনির্বচনীয় অবস্থা বলেছেন। তাঁর *বুদ্ধচরিত*-এ বুদ্ধদেব বলেছেন যিনি আত্মার যতক্ষণ অস্তিত্ব স্বীকার করবে, ততক্ষণ তাঁর কিছুতেই মুক্তি হবে না। বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট করে আত্মাকে 'চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্ত' করে 'তৃপ্ত' হয়েছিলেন। তাঁর

শিষ্যেরা আত্মাকে শূন্যরূপ, অনির্বচনীয় রূপ, চতুষ্কোটি বিনির্মুক্তরূপ মনে করলেও ক্রমে তাঁদের শিষ্যরা আবার নির্বাণকে 'অভাব' বলে মনে করতেন। সংসার হল ভাব পদার্থ আর নির্বাণ অভাব, ভাবাভাব হল ভব ও নির্বাণ। প্রকৃতপক্ষে ভব ও সংসার বাস্তবে নেই, ব্যবহারত 'অস্তি' বলে মনে করলেও বাস্তবিক সেটি অভাব পদার্থ।

সরহপাদের পদের দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন যে ভব শূন্যরূপ, নির্বাণ শূন্যরূপ, ভব-ও শূন্য, ভাবও শূন্য, আত্মাও শূন্য। সুতরাং আত্মা সবসময় ও স্বভাবত মুক্ত, 'শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ'। ধর্ম-যোগ-কঠোর-ধ্যান-সমাধি-ধর্মাধর্ম অপ্রয়োজনীয়, সবাই স্বভাবত মুক্ত, পরম যোগী ও অতি পাপিষ্ঠ। সহজিয়া বৌদ্ধরা মূঢ় ও পণ্ডিতের মধ্যে ভেদ করে বলেছিলেন যে সকলে স্বভাবত মুক্ত হলেও মূঢ় লোকে পঞ্চকামভোগাদি দ্বারা নিজেদের বদ্ধ করেন আর পণ্ডিতেরা গুরুর উপদেশে মুক্ত হন।

মানুষের চিত্ত বোধিলাভ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলে তাকে 'বোধিচিত্ত' বলে। বোধিচিত্ত ক্রমে সৎ বা ধর্ম বা সদ্ধর্মপথে অগ্রসর হতে থাকলে, ক্রমে তাঁর বারবার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তা উন্নততর লোকে উঠতে থাকে। তাঁর উদ্যম অত্যন্ত উৎকট হয়ে উঠলে তিনি এই জন্মেই অনেক দূর অগ্রসর হতে পারেন (মতান্তরে এই জন্মেই বোধিলাভ সম্ভব)। 'নির্বাণ'কে দৃশ্যমান উদাহরণ সহযোগ ব্যাখ্যা করতে প্রাবন্ধিক বৌদ্ধবিহার স্তূপের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। স্তূপগুলি প্রথমে একটি গোল নলের উপর খানিকটা দূরে ওঠার পর অর্ধগোলাকার, তার উপর বর্গাকার জিনিস, তার উপর প্রথম তিনটি ছাতা ক্রমান্বয়ে ছোট থেকে একটু বড় এবং চতুর্থ ও পঞ্চমটি ক্রমান্বয়ে ছোট হয়েছে। এখানে এক সেট ছাতা শেষ হওয়ার উপরে ছাতার খানিকটা বাঁটে আরেক সেট ছাতা (তেরো বা ষোলো বা একুশ বা তেইশটি) ক্রমেন্বয়ে ছোট হয়ে উঠেছে। তার উপর আবার খানিকটা ছাতার বাঁট, এর উপর আবার মোচার আগার মতো আরেকটা জিনিসটি বেড় হয়ে উপরি উপরি চার-পাঁচটি বৃত্ত রয়েছে। মোচার আগাটি সূঁচের মতো দেখতে হয়।

বোধিচিত্ত প্রাণিধিবলে অগ্রসর হতে থাকলে তিনি সেই স্তূপে উঠতে থাকেন। স্তূপের নিচের দিকটা ভূত-প্রেত-পিশাচলোক ও নরক, তার উপরের অর্ধগোলাকার অংশ মনুষ্যলোক। বোধিচিত্ত মানুষেরই হয়। সুতরাং সেই চিত্ত এখান থেকেই উঠে প্রথমে দান, শীল, সমাধি ইত্যাদি দ্বারা বর্গাকারে উত্তীর্ণ হন। এটি চারদিকের অধিপতি ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়ক, বৈশ্রবণ ও বিরূপাক্ষর স্থান। তার উপর

ত্রয়োস্ত্রিংশ ভুবনে রাজা ইন্দ্র ও তেত্রিশজন দেবতা এখানে বসবাস করেন। এর উপরের তুষিত ভুবন থেকে বোধিসত্ত্বেরা একবার মাত্র পৃথিবীতে গিয়ে সম্যক্ সম্বোধি লাভ করে বুদ্ধ হন। এরপর যামলোক। এরপর নির্মাণরতিলোক অর্থাৎ এঁরা ইচ্ছামতো নানারূপে ভোগ্যবস্তু নির্মাণ করে উপভোগ করতে পারেন। এরপরের লোক পরনির্মিতবশবর্তী অর্থাৎ তাঁরা নিজে কিছুই নির্মাণ না করে অন্যের নির্মিত বস্তু উপভোগ করেন। এই পর্যন্ত এসে কামধাতু শেষ হলে বোধিচিত্তের আর কোনো ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এখান থেকেই রূপলোকের সূচনা; কাম নেই, রূপ আর উৎসাহ আছে। তিনি উৎসাহে ধ্যান, প্রণিধি ও সমাধিবলে বোধিচিত্ত ক্রমশই উঠতে থাকেন। রূপধাতুতে প্রধাণত চারটি লোক, অবশিষ্ট লোকগুলি এই চারটির অধীন। এই চারটি লোক লাভ করতে হলে বৌদ্ধদের চারটি ধ্যান অভ্যাস করতে হয়। প্রথম দুটি ধ্যান প্রীতি ও সুখে মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তৃতীয় ধ্যানে প্রীতি লোপ হয়ে কেবলমাত্র সুখ থাকে। চতুর্থ ধ্যানে সুখ লোপ হলে বোধিচিত্ত রূপ অর্থাৎ শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

রূপ ও শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করে বোধিচিত্ত আরও অগ্রসর হয়ে রূপলোক ছাড়িয়ে অরূপলোকে উঠে নিজেকে ও সমস্ত বস্তুকে আকাশমাত্র অর্থাৎ অনন্ত ও উন্মুক্ত বলে দেখেন। তারপর আত্মচিন্তা করতে করতে তাঁর সম্পূর্ণ ধারণা হয় যে কিছুই কিছু নয়। এর উপরে অগ্রসর হলে তখন তাঁর চিন্তা হয় এই যে কিছুই নয়, এর কোন সংজ্ঞা আছে কিনা। যদি সংজ্ঞা থাকে তবে সংজ্ঞীও আছে, সংজ্ঞী না থাকলে তা অকিঞ্চণ, সুতরাং সংজ্ঞাও নেই, সংজ্ঞীও নেই। এরপর বোধিচিত্ত সেই মোচার আগা ত্রৈধাতুক 'লোক'স্তূপের মাথার উপরে ওঠেন, তাঁর চারদিকে অনন্ত শূন্য, আর উঠবার স্থান নেই। এখান থেকে তিনি অনন্তশূন্যে ঝাঁপ দেন। প্রাবন্ধিক অসামান্য কুশলতায় এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন –

> যেমন নুনের কণা জলে মিশিয়া যায়, তাহার কিছুই থাকে না। সেইরূপ বোধিচিত্তও আপনাকে হারাইয়া অনন্তশূন্যে মিশিয়া গেলেন। যেমন সমুদ্রের জলে একটু লোনা আস্বাদ রহিয়া গেল, তেমনি অনন্ত শূন্যে বুদ্ধের একটু প্রভাব রহিয়া গেল। তাঁহার প্রণীত ধর্ম ও বিনয় অনন্তকালের জন্য ত্রৈধাতুক লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

নির্বাণের অনির্বচনীয় অবস্থায় বৌদ্ধরা কেবল শূন্য হওয়াকেই উদ্দেশ্য বলে মনে না করে তার সঙ্গে সর্বজীবে সর্বভূতে 'করুণা' আনার ফলে শুদ্ধ 'শূন্যতা'র প্রাণশূন্য, নিশ্চল, নিস্পন্দ নির্বাণ করুণার স্পর্শে জীবনচাঞ্চল্যে উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়েছিল। নিজেদের মুক্তি নিজের উদ্ধার নয়, জগতের উদ্ধারই লক্ষ্য হয়ে পড়েছিল। করুণাবতার অবলোকিতেশ্বর জীবের দুঃখে কাতর হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যতক্ষণ

জগতের একটিমাত্র প্রাণি বদ্ধ থাকবে, ততক্ষণ তিনি নির্বাণ নেবেন না। খ্রিস্টিয় দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে বৌদ্ধরা ভারতে 'মহাযান' মতে চলতেন। জগৎ উদ্ধারের জন্য এঁরা বুদ্ধদেব-দেশিত পঞ্চশীল ভাঙতে বা অন্যপ্রকার দোষকেও ধর্তব্যের মধ্যে আনতেন না, এটিই 'বৌদ্ধধর্মের চরমাবস্থা'। প্রাবন্ধিক এই অবস্থাকেই 'বৌদ্ধধর্মের চরম উন্নতি' বলে আখ্যায়িত করে লিখেছেন যে মহাযান দর্শন যেমন গভীর, ধর্মমত যেমন বিশুদ্ধ, করুণা যেমন প্রবল, এমন আর কোনো ধর্মে দেখা যায় না। বুদ্ধদেবের সময় থেকে প্রায় হাজার বৎসর অনেকে অনেক তপস্যা ও সাধনা করে এই মতের সৃষ্টি করেছিলেন। মহাযানের 'শূন্যতা' ও 'করুণা'য় মেশামেশি নির্বাণের জ্ঞান বেশিদিন রক্ষা করা হয়নি। যজমানদের সহজবোধ্যতার জন্যে 'শূন্যতা'র বদলে বৌদ্ধভিক্ষুরা 'নিরাত্মা' শব্দটি ব্যবহার করতেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের গণ্ডিতে না থেকে ভিক্ষুরা যজমানদের বোঝালেন যে স্তূপের মাথায় বোধিসত্ত্ব অনন্ত শূন্য 'নিরাত্মা' বা 'নিরাত্মাদেবী'র (স্ত্রীলিঙ্গ) কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। প্রাবন্ধিকের রসবোধের দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রবন্ধের শেষাংশে উদ্ধৃত হল –

> পুরুষ মেয়ের কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়িলে যাহা হয়, যজমানেরা সেকথা অনায়াসেই বুঝিতে পারিল; ...সুতরাং নির্বাণ যে শূন্যতা ও করুণার মিশামিশি, তাহাই রহিয়া গেল, অথচ বুঝিতে কত সহজ হইল। এ নির্বাণেও সেই অনির্বচনীয় ভাব ও সেই অনন্ত ভাব, দিকেও অনন্ত, দেশেও অনন্ত, কালেও অনন্ত।

'নির্বাণ কয় রকম?' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক তুলনামূলক পদ্ধতিতে হীনযান ও মহাযানের নির্বাণ ধারণার পার্থক্য দেখিয়ে বিষয়টি প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। থেরবাদী ও প্রত্যেক বুদ্ধেরা মনে করতেন যে মানুষ সদুপদেশ পেয়ে অথবা চাতুরার্যসত্যে বিশ্বাস করে অষ্টাঙ্গিক মার্গ মেনে চললে বহুকাল অভ্যাসের পরে 'স্রোতে' পড়ে যান। এইরকম 'সোতাপন্ন' স্রোতে পড়লে নির্বাণের দিকে যান, সংসারের দিকে ফিরে আসেন না, তাঁর বারবার জন্ম হলেও আর উজানে যাত্রা করেন না। আরও কিছুদিন নিয়ম পালন করলে 'সকৃদাগামী' হন অর্থাৎ তিনি একবারমাত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই অবস্থায় আরও কিছুদিন নিয়ম পালন করলে তিনি 'অনাগামী' অর্থাৎ এই অবস্থায় এলে আর ফিরতে হয় না। এরপর 'অর্হৎ' অবস্থায় তিনি কিছুদিন বেঁচে থাকলেও মুক্তপুরুষ অবস্থায় থাকেন, তাঁর প্রাপ্ত নির্বাণ 'স্বউপাদী সেস নিব্বাণ' বা 'স্ব-উপাধি নিব্বাণ'। এটি নিঃসন্দেহে নির্বাণ, কিন্তু পুনর্জন্মের কিছু কিছু 'উপাদান' তখনো শেষ হয়নি অথবা সকল কর্মের ক্ষয় না হওয়ায় কর্মজাত সংস্কার কিছু বাকি থাকে। এইরকম জীবমুক্ত অর্হতের কর্মক্ষয়

হয়ে মৃত্যু হলেই তিনি ‘নিরুদি সেস নিব্বাণ ধাতু’তে প্রবেশ করেন। তখন তাঁর কর্ম ও কর্মজাত সংস্কার থাকে না, নির্বাণে প্রবেশ করলে সব ফুরিয়ে যায়।

মহাযানীরা থেরাবাদীদের এই নির্বাণকে নীরস, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর ও সংকীর্ণ মনের পরিচায়ক বলে মনে করেন। তাঁদের কাছে জগৎ থাকা-না-থাকা দুই-ই সমান। মহাযানীরা নির্বাণকে নিষেধমুখে অর্থাৎ ‘না’ করে দেখতে না চেয়ে তাকে বিধিমুখে অর্থাৎ ‘হাঁ’-র দিক থেকে দেখেন। আত্মা, জ্ঞান, বুদ্ধিনাশের নাম নির্বাণ – হীনযানীদের ‘না’ দিক থেকে দেখা বুদ্ধের মনের কথা হতে পারে না, চতুরার্যসত্য ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ধরে চলার নামই নির্বাণ। বুদ্ধের মতে মানুষের হৃদয়ের যত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সব শান্তি করে দেওয়া নয়, নির্লিপ্তভাবে বা তার উপর অবস্থিতি করে সেগুলির চরিতার্থতাই নির্বাণ। নিরালম্ব নির্বাণে বোধিচিত্ত ক্লেশ পরম্পরা ও কুদৃষ্টি থেকে মুক্ত হলে ধর্মকায়ের পবিত্র মূর্তি দেখতে পান। দুটি জিনিস তখন তাঁর পথপ্রদর্শক হয় – ক) সর্বভূতে করুণা এবং খ) সর্বব্যাপী জ্ঞান। যিনি এইরূপে ‘সম্যক সম্বোধি’ লাভ করে সংসারের উপরে উঠেছেন, নির্বাণেও তখন তাঁর একান্ত আস্থা নেই, তখন তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বজীবের পরিত্রাণ ও তার জন্য তিনি নিজেকে বারংবার বদ্ধ করতেও কাতর হন না। তিনি তাঁর সর্বব্যাপী প্রজ্ঞাবলে পদার্থের সত্যাসত্য দেখতে পান।

প্রাবন্ধিক মহাযানীদের ভব ও নির্বাণের অতীত আরেকপ্রকার মুক্তির কথা বলেছেন। এটি সম্পূর্ণরূপে ধর্মকায়ের সঙ্গে এক। যা তত্ত্ব বা তথ্য, তা মহাযানীদের মতে তথতা। ধর্মের তথতাই ধর্মকায়। যিনি মুক্ত তিনি তথাগত অর্থাৎ পরম সত্যে আগত হয়েছেন। পরম সত্যটি হল জগতে দৃশ্যমান সবকিছুর তলায় যে নিগূঢ় সত্যটুকু তা ধর্মকায়, তা থেকে সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝা যায়। এটি মহাযানীদের নিজস্ব, কারণ থেরবাদীরা জগতের আদিকারণ নির্ণয় করেন নি, তাঁরা ধর্মকায় বলতে বুদ্ধের ধর্ম ও শরীর বোঝাতেন। ধর্মকায়ের ইচ্ছা, বিবেকশক্তি অর্থাৎ করুণা ও বোধি রয়েছে, সকল সজীব পদার্থ এর প্রকাশমাত্র। নির্বাণ বলতে চৈতন্যের নাশ বা নিরোধ না বুঝিয়ে অহংভাবের নিরোধ বোঝায়, এটি ‘নিষেধমুখে’ অর্থাৎ ‘না’র দিক থেকে বিধিমুখে করুণা বা সর্বভূতে দয়াকে বোঝায়; এই দুটি জিনিস নিয়েই নির্বাণ সম্পূর্ণ বলে প্রাবন্ধিক মতপ্রকাশ করেছেন।

‘গুভাজু’ ভাবনা ও বৌদ্ধদর্শন

‘বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে?’ (*নারায়ণ*, অগ্রহায়ণ, ১৩২১) প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন যে বৌদ্ধদের ইতিহাস লিখবার চেষ্টা হিন্দু বা মুসলমান, এমনকি বৌদ্ধরাও বিশেষ করেন নি। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁদের শিষ্য শিক্ষিত ভারত-সন্তানেরা করেছেন। সাতশ বছরের ইসলামী শাসনে তাঁরা ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের নাম শোনেন নি। আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরী*-তে তার কোন পরিচয় নেই। কেবল *তরকতি মাশিরি*-তে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি ওদন্তপুরী বিহারকে কেল্লা ও গৈরিক বসন পরা মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষুদের সৈনিক মনে করে ধ্বংস করেছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে। ইউরোপীয়েরা সিংহলে প্রথম বৌদ্ধধর্ম দেখে, পালিভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ পড়ে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ‘বৌদ্ধধর্ম কেবল ধর্মনীতির সমষ্টিমাত্র’। জেসনের দেখা নেপালের বৌদ্ধধর্ম আর বিশপ বিগাণ্ডেটের দেখা ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধধর্ম আলাদা। তেমনই তিব্বত, চিন, জাপানে বৌদ্ধধর্মের রূপভেদ রয়েছে।

চিন, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়ার অধিকাংশ মানুষ; তিব্বত, ভুটান, সিকিম, রামপুরবুসায়র, বর্মা, সায়াম ও আনামের সব মানুষ; নেপালের অর্ধেকের বেশি, সিংহলের অধিকাংশ বাসিন্দাই বৌদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম না মানলেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুই বৌদ্ধদের অনেক আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেছেন। ভারতবর্ষের অনেক সূত্রে বৌদ্ধমত বিকৃতভাবে প্রচলিত। চাটগাঁ, রাঙামাটি ছাড়া উড়িষ্যার গড়জাত মহলের অনেকগুলি রাজ্যে কোথাও কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধমত চলছে। যেমন – উড়িষ্যার মহিমপথ ‘নূতন বৌদ্ধ মত’, বাংলার ধর্মঠাকুরের পূজকরা বৌদ্ধ, বিধবা ও বিল নারায়ণের ভক্তরা নিজেদের ‘বৌদ্ধবৈষ্ণব’ বলেন। বাঙালিদের তন্ত্রশাস্ত্র শূন্যবাদে অনুপ্রবিষ্ট যা সম্পূর্ণতই বৌদ্ধজাত। একসময়ে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। তুর্কিস্থান, পারস্য, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান প্রভৃতি দেশ বৌদ্ধ ছিল। পারস্যের পশ্চিমে বৌদ্ধদের প্রভাব বেশ বেশি। কারণ রোমান ক্যাথলিকদের অনেক ব্যবহার, রীতি-নীতি, পূজা-পদ্ধতি বৌদ্ধদের মত। রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে দুইজন ‘সেন্ট’ বারলাম ও জোসেফট (আনুমানিক পঞ্চম-ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ)[২৩] পণ্ডিতদের মতে ‘বৌদ্ধ’ ও ‘বোধিসত্ত্ব’ শব্দেরই রূপান্তরমাত্র।

নানা দেশে নানা মূর্তি ধারণ করে বৌদ্ধধর্ম কোথাও পূর্বপুরুষের উপাসনা, কোথাও বা ভূতপ্রেত উপাসনার, কোথাও বা দেহতত্ত্ব উপাসনার সঙ্গে মিশেছিল। কোথাও খাঁটি বুদ্ধের মত, কোথাও খাঁটি নাগার্জুনের মত চলার ফলে ‘সমস্ত বৌদ্ধধর্মের একখানি পুরা ইতিহাস লেখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার’ হয়ে উঠেছিল। কোশলের উত্তরাংশের ব্যক্তি বুদ্ধদেব কোশল ও মগধের লোকের বোধগম্য ভাষাতে (না-সংস্কৃত,

না-মাগধী, না-কোশলী – একরকম 'মাঝামাঝি গোছের ভাষা' যা 'মিশ্রভাষা') ধর্মপ্রচার করেছিলেন। *বিমলপ্রভা* পুথিতে (নবম শতক) মগধ, সিন্ধু, বোধ, চীন, মহাচীন, পারস্য, রুক্ষ ভাষায় বুদ্ধবচন ও প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় অনেক বৌদ্ধগান লেখা হয়েছিল।

সিংহলী বৌদ্ধধর্ম দেখে এবং পালিগ্রন্থ পড়ে একদল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে সংসার ত্যাগী, ত্রিপিটক অনুসরণকারী, বিহার-বাসীরাই 'যথার্থ বৌদ্ধ'। গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকাদের স্থান এতে নেই এবং তাঁদের বৌদ্ধ বলা যায় না। অন্য মতে, পঞ্চশীল নিয়ম পালনের প্রতিজ্ঞাকারীরাও বৌদ্ধ। কিন্তু প্রশ্ন হল যে সকল জাতি দিন-রাত প্রাণি হিংসা করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, যেমন – জেলে, মালো, কৈবর্ত, শিকারী, ব্যাধ, খেট, খটিক্ প্রভৃতি জাতির বৌদ্ধধর্মের প্রবেশের অধিকার থাকে না? অন্যদিকে নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী 'পৃথিবী সুদ্ধই বৌদ্ধ'। কারণ, যিনি বোধিসত্ত্ব হবেন, তাঁকে জগৎ উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা করতে হবে। এই সূত্রেই এই 'যানী'রা নিজেদের 'মহাযান' (বোধিসত্ত্বযান) এবং সিংহলবাসীদের 'হীনযান' বলেন। মহাযানীরা জগৎ উদ্ধারক, সেই অর্থে জগৎসুদ্ধ লোক বৌদ্ধ। 'কারণ্ডব্যূহ সূত্র' অনুযায়ী যার যেরকম ভক্তি, তাকে সেইরকমভাবে অবলোকিতেশ্বর উদ্ধার করবেন। এই অর্থে সকলেই বৌদ্ধ। মহাযান মতের সারকথা 'করুণা', প্রধান গ্রন্থ *প্রজ্ঞাপারমিতা*।

মহাযান মতের 'জীবমাত্রেই বৌদ্ধ' – এই কথার বিরুদ্ধ তর্কের কথাও প্রাবন্ধিক উপস্থাপিত করেছেন। জাতিভেদ অস্বীকারকারী বৌদ্ধ গৃহস্থরা বৌদ্ধ কিনা এবং তাঁদের সন্তান বৌদ্ধ হবেন কিনা এই বিষয়ে পণ্ডিতরা কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। শুভাকর গুপ্তের *আদিকর্ম রচনা* নামক বৌদ্ধস্মৃতিতে এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির কথা বলা হয়েছে যে কেউ ত্রিশরণ গমন করলে তিনি বৌদ্ধ। ত্রিশরণ অর্থাৎ তিনবার বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের শরণগ্রহণ। *বিমলপ্রভা* অনুযায়ী আগে ত্রিশরণ গমন, পরে এই জন্মেই বুদ্ধ হওয়ার জন্য কালচক্র মতে লৌকিক ও লোকোত্তর সিদ্ধির চেষ্টা করতে হবে, রত্নত্রয়ের শরণ নিলে যদি বৌদ্ধ হন এবং সেরকম শরণ নেওয়ার জন্য যদি পুরোহিতের প্রয়োজন না থাকে, তাহলে জেলে, মালো, কৈবর্তদের বৌদ্ধধর্মে প্রবেশের বাধা থাকে না। *বিনয়পিটক* অনুযায়ী রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ভিক্ষু করে সংঘে নেওয়া না গেলেও শুভঙ্কর গুপ্তের ব্যবস্থানুসারে তিনি অনায়াসেই বৌদ্ধ হতে পারেন।

প্রাবন্ধিকের পরবর্তী অনুসন্ধানের বিষয় 'বৌদ্ধধর্মের গুরু কে?' প্রথমাবস্থায় বৌদ্ধধর্ম 'সন্ন্যাসীর ধর্ম' ছিল, সন্ন্যাসীদের নাম ভিক্ষু, দলের নাম সংঘ, বাসস্থান সংঘারাম, তার মধ্যে একটি (বিহার) মন্দির

থাকত। প্রাবন্ধিক বৌদ্ধধর্মের গুরুর অনুসন্ধানের জন্য এই ধর্মের গোটা বিবর্তন – প্রাচীন শ্রাবকযান থেকে দলাইলামাযান পর্যন্ত সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসকে উপস্থিত করেছেন। শ্রাবকযানের গুরু বয়োবৃদ্ধ স্থবির বা থের অন্ততপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর উপস্থিতিতে নবিশকে কতগুলি কথা জিজ্ঞাসা করেন। যেমন – উৎকট রোগ আছে কিনা, রাজচাকরি করে কিনা, ভিক্ষাপাত্র ও চীর আছে কিনা। পরে সংঘের সম্মতিতে নবিশকে সংঘভুক্ত করা হত। শিক্ষানবিশ শ্রমণেরা নিজের উপাধ্যায়কে মেনে চলতেন। শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে শ্রমণ আর উপাধ্যায়ের কোন প্রভেদ থাকত না, সংঘে দুজনের সমান ভোট হত। দৃষ্টান্তস্বরূপ অশ্বঘোষের *সৌন্দরনন্দ* কাব্যের কথা বলা যায়। বৈদেহমুনি নন্দের উপাধ্যায় হলেও দুইজনে পরস্পর বন্ধুভাবে এবং নিজেদের সমান বলে মনে করতেন। মহাযানের গুরুর ধারণা অনুযায়ী উপাধ্যায়কে 'কল্যাণমিত্র' (পরলোকের কল্যাণকামনায় গুরু শিষ্যের মিত্র) বলা হত। তাঁরা খুব দর্শনচর্চা করতেন, সংঘে সমানাধিকার পেতেন এবং পরস্পরের মিত্র হতেন।

মহাযানীরা দর্শন শাস্ত্র পড়া ও যোগ-ধ্যান করা অত্যন্ত কঠিন বলে বিবাহ করে গৃহস্থ ভিক্ষু হতে থাকলে মন্ত্রযানের উৎপত্তি হয়েছিল। তাঁদের মতে মন্ত্র জপ করলেই পাঠ, স্বাধ্যায়, তপ প্রভৃতি সকল ধর্ম-কর্মেরই ফলপ্রাপ্তি ঘটবে। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক এক্ষেত্রে খুব আঁটাআঁটি হয়ে গেলে তিনটি কথা উঠল – 'গুরুপ্রসাদ' (গুরুকে ভক্তি করতে হবে), 'শিষ্যপ্রসাদ' (শিষ্যকে স্নেহ করতে হবে) ও 'মন্ত্রপ্রসাদ' (মন্ত্রের প্রতি আস্থা থাকবে)। শিষ্য গুরুর দাস, তাঁর যথাসর্বস্ব গুরুর। মন্ত্রযানে গুরু-শিষ্যের সমানাধিকার না থেকে গুরু বড় হয়েছিলেন। বজ্রযানে গুরু আরও বড় – স্বয়ং বজ্রধারী। বজ্রযানে দেবতা, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের 'বজ্রধর' নামে একজন পুরোহিত এবং পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের উপর বজ্রসত্ত্ব নামে আরেকজন বুদ্ধ (বুদ্ধদের পুরোহিত) হয়েছিলেন। বজ্রসত্ত্ব অনেকটা আদিবুদ্ধ বা ঈশ্বরের স্থান অধিকার করেছিলেন। এই মতের গুরুদের বজ্রাচার্য পাঁচটি অভিষেক হত – মুকুটাভিষেক, ঘণ্টাভিষেক[২৪], মন্ত্রাভিষেক এবং পট্যাভিষেক। তাঁর দেশীয় নাম 'গুভাজু' (গুরু), তাঁকে সকলে ভজনা করবে।

সহজযান গুরু-উপদেশসর্বস্ব। গুরুর উপদেশ ছাড়া সহজপন্থীদের কোন জ্ঞান হয় না; আগম, বেদ, পুরাণ, তপ, জপ সমস্তই বৃথা; গুরুর উপদেশমাত্রই সত্য। পরিবর্তিত বৌদ্ধধর্মে গুরুর সম্মান বাড়তে থাকে। কালচক্রযানে গুরু সর্বোচ্চ মান্য। *লঘুকালচক্রতন্ত্র*-এর টীকা *বিমলপ্রভা* গ্রন্থ রচয়িতা পুণ্ডরীক নিজেকে অবলোকিতেশ্বরের নির্মাণকায় বা অবতার বলেছেন। কালচক্রযানের পর লামাযানে

সকল লামাই এক একজন বড়ো বোধিসত্ত্বের অবতার। সুতরাং, তিনি সাক্ষাৎ বোধিসত্ত্ব, সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী। লামাযান ক্রমে উঠে দলাইলামাযানে পরিণত হয়েছে। দলাই লামা অবলোকিতশ্বরের অবতার। তিনি মরেন না, তিনি এক কায়া ত্যাগ করে কায়ান্তর ধারণ করেন। বৌদ্ধধর্মের আদি পর্যায়ের উপাধ্যায় বর্তমানে দলাইলামাযানে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার হয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের তুলনা টেনে হরপ্রসাদ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বলেছেন যে বৌদ্ধদৃষ্টান্ত হিন্দুমতে প্রবেশ করেছে। তন্ত্রমতে গুরুই পরমেশ্বর। গুরুর পাদপূজা, উচ্ছিষ্ট ভোজন করতে হয়। গুরু শিষ্যের সর্বস্বের অধিকারী। বৈষ্ণবেরও অনুরূপ মত, আরও গুরুসর্বস্বতার জন্য অনেকে কর্তাভজা[২৫] হন। এইভাবেই প্রাবন্ধিক বৌদ্ধগুরুর বিবর্তনের সূত্রটি পাঠককে ধরিয়ে দেন।

বৌদ্ধযান: হীনযান, মহাযান ও সহজযান

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘হীনযান ও মহাযান’ (*নারায়ণ,* আষাঢ়, ১৩২২), ‘মহাযান কোথা থেকে আসিল?’ (*নারায়ণ,* শ্রাবণ, ১৩২২) এবং ‘সহজযান’ (*নারায়ণ,* ভাদ্র, ১৩২২) তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দর্শনগত পার্থক্য ও তাদের অনন্যতা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

‘হীনযান ও মহাযান’ প্রবন্ধে দুটি যানের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। হীনযান বলে কোন যান না থাকলেও মহাযানেরা থেরবাদী বৌদ্ধদের ‘হীনযান’ বলতেন। যেহেতু তাঁরা ‘মহা’, সুতরাং তাঁদের সাপেক্ষে থেরবাদীরা ‘হীন’। আগে দুটি যানের অস্তিত্ব ছিল – ক) প্রত্যেকবুদ্ধ বা প্রত্যেকযান ও খ) শ্রাবকযান। বুদ্ধদেব স্বয়ং প্রত্যেকবুদ্ধযান স্বীকার করেছিলেন। যাঁরা নিজের যত্নে, বুদ্ধের অনুপস্থিতিতে বুদ্ধের সাহায্য না পেয়ে উদ্ধার হন, তাঁদেরকে প্রত্যেকবুদ্ধযান বলে। এঁরা নিজেই উদ্ধার হতে পারেন, আর কাউকে উদ্ধার করবার শক্তি এঁদের নেই। বুদ্ধের মুখে ধর্মকথা শুনে যাঁরা ধর্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁদের নাম ‘শ্রাবক’। বুদ্ধের পরামর্শে অনেক শ্রাবক উদ্ধার পান। তাঁরা প্রথমে ‘শ্রাবক’, পরে ‘ভিক্ষু’ হয়ে বিহারে বাস করতে করতে ‘স্রোতাপন্ন’, ‘সকৃতাগামী’, ‘অনাগামী’ এবং ‘অর্হৎ’ হন। এঁরা জন্ম মরণ থেকে অব্যাহতি পেলেও কাউকে উদ্ধার করতে পারেন না। এঁদের যান ‘শ্রাবকযান’। ‘বুদ্ধ’ নির্বান পেলে তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের থেকে শ্রাবকেরা ধর্মকথা শোনেন। তাঁরা পর-পর জন্মে ধার্মিক বৌদ্ধ হতে পারলেও মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁদেরকে বুদ্ধের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হয়।

মহাযানীরা 'প্রত্যেকযান' ও 'শ্রাবকযান' – এই দুটিকেই অত্যন্ত স্বার্থপরতার কারণে 'হীন' বলে নিন্দা করেছেন। মহাযান নিজে উদ্ধারের কথা না ভেবে জগৎ উদ্ধারের জন্য ভাবেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, অবলোকিতেশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে একটিও প্রাণি যতক্ষণ বদ্ধ থাকবে, ততক্ষণ তিনি নির্বাণে প্রবেশ করবেন না। এই করুণা, সর্বভূতে দয়াই মহাযানকে 'মহা' আর বাকি দুই যানকে 'হীন' করে তুলেছে।

হীনযান অর্হত্ব চায়, আর মহাযান চায় বুদ্ধত্ব। অর্হৎ ও বুদ্ধ দুজনে জন্মজরামরণের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে বোধিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভ করলেও তাঁদের প্রভেদ রয়েছে যে অর্হতেরা হীনযান আর বুদ্ধ হন। এর ব্যাখ্যায় প্রাবন্ধিক বলেছেন যে বুদ্ধ সম্যক সমাধি লাভের পর নির্বাণ লাভের জন্য ব্যাকুল হলে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র এসে তাঁকে অধর্মের ভারে নিমজ্জমান মগধকে উদ্ধার করতে অনুরোধ করেছিলেন। মগধ উদ্ধারের জন্য তিনি একচল্লিশ, কারো মতে পঁয়তাল্লিশ বছর ধর্মপ্রচার করে আশি বছর বয়েসে নির্বাণ লাভ করেন। পরের উদ্ধারের জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন বলে তিনি বুদ্ধ আর তাঁর শিষ্যেরা নিজেরাই উদ্ধার পান বলে তাঁরা অর্হৎ বলে পরিচিত হন। মহাযান বুদ্ধের জীবন ও বাণীকে শ্রাবকযানদের মতো অক্ষরার্থে গ্রহণ না করে ভাবার্থে গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধ এককালে বোধিসত্ত্ব ছিলেন, আর মৈত্রেয় একজন বোধিসত্ত্ব হবেন। মহাযান দাবি করেছে যে বোধিসত্ত্ব হবার উপদেশও বুদ্ধদেব দিয়েছিলেন, কারণ বোধিসত্ত্ব না হলে একেবারে বুদ্ধ হবার উপায় নেই।

বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম সমন্বিত ত্রিপিটকের বাইরে বুদ্ধবচন নেই – এই যুক্তিতে শ্রাবকযান মহাযানের উদ্দেশে বলেন যে মহাযান মতে কোন ধর্মেরই 'সত্তা' ও 'স্বভাব' নেই, সব 'অভাব' ও 'শূন্য'। এগুলি 'বুদ্ধবচন' রূপে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে মহাযান তাঁদের শত শত 'সূত্র' যেমন প্রজ্ঞাপারমিতার কথা বলেন। 'বিনয়'-এর উদ্দেশ্য ক্লেশনাশ, সমস্ত বিকল্পই ক্লেশ এবং চারদিকের দৃশ্যমান সকলই 'বিকল্প'। 'পরমার্থ সত্য' জানলেই সমস্ত বিকল্প নাশ হয়ে বিনয়ের চূড়ান্ত হবে। এই বিনয়ের উদারতা ও গভীরতা শ্রাবকযানের বিদ্যাবুদ্ধির অতীত, যেমন – বোধিসত্ত্বের বিনয়। ধর্ম নিয়েই 'অভিধর্ম' আর মহাযানের ধর্ম 'অনুত্তরসম্যক্‌সম্বোধি' প্রাপ্তি। এই অর্থে, মহাযানে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম রয়েছে।

শ্রাবকযানে প্রথমে গৃহস্থ ও ভিক্ষুদের জন্য 'ত্রিশরণ' গমন, 'পঞ্চশীল' ও 'অষ্টশীল' গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। 'দশশীল'[২৬] কেবল ভিক্ষুদের জন্য প্রযোজ্য। মহাযানেও ত্রিশরণ গমন ও শীলরক্ষার কথা থাকলেও 'পোষধ' ব্রতের কথা খুব একটা পাওয়া যায় না। শীলরক্ষাটা শ্রাবকেরা যত বড়ো বলে মনে

করেন, বোধিসত্ত্বেরা তত বড় মনে করেন না। তাঁরা 'শরণ'গমনের পর বোধিলাভ ('চিত্তোৎপাদ' বা 'বোধিচিত্তোৎপাদ'), 'পাপদেশনা' (পাপ কাকে বলে তাঁর উপদেশ) সম্পর্কে অবহিত হন, 'পুণ্যানুমোদন' (পুণ্যের প্রতি আসক্তি) ও ছয়টি 'পারমিতা' আচরণ করেন। প্রাবন্ধিক হীনযান ও মহাযানের পার্থক্য নির্ধারণে বলেছেন –

> হীনযানের শিক্ষা নিষেধমুখে, মহাযানের উপদেশ বিধিমুখে। হীনযানের যেন জীবনীশক্তি কম, নাই বলিলেই যেন হয়। ... মহাযানের এই জীবনীশক্তি বড়ো বেশি। তাঁহাদের একটি পারমিতার নামই 'বীর্য', অর্থাৎ বীরত্ব অর্থাৎ উৎসাহ। শীলরক্ষা করিয়া যাইব, ক্রমে এমন হইয়া উঠিবে যে আমি শীলরক্ষায় সকলের উপর উঠিব এবং অন্যে যাহাতে শীলরক্ষা করিতে বা জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিব। হীনযানে 'বীর্য' শব্দটিই নাই। মহাযানে উহা একটি পারমিতার মধ্যে। শুধু সামান্য উৎসাহ নহে; এমন উৎসাহ যে উহা হইতে আর বেশি কল্পনা করা যায় না।

শ্রাবকযানে চারটি ধ্যান অনুসারে ভিক্ষু ক্রমে 'স্রোতাপন্ন', 'সকৃতাগামী' ও 'অনাগামী' হয়ে পরে 'অর্হৎ' হন। মহাযানে ধ্যানের কথা, এই চারটি ধ্যান সমেত অসংখ্য ধ্যান ও সমাধি আর সেই বিষয়ক অনেক পুথি আছে। 'স্রোতাপন্ন', 'সকৃতাগামী', 'অনাগামী', 'অর্হৎ' এই শব্দগুলি মহাযানে পাওয়া না গেলেও 'দশ বোধিসত্ত্ব ভূমি'র কথা পাওয়া যায়। বোধিসত্ত্ব দশটি ভূমি (মনোবৃত্তিগুলি) অতিক্রম করলে নির্বাণপথের যথার্থ পথিক হতে পারেন। 'করুণা' শ্রাবকযানে গুরুত্বহীন হলেও মহাযানে তা বোধিসত্ত্বের চিরসহচর, ভূমি অনুসারে করুণা প্রবল হয়। পাঁচটি পারমিতায় দক্ষতালাভ করলে তারপর 'প্রজ্ঞাপারমিতা' বা 'আসল পারমিতা'। এর সঙ্গে অন্যান্য পারমিতা যুক্ত হয়ে পূর্ণ পারমিতা হয়। প্রজ্ঞাপারমিতার মতে সত্য দুই প্রকার – সাংবৃতিক বা ব্যবহারিক সত্য ও পরমার্থ বা চিরকালীন সত্য যাকে মহাযানীরা শূন্য বলেন।

ত্রিশরণ গমনের মন্ত্র হীনযান ও মহাযান দুইয়ের মধ্যেই এক, তবে মহাযানে ত্রিরত্ন – বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ নয়; ধর্ম, বুদ্ধ ও সংঘ। বুদ্ধকে দ্বিতীয় ও ধর্মকে প্রথম স্থান দিয়ে মহাযান বুদ্ধ থেকে ধর্মকে প্রধান বলে মনে করেন। স্তূপ বা চৈত্যই ধর্ম। এর গায়ে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মন্দির। নেপালের মহাযানীদের মধ্যে সংঘ বলতে একটি বিহারে যতগুলি ভিক্ষু থাকেন তাঁদের বোঝায়; কিন্তু তাঁরা বলেন যে সংঘ ক্রমে বোধিসত্ত্বে পরিণত হয়েছেন। এখানে শাক্যমুনি বুদ্ধের অবস্থা শোচনীয়, তিনি একজন 'মানুষী' বুদ্ধ; আবার মানুষী বুদ্ধদের মধ্যেও সপ্তম। মহাযান মতে, হিন্দু ব্যাসদেবের মতো শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্মের সংকলক মাত্র। ধ্যানীবুদ্ধদের ধর্ম আদিকাল থেকে প্রবহমান। মহাযানীরা পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধকে মানেন।

নেপালের স্বয়ম্ভূক্ষেত্রে চৈত্যের চারদিকে পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধের মন্দির আছে। এখানে বুদ্ধদেব পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের একরকম দ্বারপাল। আগে যা ধর্ম, বুদ্ধ ও সংঘ ছিল, মহাযানের সমৃদ্ধিতে তা প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্বে পরিণত হয়েছিল। ধর্ম হলেন প্রজ্ঞা, কারণ মহাযানীরা ঘোর জ্ঞানবাদী আর জ্ঞানই মুক্তি। বুদ্ধ হলেন উপায়স্বরূপ; তাঁর দৃষ্টান্ত দেখে, উপদেশ নিয়ে জ্ঞানার্জন সম্ভব হয়। প্রজ্ঞা, উপায় ও সংঘ যথাক্রমে ধর্ম, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের স্থান দখল করেছিল। হীনযান ধর্মনীতি ও সমাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত আর মহাযান দর্শনে শূন্যবাদী, নীতিতে করুণাবাদী। তাই তাঁরা নিজেদের 'মহা' এবং শ্রাবক ও প্রত্যেকযানকে 'হীন' বলে মনে করতেন।

'মহাযান কোথা হইতে আসিল?' প্রবন্ধে মহাযানের উৎস সন্ধান করা হয়েছে। মহাযান মতের প্রবর্তক নাগার্জুনের *মাধ্যমকবৃত্তি* মহাযানের প্রথম গ্রন্থ। কিংবদন্তী অনুসারে তিনি পাতাল থেকে *প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র* উদ্ধার করেছিলেন। চীনেরা বলেন যে নাগার্জুনের শিষ্য আর্যদেব অধ্যাত্মবিদ্যার চূড়ান্ত করে গেছেন। এঁরাই মহাযানের আদিগুরু। কিন্তু, নাগার্জুনের আগে থেকেই মহাযান মত প্রচলিত ছিল। তাঁরও আগে অশ্বঘোষ *মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূত্র*[৭], *বুদ্ধচরিত* ও *সৌন্দরানন্দ* লেখেন যা মহাযান মতে লিখিত বলে বিবেচিত হয়। তাঁর আগে লঙ্কাবতার প্রভৃতি তিনটি মহাযান সূত্র প্রচলিত ছিল। তাই মহাযানের আদি উৎসের সন্ধান করা কঠিন কাজ। বৌদ্ধদের মতে, বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বানের প্রায় একশ বছর পরে বিনয় মানা সংক্রান্ত বিষয়ে বৌদ্ধসংঘের মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়েছিল। বৈশালীতে এক মহাসভায় বৌদ্ধস্থবিরের দল স্থবির বা থেরবাদ এবং মহাসাংঘিক দলে বিভক্ত হন। মহাসাংঘিকরা বুদ্ধকে অসামান্য অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে 'লোকোত্তরবাদী' হয়েছিলেন।

অশোকের সময়ে পাটলিপুত্রে যে মহাসভা হয়, তাতে মহাসাংঘিকেরা স্থান পাননি। মহাসাংঘিক ও মহাযানদের মতে সে সভার কোনো অস্তিত্বই নেই। স্থবিরবাদের পৃষ্ঠপোষক অশোকের সৌজন্যে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। মগধ ও বাংলায় স্থবিরবাদের লোক বেশি ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যভাগে অযোধ্যা, মথুরা, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে মহাসাঙ্ঘিকরাই প্রবল হয়ে উঠে প্রধানত দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছিল – মহীশাসক ও বজ্জিপুত্তক। মহীশাসকরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয় – সর্বত্থবাদী ও ধর্মগুপ্তিক। সর্বত্থবাদ তিনভাগে কশ্যপীয়, সংকান্তিক ও সুত্তবাদ আর বজ্জিপুত্তকরা চারভাগে ধম্মত্থানীয়, ছন্দাগারিক, ভদ্দজানিক ও সম্মতীয় বিভক্ত হয়েছিল। মহাসাংঘিকদের দুটি দল – গোকুলিক ও একব্যবহারিক।

গোকুলিকরা তিনভাগে বিভক্ত হয় – পণ্ণখিবাদ, বাহুলিক ও চেতিয়বাদ। এছাড়াও দেশভেদে অনেকগুলি শাখা হয়েছিল – হেমবন্ত, রাজগিরীয়, সিদ্ধত্থক, পূর্বশেলিয়, অপরশেলিয়, বাজিরীয়। তবে কী নিয়ে এইসকল শাখাভেদ তা জানা যায়নি।

বৌদ্ধধর্মের নানা শাখার মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ থাকায় তাঁরা দুর্বল ছিলেন। অশোকের মৃত্যুর পর শুঙ্গরা রাজক্ষমতা দখল করে স্থবিরবাদীদের উপর অত্যধিক অত্যাচার করেছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলে শক, যবন ও পহ্লব প্রভৃতি জাতির রাজত্ব কালে মহাসাংঘিকেরা সেখানে গিয়ে বিদেশি রাজাদের স্বমতে আনবার চেষ্টা করে সফল হয়েছিলেন। অনেক সম্প্রদায় নিজেদের শাখার অস্তিত্ব ভুলে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। মহাসাংঘিকেরা কনিষ্কের সময় জলন্ধরে একটি মহাসভা করেন যেখানে স্থবিরবাদীরা বিশেষ স্থান পাননি। তাঁরা নিজেদের ধর্মগ্রন্থ, তার টীকা ও ধর্মমত স্থির করে নেন। কনিষ্কের গুরু অশ্বঘোষ মহাযানের পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় সভায় মহাযানীদের উপস্থিতি বেশি ছিল বলে প্রাবন্ধিক মতপ্রকাশ করেছিলেন। মহাসাংঘিক ও মহাযানের অনেক বিষয়ে মতের ঐক্য থাকায় এই সভার মহাসাংঘিকেরা মহাযানরূপে পরিণত হয়েছিলেন। মহাসাংঘিকরা দশভূমি[২৮] ও দার্শনিক মতের পক্ষপাতী ছিলেন। সম্ভবত মহাসাংঘিকেরাই তিনশ বছর ধরে ক্রমে ক্রমে মহাযান হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

মহাসাংঘিকদের প্রাপ্ত একমাত্র গ্রন্থ *মহাবস্তু অবদান*-এ লেখা রয়েছে – 'আর্য্য মহাসাঙ্ঘিকানাং লোকোত্তরবাদিনাং পাঠেন' অর্থাৎ লোকোত্তরবাদী মহাসাংঘিকদের এই গ্রন্থ। এর ভাষা নির্ধারণ করতে না পেরে প্রাবন্ধিক লিখেছেন যে *ললিতবিস্তর*-এর শেষের গাথাগুলি, *সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক*-এর গাথাগুলি, *শতসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা*-এর গুণরত্নসঞ্চয় গাথা, মথুরার ছোটো ছোটো শিলালেখগুলি, নাসিক, কার্লি প্রভৃতি গুহায় সাতকর্ণি রাজাদের শিলালেখগুলি যে ভাষায় লিখিত; *মহাবস্তু অবদান*-ও সেই ভাষায় লিখিত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই ভাষাকে 'গাথাভাষা', ই. সিনার 'mixed Sanskrit', কেউ কেউ 'vernacularised Sanskrit', 'Sanskritized vernacular' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। প্রাবন্ধিক *মহাবস্তু অবদান*-এর 'মিশ্রভাষা'র উপর আলোচনা করেছেন। কনিষ্কের সময় লিখিত গ্রন্থের একটিও পাওয়া যায়নি। চীনে তার কয়েকটির তর্জমা রয়েছে। সক্‌ডিয়ানা ও মধ্য-এশিয়ায় মহাসাংঘিকদের একেকটি শাখার মত চলিত, কিন্তু তার কোনো গ্রন্থের সন্ধান মেলেনি। *মহাবস্তু অবদান*-এর পর এবং নাগার্জুনের আগে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে *লঙ্কাবতার সূত্র* ও অশ্বঘোষের তিন চারটি গ্রন্থ

দেখতে পাওয়া যায়। এতে বোঝা যায় যে মহাযানের মত ক্রমে ক্রমে বেড়ে গেছে। *মহাবস্তু অবদান*-এ দশভূমি, বুদ্ধত্ব লাভের কথা থাকলেও বোধিসত্ত্ববাদ নেই। *লঙ্কাবতার সূত্র*, অশ্বঘোষের *সৌন্দরানন্দ* কাব্য-এ বোধিসত্ত্ববাদ রয়েছে।

প্রচলিতমতে নাগার্জুন হিন্দু ও বৌদ্ধদের মেলাবার জন্যই মহাযানমতের সৃষ্টি করেছিলেন। বুদ্ধদেবের পরে রচিত *ভগবদ্গীতা*-র মত মহাসাংঘিকদের মধ্যে প্রবেশ করে মহাযানকে গড়ে উঠতে সহায়তা করেছিল। প্রাবন্ধিক এই মত মানেন নি। নেপালিদের মতে, ধর্ম দুইপ্রকার – দেবভাজু ও গুভাজু; হয় দেবতা, নয় গুরুকে ভজনা কর। ব্রাহ্মণেরা দেবভাজু, বৌদ্ধেরা গুভাজু। সুতরাং, দুটি ধর্ম কিছুতেই মিশতে পারে না। মহাযানও সম্পূর্ণরূপে গুভাজু, তাঁরা তাঁদের গুরু ও মুক্তির উপায়স্বরূপ বুদ্ধকেই মানেন, কোনো দেবতাকে তাঁরা উপাসনা করেন না, তবে হিন্দু ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য কি করে সম্ভব? বরং হীনযান সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করতে বলেন, কিন্তু মহাযানে সেটুকুও দেখা যায় না। ব্যবহারিক জীবনের উদাহরণ দিয়ে প্রাবন্ধিক দেখাতে চেয়েছেন যে মহাযান হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সামঞ্জস্যমাত্র নয়।

মহাযানের একটি ‘বাহাদুরি’র দিকে হরপ্রসাদ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মহাসাংঘিকের সময় পর্যন্ত বৌদ্ধদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ, পরস্পর রেষারেষি ছিল; কিন্তু মহাযানের পর থেকে শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানা যানের উৎপত্তি হলেও তারা সকলে নিজেদের মহাযান বলে পরিচয় দেন। মহাযানের উদারতাই এর কারণ বলে মনে করেন –

> মহাসাংঘিকেরাই ক্রমে মহাযান হইয়া গিয়াছে; ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত উহার কোনো বিশেষ সম্বন্ধ নাই; ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য করিবার জন্য মহাযানের সৃষ্টি হয় নাই; মহাযানের উদ্দেশ্য মহৎ, উহা সকল ধর্মকেই আপনার ক্রোড়ে টানিয়া লইতে পারে।

‘সহজযান’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের বাড়তি আগ্রহের কারণ সহজযানীদের বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাগান। মহাযানী দর্শন থেকে তিনি সহজযানের উৎস সন্ধান করেছেন। মহাযানমতে নির্বাণ লাভ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। অনেক জন্মান্তর ধরে ধ্যান, ধারণা, সমাধি করে ‘দশভূমি’ ও বহুশূন্য পার হয়ে নির্বাণ-পদ লাভ করা যায়। এই কাজ সাধারণ লোকের সাধ্য নয়। মহাযানে ‘সাংবৃত সত্য’ বা সংসারকে নস্যাৎ করে ‘পরমার্থ সত্য’কে শূন্য বলে বর্ণনা করেছে। নির্বাণ ও শূন্য একই। মাধ্যমিকেরা মনে করেন যে ‘শূন্য’ ‘চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত’; তা ‘অস্তি’ও নয়, ‘নাস্তি’ও নয়, ‘তদুভয়’ও নয়, ‘অনুভয়’ও নয়, তা অনির্বচনীয় রূপ। তার ধারণা অভাবরূপে নয়, ভাবরূপে। যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদীরা বলেন যে ঐ অবস্থায় শূন্য

বিজ্ঞানমাত্র ‘ভাব’। জটিল দর্শনকে সহজসাধ্য করে অনুসন্ধানের জন্যই সহজযানের উদ্ভব হয়েছিল। সহজবাদীরা সংসার ও নির্বাণকে ‘মিথ্যা’ বলেন, মানুষ সকলেই নিত্যমুক্ত, পাপ পুণ্য বলে কোনো জিনিসই নেই।

সহজধর্মের অনেক গ্রন্থই বাংলায় লেখা এবং তা ‘হওয়াই উচিত’ বলে প্রাবন্ধিক অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। নির্বাণকে সহজ করার জন্য বাংলাতেই সহজধর্ম প্রচার করা হয়েছিল। সরহপাদের ২২ সংখ্যক পদ ‘অপণে রচি রচি ভব নির্বাণা’ পদ ও ভাদেপাদের ৩৫ সংখ্যক পদ ‘এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহে’ পদ উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করেছেন যে যখন সবই শূন্য তখন উৎপত্তি-নিবৃত্তি-ভঙ্গ-জন্ম-মরণ-সংসারও নেই।[২৯] সহজযানকে বুঝবার পূর্বপ্রস্থান রূপে প্রাবন্ধিক যোগাচার দর্শনের প্রসঙ্গ এনেছেন। যোগাচার মতে যেমন কিছুই থাকে না, বিজ্ঞানমাত্র থাকে; সহজ মতে তেমনই কিছুই থাকে না, আনন্দমাত্র থাকে। এই আনন্দকে তাঁরা কখনো ‘সুখ’, কখনোবা ‘মহাসুখ’ বলেন। সেই সুখ স্ত্রীপুরুষসংযোগজনিত সুখ। এঁদের মতে চারটি শূন্য রয়েছে – নিচের শূন্য কয়টি কিছুই নয়, আলোকমাত্র; চতুর্থ শূন্যের নাম প্রভাস্বর, তা নিজেই উজ্জ্বল।

শ্রীসমাজতন্ত্র, বজ্রজাপ, সরহপাদপ্রবন্ধ পুথিতে নির্বাণ, মোক্ষলাভ বা সুখ লাভের জন্য গুরুর উপাসনার কথা বলা হয়েছে। *যোগরত্নমালা*-য় বজ্রগুরুর তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে বজ্র হল শূন্যতা, এই শূন্যতাবজ্রের উপদেশ যিনি দেন তিনি বজ্রগুরু। শতসহস্র সমাধির থেকেও গুরুর উপদেশ অমূল্য। ইন্দ্রিয় নিরোধ, পাপ পরিহার, কঠোর ব্রতধারণ, কঠিন নিয়মপালনের চেষ্টা করা বৃথা; সহজযান থেকে গুরুর উপদেশই নিতে হয়। এখানে আসক্তির ‘বিপরীতভাবনা’ বা ফলদানের ক্ষমতা (*হে বজ্রতন্ত্র*), পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয় বা কামভোগ (*শ্রীসমাজতন্ত্র*), সুখভোগ (*যোগতন্ত্র*) করতে করতে বোধিসাধনার কথা বলা হয়েছে।

সহজযান স্পষ্ট করে বলেছেন যে বোধিলাভের ইচ্ছা থাকলে ‘পঞ্চকাম’ উপভোগ কর। এতে মানুষ পাপপুণ্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু যখন বজ্রগুরু বুঝিয়ে দেন, সবই শূন্য ও নিঃস্বভাব, তখনই সহজিয়ারা পঞ্চকামোপভোগ করেও পাপপুণ্যে লিপ্ত হয় না। দ্বারিকপাদ লিখিত ৩৪ সংখ্যক ও শবরপাদ রচিত ৫০ সংখ্যক গানে মহাসুখ লাভে সহজিয়াদের অনির্বচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে আগমে বলা হয়েছে যে শরীর সৎসুখে মূর্ছিত হলে ইন্দ্রিয়সকল যেন ঘুমিয়ে পড়ে, শরীর নিশ্চেষ্ট হয়, মন মনের ভিতর ঢুকে যায়।[৩০] *অনুত্তরসন্ধি-*

তে পঞ্চকামোপভোগের মধ্যে স্ত্রীমায়াকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এতে তিনটি জ্ঞানের প্রভেদ স্পষ্ট। প্রথম তিনটি শূন্য এবং বিরমানন্দ রূপ চতুর্থ শূন্য ‘প্রভাস্বর’ পাওয়া যায়।

সিদ্ধাচার্যরা নানা রাগ রাগিণীতে চর্যাগান গেয়ে বেড়াতেন। তাঁদের ব্যবহৃত যন্ত্রগুলি খোল করতাল বলে মনে হয়। একতারা ছিল, বীণাপাদ লিখিত ১৭ সংখ্যক গানে তার প্রমাণ আছে।[৩১] তাঁরা পটহ বা ঢোল বাজাতেন, ভুসুকুপাদের ৬ সংখ্যক গানে তার প্রমাণ আছে – ‘বেটিল হাক পড়অ চৌদীশ’; কৃষ্ণাচার্যের গানে পাই সেসময় ১১ সংখ্যক গানে ডমরু ও ১৯ সংখ্যক গানে মাদল ব্যবহার করা হোত – ‘অনাহা ডমরু বাজএ বীরনাদে’ বা ‘ভবনির্ব্বাণে পড়হ মাদলা’ বা ‘জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ’।[৩২] তাঁরা যে সকল রাগে গাইতেন তার অনেকগুলি এখনো প্রচলিত। যেমন – রাগ পটমঞ্জরী, বড়াডী, গুঞ্জরী, শীবরী, কামোদ, মল্লারি, দেশাখ, ভৈরবী, মালসী, গবুড়া, রামক্রী, বঙ্গাল ইত্যাদি।

পদকর্তারা ‘আলোআঁধারে’ সন্ধ্যাভাষায়[৩৩] গান করতেন যার উপরে একরকম অর্থ আর ভিতরে রূপকের মতো গূঢ় অর্থ। বোধিচিত্ত ও নিরাত্মা দেবীর মিলনকে কখনো বিবাহ, কখনো তরুলতা সাজানো, কখনো হরিণ হরিণীর ক্রীড়া, কখনো দুধ দোয়া, কখনো শুঁড়িনীর মদ বেচা, কখনো শূন্য ও করুণার মিলন, কখনো গঙ্গা-যমুনার মাঝে নৌকা, কখনো ইঁদুরের সঙ্গে তুলনা করে নানা রসে, ভাবে, ছন্দে, অলঙ্কারে সহজ মত প্রচার করা হত। সিদ্ধাচার্যরা চর্যাপদ বা গীতিকা ছাড়াও বজ্রপদ বা বজ্রগীতিকা, উপদেশপদ বা উপদেশ গীতিকা লিখতেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, রত্নাকর শান্তি বাংলায় গীতিকা লিখেছিলেন। সহজধর্মের গুরুদেরকে সংস্কৃতে বজ্রগুরু, বাংলায় বাজিল, বজুল ও বজগু, সিদ্ধাচার্য বলা হত। এঁরা দাড়িগোঁপ কামাতেন, মাথায় বড়ো বড়ো চুল রাখতেন, আলখাল্লা পরতেন, গান গাইতেন। তিব্বতে অনেক সিদ্ধাচার্যদের মূর্তির পূজা হয়।

> চুরাশি জন সিদ্ধাচার্যের আদি লুইপাদ বা মৎস্যান্ত্রাদ বাঙালি ছিলেন। রাঢ়ের ধর্মঠাকুরের পূজকরা লুইকে মানেন এবং তাঁর উদ্দেশে পাঁঠা ছেড়ে দেন। লুইপূজার দিন সে পাঁঠা বলি হয়। কেউ পাঁঠা চুরি করে খেলে তাঁর অত্যন্ত অমঙ্গল হয়। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে, রাঢ় অঞ্চলের ময়ূরভঞ্জে লুই পূজা হয়। লুইয়ের বংশে অন্যান্য সিদ্ধাচার্যরা বাংলায় গান লিখেছিলেন।

হরপ্রসাদ লিখেছেন, সিদ্ধাচার্যদের সময়ে বাংলায় ব্রাহ্মণদের এত প্রাদুর্ভাব সম্ভবত ছিল না। সিদ্ধাচার্য ও তাঁদের চেলারা দেশের একরকম কর্তা ছিলেন। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী তাঁদের ধর্ম সহজ ছিল। তাঁরা বক্তৃতা, শাস্ত্র, সংস্কৃত ব্যাখ্যা, উপদেশ দিয়ে নয়; গানে, নানা সুরে, নানা বাদ্যের সঙ্গে, গান

করে লোকদের তত্ত্বকথা শোনাতেন যার আদি-মধ্য-অন্তে আনন্দ থাকত। সিদ্ধাচার্যদের গুরুগিরি শিষ্যদের মধ্যে ঠিকভাবে পরিণাম পায়নি। কিন্তু তাঁদের উপকার স্মরণ করে প্রাবন্ধিক লিখেছেন –

> তাঁহারা বাংলা ভাষাটিকে সজীব, সতেজ, সরল ও মধুর করিয়া গিয়াছেন এবং বৌদ্ধজগতে তাহাকে একটি উচ্চস্থান দিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য বঙ্গবাসী মাত্রেরই ইঁহাদের উপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

সিদ্ধাচার্যেরা জায়মান সহজধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন। আদি সহজিয়াদের সঙ্গে পরবর্তীকালের সহজিয়াদের অবস্থার পার্থক্য দেখিয়ে প্রাবন্ধিক বলেন যে আদি সহজিয়ারা আপনাতেই সহজভাবে মত্ত থাকতেন ও তখন তাঁরা নিজেই যুগনদ্ধ ক্রীড়া করতেন, পরবর্তীকালে তাঁরা দেবতাদের সহজভাবে বিভোর হয়ে তাঁদের যুগনদ্ধ ক্রীড়া দেখেই আনন্দ পান।

বৌদ্ধদর্শনের বিচিত্রে ভিন্ন সাহিত্য-দর্শন

রামদাস সেন 'বৌদ্ধ মত ও তৎসমালোচন' প্রবন্ধে বৌদ্ধশাস্ত্র সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর ব্রাহ্মণ শিষ্য অভিধর্ম, তাঁর ক্ষত্রিয় শিষ্য ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ সূত্র এবং শূদ্র শিষ্য উপালি বিনয় সংকলনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বুদ্ধবচনের সংকলন ত্রিপিটক বৌদ্ধদের মূল গ্রন্থ এবং এর মধ্যেই বুদ্ধদেব সংসারের মধ্যে সজীব রয়েছেন। বৌদ্ধাচার্য বুদ্ধঘোষ বলেন, বুদ্ধবচন অপরিবর্তনীয়, কারণ বুদ্ধ একটি বাক্যও বৃথা ব্যবহার করেন নি।

কানিংহামের মতে, বিনয় ও সূত্রপিটক শ্রাবক ও সাধারণ বুদ্ধমণ্ডলীকে সম্বোধন করে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। কিন্তু প্রাবন্ধিকের বিবেচনা অনুযায়ী সেগুলি সমস্তই পালি ভাষায় লিখিত হয়েছিল, কেননা বুদ্ধদেব মাগধী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় উপদেশ দেন নি। *মহাবংস* অনুসারে সুভূতি নামের সিংহলী বৌদ্ধাচার্য অনুমান করেন যে *ত্রিপিটক* শ্রুতির মত আগে সকলের কণ্ঠস্থ ছিল, তারপরে সম্ভবত একশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভট্টগমনীর রাজত্বকালে গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হয়েছিল। ৩০৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহেন্দ্র *ত্রিপিটক* ও তার *অর্থকথা* সিংহলে প্রচার করেছিলেন। আচার্য বুদ্ধঘোষ চারশ খ্রিস্টাব্দে তা আবার পালিতে অনুবাদ করেছিলেন। এটি সিংহল ও ব্রহ্মদেশে প্রচলিত রয়েছে। *বিনয়পিটক*-এ বুদ্ধের জীবনচরিত ও বৌদ্ধভিক্ষুদের জন্য সৎকর্ম পদ্ধতি লিখিত, *সূত্রপিটক*-এ বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বিবিধ আখ্যান পরিপূর্ণ এবং *অভিধর্মপিটক*-এ বিজ্ঞান ইত্যাদি ঘটিত বৌদ্ধধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপিত হয়েছে। *বিনয়পিটক*-এর অন্তর্গত গ্রন্থগুলি হল – ক) *সুত্তবিভঙ্গ:* ১) *মহাবিভঙ্গ* বা *ভিক্খুবিভঙ্গ* বা

পরাজিকা, ২) *ভিক্খুণীবিভঙ্গ* বা *পাসিত্তি;* খ) *খন্ধক:* ৩) *মহাবগ্গ,* ৪) *চুল্লবগ্গ* এবং ৫) *পরিবার* বা *পরিবারপাঠ*। *সুত্তপিটক*-এর অন্তর্গত গ্রন্থগুলি হল – ক) *দীঘ নিকায়,* খ) *মজ্ঝিম নিকায়,* গ) *সংযুত্ত নিকায়,* ঘ) *অঙ্গুত্তর নিকায়* ও ঙ) *খুদ্দক নিকায়*। *খুদ্দক নিকায়* কয়েকটি ভাগে বিভক্ত – ১) *খুদ্দক পাঠ,* ২) *ধম্মপদ,* ৩) *উদান,* ৪) *ইতিবুত্থক,* ৫) *সুত্তনিপাত,* ৬) *বিমানবত্থু,* ৭) *পেতবত্থু,* ৮) *থেরগাথা,* ৯) *থেরীগাথা,* ১০) *জাতক,* ১১) *নিদ্দেস* (*মহানিদ্দেস* ও *চুল্লনিদ্দেস*), ১২) *পটিসম্ভিদামগ্গ,* ১৩) *অপদান,* ১৪) *বুদ্ধবংস* ও ১৫) *চারিয়াপিটক*। *অভিধর্মপিটক*-এর অন্তর্গত গ্রন্থগুলি হল – ক) *ধম্মসঙ্গণি,* খ) *বিভঙ্গ,* গ) *ধাতুকথা,* ঘ) *পুগ্গলপঞ্ঞত্তি,* ঙ) *কথাবত্থু,* চ) *যমক* ও ছ) *পট্ঠান*।

প্রাবন্ধিকের মতে বৌদ্ধেরা নাস্তিক, তাঁদের ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বরের উল্লেখ নেই। বৌদ্ধগ্রন্থের মধ্যে 'আদিবুদ্ধ' শব্দের উল্লেখমাত্র রয়েছে। কেউ কেউ তার অর্থ ঈশ্বর অনুমান করলেও তার অর্থ অতীতকল্পের দীপঙ্করপ্রমুখ বুদ্ধ বলেই মনে হয়। তত্ত্ববিদ ইমানুয়েল কাণ্ট (১৭২৪ – ১৮০৪) ও অগাস্টাস কোমৎ (কোঁত; ১৭৯৮ – ১৮৫৭) যে সকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, তার অধিকাংশ বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বলে প্রাবন্ধিক দাবি করেছেন। প্রাচীন শাস্ত্র আলোচনা করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক 'শোকে আপ্লুত' 'হৃদয়' নিয়ে লিখেছেন –

> যে যবন জাতি আমাদিগকে এক্ষণে অসভ্য অর্দ্ধশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, সেই জাতির পিতামহ গ্রীকগণ আমাদিগের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতেন। আমরা সেই আর্য্য জাতি। এবং ভারতবর্ষের মৃত্তিকা হইতে সকল জ্ঞান বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, কিন্তু সেদিন কোথায়! ... আমাদিগের সেই অসীম বুদ্ধবল কালের তরঙ্গে চিরকালের জন্য বিলীন হইয়া গিয়াছে।

রামদাস সেন 'বৌদ্ধ ধর্ম্ম' প্রবন্ধে অভিযোগ করেছেন যে বৌদ্ধাচার্যদের প্রণীত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও তাঁর সমকালীন অধিকাংশ চিন্তকেরা সেগুলি সম্পর্কে অবহিত নন। *প্রবোধচন্দ্রোদয়* নাটক এবং *সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ* মধ্যে যেটুকু বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় বিবরণটুকু জেনে, *ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী* এবং কিছু অংশ *কুসুমাঞ্জলি* পড়ে কোন কোন বাংলার নৈয়ায়িকরা বৌদ্ধমতে দোষারোপ করেছেন যা গভীর দুঃখের বিষয় বলে প্রাবন্ধিক মনে করেছেন। বৌদ্ধদের সংস্কৃত গ্রন্থগুলি অনেক কাল থেকেই দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। ঊনবিংশ শতকে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের যত্নে নেপাল থেকে অসংখ্য সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছিল। নেপালের বৌদ্ধেরা বলেন যে চুরাশি হাজার বৌদ্ধগ্রন্থ আছে। তার মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি নবধর্ম নামে খ্যাত – *অষ্ট সাহস্রিক, গণ্ডব্যূহ, দশভূমীশ্বর, সমাধিরাজ, লঙ্কাবতার, সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক, তথাগত*

গুহ্যক, ললিত বিস্তর, সুবর্ণ প্রভাস। বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থগুলি দ্বাদশ শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা – সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, নিদান, ইত্যুক্ত, জাতক, বৈপুল্য অদ্ভুত ধর্ম, অবদান, উপদেশ। কয়েকটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ, যেমন – *প্রজ্ঞাপারমিতা,* সারিপুত্রকৃত *অভিধর্ম,* দেবপুত্রকৃত *অভিধর্ম, ধর্মস্কন্ধপদ, কারণ্ডব্যূহ, ধর্মবোধ, ধর্মসংগ্রহ, সপ্ত বুদ্ধস্তোত্র, বিনয় সূত্র, মহান্য সূত্র, মহান্য সূত্রালঙ্কার, জাতকমালা, চৈত্য মাহাত্ম্য, অনুমান খণ্ড, বুদ্ধশিক্ষাসমুচ্চয়, বুদ্ধচরিত কাব্য, বুদ্ধকপালতন্ত্র, সঙ্কীর্ণতন্ত্র* প্রভৃতি। এইসকল গ্রন্থের কথা অনেক অনুসন্ধানের পর হজসন সাহেব নেপালি বৌদ্ধদের থেকে জেনেছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'জাতক ও অবদান' (*নারায়ণ,* শ্রাবণ, ১৩২৩) প্রবন্ধটি থেরবাদ ও মহাযান বৌদ্ধসাহিত্যের তো বটেই, বৌদ্ধদর্শন বুঝবার পক্ষেও অত্যন্ত জরুরি। বুদ্ধ সহজ ভাবে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন, তার জন্য অনেকসময়ে তিনি নিজের পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা দিয়ে সেগুলি ব্যাখ্যা করতেন যেগুলি জাতক নামে পরিচিত। জাতকের প্রভাব হীনযানে, পালিভাষায় অত্যন্ত বেশি। পালিভাষার গ্রন্থে ৫৫৫টি জাতক রয়েছে। এই সংখ্যা সর্ববাদীসম্মত নয়; কারো মতে ৫৫৫, কারো মতে ৫৫০, কারো মতে ৫২৫, কারো মতে ৫৩৫, কারো মতে ৫১৫। ব্রহ্মদেশে ৫১৫টি জাতক প্রচলিত; তার মধ্যে ১০টি বড়ো আর ৫০৫টি ছোটো। সংস্কৃতে আর্যসূর প্রণীত একটি *জাতকমালা* আছে, এতে ৩৪টি মাত্র জাতক রয়েছে। হীনযানের লোকেরাও সংস্কৃতে লিখতেন বলে এই গ্রন্থ হীনযান না মহাযানের তা নির্ণয় করা যায় না। বসুবন্ধু হীনযানে থাকাকালীন সময়ে সংস্কৃতে *অভিধর্ম্মকোষ* লিখেছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁর আগে থেকেই প্রচলিত গল্পগুলিকে নিজের পূর্বজন্মের গল্প বলে বর্ণনা করেছিলেন যা 'ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন সম্পত্তি'। জাতকের কাহিনি থেকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পূর্বে ভারতবর্ষের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, মনের ভাব জানতে পারা যায়।

মহাযানীদের জাতকের উপর ততটা আস্থা ছিল না। কারণ *জাতকমালা* ব্যতীত তাঁদের জাতকের আর কোন গ্রন্থ নেই। আবার *জাতকমালা* তাঁরা যখন পড়েন তখন তার নাম হয় *বোধিসত্ত্বাবদান* বা *বোধিসত্ত্বাবদানমালা*। *জাতকমালা*-র পুথিটি মহাযানীরা সংগীতের ছাঁচে ঢেলে মঙ্গলাচরণের পর তাতে 'এবং ময়া শ্রুতমেকাস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যাং বিজহার' বলে মুখপাত করেছেন অর্থাৎ আর্যশূরের গ্রন্থটিকে তাঁরা বুদ্ধবচন করে তুলেছেন। তাঁরা প্রথমত একটি নূতন জাতক দিয়ে আর্যশূরের ৩৪টি

জাতকের স্থানে ৩৫টি করে নিয়েছেন। মহাযানীরা জাতকের স্থানে ‘অবদান’ শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। মহাসাংঘিকদের প্রাপ্ত একটিমাত্র গ্রন্থে জাতকের অনেকগুলি গল্প আছে, সেগুলির নামও অবদান। অবদান অর্থে সংস্কৃতে মহৎ কাজ বোঝায়। মহাযানের অবদানে শুধু বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের কথা নয়, সম্রাট অশোকসহ আরো অনেক মহাপুরুষদেরই পূর্বজন্মের কথা আছে। সুতরাং অবদান শব্দ যতটা ব্যাপক, জাতক শব্দ ততটা ব্যাপক নয়। মহাযানে অবদানের অনেক গ্রন্থ আছে। আর্যশূরের *অবদানশতক*-এ ১০০টি অবদান আছে। *দিব্যাবদানমালা*-য় ৩৭টি ও *ভদ্রকল্পাবদান*-এ ৩৫টি অবদান আছে। *অশোকাবদান দিব্যাবদানমালা*-র গদ্যে লেখা একটি অবদান, কিন্তু *অশোকাবদান* নামে পদ্যে লেখা আরো একটি অবদান রয়েছে। *সুগতাবদান* আরেকটি অবদান গ্রন্থ। অবদানের শেষ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ খ্রিস্টিয় একাদশ শতকে কাশ্মীরের হিন্দু ব্রাহ্মণ কবি ক্ষেমেন্দ্রব্যাসদাসের লেখা ১০৮টি অবদান কাহিনি *বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা*।

হরপ্রসাদ প্রবন্ধে আর্যশূরের *জাতকমালা*-এর প্রথম ব্যাঘ্রী জাতক ও একটি *মহাবস্তুঅবদান*-এর পুণ্যবন্ত ও তাঁর বন্ধুদের অবদান নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বুদ্ধযানের ‘দলাদলি’র স্বরূপ ও পরিণতি

অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ ‘বুদ্ধদেব ও তদুদ্ভাবিত ধর্ম্ম-প্রণালী’, রামদাস সেনের ‘বৌদ্ধ ধর্ম্ম’ ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘দলাদলি’ (*নারায়ণ*, কার্তিক, ১৩২৩) তিনটি প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্মের আদর্শগত মতভেদের ইতিহাসের অনুসন্ধান করা হয়েছে।

‘বুদ্ধদেব ও তদুদ্ভাবিত ধর্ম্ম-প্রণালী’ প্রবন্ধে বৌদ্ধদের চারটি সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্ত্রিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিকদের মতে জগতে কিছুই নেই, সকলই শূন্য। যে সকল পদার্থ স্বপ্নে দেখা যায়, জেগে তার কিছুই দেখা যায় না, আবার যে সকল বস্তু জেগে দেখা যায়, স্বপ্নে দেখা যায় না। আর সুষুপ্তিকালে কোন বস্তুই মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর হতে পারে না। এর দ্বারা মাধ্যমিকরা প্রতিপন্ন করেন যে কোন বস্তুই সত্য নয়, সত্য হলে তা সকল অবস্থায় দেখা যেত। যোগাচারমতে বাহ্যবস্তু মাত্রেই অলীক, কেবল ক্ষণিক-বিজ্ঞান-রূপ আত্মাই সত্য। এই বিজ্ঞান দুইপ্রকার – জাগা ও সুপ্ত অবস্থায় জন্মানো জ্ঞান প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, আর সুষুপ্তিদশায় জন্মানো জ্ঞান আলয়বিজ্ঞান।

সৌত্রান্ত্রিকেরা বাহ্য পদার্থকে সত্য ও অনুমানসিদ্ধ আর বৈভাষিকেরা বাহ্যবস্তু সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলে স্বীকার করেন। বৌদ্ধমতে বাক্, পাণি, পাদ, গুহ্য ও লিঙ্গ – এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়; নাক, জিব, চোখ, ত্বক ও কান – এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর মন, বুদ্ধি – এই দুটি উভয়েন্দ্রিয়। এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়ের অধীন বলে দেহকে দ্বাদশায়তন বলে। সকল বৌদ্ধমতে এই দ্বাদশায়তন দেহের পূজা করাই প্রধান ধর্ম। সকল সংস্কার ক্ষণস্থায়ীমাত্র – এইরকম স্থির বাসনার নাম মার্গতত্ত্ব। এই মার্গতত্ত্বই বৌদ্ধদের মোক্ষ। চর্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্বাহ্নে ভোজন, সমুহাবস্থান ও রক্তাম্বর – এই কয়েকটি বৌদ্ধদের যতিধর্মের অঙ্গরূপ।[৩৪]

‘বৌদ্ধ ধর্ম্ম’ প্রবন্ধে *বোধিচিত্ত বিবরণ* বৌদ্ধগ্রন্থের প্রণেতা ধর্মকীর্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে বুদ্ধের বহুতর শিষ্যের মধ্যে সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক এই চারজন শিষ্যই সেই ধর্মের আচার্য। উক্ত সৌত্রান্তিক প্রভৃতি শব্দগুলি এইস্থানে নামমাত্র বোধক কি তা শাস্ত্রপ্রস্থানবোধক স্থির করা যায় না।[৩৫] উক্ত চারজন শিষ্য থেকেই বৌদ্ধধর্মের মতভেদ উপস্থিত হয়েছিল, নয়তো বুদ্ধের উপদেশ কখনোই বিভিন্ন মতাক্রান্ত নয়।

‘দলাদলি’ প্রবন্ধে বৌদ্ধ দলাদলির গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করে বলা হয়েছে যে বৌদ্ধধর্মের দলাদলির ফলেই ধর্মের উন্নতি হয়েছিল। থেরবাদী এবং মহাসাংঘিকেরা ধর্মপ্রচারের জন্য উত্তরে আর দক্ষিণে গিয়ে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের ধর্মপ্রচারের জন্য দলাদলির ইতিহাস জানা জরুরি। পালি দশবত্থু বা সংস্কৃত দশবস্তু অর্থাৎ দশটি বস্তু নিয়ে দলাদলির সূত্রপাত হয়েছিল। দশবস্তু হল – ১) কপ্পতি সিঙ্গিলোণ কপ্পো, ২) কপ্পতি দ্বঙ্গুল কপ্পো, ৩) কপ্পতি গামান্তর কপ্পো, ৪) কপ্পতি আবাসকপ্পো, ৫) কপ্পতি অনুমতি কপ্পো, ৬) কপ্পতি আচিণ্ণ কপ্পো, ৭) কপ্পতি অমথিত কপ্পো, ৮) কপ্পতি জলোগি কপ্পো, ৯) কপ্পতি অদসকং নিসীদনং ও ১০) কপ্পতি জাতরূপ রজতন্তি। দশবস্তু[৩৬] সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর একশো বছর পর বৈশালীর বজ্জিবংশীয় ভিক্ষুরা প্রধাণত এই দশবস্তু চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। যশ নামের একজন ভিক্ষু বৈশালীতে এসে উপস্থিত হয়ে দশবস্তু চালানোর চেষ্টাকে ধর্মবিরুদ্ধ বলেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বৈশালীতে এগারোশো নব্বই হাজার ভিক্ষুর উপস্থিতিতে রেবতস্থবির বিরুদ্ধবাদীদের সামনেই ‘উব্বাহিকা’ করে সমস্যার নিস্পত্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। শতবর্ষ

অতিক্রমকারী আটজন ভিক্ষু যাঁরা বুদ্ধকে দেখেছিলেন, তাঁরা সকলেই দশবস্তুর বিরুদ্ধে মত প্রচার করেছিলেন। এই মত গ্রহণকারীরা স্থবির বা থেরবাদী নামে এবং বিরুদ্ধবাদীরা মহাসাংঘিক নামে পরিচিত হয়েছিলেন। এইভাবেই বৌদ্ধধর্ম দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

মহাসাংঘিক ও থেরবাদের দার্শনিকপ্রস্থান: যোগাযোগ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেরবাদ ও মহাযান বিষয়ে নানা প্রবন্ধের মধ্যে আলোচনা করেছেন। তিনি মহাসাংঘিককে থেরবাদ থেকে মহাযানের সংযোগ পর্ব বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি 'মহাসাংঘিক মত' (*নারায়ণ,* মাঘ, ১৩২৩) ও 'থেরাবাদ ও মহাসাংঘিক' (*নারায়ণ,* চৈত্র, ১৩২৩) প্রবন্ধ দুটিতে এই দুই দার্শনিক প্রস্থান সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছেন।

'মহাসাংঘিক মত' প্রবন্ধে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের সময় নিয়ে মতান্তর রয়েছে। সিংহলবাসীদের মতে, বুদ্ধদেব ৫৪৩ খ্রিস্টপূর্বে এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে তিনি ৪৮৩ খ্রিস্টপূর্বে নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তার একশো বছর পর সপ্তপর্ণী গুহায় সংঘস্থবির মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে ভিক্ষুরা অভ্যন্তরীণ গোলোযোগ মিটিয়ে নেন। ৩৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দশবস্তু নিয়ে দলাদলি হয়েছিল। থেরবাদীরা বলেন যে তাঁদের পক্ষে ১১,৯০,০০০ ভিক্ষু আর বৈশালীর ভিক্ষুদের পক্ষে ১০,০০০ ভিক্ষু ছিলেন। বৈশালীর ভিক্ষুদের পক্ষে এত কম ভিক্ষু ছিলেন, অথচ তাঁরা পরে 'মহাসাংঘিক' নাম নিলেন এই যুক্তি মানতে না চেয়ে প্রাবন্ধিক প্রশ্ন তুলেছেন যে এত কম হলে তাঁরা 'মহাসাংঘিক' নাম নিলেন কোন্ সাহসে? আর অশোকের আগে এগারো লক্ষ ভিক্ষু থাকাও সম্ভব নয়। তাঁর মতে, সংখ্যায় বিরুদ্ধদল বড়ো হলেও বয়স, বিজ্ঞতা, বিদ্যা, বুদ্ধি, পসার-প্রতিপত্তিতে থেরবাদীরা বড়ো ছিলেন। থেরবাদীদের ইতিহাস পালিগ্রন্থে পাওয়া গেলেও মহাসাংঘিকদের ইতিহাস নেই বললেই চলে। চীনদেশে প্রাপ্ত ইতিহাস কনিষ্কের সময় থেকেই বিশ্বাসযোগ্য, কারণ তাঁর সময়েই চীনে প্রথম বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৩ থেকে খ্রিস্টাব্দ ৭৮ পর্যন্ত মহাসাংঘিকদের ইতিহাস অন্ধকারময়। অশোকের রাজত্বের সতেরো বছরে পাটলিপুত্রের সংগীতির অস্তিত্ব মহাসাংঘিকরা স্বীকার করেন না। আবার কনিষ্কের সময় জলন্ধরে যে সংগীতি হয় তার অস্তিত্ব থেরাবাদীরাও স্বীকার করেন না। খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৩ থেকে অশোকের সময়ের সংগীতি পর্যন্ত মহাসাংঘিকরা ছয়টি এবং থেরাবাদীরা বারোটি দলে মোট আঠারোটি দলে তাঁরা বিভক্ত

হয়েছিলেন। অশোকের অনুগ্রহে থেরবাদীরা প্রবল হয়ে উঠলে মহাসাংঘিকেরা সম্ভবত চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কাণ্ডারী শুঙ্গ গোত্রের সামবেদীয় ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্র বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করেন। এই অত্যাচার থেকে মহাসাংঘিকেরা অনেকটা রক্ষা পেয়েছিলেন। আবার থেরবাদীদের অত্যাচারেও মহাসাংঘিকেরা কিছুটা হিন্দুদের দিকে ঢলে পড়েছিলেন। তাঁরা 'মহাবস্তু' বুদ্ধদেবকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলে মনে করতেন। বুদ্ধদেব আশি বছর বেঁচেছিলেন তাঁরা তা অস্বীকার করে বলেন যে তিনি কোন অনির্বচনীয় ভাবে রয়েছেন। তাঁরাই প্রথম বুদ্ধমূর্তির নির্মাণ করে বিহারে স্থাপিত করেছিলেন। তাঁদের পুথিপাজি সংস্কৃত-মিশ্রিত ভাষায় লেখা হত। থেরবাদীরা বিনয়ের কঠোর অনুশাসন ও বিশুদ্ধমার্গে আর মহাসাংঘিকেরা দর্শনশাস্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন। মহাসাংঘিকদের মতে, প্রথমে ভিক্ষুদের জন্য বিনয় জরুরি, কিন্তু চরিত্র ও কর্মবলে কিছুদূর এগোলে তাঁরা এমন স্থানে উপস্থিত হন যে কর্ম, চরিত্র, বিনয়ে তাঁদের কোনো সাহায্য হয় না, তখন স্বতন্ত্র উপায় ও উপকরণে জ্ঞান প্রয়োজন হয়।

বুদ্ধদেব 'লোকোত্তর' কিনা সেই বিষয়ে থেরবাদ ও মহাসাংঘিকদের মধ্যে তর্ক ছিল এবং তা মহাসাংঘিক ধর্মের উৎপত্তির অন্যতম কারণ বলে প্রাবন্ধিক মতপ্রকাশ করেছেন। থেরাবাদীরা বুদ্ধকে মানুষ ভাবলেও মহাসাংঘিকরা তাঁকে 'লোকোত্তর' মানায় মহাসাংঘিকদের অন্য নাম লোকোত্তরবাদী। *মহাবস্তু* অনুযায়ী, 'অর্ঘ্যমহাসাজ্ঘিকানাং লোকোত্তরবাদিনাং পাঠেন' ইত্যাদি। বুদ্ধদেব তাঁদের মতে আশ্রব অর্থাৎ দোষশূন্য, অহংবুদ্ধিশূন্য, অজ্ঞানশূন্য এবং জন্ম-মৃত্যুর অতীত ছিলেন। থেরাবাদীরা মানুষ বুদ্ধদেবকে কখনো 'লোকোত্তর' বলে দাবি করেননি। বুদ্ধ অলৌকিক শক্তি লাভ করে পরমার্থিক সত্য আবিষ্কার করেননি, তিনি তা জন্মান্তরের সুকৃতির ফলেই লাভ করেছিলেন, শিষ্যদের তা উপদেশ দিতেন। অন্যদিকে মহাসাংঘিকদের মতে, বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়ে এবং কাজে নিরন্তর লোক উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করতেন। বুদ্ধের উপদেশ, সূত্রান্তের গভীর ভাব, উপদেশ, গূঢ় তত্ত্বকথা সাধারণ মানুষের মনে সে ভাব ধারণা করা, গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।

'থেরাবাদ ও মহাসাংঘিক' প্রবন্ধে সংস্কৃত 'নিদান' শব্দের অর্থ আদি কারণ, মূল কারণ, একেবারে গোড়া। বুদ্ধদেবের নিদান অনুসন্ধান কালে পূর্ব পূর্ব জন্মে বুদ্ধ হওয়ার জন্য কী কী করেছিলেন তার অনুসন্ধান করা হয়। এই বুদ্ধনিদান সম্বন্ধে থেরবাদী ও মহাসাংঘিকদের বিশেষ মতান্তর ছিল। থেরবাদীরা

চব্বিশজন বুদ্ধকে মানেন।[৩৭] এঁদের মধ্যে যাঁরা শাক্যমুনি বুদ্ধ হবেন বলে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, তাঁরাই শাক্যমুনি বুদ্ধের নিদান।[৩৮] চব্বিশ জনের শেষ বুদ্ধ কাশ্যপ তাঁর শিষ্য জ্যোতিষ্পাল ভবিষ্যতে শাক্যমুনি বুদ্ধ হবেন বলেছিলেন। এটিই থেরাবাদী শাক্যসিংহের নিদান। চব্বিশ সংখ্যার কারণ জানা না গেলেও প্রাবন্ধিক অনুমান করেছেন যে সেকালে এই সংখ্যাটি খুব লোকপ্রিয় ছিল।[৩৯]

মহাসাংঘিকদের মতে বুদ্ধনিদান অন্যরকম। তাঁদের মতে বোধিসত্ত্বদের চারপ্রকার চর্যা (আচারে) অনেক জন্ম-জন্মান্তর চলে যায়। থেরবাদীরা যা বলেছেন তা চর্যার শেষ অংশমাত্র, আগের তিনটি চর্যার নামও এতে নেই। চারটি চর্যা হল – ক) প্রকৃতিচর্যা, খ) প্রণিধানচর্যা, গ) অনুলোমচর্যা ও ঘ) অনিবর্তনচর্যা।[৪০] থেরবাদীদের নিদান[৪১] এই ব্যাকরণ থেকে সূচিত হয়েছিল তা একপ্রকার শেষ চর্যার নিদান। অন্যদিকে মহাসাংঘিকদের চারটি চর্যায় অসংখ্য নিদান ছিল।

মহাবস্তু অবদান-এর 'নিদাননমস্কারাণি সমাপ্তানি' অনুচ্ছেদে কয়েকটি নিদানের নাম রয়েছে। এই গ্রন্থের মূল গদ্যে, মূল পদ্যে বা গাথায় অনেক বুদ্ধের নাম আছে। কথায় কথায় মহাসাংঘিকেরা তিন কোটি, চার কোটি, নব্বই হাজার, কুড়ি হাজার, চুরাশি হাজার বুদ্ধের নাম করেছেন। কোটি কোটি কল্পের উল্লেখ মহাযানীরা মহাসাংঘিকদের ঐতিহ্য থেকে পেয়েছিলেন। হরপ্রসাদ আলাপচারী ভঙ্গিমায় একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন –

> সমিতাবী নামে একজন বুদ্ধ দেখিলেন, আমি নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে, এককল্প দু কল্প কোনো বুদ্ধ হইবেন না, সহস্র কল্পের পরে বুদ্ধ হইবেন। কিন্তু এত কাল ধরিয়া তো বুদ্ধ-কার্য হওয়া চাই। বুদ্ধ হইবে না; তো, কে করিবে? অতএব আমাকেই থাকিতে হইল। তিনি শত সহস্র কল্প রহিলেন। পূর্বে বলিয়াছিলেন, সহস্র কল্পের পর বুদ্ধ হইবেন, এখন শত সহস্র কল্প রহিয়া গেলেন! মাঝের ও শতটা যেন কিছুই নয়!

আরেকটি বিষয়ে থেরাবাদ ও মহাসাংঘিকদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। পালি *জাতক*-এ বুদ্ধদেবের নিদানের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। *মহাবস্তু*-তে সেগুলি একত্রে একটা ধারা বেঁধে লেখা, কালের বিচারে লম্বা-চওড়া হলেও কালানুক্রমিক ভাবে সাজানো হয়েছে। থেরবাদীরা 'বুদ্ধায় নমঃ' বললেও এঁরা এক বুদ্ধকে নমস্কার করে তুষ্ট নন, তাঁরা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালে যত বুদ্ধ হয়েছেন, হবেন ও হচ্ছেন, সকল বুদ্ধকে নমস্কার করছেন। থেরবাদীরা চব্বিশ ও দুই (শাক্যসিংহ ও মৈত্রেয়) এই ছাব্বিশ জনে সন্তুষ্ট হলেও মহাসাংঘিকেরা ছাব্বিশকোটিনিযুতশতসহস্রেও সন্তুষ্ট নন। প্রাবন্ধিক মহাসাংঘিকদের দৃষ্টান্ত দিয়ে

একটি অনুচ্ছেদেই সাতানব্বইটি নাম দেখিয়েছেন। প্রাবন্ধিক এই প্রবণতা অনুযায়ী থেরবাদী ও মহাসাংঘিকদের পার্থক্য দেখিয়ে থেরাবাদীদের ভারতবর্ষ থেকে অবলুপ্তির কারণ নির্দেশ করেছেন –

> ... লম্বা হাতে নাম বাড়াইতে মহাসাংঘিক মহাশয়েরা খুব মজবুত। ইঁহাদের সঙ্গে গরিব থেরাবাদীরা পারিবে কেন? কাজেই ক্রমে তাঁহাদিগকে ভারত ছাড়িতে হইয়াছে।

বৌদ্ধদর্শনে পারস্পরিক সম্পর্ক: মানুষ ও রাজা আর ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ

মূল বৌদ্ধদর্শন ঈশ্বর সম্পর্কে নীরবতা বা উপেক্ষা দেখানোয় অধিকতর আগ্রহী এবং এই দর্শন সম্পূর্ণ মানবকেন্দ্রিক। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু, পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয় বাস্তব যুক্তিগ্রাহ্য ভাবেই এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ’ (*বঙ্গদর্শন*, শ্রাবণ, ১২৮৪) ও ‘মানুষ ও রাজা’ (*নারায়ণ*, বৈশাখ, ১৩২৪) প্রবন্ধ দুটিতে বৌদ্ধদর্শনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ক) ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ

প্রাবন্ধিক মৌর্যবংশের সময়কাল থেকে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। মৌর্যবংশের অধিকারকালে অশোকের সময়ে সভ্য ভারতের অধিকাংশ লোকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় ব্রাহ্মণেরা ক্ষমতা হারিয়েছিল। বৌদ্ধদের সঙ্গে সংগ্রামে বহু শতাব্দী পরে ব্রাহ্মণ কী উপায়ে জয়লাভ করেছিল তা প্রবন্ধে বিশ্লেষিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের গৌরবের প্রথম দিকে উচ্চস্তরের দার্শনিক মতগুলি চারদিকে প্রচারিত হওয়ার সময় বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল। বুদ্ধদেবের ব্যক্তিত্ব, নিঃস্বার্থ প্রাণি হিতৈষিতা প্রভৃতি দর্শন এবং তৎকালীন সামাজিক অবস্থাও বৌদ্ধধর্মের উন্নতির কারণ হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা প্রধানত তিন দলে বিভক্ত ছিলেন – ১) একদল মঠে থেকে ভিক্ষাবৃত্তি করে বুদ্ধত্বলাভের জন্য ধ্যান-ধারণায় রত থাকতেন। এঁদের জ্ঞানের উন্নতি অবনতিক্রমে ভিক্ষু, অর্হৎ, বোধিসত্ত্ব নাম হত। ২) শ্রাবকদল বিষয়ী লোকদেরকে ধর্মশিক্ষা দিতেন। তাঁরা কোন প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত হয়ে ধর্ম, নীতি, বিনয় প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। ৩) বৌদ্ধরা সাধারণ লোকেদের ধর্মশিক্ষার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা স্ত্রীলোকদের ধর্মপ্রচার করতে এবং তাঁদেরকে মঠের মধ্যে স্থান দিতেন। বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীলোকদের পক্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম একপ্রকার নিষিদ্ধ থাকায় বৌদ্ধধর্ম তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল।

ইতর সাধারণেরা যে ধর্ম অবলম্বন করেন সেই ধর্মের গৌরবই বেশি। বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম, তা যেকোন জাতির লোককেই উন্নত পদ দিতে আগ্রহী। যেমন – বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্যমণ্ডলীতে রাহুল ক্ষত্রিয়, কশ্যপ ব্রাহ্মণ, কাত্যায়ন বৈশ্য এবং উপালি শূদ্র ছিলেন। বৌদ্ধদের প্রথম ধর্মসভায় বুদ্ধ উপালিকে বিনয়ধর্ম প্রচারের প্রকৃত উপযুক্ত পাত্ররূপে মনোনীত করেছিলেন। প্রাবন্ধিক এর কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন –

> বিনয়ধর্ম সাধারণ লোকদিগের জন্য। বুদ্ধদেব বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন শূদ্রদিগের দ্বারাই তাঁহার মত সাদরে গৃহীত হইবে এবং তাহার জন্য একজন শূদ্রই বিশেষ উপযুক্ত।

বৌদ্ধধর্মকে রোধ করার জন্য ব্রাহ্মণদের কৌশল সম্বন্ধে হরপ্রসাদ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেগুলি হল –

১) ভারতের পশ্চিমাংশই ব্রাহ্মণদের প্রধান স্থান। বৌদ্ধদের ক্ষমতাপ্রাপ্তিতে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তাঁরাও সাধারণ লোকদের দলে টেনেছিলেন। যেখানে বৌদ্ধদের ক্ষমতা প্রবল হয় নি সেখানে গিয়ে স্মৃতি উপদেশ দিয়ে, অনার্যদের দেবতাকেও নিজেদের দেবতারূপে গ্রহণ করে, নিরাকার উপাসনার বদলে সাকার ঈশ্বরের রূপকল্পনা গ্রহণ করে দলবৃদ্ধি করেছিলেন।

২) অনার্যদের ব্রাহ্মণ্যধর্মে দীক্ষিত হওয়ার প্রমাণ পঞ্চমবর্ণ পাওয়া যায় – অন্ত্যজ বা নিষাদ। অন্ত্যজদের উপর ব্রাহ্মণদের ঘৃণা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদের 'একটু জাত্যভিমান' জন্মানোয় তারা সেখানেই থেকে গিয়াছিল।

৩) ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৌত্তলিকতা নিম্নবর্ণের মানুষকে কাছে টেনেছিল।

৪) অশিক্ষিত লোকেদের পক্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বর, সুখ ও উৎসবের সংস্কার যতটা সুবিধাজনক, বৌদ্ধধর্ম তার অভাব দেখা যায়।

৫) ব্রাহ্মণেরা উপনিষদ প্রভৃতিতে 'নিঃশ্রেয়স' লাভের উপায় না দেখে বৌদ্ধদের জ্ঞানধর্মী নির্বাণের বিপরীতে ভক্তিমার্গ প্রচার করে নাস্তিক্য নিবারণ করেছিলেন।

৬) বৌদ্ধদের ধর্মব্যাখ্যা অপেক্ষা হিন্দুদের পুরাণ পাঠের 'মোহিনী শক্তি' বেশি ছিল। বৌদ্ধদের 'দান' ভাবনার কুফল রূপে বলিরাজার পুরাণকাহিনি ইত্যাদি প্রচার করে অশিক্ষিতদের হিন্দুমতে আকর্ষণ করার বিশেষ সুবিধা হয়েছিল।

৭) সংসারত্যাগী ভিক্ষুরাই বৌদ্ধধর্মের প্রচারক আর ব্রাহ্মণদের কাছে ধর্ম তাঁদের যজমানি বৃত্তির জীবনোপায় স্বরূপ। একদিকে সাধনার জন্য 'উৎকট পরিশ্রম' আর অন্যদিকে 'সম্পূর্ণতা' – এটি প্রচার করে ব্রাহ্মণ্যধর্ম সুবিধা লাভ করেছিল।

৮) ব্রাহ্মণদের সম্পূর্ণ বিনাশ না করে ধর্ম বিষয়ে উৎকট পরিশ্রমী ভিক্ষুদের বেছে বেছে বিদেশে পাঠানোর ফলে ব্রাহ্মণদের ধর্মপ্রচারে বিশেষ সুবিধা হয়েছিল।

৯) বৌদ্ধধর্মের প্রচারকালে শুধু যে ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই তাঁদের বিরোধ ছিল তা নয়, অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গেও ছিল। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের দুশো বছর পর বৌদ্ধদের মধ্যে আলাদা আলাদা দল হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুদল একতাসূত্রে গ্রথিত, হিন্দুধর্মের অজস্র দল থাকা সত্ত্বেও তাঁরা রাজনৈতিক সূত্রে আবদ্ধ। বৌদ্ধধর্মে তা ছিল না।

১০) কানিংহাম বলেছেন সেকন্দর শাহের সময় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের তুল্য সম্মান ছিল। খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে অযোধ্যায় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের মধ্যে ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধে প্রায় পঞ্চাশ বছর পর শ্রমণের জয় হয়েছিল। ফা হিয়েনের সময় দুই-ই সমান; বৌদ্ধেরা 'যেন একটু বেশি'। হিউয়েন সাঙের সময় বিহারের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। অনেক বৌদ্ধ সংসারী হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন, জনসাধারণ বিহারবাসীদের ভিক্ষা দিতে সম্মত ছিলেন না। শঙ্করাচার্য ও তাঁর শিষ্যেরা দার্শনিক খ্যাতিসম্পন্ন মঠবাসীদের সঙ্গে বিচার করে অনেককে শুদ্ধাদ্বৈতমতে নিয়ে এসে বৌদ্ধবিহারগুলিকে হিন্দু মন্দিরে পরিণত করেছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের বহুল প্রচারের সময় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ দর্শনের চর্চা ধ্বংস হয়েছিল। উদয়নাচার্যের *আত্মতত্ত্ববিবেক* বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে লিখিত শেষ গ্রন্থ হলেও তখনো বৌদ্ধধর্ম নির্মূল হয়ে যায় নি। *প্রবোধচন্দ্রোদয়* ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে তার স্মৃতি দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম প্রচার সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাজারা (যেমন – অজাতশত্রু), মতবিরুদ্ধ সন্ন্যাসী (যেমন – দেবদত্ত) বৌদ্ধদের উৎপীড়ন করেছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের শেষ পর্যায়ে দেখতে পাওয়া যায় বৌদ্ধরাই উৎপীড়ক। কানিংহামের *The Ancient Geography of India* (১৮৭১) গ্রন্থের দৃষ্টান্তে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন যে সপ্তম শতাব্দীতে অনেক বৌদ্ধ রাজারাই উৎপীড়ক।

ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিলয় সম্পর্কে হরপ্রসাদ অনুমান করেছেন যে সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে নানাপ্রকার নূতন নূতন ধর্মের উৎপত্তি হওয়ায় বৌদ্ধধর্মের শেষ স্মৃতিটুকু বিলুপ্ত হয়েছিল। আমরা প্রবন্ধের শেষ দুটি অনুচ্ছেদের শেষ পঙক্তিগুলিকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি –

ক) এখন আবার বৌদ্ধদিগকে সমাদর করিতে শিখিয়াছি।

খ) বৌদ্ধেরা এদেশে না থাকুক আমরা যদি প্রণিধান করিয়া দেখি তাহাদের ধর্ম তাহাদের আচার আমাদের নিত্য কর্মমধ্যে নিত্যই দেখিতে পাই।

খ) মানুষ ও রাজা

পৃথিবীর সকল দেশেই, পৃথিবীর উৎপত্তি, মানুষের জন্ম কীভাবে হল তা নিয়ে বাদানুবাদ হয়ে থাকে। বুদ্ধদেব সৃষ্টি ও স্রষ্টার কথা সম্পর্কে কোথাও স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি।

মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে মহাসাংঘিকদের মত পরে পালিভাষায় প্রচারিত হয়েছিল। তাঁদের মতে, অনাদিকাল থেকেই 'সম্বর্ত' (প্রলয়) ও 'বিবর্ত' (সৃষ্টি) চলছে। প্রলয় হয়ে গেলে সমস্ত সত্ত্ব (জীব) 'আভাস্বর' নামে এক স্বর্গে উৎপন্ন হয়। আবার সৃষ্টি ও লোকের থাকবার স্থান হলে কতগুলি 'সত্ত্ব' 'আভাস্বর' থেকে নেমে পৃথিবীতে উৎপন্ন হন। তখন তাঁরা 'স্বয়ংপ্রভ', 'অন্তরীক্ষচর', 'মনোময়', 'প্রীতিভক্ষ্য', 'সুখস্থায়ী' ও 'কামচর' এবং তাঁদের কৃত কর্ম ধর্ম নামে পরিচিত হয়। ক্রমে পৃথিবীর উৎপত্তি, মানুষের জীবনধারণ ইত্যাদি বিষয় এখানে বর্ণিত হয়েছে। যখন ধানের অধিকারকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে চুরি, মিথ্যাকথা ও শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছিল, তখন সকলের সম্মতিক্রমে একজন বলবান লোককে সকলের ফসলের অংশের বিনিময়ে ক্ষেতরক্ষার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন যিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে সকলের প্রাপ্য ফসল ভাগ করে দেবেন। সকলের সম্মতিক্রমে তিনি রাজা[৪২] হওয়ায় তাঁর নাম মহাসম্মত হয়েছিল। সেই 'ক্ষেতওয়ালা'ই রাজা, ফসলের ছয়ভাগের একভাগ তাঁর পারিশ্রমিক। *মহাবস্তু অবদান* গ্রন্থে বুদ্ধদেবের জন্মকথা উপলক্ষে এই বৃত্তান্তটি দেওয়া হয়েছে। এই মহাসম্মতের অনেক পুরুষ পরে ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর অনেক পুরুষ পরে শুদ্ধোদন, শুদ্ধোদনের পুত্র বুদ্ধদেব। হরপ্রসাদ এই আখ্যানকে 'প্রাচীন' বলেই মনে করেছেন।

দীঘ নিকায়-এর 'অগ্‌গিঞ্ঞ সুত্ত' বা অগ্রণ্যসূত্র[৪৩], অর্থাৎ সকলের অগ্রবর্তীর বিষয়ে একটি আখ্যান রয়েছে। থেরবাদীরা এই গল্পটি স্বয়ং বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত বলেছেন। বুদ্ধদেবের বাশিষ্ঠ-ভরদ্বাজ

নামের একজন ভিক্ষুশিষ্য ব্রাহ্মণের ছেলে বলে মনে মনে গর্ব করতেন। তাই বুদ্ধদেব একদিন তাঁকে এই গল্পটি শুনিয়ে বলেন – ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য নন, ভিক্ষুই অগ্রগণ্য। প্রাবন্ধিক ‘বাশিষ্ঠ-ভরদ্বাজ’ একজন শিষ্যের কথা বললেও *দীঘ নিকায়*-এ বাসেট্‌ঠ এবং ভরদ্বাজ দুইজন বুদ্ধের ব্রাহ্মণ শিষ্যের কথা পাওয়া যায়।[৪৪] প্রাবন্ধিক লিখেছেন যে *মহাবস্তু অবদান*-এর রাজবংশের আদি অধ্যায়টি ও ‘অগ্রণ্য সূত্র’টি পাঠ করলেই মনে হবে যে *মহাবস্তু* দেখেই এই সূত্রটি তৈরি হয়েছিল। রাজা সকলের সম্মতি অনুসারে খেত আগলাবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। খেত আগলাবার কারণ *মহাবস্তু*-তে সূত্রানুসারে রয়েছে, পালিসূত্রের মতো কোন অবান্তর কথা বা ‘বাজে কথা’ (স্ত্রীপুত্রের মার খেয়ে বনে পালানো, ক্রমে বনে তাঁদের বাস, বনে গ্রাম নগরের পত্তন ইত্যাদি) না থাকায় প্রাবন্ধিক সিদ্ধান্তে এসেছেন –

> ‘মহাবস্তু’ দেখিয়াই সূত্র প্রস্তুত হইয়াছে। আরো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র চারি বর্ণের কথা, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ বড়ো কিনা, এ-সকল কথার মীমাংসা কি এ গল্পের দ্বারা হইতে পারে, এ যেন গণেশের মাথায় গজমুণ্ড দেওয়া। ভাষা দেখিলেও বোধ হয়, ‘মহাবস্তু’ আগে ও সূত্রটি তাহার পরে।

রাজা ঈশ্বরের অংশ – এই মতটি অধিকাংশ দেশে প্রচলিত হলেও এখনকার দিনে অবস্থাটা উল্টো দাঁড়িয়েছে যা বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকদিন ধরে প্রচলিত ছিল। খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর দার্শনিক চন্দ্রকীর্তির বক্তব্য উদ্ধার করে প্রাবন্ধিক প্রবন্ধটির সমাপ্তি টেনে লিখেছেন –

> গণদাসস্য তে গর্ব্বঃ ষড়্ভাগেন ভৃত্যস্য কঃ।
>
> “তুমি তো দেশের লোকের দাস। ফসলের ছয় ভাগের একভাগ মাহিনাই তোমার জীবিকা। তুমি আবার গুমর করো কী?”

বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের সম্পর্ক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় প্রথম তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিতে আলোচনা সূচিত হয়েছিল। এখানে প্রকাশিত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের ‘গণেশ পুরাণ ও বৌদ্ধধর্ম্ম’ (মাঘ, ১২৭৩), ‘বিষ্ণুপুরাণ ও বৌদ্ধধর্ম্ম’ (বৈশাখ, ১৩০৪), ‘বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম্ম’ (ভাদ্র, ১৩২৬); গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থের ‘হিন্দু ও বৌদ্ধ’ (বৈশাখ, ১৩৩৫) প্রভৃতি প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্মের আলোচনা রয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত’ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ – অগ্রহায়ণ, ১৩০৬ এবং বৈশাখ, ১৩০৭) প্রবন্ধমালায়

ভারেতের অতীত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দার্শনিক প্রস্থান অনুযায়ী দুই ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছে।

ক) বৌদ্ধদর্শন ও হিন্দুদর্শন

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'মসলা বাঁধা কাগজ' (*জ্ঞানাঙ্কুর* মাঘ, ১২৮০) প্রবন্ধের 'ধর্ম্ম কী?' অংশের একটিমাত্র স্থানে প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধধর্মের কথা উল্লিখিত হয়েছে। প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে 'উপাসনা মনুষ্যের ধর্ম্ম' হওয়ায় মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরোপাসনায় চলে। জড়োপাসনা থেকে যেমন একেশ্বরবাদ সমুদ্ভূত হয়, তেমনি একেশ্বরবাদ থেকে পৌত্তলিকতার জন্ম হয়। প্রাচীন ভারতে বেদান্তের পর পৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। সেইভাবে বৌদ্ধধর্মের অনেকাংশ পৌত্তলিকতায় পরিণত হওয়ার পিছনে মানুষের 'পরোপাসনা'র প্রতিই লেখক ইঙ্গিত করেছেন।

রামদাস সেনের 'বৌদ্ধ ধর্ম্ম' ও অস্বাক্ষরিত 'বুদ্ধদেব ও তদুদ্ভাবিত ধর্ম্ম-প্রণালী' প্রবন্ধ দুটিতে জানানো হয়েছে যে আকবরের আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণদের দিয়ে আবুল ফজল বহু অনুসন্ধানের পরও একটি বৌদ্ধসূত্রও উদ্ধার করতে পারেন নি। 'বুদ্ধদেব ও তদুদ্ভাবিত ধর্ম্ম-প্রণালী' প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে হিন্দুদের প্রবল অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে বৌদ্ধেরা বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এই কথা কোন মতেই সঙ্গত নয়, কারণ বিধর্মীদের প্রতি অত্যাচার করা কখনোই হিন্দুদের স্বভাব নয়। সম্ভবত বৌদ্ধ পুরোহিতদের আলস্য ও ঔদাস্যই বৌদ্ধধর্ম বিলোপের 'একমাত্র কারণ' বলে প্রবন্ধে মতপ্রকাশ করা হয়েছে। আমরা মনে করি, ফজলের সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে কোন বৌদ্ধ ছিল না তা ঠিক নয়, তা নানা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। ধর্মীয় অসূয়া ভারতে ছিল যা হিন্দু-বৌদ্ধ উভয়ক্ষেত্রেই সত্যি, কাজেই বৌদ্ধদের উপর হিন্দুদের অত্যাচারের দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে। হিন্দু ভাবাদর্শে চালিত উক্ত সাময়িকপত্রের বক্তব্য একদেশদর্শীয় আক্রান্ত।

'বুদ্ধদেব ও তদুদ্ভাবিত ধর্ম্ম-প্রণালী' প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে বুদ্ধদেবের প্রণীত বিশুদ্ধ ধর্ম এখন আর সেরকম অবস্থায় নেই। প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্মের কোন কোন অংশ প্রবিষ্ট হয়েছে। প্রাচীন বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বর হলেও এখনকার অনেক বৌদ্ধমন্দিরে হিন্দু দেবদেবীদের প্রতিমূর্তি দেখা যায়। 'অহিংসা পরমধর্ম' এটি বৌদ্ধদের নিজের মত নয়, এটি হিন্দুদের থেকে গৃহীত। বৌদ্ধধর্মের নানা

পরিবর্তন দেখে প্রাবন্ধিক এরকম অনুমান করেছেন যে বৌদ্ধধর্ম 'ভবিষ্যতে এক সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ' হয়ে উঠবে।

প্রবন্ধকার বলেছেন যে বৌদ্ধরা বেদ-প্রদর্শিত ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীতে নিরীশ্বর মতাবলম্বী হওয়ায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এঁদের মতে মানুষই নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন জন্মগ্রহণ করবার পর আগে বোধিসত্ত্ব ও পরে বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। বুদ্ধ হলে মানুষের ক্ষমতা সর্বতোমুখী হওয়ার ফলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের আবশ্যকতা থাকে না। আগে বৌদ্ধরা জাতিভেদ স্বীকার করলেও এখন এঁদের মধ্যে জাতিপ্রথা প্রচলিত নেই। আগে বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ প্রথা স্বীকৃত ছিল এমন কোন দৃষ্টান্ত প্রাবন্ধিক দিতে পারেননি এবং একথা ইতিহাস সমর্থিতও নয়।

প্রবন্ধের মতে, বৌদ্ধধর্মে সকল জাতির লোকেরাই পৌরহিত্য ও আচার্যত্ব গ্রহণ করতে পারেন। বৌদ্ধভিক্ষুরা সমবেত হয়ে বিহার বা মঠে বাস করলেও হিন্দু পুরোহিতদের মধ্যে এরকম কোন প্রথা নেই। বৌদ্ধমঠের অধিকারীকে লামা বলে। প্রাবন্ধিক এখানে বৌদ্ধমত বলতে মহাযানী মতকেই বুঝিয়েছেন। প্রাবন্ধিকের এই মতটি খণ্ডিত, কারণ তখন ভারতবর্ষে থেরবাদীরা যে একেবারেই ছিলেন না তা নয়, বিশেষত বাঙালি বৌদ্ধদের কথা এই প্রসঙ্গে বলা যায়। হিন্দুধর্ম বংশানুসারে পাওয়া যায়, অন্য ধর্মাবলম্বী কোন ব্যাক্তি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে পারেন না। অন্যদিকে, বৌদ্ধরা অন্যান্য মতাবলম্বীদেরকে স্বধর্মভুক্ত করার ফলে তার প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বৌদ্ধেরা পরলোক স্বীকার করেন না। এঁদের মতে নির্বাণ শব্দের অর্থ বিনাশ, যেরকম প্রদীপ নির্বাণ হয়ে যায়, সেরকম 'আত্মা'রও নির্বাণ অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে থাকে। কোন কোন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বটে, কিন্তু সে সকল কেবল হিন্দুধর্মের সঙ্গে সংস্রবে সংঘটিত হয়েছে বলে প্রাবন্ধিক অভিমত প্রকাশ করেছেন –

> বৌদ্ধেরা সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিয়ত থেকে উপদেশ দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সমাজের মঙ্গলসাধন ইঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। ইঁহাদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায়ই স্ত্রী লোকদিগকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিয়া থাকে, এমন কি দৈবাৎ কোন স্ত্রীলোককে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে দেখিলেও ইহারা তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করে না।

দৃষ্টান্তহীন অজ্ঞতাপ্রসূত এই বক্তব্য অশোকের লোকহিতৈষণার দৃষ্টান্ত দিয়েই খারিজ করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে মাধ্বাচার্য *সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ* গ্রন্থে চারজন প্রধান আচার্যের মত সংগ্রহ করেছেন

মাত্র। সেখানে বুদ্ধের নিজের মত যা সারিপুত্র, আনন্দ, উপালি প্রমুখ গ্রহণ করেছিলেন তার কিছুমাত্র আভাষ দেওয়া হয় নি।

প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কিছু ইতিবাচক দিক আলোচিত হয়েছে। কৃষ্ণমিত্র *প্রবোধচন্দ্রোদয়* নাটকে যে বৌদ্ধমতের উল্লেখ করেছেন তা অতি ঘৃণিত ও বিকৃত ভাবাপন্ন বলে প্রাবন্ধিক লিখেছেন যে বোধহয় নাটককার *প্রজ্ঞাপারমিতা* প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থ কখনো না পড়ে কেবল অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রণীত আধুনিক সংগ্রহ গ্রন্থ পড়ার ফলে এইরকম ভুল করেছেন। বুদ্ধের মত 'অতি পবিত্র' হওয়ায় হিন্দুরা তাঁকে 'নারায়ণের অবতার' বলে থাকেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের অনেক সৌসাদৃশ্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধধর্ম সিংহল থেকে ক্রমে চীন, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, জাপান, শ্যাম, উত্তর সাইবেরিয়া এবং লাপলাণ্ড পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছিল। অন্য কোন ধর্মের এতদূর উন্নতি হয় নি।

'বৌদ্ধ ধর্ম্ম' প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে আর্যজাতির প্রাথমিক ধর্মরূপে বৈদিক ধর্ম অনুযায়ী সংসারযাত্রা নির্বাহের সমস্ত কাজ অনুষ্ঠিত হত ও বেদবিরোধী সমস্ত লোকই 'নাস্তিক', 'ঘোর পাষণ্ড', 'সমাজশত্রু' বলে বিবেচিত হত। আর্যরা ধর্মসাধন করতে গিয়ে 'নিষ্ঠুরতার একশেষ' করলে সমাজ বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। প্রাবন্ধিক লিখেছেন –

> মনুষ্যের মনোমধ্যে অভিনব চিন্তার অবতারবৎ সমাজের পরিত্রাতা শাক্যসিংহ উদয় হইলেন। ইনি বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিন্দা করিতে তথা সমাজের অভিনব প্রণালী বদ্ধ করিতে প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় জ্ঞানের শাণিত অসিহস্তে উপস্থিত হইলেন।

প্রাবন্ধিক মহাকাব্য ও পুরাণ থেকে কিছু বুদ্ধ-প্রসঙ্গের উদাহরণ দিয়েছেন। *বাল্মীকি রামায়ণ*-এর অযোধ্যাকাণ্ডে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন – বৌদ্ধ তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও সেরকম দণ্ড দিতে হবে। অতএব, যাকে বেদবহিষ্কৃত বলে পরিহার করা কর্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সঙ্গে সম্ভাষণ করবেন না। এছাড়াও *বায়ুপুরাণ, কল্কিপুরাণ, গণেশপুরাণ, শম্ভুপুরাণ* প্রভৃতি উপপুরাণে বৌদ্ধধর্ম ও বুদ্ধ অবতারের উল্লেখ রয়েছে। বৌদ্ধপুরাণ অনুযায়ী শাক্যসিংহ শেষ মর্ত্য বুদ্ধ। আগে পঞ্চান্ন জন বুদ্ধ ছিলেন, তার মধ্যে পদ্মোত্তর থেকে সমপূজিত পর্যন্ত ঊনপঞ্চাশ জন বুদ্ধ স্বর্গে আর বিপশ্যি, শিখি, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কণকমুনি ও কাশ্যপ মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শেষ বুদ্ধ

শাক্যসিংহ 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' আদর্শ নিয়ে মর্ত্যলোকে বোধিসত্ত্বের উন্নতি জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি 'মহাজ্ঞানী ও সর্ব্বশুভপ্রদ ধর্ম্মের একমাত্র উপদেশক'।

অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ 'পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব'-এ (*নবজীবন*, চৈত্র, ১২৯১) পৌরাণিক অবতারতত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে। বিশ্লেষণ পদ্ধতির মধ্যে প্রাবন্ধিকের অভিনবত্ব ও সমকালের হিন্দুধর্মের অনুসন্ধান প্রকাশিত হয়েছে। নানা পুরাণ মতে অবতারের সংখ্যা নানা, কোথাও চব্বিশটি, কোথাও বাইশটি, কোথাও আঠারোটি। *শ্রীমদ্ভাগবত*-এ বাইশটি অবতারের ক্রমে বুদ্ধের অবস্থান একুশ। বর্তমান কালের হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ী দশটি অবতারের মধ্যে নবমে বুদ্ধ রয়েছেন। জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রের সৌজন্যে তা বাংলার কাছে অতি পরিচিত। এই দশাবতার সম্পর্কে বলা হয় 'তর্কনিষ্ঠনরে বুদ্ধো' অর্থাৎ তর্কনিষ্ঠ হলে ভগবদ্ভাব বুদ্ধ। প্রাবন্ধিক দশাবতারের শেষ অবতার হিসাবে কল্কির স্থানে চৈতন্যের প্রস্তাব করেছেন। দশাবতারের মধ্যে প্রথম পঞ্চ অবতারের প্রসঙ্গে (মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন) নিকৃষ্ট জীবের শারীরিক বিকাশের ফলে উৎকৃষ্ট জীব মানুষের অবতারণা ঘটেছে। তারপর, মানুষের সামাজিক বিকাশ; এর তিনটি গ্রন্থির তিনটি অবতার – পরশুরাম, রাম ও বলরাম। পরশুরামাবতারে বাহুবলে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব স্থাপন, রামচন্দ্রাবতারে ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য স্থাপন এবং বলরামাবতারে ভারতের কৃষিযুগের মানুষের সামাজিক উন্নতির চরমসীমা। তারপর আধ্যাত্মিক বিকাশের অবতার বুদ্ধ (যুক্তি) ও চৈতন্য (ভক্তি)। বুদ্ধের একটি নাম বিজ্ঞানমাতৃক (হেমচন্দ্রের অভিধানধৃত 'বুদ্ধ' শব্দের প্রতিশব্দ)। বুদ্ধের এই নামকরণেই বোঝা যায় যে বৌদ্ধধর্মের যুক্তিই মূল। সেই যুক্তিতে বিশ্বনিয়ামক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়ে 'ভক্তিহীন ধর্মযুক্তির শেষ সীমা'য় 'যুক্তির অবতার' বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেছিল। এরপর ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্যের মধ্যে 'মানবের ধর্ম্মজীবনের পূর্ণ বিকাশ' ঘটেছিল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বৌদ্ধধর্ম কোথা হইতে আসিল?' প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে ঔপনিষদিক দর্শনের উল্লেখ করেছেন।[৪৫] কারণ, যজ্ঞে প্রাচীন উপনিষদগুলি যথা *ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ব্রাহ্মণ*-এর অংশগুলি ব্যবহৃত হত। সেকালে যেকোনো সার কথা গুরুর কাছ থেকে শিখতে হত, তার নামই ছিল 'উপনিষদ'। বৌদ্ধদের বহুব্যহৃত উপনিষদ দর্শনের মত সর্বপ্রথম *হর্ষচরিত* গ্রন্থে দেখা যায়। বুদ্ধের আবির্ভাবের বহুকাল পরে কালিদাস ও হর্ষবর্ধনের সময়ে উপনিষদ একটা দার্শনিক মতের মধ্যে গণ্য আর শঙ্করাচার্যের

পর থেকে তার প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। প্রাবন্ধিকের মতে, উপনিষদের অদ্বৈতবাদ থেকে বৌদ্ধধর্ম – এটা বিশ্বাস করা কঠিন।

অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধে ‘ভারতে ব্রাহ্মণ বাস’-এ (*নবজীবন*, অগ্রহায়ণ, ১২৯৫) ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির ফলে বর্ণভেদ বিরোধী বুদ্ধকেও ‘দ্বিজকুল সম্ভূত’ বলে দাবি করা হয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মত উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিনটি বর্ণ ভারতের আদিম নিবাসী নয়, শূদ্ররাই আদিম অধিবাসী। প্রাবন্ধিকের মতে, সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণেরাও শূদ্রকে নিজেদের সঙ্গে ‘সমান’ করবার চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য প্রমুখ যাঁরা বর্ণভেদ রদ করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা সকলেই ‘দ্বিজকুল সম্ভূত’ বলে প্রবন্ধে দাবি করা হয়েছে। ভারতের এই ধারা প্রাচীনকাল থেকে ঊনবিংশ শতকেও অব্যাহত ছিল বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। সকল দিক থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা হিন্দু জাতীয়তাবাদের গৌরব দেখানোর রাজনীতি বা কৌশলই এই প্রবন্ধে কার্যকরী হয়েছে।

আমাদের মনে হয় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুস্তরীয় জটিলতা রয়েছে। কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর ‘জৈন ও বৌদ্ধ ভারতের জাতিরহস্য’ প্রবন্ধে (*বঙ্গবাণী*, মাঘ, ১৩৩৪) সরাসরি বলা হয়েছে – ‘বৌদ্ধের প্রতি ভারতের অনেক হিন্দু বিজাতীয় দ্বেষ হিংসা পোষণ করেন’। হিন্দু-বৌদ্ধের মিশ্র ও জটিল সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি বৌদ্ধ পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনও চলেছিল। প্রাথমিক পর্বে হিন্দু-বৌদ্ধের সহযোগে যে চমৎকার যুগলবন্দী তৈরি হয়েছিল তা ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের শিকাগো বিশ্ব ধর্মমহাসভার সময় থেকে বেশ কিছুকাল স্বামী বিবেকানন্দ ও আনাগারিক ধর্মপালের সখ্যের মধ্যে ধরা পড়লেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠের সুবিধা থাকায় ‘রাজনৈতিক’ অর্থেই বিবেকানন্দ বাড়তি সুবিধা পেয়েছিলেন। বুদ্ধদেব সম্পর্কে তিনি যেমন আন্তরিক শ্রদ্ধাবনত ছিলেন, ঠিক তেমনই সচেতনভাবে বৌদ্ধদের প্রতি আক্রমণাত্মকও ছিলেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে আম্বেদকরের ‘হিন্দুধর্ম’ ছেড়ে ‘বৌদ্ধধর্ম’ গ্রহণ করার পিছনে বিজাতীয় বা অভারতীয় খ্রিস্টধর্ম বা ইসলাম ধর্ম নয়, ‘ভারতীয়’ ধর্মের আশ্রয় নেওয়ার বিষয়টাই গুরুত্ব পেয়েছিল।

খ) বৌদ্ধদর্শন ও সাংখ্যদর্শন

অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ ‘সাংখ্যদর্শন’-এ (*বঙ্গদর্শন*, পৌষ, ১২৭৯) সাংখ্য ও বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। হাজার বছর কাল বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতের পুরাবৃত্তের ‘সর্বাপেক্ষা বিচিত্র’ এবং ‘সৌষ্ঠব লক্ষণযুক্ত’ সময়ে প্রধান ধর্ম ছিল বৌদ্ধধর্ম। ভারত থেকে লুপ্ত হয়ে সিংহল, নেপাল, তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম, শ্যামে এই ধর্ম এখনো রয়েছে। প্রাবন্ধিক বৌদ্ধধর্মের ‘আদি’ সাংখ্য দর্শনে রয়েছে বলে অভিমত পোষণ করেছেন। তিনটি নূতন জিনিস – বেদে অবজ্ঞা, নির্বাণ এবং নিরীশ্বরতা বৌদ্ধধর্মের কলেবর। আলোচ্য লেখকের *কলকাতা রিভিউ*-এর (১০৬ সংখ্যা) ‘বৌদ্ধধর্ম্ম এবং সাংখ্য দর্শন’ প্রবন্ধে এই তিনটি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। নির্বাণ সাংখ্যের ‘যুক্তি-পরিণাম’ মাত্র। বেদের অবজ্ঞা সাংখ্যে প্রকাশ্যে কোথাও না থাকলেও বৈদিকতার অনেক আড়ম্বর রয়েছে। কিন্তু, সাংখ্য প্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়ে শেষে তার মূলোচ্ছেদ করেছিলেন।

প্রথমে বুদ্ধ ও দ্বিতীয়ে যিশুখ্রিস্ট পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোকের জীবনের উপর ‘প্রভুত্ব’ করেছিলেন। বুদ্ধের সঙ্গে সাংখ্যের প্রসঙ্গ জড়িত রয়েছে। সাংখ্য প্রবচনকে অনেকে কপিল সূত্র বললেও তা কপিলপ্রণীত নয়; এটি বৌদ্ধ, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শন প্রচারের পরে প্রণীত হওয়ার প্রমাণ এই গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে। সংসারের দুঃখময়তার কথাই সাংখ্য ও বৌদ্ধদর্শনের মূলতত্ত্ব। আনন্দ কেন্টিস কুমারস্বামী সাংখ্য ও বৌদ্ধের সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের সুখ ও যন্ত্রনাকে দুঃখযন্ত্রণার মতো এক বলে উল্লেখ করেছিলেন।[৪৬]

‘বুদ্ধদেব ও তদুদ্ভাবিত ধর্ম্ম-প্রণালী’ প্রবন্ধ অনুযায়ী বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতির বিষয় পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই বোধ হবে যে এই ধর্ম কপিলপ্রণীত সাংখ্যদর্শনের মূলসূত্র অনুসারে সংঘটিত হয়েছিল। সাংখ্য ও বৌদ্ধধর্ম উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যেমন – শুদ্ধোধন, মায়াদেবী, কপিলবস্তু, সিদ্ধার্থ প্রভৃতি নামগুলিও বাস্তবিক পদার্থের পরিচায়ক নয়, বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যের রূপান্তর মাত্র। কিন্তু প্রাবন্ধিক এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করলেও তার কোন ব্যাখ্যা দেননি।

‘বৌদ্ধ ধর্ম্ম’ প্রবন্ধে রামদাস সেন লিখেছেন যে নিরীশ্বর সাংখ্য কপিল ঈশ্বরের সত্তা অস্বীকার করেছেন। বৌদ্ধেরা ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন বিচার উপস্থিত না করলেও এঁরা সাংখ্যের মতো নাস্তিক। বুদ্ধের উপদেশের মধ্যে কোন স্থানেই ঈশ্বরের প্রসঙ্গ না থাকায় বৌদ্ধেরা ‘প্রায় স্বাভাবিকবাদী’।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বৌদ্ধধর্ম কোথা হইতে আসিল?' প্রবন্ধে বৌদ্ধ ও সাংখ্যমতের সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধমত সাংখ্যমত জাত – অশ্বঘোষের লেখায় তার ইঙ্গিত রয়েছে। সিদ্ধার্থের গুরু আড়ার কালাম ও উদ্রক দুজনেই সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন। তাঁদের মতে, 'কেবল' অর্থাৎ জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হতে পারলেই মুক্তি হয়। বুদ্ধ তাঁদের মত অস্বীকার করে বলেছিলেন যে 'কেবল' হলেও অস্তিত্ব থাকলে নিঃসম্পর্ক হওয়ার উপায় নেই। শঙ্করাচার্য সাংখ্যমতকে বৌদ্ধ প্রভৃতি মতের মতো 'অবৈদিক' বলে উল্লেখ করেছিলেন। সাংখ্যমত পূর্বদেশের মানুষের সৃষ্টি করা সবচেয়ে পুরানো মতবাদ। বৌদ্ধধর্মে আর্যধর্ম-বিরোধী অনেক বিষয় রয়েছে। আর্যরা তিন আশ্রম পালন না করে ভিক্ষু আশ্রম নিতেন না, অন্যদিকে সংসারে বিরাগ উপস্থিত হলে সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষু হওয়ার কথা বুদ্ধ বলেছিলেন। বৌদ্ধভিক্ষুর বেশ আর্যবিরোধী, আর্যরা উষ্ণিষ ও উপনাহ ব্যবহার করলেও বৌদ্ধরা এইগুলি ব্যবহার করতেন না। বৌদ্ধ ও সাংখ্যদর্শনের সম্পর্ক স্বীকার্য, কিন্তু উভয় মত নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যে এতটাই স্বতন্ত্র যে এঁদের আলাদা বলাই বাঞ্ছনীয়।

গ) লোকদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন

দীনেশচন্দ্র সেনের 'ঘোষ পাড়া কর্ত্তাভজার দল' (*বঙ্গবাণী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯) প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক তত্ত্বের প্রতিধ্বনি দেখা যায়। প্রাবন্ধিক মন্তব্য করেছেন –

> এখনো এদেশে বৌদ্ধতন্ত্রের অবাধ রাজত্ব, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও লক্ষ লক্ষ লোক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। তাহারা নিজেরা না জানিয়া বৈষ্ণবধ্বজার নীচে বৌদ্ধধর্ম্মের সাধনা ও অনুষ্ঠান বজায় রাখিয়া আসিয়াছে।

মাধ্যমিক মহাযান সম্প্রদায় 'শূন্যবাদী' ছিলেন, তাঁদের পদ্ধতিতে 'ধ্যায়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং' কথা আছে। বাউলেরা চৈতন্যের বিগ্রহ পূজা করেন না, তাঁদের কাছে তিনি 'শূন্যমূর্তি'। মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যেও বৌদ্ধবাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমানে বৈষ্ণবধর্মের বহু শাখা এই বৌদ্ধমতেরই সাধনা করছেন, এঁরা 'সহজিয়া', 'কর্তাভজা', 'রামবল্লভী', 'কিশোরী ভজক' প্রভৃতি বহুশ্রেণিতে বিভক্ত। চৈতন্য নামাঙ্কিত মেকী সহজিয়া গ্রন্থ *জ্ঞানাদ-সাধন*-এ (সপ্তদশ শতক) ব্রাহ্মণ ও বেদের যথোচিত নিন্দা, 'নীলনীরদবর্ণ কৃষ্ণের' সম্বন্ধে 'টিট্‌কারি' থাকলেও গ্রন্থকার নিজেকে বৈষ্ণবদের একশ্রেণির অন্তর্গত বলে মনে করেছেন। এঁদের মধ্যে 'নারীপূজা'র যে মত প্রচলিত আছে এবং যা চণ্ডীদাস-রামীর প্রেমোপলক্ষে বিচিত্র কবিতার ছন্দে

প্রচার করেছেন, সেই নারীপূজা খ্রিস্টপূর্ব দুশো শতাব্দী থেকে 'বৌদ্ধধর্মের কোন কোন পাণ্ডা' প্রচার করে এসেছেন, এই 'প্রচ্ছন্ন' বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের মধ্যে কর্তাভজার দল প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম যখন ব্রাহ্মণ্য আক্রমণে ধ্বংসমুখে পড়েছিল, তখন শত শত বছর ধরে যে মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তার অবশিষ্ট থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র খড়দহ গ্রামে দুই হাজার পাঁচশো ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীকে সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'সহজিয়া ও চণ্ডীদাস' প্রবন্ধে (*বঙ্গবাণী*, পৌষ, ১৩৩৩) হাজার বছরেরও প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, খ্রিস্টিয় অষ্টম শতাব্দীর লুইপাদ এই মতের প্রচারক। তারও আগে উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতির কন্যা লক্ষ্মীঙ্করা (তাঁরা সম্ভবত অষ্টম (বিনয়তোষ ভট্টাচার্য) মতান্তরে নবম (M. J. Shendge) শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন) *অদ্বয়সিদ্ধি* গ্রন্থে লিখেছিলেন – 'যোষিৎ আনন্দই জগতের শ্রেষ্ঠ আনন্দ'। 'স্ত্রীলোক' নিয়ে 'ধর্মসাধনা' সহজযানে এসে 'আকার' পেয়েছিল। বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন সম্পর্কে প্রাবন্ধিক একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন –

যাবন্নো পততি প্রভাস্বরময়ো শীতাংশুধারা দ্রবো
দেবী পদ্মদলোদরে সম রসীভূতো জিনানাং গণৈঃ
স্ফুর্জ্জদ্ বজ্র শিখাগ্রতঃ করুণয়া ভিন্নং জগত কারণং
গজ্জদ্ধী করুণাবলস্য সহজং জানীহি রূপং বিভোঃ।

বৈষ্ণব সহজিয়ারা এরই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেন – 'রজে বীজে সাধন', 'টলে জীব অটলে ঈশ্বর, তার মাঝে খেলা করে রসিক শেখর'। 'যে মহাসুখবাদ বৌদ্ধদের নিজ দেহেন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগের বস্তু' ছিল, জয়দেব *গীতগোবিন্দ*-এর রাধাকৃষ্ণে তা 'আরোপ' করে 'নিজেকে সঙ্গীরূপে কল্পনা' করেছিলেন। প্রাবন্ধিকের মতে, জয়দেব 'যেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনানন্দের দর্শক মাত্র'। 'যুগল পীরিতির অনুভবানন্দে তিনি দ্রষ্টার আসন' গ্রহণ করেছিলেন, 'বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদের প্রতিক্রিয়ায় এটিই তাঁর বিশেষত্ব'। জয়দেব বা তাঁর অনুবর্তীরা 'প্রতীক উপাসনার হিসাবে কোনো নায়িকার আশ্রয় গ্রহণ' করতেন কিনা 'ভাবিবার বিষয় বটে'। মহাপ্রভু চৈতন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সহজ সাধনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হলেও নিত্যানন্দের সৌজন্যে অনেক বৌদ্ধ সহজিয়ারা তথাকথিত 'বৈষ্ণব' নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

প্রাবন্ধিক মুখ্যত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের তাত্ত্বিক। তিনি বৌদ্ধ সহজিয়াদের সম্পর্কে যা বলেছেন তা সবটাই অনুমান নির্ভর, প্রবন্ধে সেই সাধনা বা দর্শন সম্পর্কে ইতিবাচক কিছুই তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি। বরং, তাঁর প্রবন্ধে সহজিয়া আর প্রচ্ছন্ন সহজিয়া সাধনার 'বীভৎস ব্যাপার' সম্পর্কে বীতরাগ ধরা পড়েছে।

ঘ) বৌদ্ধদর্শন ও জৈনদর্শন

অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ 'জৈনধর্ম্ম'-এ (*আর্য্যদর্শন*, শ্রাবণ, ১২৮২) জৈনধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের কথা এসেছে। প্রাবন্ধিকের মতে বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতাপের সময়ে জৈনরা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি শাখারূপে ও পরবর্তীকালে স্বতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। আমাদের মতে, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের আলাদা দার্শনিক প্রস্থান ও সম্প্রদায়। নরপূজাবিধি বৌদ্ধধর্মের অঙ্গস্বরূপ হলেও এইবিষয়ে জৈনরা বৌদ্ধদের থেকে অনেক এগিয়ে।[৪৭] বৌদ্ধদের থেকে প্রাপ্ত মতানুসারে জৈনরা বলে থাকেন যে আদিমকালের বুদ্ধেরা সকল বিষয়ে সর্বলোকাতিগ ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে শেষের বুদ্ধেরা ক্রমশ 'ন্যূন' হয়ে পড়েছিলেন। মনিয়র উইলিয়মস বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের তুলনাত্মক একটি দীর্ঘ আলোচনা করে পরিশেষে লিখেছেন –

> Jainism, like Buddhism, is gradually drifting into the current of Hinduism which everywhere surrounds it, and, like every other offshoot from that system, is destined in the end to be reabsorbed into its source.[৪৮]

ঙ) বৌদ্ধদর্শন ও খ্রিস্টদর্শন

ইউরোপীয় সভ্যতা বিকাশের মূল হিসাবে ভারতীয় (প্রধানত বৌদ্ধধর্ম) প্রচারের মতকে প্রতিষ্ঠা করা 'য়ুরোপে দর্শন ও ধর্ম্মপ্রচার' চারটি প্রবন্ধের (*নবজীবন*, মাঘ, ১২৯৩; চৈত্র, ১২৯৩; আশ্বিন, ১২৯৪ ও পৌষ, ১২৯৪) মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রথম দুটি প্রবন্ধে 'য়ুরোপ' আর শেষের দুটিতে 'ইউরোপ' বানান রয়েছে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সময়ে ইতালির সমাজ স্থাপিত এবং তা থেকে অনান্য মতের সৃষ্টি হয়েছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন যে প্লেতো ইতালি সমাজের শিষ্য ছিলেন। এই সমাজের মধ্যে বৌদ্ধ আচার, অনুষ্ঠান, মত প্রভৃতি দেখা যায়। প্লেতোকে সক্রেতিসের শিষ্য বলা হয়। কিন্তু তাঁর তত্ত্ব কোন্ মূল থেকে উদ্ভূত তার অনুসন্ধান করলে প্রকৃত ঐতিহাসিক বিষয়ে দুর্জ্ঞেয়তা দূর হতে পারত। তবে খ্রিস্টিয়

তত্ত্বে প্লেতোর অপরিসীম প্রভাবের কারণ অনুসন্ধানে প্রাবন্ধিক বলেছেন যে প্লেতো 'মূল' (বৌদ্ধ) থেকে উপদিষ্ট থাকায় তাঁর শিষ্যরা তা লাভ করেছিলেন। সুতরাং, ইতালিয় তত্ত্বের মত গুরু-শিষ্য উভয়েই মেনেছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টিয় তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব প্লেতোনিস্ট শিষ্যদের থেকে সূচিত হয়েছিল। সুতরাং তাঁদের লিখিত খ্রিস্টিয় তত্ত্বে তাঁরা নিজের নিজের মতে তার মধ্যে প্রাচীন বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করে গুরুর প্রভুত্ব স্থাপনে ভুল করেন নি। এইভাবেই খ্রিস্টিয় তত্ত্বের উপর প্লেতোতত্ত্বের প্রভাব দেখা গিয়েছিল।

বৌদ্ধতত্ত্বের প্রধান লক্ষণ জন্ম, মৃত্যু, বাসনা, ক্লেশ ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে 'অনুপাধিশেষ নির্বাণ' প্লেতোতত্ত্বেও উক্ত হয়েছে। অনর্থ প্রসবিনী মায়া দ্বারা আত্মা উন্মার্গগামী হয়ে মায়া আশ্রয় করলে ভ্রম, অহংকার, বেদনার দ্বারা আত্মার অবসাদ জন্মে 'নির্বাণ' লাভ হয় না। প্লেতো প্রকারান্তরে তা স্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে মন থেকেই জড়ের কার্যসাধিকা শক্তি জন্মায়। এই সম্পর্কে সাংখ্য বা প্লেতোর মতের সঙ্গে বৌদ্ধমতের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। বৌদ্ধদের মতো প্লেতো স্বর্গ ও মনুষ্যলোক প্রভৃতি মানতেন।

প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে সাংখ্য ও বৌদ্ধদর্শনে বিশেষ পার্থক্য নেই। বৌদ্ধেরা সাংখ্যের আদর্শে ধর্মপ্রচারের জন্য দূরবর্তী দেশে গতায়াত করতেন। তাঁদের স্থাপিত ইতালি সমাজ থেকেই ইউরোপে তত্ত্ববিদ্যার সবিশেষ আলোচনা হয়েছিল। আয়োনীয় দর্শনের সৃষ্টি পর্যন্ত গ্রিকদর্শনের প্রারম্ভকাল বলে স্বীকৃত, এই দর্শন এশিয়া মাইনর থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, এশিয়া মাইনরে আয়োনীয় তত্ত্ব প্রথম প্রচারিত হওয়ার সময়ে সেখানে বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত প্রবল ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। ভারতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা যেরকম স্থান পায় নি, ইতালির সমাজও বহুকাল ইতালিতে অবস্থিতি করতে পারে নি। এইদেশের বৌদ্ধদের মতো ইতালি সমাজও উৎপীড়িত হয়ে গ্রিসে পালাতে বাধ্য হয়ে সেখানে প্লেতো প্রমুখ ছাত্রদের স্বধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। ইতালিয় ছাত্ররা গ্রিসে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিলেন। নিও প্লেতোনিস্ট সম্প্রদায়ের গুরু এবং মহাগুরুরা বৌদ্ধস্থবিরদের উপদেশ থেকে 'আত্মা'কে উন্নত করেছিলেন, পুরাবৃত্তেও তার আভাষ রয়েছে। গ্রিকদের দর্শনশাস্ত্র না থাকায় তাঁরা বৌদ্ধস্থবিরদের কাছ থেকে দর্শনশাস্ত্রের উপদেশ লাভ করেছিলেন। প্রবন্ধে কিছু প্রশ্ন তোলা হয়েছে –

> পাশ্চাত্যেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহা প্লাবন উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেধর্ম্ম কি উড়িয়া গেল, অথবা তাহা কুতার্কিক (Heretics) দিগের হস্তে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে? পাশ্চাত্য লোকেরা কি তাহার কোন পুরাবৃত্ত রক্ষা করেন নাই? যদি করিয়া থাকেন, পৃথিবীর ধর্ম্মান্ধদিগের বৈর্য্যানল হইতে কি তাহার উদ্ধার হইয়াছিল?

এই প্রসঙ্গে রোমান সম্রাট অদ্রিয় (Hadrian ৭৬ – ১৩৮, রাজত্বকাল ১১৭ – ১৩৮) সময়ে ইতালির সমাজের শিষ্যদল সেখানে অবিশ্রান্ত অধ্যাবসায়ের সঙ্গে সদ্ধর্মের জ্ঞান প্রচার করে জনগণের মোহান্ধকার বিনাশ করেছিলেন। সেই সময় ক্যাথালিকদের নাম লোকে জানতেন না। একশো ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধাচার্যরা রোমের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সদ্ধর্ম প্রচার করেছিলেন। পরাক্রান্ত রোমের মানুষ এই ধর্মকথা শুনে পৃথিবী বিজয়ের বাসনা পরিহার করেছিল। তাই এই ধর্মকথা জগতে প্রচারিত হলে 'মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই' বলে প্রবন্ধে মতপ্রকাশ করা হয়েছে।

প্রাচ্যের কোন জাতির ধর্মতত্ত্ব থেকে জ্ঞস্তিক (গ্নস্তিক বা Gnostic) সম্প্রদায়ের ধর্ম উৎপন্ন হয়েছিল তা ইউরোপীয় লেখকদের লেখার ভঙ্গিতে তা বোঝা কঠিন হলেও প্রবন্ধে অনুমিত হয়েছে যে বৌদ্ধ ও জ্ঞস্তিকধর্ম এক ও অভিন্ন। গ্নস্তিকরা প্রকৃতি ও প্রধান অর্থাৎ জড় ও চৈতন্য দুটি পৃথক পদার্থে বিশ্বাস করতেন। সাংখ্যতত্ত্ব ব্যতীত এই মত কোন জাতির কোন ধর্মেই ছিল না। এই জড়ই দুঃখভোগের মূল, ভারতের বৌদ্ধ দার্শনিকরা তা অনেক আগেই বলেছিলেন। তাঁদের মতে, জড়ের মোহিনী শক্তিই মানুষকে প্রলুব্ধ ও ভ্রান্ত করে এবং তা ধ্বংস করার উপায় সমাধি। খ্রিস্টানদের শয়তান আর বৌদ্ধদের জড় বা প্রলোভনে (মার) বিশেষ তফাৎ নেই। জ্ঞস্তিক ইয়নদের উৎপত্তি ও বৌদ্ধদের ত্রিবিধ বুদ্ধোৎপত্তির বৃত্তান্ত একই পদার্থ এবং তাঁরা বৌদ্ধদের মতো স্রষ্টা স্বীকার করতেন না। এই গ্নস্তিকধর্ম থেকেই রোমান ক্যাথলিক ধর্মের সৃষ্টি বলে প্রবন্ধে অনুমিত হয়েছে। আর্থার লিলির *Buddhism in Christendom or Jesus the Essene* গ্রন্থে স্বীকার করেছেন বৌদ্ধধর্মই খ্রিস্টিয় ধর্ম, বৌদ্ধধর্মোৎসাহী রাজা অশোক পাশ্চাত্যে স্থবির প্রেরণ করেছিলেন, উক্ত স্থবিরদের ধর্মপ্রচার দ্বারা গ্নস্তিক বা জ্ঞস্তিক সমাজ গঠিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিষয়টি 'মিল্লনিয়ম'। *জাতক*-এর বৃত্তান্ত এবং *বাইবেল*-এর 'প্রকাশিত' ('Revelation') নামক পর্বের বিংশ অধ্যায়ের কয়েকটি পদের অর্থের ক্ষেত্রে উভয় বৃত্তান্তের মিল রয়েছে।[৪৯] খ্রিস্টানরা খ্রিস্টজন্মের ভবিষ্যৎবাণী দেখিয়ে ধর্মরাজত্বের প্রমাণ উল্লেখ করেন। *জাতক* গ্রন্থে এরকম ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে যে বুদ্ধদেব ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে 'ভদ্রকল্প' অনুযায়ী পাঁচহাজার বছর ধর্মশাসন স্থাপন করবেন। এই কল্পবিষয়ক এই শিক্ষা খ্রিস্টানরা বৌদ্ধ বা জ্ঞস্তিকদের ধর্মোপদেশ থেকেই পেয়েছিলেন। বৌদ্ধ বা

জ্ঞস্তিক মতে ‘আত্মা’র শেষ উন্নতি একরকমের। জ্ঞস্তিকদের একটি শাখা কার্পোক্রেশন সম্প্রদায়ের সব কিছুই বৌদ্ধদের মতো।

ফাইলো ও প্লিনির লিপি দ্বারা ব্যক্ত হয় যে প্যালেস্তাইনের ‘বৌদ্ধ’ হেসেনি সম্প্রদায় সমৃদ্ধিশালী নগর ত্যাগ করে নির্জনে বাস করতেন। বৌদ্ধবিহারের মতোই তাঁদের মঠ ও নিয়ম ছিল। তাঁরা কখনো অবৈধ সম্পর্ক, মাদক সেবন, মাংস খাওয়া, মিথ্যা বলা ও রাতে খাওয়া প্রভৃতি কাজ করতেন না। তাঁরা পুণ্যদিনে অনসন করে আন্তরিকভাবে ধর্মানুষ্ঠান করতেন, ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করলে তাঁদের মঠ ও শ্রেণি থেকে বহিষ্কৃত হতেন। পরোপকার, দয়া, শান্তি এবং প্রেমগুণসম্পন্ন হেসেনিরা ধর্ম পালন করার জন্য অনায়াসে মরতে পারতেন। হীনযান ও মহাযান উভয় বৌদ্ধধর্মের মতোই হেসেনিদের ধর্মজীবনে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য শীলে প্রতিষ্ঠিত হতে হত, অহিংসা ও ভ্রাতৃভাব এঁদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ছিল। প্লিনির মতে, ডেড সির পশ্চিম পার থেকে তাঁরা ক্রমে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর দেশে বিহার স্থাপন করেছিলেন। *বাইবেল নিউ টেস্টামেন্ট*-এর হোসেনিদের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। যিশুকে বাপ্তাইজকারী যোহন এবং যিশু উভয়েই হেসেনিগোত্রীয়। মিশরে বাসকারী হেসেনিদের কয়েকটি শাখা থিরাপুতিক ও আরেকটি শাখা আস্কেতি নামে খ্যাত ছিল। প্রাচীন খ্রিস্টিয় লেখকদের মতে, আস্কেতিরা স্পৌদে নামে খ্যাত ছিলেন, যাঁদের সঙ্গে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সমরূপতা লক্ষিত হয়। ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ও আস্কেতি সম্প্রদায় একই। প্রবন্ধের প্রস্তাব অনুসারে বলা যায় –

> এক্ষণে আস্কেতি, কাথলিক মঙ্ক বা যাজক, থিরাপুতিক ও হেসেনি, বৌদ্ধ ও জ্ঞস্তিকদিগের গভীর তত্ত্ব নিরূপণ করিবার সময় আগত হইয়াছে।

খ্রিস্টিয় মতাবলম্বীগণ থিরাপুতিকদেরকে খ্রিস্টান বলে বর্ণনা করলেও পণ্ডিত বাসনেজ (Jacques Basnage, ১৬৫৩ – ১৭২৩) *Histoire des Juifes* গ্রন্থে সপ্রমাণ করেছেন যে তাঁরা খ্রিস্টান নন, কিন্তু এই সন্ন্যাসীরা ক্যাথলিক যাজকদের উপদেষ্টা। তাঁদের আচার ব্যবহার মত বিশ্বাস সমস্তই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতো, তাঁরা আগের নাম ত্যাগ করে ক্রমে ‘মঙ্ক’ উপাধি পেয়েছিলেন।

প্রবন্ধকার অনুমান করেছেন যে ঘোর কুতীর্থিক দলের অগ্রণী রোমীয় সম্রাট কনষ্টান্টাইনের (রাজত্বকাল ৩০৬ – ৩৩৭ খ্রিস্টাব্দ) উৎপীড়নে কুতীর্থিক দলের প্রশ্রয় বৃদ্ধি ও জ্ঞস্তিক ধর্মের লোপ হয়েছিল। খ্রিস্ট স্বয়ং ধর্মপ্রচারের জন্য সত্তরজন শিষ্য প্রেরণ করেন – লুক এই কথা বললেও মোহন, মথি এবং মার্ক এইকথা বলেননি; পাশ্চাত্য সমালোচকেরাও এর প্রতিবাদ করেছেন। এই ব্যাপার বৌদ্ধ

সমাজেও অপরিজ্ঞাত নয়। বুদ্ধদেব বর্ষাকালে মৃগদাব বনে তিনমাস কাটিয়ে ষাটজন শিষ্যকে ধর্মপ্রচারের জন্য দিগ্‌দিগন্তে পাঠানোর সময়ে শিষ্যদের উচ্চ-নিচ-মধ্য সকল লোকের গৃহে ধর্মকথা প্রচার করতে বলেছিলেন। অন্যদিকে খ্রিস্টধর্মের কোন পুরাবৃত্ত লেখক রোমের আদি বিশপদের বৃত্তান্ত নির্ণয় করতে পারেননি। অন্যদিকে ক্যাথলিকরা বৌদ্ধধর্মকে গ্রাস করেও নিবৃত্ত হননি। ফরাসি পণ্ডিত কালিস্‌ ডি. প্লান্‌সি বুদ্ধদেবকে কালমুখ তাতারী জাতির উপন্যাসের নায়ক বলে বর্ণনা করলেও ক্যাথালিকরা বুদ্ধদেবকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে এই প্রবন্ধটি সমাপ্ত হয়েছে –

> পৃথিবী মধ্যে অনেকেই জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবত্ব লাভ পূর্ব্বক লোকের পূজ্য এবং উপাস্য হইয়াছেন, কিন্তু খৃষ্টীয়ানেরা সে সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধদেবকে যখন তখন ক্রাইষ্ট ব্লিয়াগোলোক ধাঁ ধাঁ দেখেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? তবে ক্রাইষ্ট কি বুদ্ধ? না বুদ্ধ ক্রাইষ্ট?

যিশুখ্রিস্টের মত বুদ্ধদেব বৌদ্ধগৃহস্থদের পাঁচটি ও ভিক্ষুদের অতিরিক্ত পাঁচটি মোট ‘দশ আজ্ঞা’ (শীল) পালন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। বুদ্ধ ও যিশুখ্রিস্টের দর্শন প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক তাঁর ও অন্যান্য পণ্ডিতদের মত ব্যক্ত করেছেন –

> বুদ্ধের নীতি অতি চমৎকার, তাহা পাঠ করিলে বৌদ্ধধর্ম্মের উপর ভক্তির উদ্রেক হয়। আধুনিক সভ্যগণ খেন, যীশুপ্রণীত উপদেশ একমাত্র সুখশান্তির উপায়স্বরূপ, কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট, তাহার প্রমাণ একবার “ধর্ম্ম পদ” গ্রন্থপাঠে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাবৃহস্পতি আধুনিক তত্ত্বদর্শী অগষ্ট কোমৎ বৌদ্ধগ্রন্থের বিশেষ আদর করিয়াছেন এবং উহা প্রত্যক্ষ দর্শনবাদিগণকে এক এক বার পাঠ জন্য দিন নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

ফ্রিডারিখ ম্যাক্সমুলার বৌদ্ধ ও খ্রিস্টিয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করে এই দুই ধর্মের সারূপ্যকে স্বীকার করে লিখেছেন –

> … when we have traced Christianity on one side and Buddhism on the other back to their historical antecedents. Many things which seemed to be alike are then perceived to be totally different in their original intention, while others are simply due to our common human nature.[৫০]

তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে এই দুই ধর্মের ঐতিহাসিক যোগকে স্বীকার করে এই দুটি ধর্মের মূলগত তত্ত্বের বিভাজন কীভাবে সম্ভব? –

> If we are to suppose that Buddhism had reached Alexandria, and had filtered into Judæa, and had influenced the thoughts of the Essenes and other sects before the rise of

> Christianity, how are we to account for the diametrical opposition which exists between the fundamental doctrines of the two religions?[৫১]

খ্রিস্টিয় দৃষ্টিকোণ থেকে অজ্ঞেয়বাদী বৌদ্ধধর্মে গ্রিক বা খ্রিস্টিয় ধারণা অনুযায়ী কোন ঈশ্বরের ধারণাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। পার্থক্য থাকলেও দুটি ধর্মের ভাবগত যোগের প্রতিই ম্যাক্সমূলার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন –

> If we translated Buddhism into Christianity, it would be, to put it briefly, a belief in the Second Person, and a complete denial of the First. While Christianity is founded on a belief in revelation, such a belief would be entirely incongruous in Buddha’s teaching. Buddha lived a long life and died a natural death, and nothing can be more different than Buddha’s conception of Nirvana from the wprds uttered on the Cross, “To-day shalt thou be with Me in Paradise.”[৫২]

বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের কারণ

‘বুদ্ধদেব ও তদুদ্ভাবিত ধর্ম্ম-প্রণালী’ প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্ম অবনতির কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পর থেকে শুরু করে ক্রমশ ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্মের তিরোভাব হয়। এর পর বহুকাল অবধি এই ধর্ম ভগ্ন ও অঙ্গহীন অবস্থায় ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিদ্যমান থাকলেও তার প্রভাব হ্রাস পেতে শুরু করেছিল।

‘বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত’ (*নারায়ণ*, আশ্বিন, ১৩২২) প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সহজযানের বিষময় ফলের কথা আলোচনা করে বৌদ্ধদর্শনের নানা দিক তুলে ধরেছেন। পঞ্চ কামোপভোগ নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন, বৌদ্ধধর্মের প্রাণস্বরূপ চরিত্র বিশুদ্ধির জন্য হীনযান থেকে মহাযানের মহত্ত্ব ও আর্যদেব *চরিত্র-বিশুদ্ধি-প্রকরণ* নামে গ্রন্থ রচনা করে গেছিলেন, সহজযানে সেই চরিত্র বিশুদ্ধি একেবারেই পরিত্যক্ত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম, নির্বাণ, অদ্বয়বাদ সহজ করতে গিয়ে সহজযানীদের মতপ্রচারে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বেড়ে উঠে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম ‘নেড়ানেড়ি’র দলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সহজযানীরা সন্ধ্যাভাষায় যে দেহতত্ত্বের গান লিখেছিলেন তার একরকম অর্থ বোধ হয়, কিন্তু তার ‘গূঢ় অর্থ অতি ভয়ানক’। দেহ জগতব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ হওয়ায় দেহে আকাশ, কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু, সুমেরু সবই রয়েছে। যে বোধিচিত্ত মহাযান মতে নির্বাণ পাবার আশায় ক্রমেই নিজের উন্নতি করছিলেন, দেহতত্ত্বের

মধ্যে এসে তার যে কী দশা হল তা কহতব্য নয়। ইন্দ্রিয়াসক্ত বৌদ্ধদের অধঃপতন *প্রবোধচন্দ্রোদয়*-এর (১০৯০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লিখিত) তৃতীয় অঙ্কটিতে ধরা রয়েছে।

মহাযান ধর্ম বুঝতে, আয়ত্ত করে সেরকম কর্ম করতে বহুদিন ও অনেক পরিশ্রম, অনেক অধ্যয়ন, ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন হয়। সকলের সাধ্য করে তুলতে মহাযানী আচার্যেরা একটি সহজ পন্থা বের করেছিলেন – ধারণী মুখস্থ, জপ, পুথি পূজা করলেই মহাযানের পাঠ, স্বাধ্যায়, যোগ – সকলের ফল হবে। যেমন – একটি বৃহৎ গ্রন্থ *প্রজ্ঞাপারমিতা* পাঠ ও আয়ত্ত না করে আচার্যের কথানুসারে 'প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয় ধারণী' মুখস্ত করে তার পাঠের সমস্ত ফল পাওয়া যাবে। এইভাবে অসংখ্য ধারণী তৈরি হয়েছিল। ক্রমে ধারণী মুখস্থ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালে তখন এক অক্ষর, দুই অক্ষর মন্ত্র হতে লাগল। যে মহাযান চিন্তাশক্তির চরম সীমায় উঠেছিল, তা মন্ত্রপাঠ, মন্ত্রজপ বৌদ্ধধর্মের শেষ অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বৌদ্ধধর্মে দেবতার সংস্রব না থাকায় হীনযানে দেবতার পুজা-আর্চা ছিলই না। বুদ্ধদেবের মূর্তি বিহারে মহাপরিনির্বাণের কতদিন পরে (চারশো বা পাঁচশো বছর) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা নিয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। গান্ধার শিল্পের (বুদ্ধের পাঁচ-ছয়শো বছর পরে নির্মিত) কুঠুরিতে প্রথম বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। মহাযানে নির্বাণ লাভের উপায়স্বরূপ বুদ্ধমূর্তি বিহারে থাকত।[৫৩] *সাধনমালা*-য় দুশো ছাপ্পান্নটি ধ্যান-সাধন নিয়ে মূর্তি নির্মাণে বৌদ্ধ কারিগরেরা যথেষ্ট বাহাদুরি দেখিয়েছিলেন। প্রাবন্ধিক প্রশ্ন তুলেছেন –

> যখন যোগিনী, ডাকিনী, ভৈরবীর পূজা লইয়া ও তাঁহাদের মূর্তি লইয়া বৌদ্ধধর্ম চলতে লাগিল, তখন আর অধঃপাতের বাকি কী রহিল ?

বৌদ্ধদের মধ্যে সূচিত 'গুহ্যপূজা'র গুহ্য দেবমূর্তিকে বলতেন 'শম্বর', গুহ্যমূর্তিগুলির উপাসনা পদ্ধতিও অশ্লীল হওয়ায় এঁদের এইসকল পুথিকে জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত 'ঘোমটা দেওয়া কামশাস্ত্র' বলেছেন। প্রাবন্ধিকের মতে, যেখানে 'কামশাস্ত্রের শেষ', সেইখানে বৌদ্ধদের 'গুহ্যপূজা আরম্ভ'। *গুহ্যসমাজ* বা *তথাগত গুহ্যক*[৫৪] নামে বৌদ্ধদের পুথি সম্পর্কে তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখা উদ্ধৃত করেছেন –

> …but in working it out, theories are indulged in, and practices enjoined which are at once the most revolting and horrible that human depravity could think of, and compared to which the worst specimens of Holywell Street literature of the last Century would appear absolutely pure.

তথাগত গুহ্যক-এর মতো আরো গ্রন্থ রয়েছে। যেমন – *চণ্ডমহারোষণতন্ত্র, চক্রসম্বরতন্ত্র, চতুষ্পীঠতন্ত্র, উড্ডীষতন্ত্র, সেকোদ্দেশ, পরমাদিবুদ্ধোদ্ধৃত কালচক্র, কালচক্রগর্ভতন্ত্র, সর্ব্ববুদ্ধসমাযোগ ডাকিনীজাল সম্বরতন্ত্র, হেবজ্রতন্ত্ররাজ, আর্য্যডাকিনীবজ্রপঞ্জর-মহাতন্ত্ররাজকল্প, মহামুদ্রাতিলক, জ্ঞানগর্ভ, জ্ঞানতিলক* নামে *যোগিনীতন্ত্ররাগপরম-মহাদ্ভুত, তত্ত্বপ্রদীপ, বজ্রডাক, ডাকার্ণব, মহাসম্বরোদয়, হেরুকাভ্যুদয়, যোগিনীসঞ্চার্য্য, সম্পুট-তন্ত্র, চতুর্যোগিনী সম্পুট, গুহ্যবজ্র* ইত্যাদি। এইসব গুহ্যবিদ্যা গ্রন্থের আবার টীকা, টিপ্পনী, পঞ্জিকা, ব্যাখ্যা, বিবরণ, তাঁর প্রয়োগ পদ্ধতি রয়েছে যেগুলি এই ধর্মের অধঃপতনের অন্যতম কারণ।[৫৫]

বুদ্ধদেব দেবতা অস্বীকার করে চরিত্রশুদ্ধির উপদেশ ও জন্ম-জরা-মরণের ভয় আর সাংসারিক চিন্তা অতিক্রমকারী মহাশান্তি দায়ী ‘দেবতা’দের থেকেও উঁচু পরমপদ প্রাপ্তির উপদেশ দিতেন। তাঁর ধর্মাবলম্বীরা শেষে ডাক, ডাকিনী, যোগিনী, প্রেত, প্রেতিনী, পিশাচ, পিশাচিনী, কটপূতনা, কঙ্কালিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা করে নিজেদের সঙ্গে দেশের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

বুদ্ধদেব স্বয়ং মহিলাদের দীক্ষা দিয়ে ভিক্ষুণী করার সঙ্গে সঙ্গে সংঘের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অনেক কঠোর নিয়ম করেছিলেন। তিনি ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে এক বিহারে থাকতে দিতেন না। কিন্তু তাঁর মহাপরিনির্বাণের পাঁচ-ছয়শো বছর পর থেকে ভিক্ষুরা ক্রমে বিবাহ করে গৃহস্থ ভিক্ষু (‘আর্য’) হতে শুরু করেছিলেন, যাঁদের সমাজে বিশেষ আদর ছিল না। তাঁরা আসল ভিক্ষুদের থেকে প্রতি-নমস্কার পেতেন না। গৃহস্থ ভিক্ষুদের সন্তান-সন্ততি হলে আপনা-আপনি ভিক্ষু হয়ে যেত। গৃহস্থ গৃহস্থাশ্রম ছেড়ে যদি ভিক্ষু থেকে গেলে তাঁকে প্রথমে ‘ত্রিশরণ’ নিয়ে তারপর ‘পুণ্যানুমোদনা’, ‘পাপদেশনা’, ‘পঞ্চশীল’, ‘অষ্টশীল’, ‘দশশীল’ গ্রহণ ও ‘পোষধব্রত’ প্রভৃতি ধারণ করতে হত। কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুর ছেলে একেবারেই ভিক্ষু হতেন; ‘ত্রিশরণ গমন’, ‘পঞ্চশীল গ্রহণ’ তাঁদের কাছে এক একটা সংস্কারের মত হয়ে যেত। ‘জাত-ভিক্ষু’ বলে একটা জাতির মতো হওয়ায় তাঁদের দলপুষ্টিতে আসল ভিক্ষুদের অবস্থা খারাপ হয়েছিল। গৃহস্থ ভিক্ষুরা কারিগরি – রাজমজুর, রাজমিস্ত্রি, চিত্রকর, ভাস্কর, স্যাকরা, ছুতোরের কাজের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষা, ধর্ম ও পূজাপাঠ করতেন। বৌদ্ধধর্মের পৌরহিত্য ক্রমে নেমে এসে কারিগরদের হাতে পড়ায় বেশি লেখাপড়া শেখা, ধ্যানধারণা ও ভাবনাচিন্তা করার সময় বা প্রবৃত্তি কোনটাই থাকত না। বিহারবাসী প্রকৃত ভিক্ষুরা বিহারের জমিজমার আয় থেকে কোনরকমে দিন গুজরান করতেন। ক্রমে রাজারা প্রায় বিধর্মী

হয়ে উঠলে বৌদ্ধ-পণ্ডিতের রাজসম্মান পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। ছোট ছোট রাজাদের পক্ষে বিধর্মী বৌদ্ধ-পণ্ডিতদের প্রতিপালন করার সাধ্য ছিল না, থাকলেও করতেন না। সুতরাং প্রকৃত ভিক্ষু এবং তাঁদের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সেন রাজত্বকালে ছোট ছোট বৌদ্ধরাজাও ছিলেন। বল্লালের সময় ব্রাহ্মণদের আদমশুমারি রাঢ়ী ও ব্রাহ্মণ মিলিয়ে আটশ ঘর ব্রাহ্মণেরা যতটা হিন্দু করে নিতে পারেন ততটা হিন্দু, আর অবশিষ্ট সবই বৌদ্ধ ছিলেন। এইসময়ে আফগানিস্থানের উপত্যকা থেকে ইসলামধর্মে দীক্ষিতরা ধর্মপ্রচারের জন্য অন্য ধর্মাবলম্বী ‘কাফের’দের বলে তাঁদের উচ্ছেদসাধনের জন্য বাংলা দেশে এলে মুসলমানদের রোকটা মূর্তিপূজক বৌদ্ধদের উপরই পড়েছিল। তাঁরা বৌদ্ধবিহারগুলি সব ভেঙে ফেলেছিলেন। ওদন্তপুরী বিহার ধ্বংস করে দুইহাজার ভিক্ষু বধ করেছিলেন; পাথরের মূর্তিগুলি ভেঙে, সোনা রূপা তামা পিতল কাঁসার মূর্তিগুলি গলিয়ে, পুথিগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। বিক্রমশীলা, নালন্দা, জগদ্দল প্রভৃতি বড়ো বড়ো বিহারের এই দশা হয়েছিল। হরপ্রসাদের সময় পর্যন্ত ওদন্তপুরী ও নালন্দা মহাবিহারের ঢিবির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। বিক্রমশীলা ও জগদ্দলের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রকৃত ভিক্ষু এই সময় থেকেই একপ্রকার লোপ পেয়েছিল। যাঁরা পালিয়েছিলেন তাঁরা নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়ায়, বার্মা ও সিংহলে গিয়েছিলেন। বাংলার বৌদ্ধদের বিদ্যাবুদ্ধি, পুথিপাজির এই পর্যন্ত শেষ বলে প্রাবন্ধিক মনে করেছিলেন।

প্রবন্ধ লিখনের ক্ষেত্রেও হরপ্রসাদ নিজের আবেগকে সংযত রাখতে পারেননি, সে চেষ্টাও করেননি, এটাই তাঁর প্রবন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কখনো কখনো অতীত বাংলা তথা ভারতবর্ষের গৌরব হানির বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়া প্রাবন্ধিকের যুক্তির পথ আবেগে দ্রবীভূত হয়ে পড়েছে –

> এক একবার মনে হয় তিন-চারি শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়া যে নিজেও অধঃপাতে দিয়াছিল, মুসলমানদের আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভরা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মুসলমানদের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের সেই ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণ করিয়া সিদ্ধিলাভের চেষ্টা, ভূতপ্রেত পূজা করিয়া বুজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তিকেই ধর্ম বলিয়া মনে করা ও তাহাই শিখানো – এই-সকলের পরিণামে তাহাদিগকে বঙ্গ দেশ চিরকালের জন্য ছাড়িতে হইল। দেশে রহিল – কারিগর পুরোহিত ও তাহাদেরই যজমান। লেখাপড়া বুদ্ধিবিদ্যার নামগন্ধ পর্যন্ত বৌদ্ধদের মধ্যে লোপ পাইল।

বৌদ্ধধর্মের বিবর্তিত অবস্থার সন্ধান

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের রূপটিকে অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। 'বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল?' (নারায়ণ, পৌষ, ১৩২২) প্রবন্ধের অনুসন্ধানের ফল 'এখনো একটু আছে' (*নারায়ণ*, মাঘ, ১৩২২) ও 'উড়িষ্যার জঙ্গলে' (*নারায়ণ*, চৈত্র, ১৩২২) প্রবন্ধদুটির মধ্যে ধরা পড়েছে। তিনি বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধানের ইতিবৃত্ত নিজের মতামত সহ প্রকাশ করেছেন।

'বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল?' প্রবন্ধে হরপ্রসাদ বৌদ্ধধর্মের অবশেষ অনুসন্ধানে উড়িষ্যার জঙ্গলের প্রতি অভিনিবেশ করেছিলেন। প্রবন্ধে মুসলমান আক্রমণের পরেও পূর্ব বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের কথা যেটুকু পাওয়া গেছে তাতে মুসলমানেরা একেবারে সমস্ত বাংলা দেশ অধিকৃত করতে পারেননি। গিয়াসুদ্দিন বলবন তুগ্রলের বিদ্রোহ দমনের জন্য বাংলায় এসে সোনারগাঁওয়ের রাজার সঙ্গে সন্ধি (১২৮০ খ্রিস্টাব্দে) করেছিলেন। নবদ্বীপ ও গৌড়জয়ের পর পূর্ব বাংলা জয় করতে মুসলমানদের প্রায় একশ কুড়ি বছর লেগেছিল। সোনারগাঁওয়ের সব রাজারা যে হিন্দু ছিলেন তা নয়, বৌদ্ধও ছিলেন। বাংলায় লেখা একটি *পঞ্চরক্ষা*-এর (১২৮৯ খ্রিস্টাব্দ) বৌদ্ধপুথি পাওয়া গেছে। এতে পাঁচটি পুথি আছে যার প্রত্যেকটি সূচিত হয়েছে এইভাবে – 'এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন সময়ে ভগবান্'। এই সময়ে পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমসৌগত মধুসেন রাজা ছিলেন। বল্লালের পর মধুসেন নামে রাজার উল্লেখ থাকলেও তিনি যে পূর্ব বাংলার রাজা ছিলেন একথা জোর দিয়ে প্রাবন্ধিক বলতে চাননি। তাঁর মতে, ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা দেশে একজন স্বাধীন বৌদ্ধরাজার রাজত্বে অনেক বৌদ্ধের বাস ছিল। মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি চোদ্দ শতকের শেষদিকে তাঁর প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থ *প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ*-এ একটি বচন তুলেছেন যে নগ্ন দেখলেই প্রায়শ্চিত্ত করেতে হবে। তিনি নগ্ন শব্দের অর্থ করেছেন – 'নগ্নাঃ বৌদ্ধাদয়'। বৌদ্ধ না থাকলে একথা বলা যেত না।

বাংলা অক্ষরে লেখা তালপাতার মহাযানী বৌদ্ধপুথি *বোধিচর্য্যাবতার* (১৪৩৬ খ্রিস্টাব্দ) সোহিনচরী প্রদেশে বেণুগ্রামে মহত্তর মাধবমিত্রের পুত্রের জন্য একজন বৌদ্ধভিক্ষু তা লিখেছিলেন এবং আরেকজন তার পাঠ মিলিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং বাংলার অনেক কায়স্থ তখনো বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে অনুমিত হয়। কেম্ব্রিজে রক্ষিত বাংলা অক্ষরে লেখা *কালচক্রতন্ত্র* পুথি (১৪৪৬ খ্রিস্টাব্দ) শাক্যভিক্ষু জ্ঞানশ্রী কোন বিহারে দান করেছিলেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আরেকটি তালপাতার কাতন্ত্রের *উণাদিবৃত্তি* পুথি

(১২৪৩ খ্রিস্টাব্দ) বৌদ্ধস্থবির শ্রীবররত্ন নিজের পাঠের জন্য কপলিয়া গ্রামের কায়স্থ শ্রীবাগীশ্বরকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত শ্রীবররত্নের জন্য বাংলা ভাষায় লেখা কাতন্ত্র ব্যাকরণের পুথি রয়েছে। সুতরাং তিনি বাংলা দেশের মহাযানমতাবলম্বী ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ বৌদ্ধস্থবির ছিলেন। শ্রীবররত্নের বিশেষণগুলির মধ্যে একটি হল 'শূন্যতাসর্ব্বকারবরোপেত মহাকরুণী' 'সর্ব্বালম্বনবিবর্জ্জিতাদ্বয়বোধিচিত্ত-চিন্তামণিপ্রতি-রূপক'। সুতরাং পঞ্চদশ শতকেও বাংলায় অনেক জায়গায় বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধ পুথিপাজিও লেখা হত।

পঞ্চদশ শতকে রাঢ়ীশ্রেণি মহিন্তা গাঁই বৃহস্পতি নামে বড়ো পণ্ডিত গৌড়ের সুলতান, রাজা গণেশ ও তাঁর মুসলমান উত্তরাধিকারীদের কাছে 'রায়মুকুট' এই উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি একটি স্মৃতি, অনেকগুলি কাব্যের টীকা ও *অমরকোষ*-এর টীকা (১৪৩১ খ্রিস্টাব্দ) লিখে বাংলা দেশে সংস্কৃতশিক্ষার বিশেষ উপকার করেন। *অমরকোষ*-এর প্রামাণিক টীকায় চোদ্দ-পনেরটি বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে তিনি প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, তখনো বৌদ্ধশাস্ত্রের পঠনপাঠন ছিল এবং ব্রাহ্মণেরাও অন্তত শব্দশাস্ত্রের প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে বৌদ্ধপুথি পড়তে বাধ্য হতেন। ষোড়শ শতকে লিখিত চূড়ামণি দাসের চৈতন্যচরিত *গৌরাঙ্গবিজয়*-এ (আনুমানিক ১৫৪২ – ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ) লেখেন যে চৈতন্যের জন্ম হলে সকলের মত বৌদ্ধরাও আনন্দিত হয়েছিলেন।[৫৬] জয়ানন্দের চৈতন্যচরিতে পুরীর জগন্নাথদেবকে বৌদ্ধমূর্তি বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ষোড়শ শতকেও বৌদ্ধেরা বাংলা থেকে একেবারে লুপ্ত হয়নি।

সপ্তদশ শতকে মঙ্গোলিয়ার উর্গা নগরের মহাবিহারের লামা তারানাথ ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা জানতে বুদ্ধগুপ্তনাথ লামাকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি জগন্নাথ ও তৈলঙ্গ ঘুরে বাংলায় আসেন। তিনি কাশ্রমগ্রাম ও দেবীকোট, হরিভঞ্জ, ফুকবাদ, ফলগ্রু প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। সেখানে অনেক বৌদ্ধপণ্ডিত ছিলেন, পুথিপাজি ছিল, বৌদ্ধধর্মও অনেক প্রবল ছিল। হরিভঞ্জ বিহারের ধর্মপণ্ডিত ও হেতুগর্ভধন নামের পণ্ডিত উপাসিকার কাছে তিনি নানারকম শিক্ষালাভ করেন। বুদ্ধগুপ্তনাথ অনেক সূত্রের মূলগ্রন্থ দেখেছিলেন। বাংলার বাইরেও তিনি অনেক স্থানে বৌদ্ধধর্মের উন্নতি দেখতে পান। তাঁর সময়ে রাঢ়ে ও ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্ম বেশ প্রবল ছিল। তিনি বোধগয়ায় মহাবোধি মন্দিরে ও বজ্রাসনের কাছে অনেক বছর বাস করেছিলেন। তিনি কোন কোন বিহারে জনকায় সিদ্ধনায়ক ডাক প্রভৃতি অনেক মণ্ডলের চিত্র দেখেছিলেন। তিনি শান্তিগুপ্ত নামে একজন সিদ্ধের কাছে দীক্ষিত হয়ে 'নাথ' উপাধি পান। যোগিনী

দিনকরা ও মহাগুরু গম্ভীরমতির থেকে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ও মহোত্তর সুধীগর্ভের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

নেপালের ললিতপত্তন নগর পাটনের একজন বজ্রাচার্য ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে মহাবোধি মন্দিরের কাছে বাস করেন। তিনি স্বপ্ন অনুযায়ী পাটনে ফিরে মহাবোধি মন্দিরের মত একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। বোধগয়ার জীর্ণ মন্দির ইংরেজরা মেরামত করে দিলে তা বজ্রাচার্য অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে মিলে যায়। এখনো মহাবোধি বিহারের বজ্রাচার্যেরা নেপালের বৌদ্ধদের মধ্যে আজও অতি উচ্চস্থান লাভ করেছে। অষ্টাদশ শতকের প্রথমে কাশীতে নাথুরাম বা নথমল ব্রহ্মচারী নামের বৌদ্ধ ছিলেন যদিও তিনি এই ধর্ম বিষয়ে বিশেষ কিছু জানতেন না। তাঁর সংস্কার ছিল ৮ মাঘ, ১৭৫৫ সংবৎ বুদ্ধদেব বদরিকাশ্রমে অবতীর্ণ হবেন। ৫ মাঘ বিষ্ণু, শিব, গণপতি, শক্তি ও সূর্য তাঁর কাছে এসে তাঁকে মুখভাষাগ্রন্থ লিখতে বলেন যার মধ্যে বুদ্ধের অবতার হওয়া, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রভৃতি অনেক কথা থাকবে। তিনি কাশীর রামপুরায় থেকে নানাদেশের চার-পাঁচজন বিদ্যার্থীর সাহায্যে সাড়ে বারো লক্ষ শ্লোকে *বুদ্ধচরিত* লিখেছিলেন।

হিন্দুরাজারা বৌদ্ধদের বিরক্ত করতে ত্রুটি করতেন না। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, যেখানে দেবোত্তর ভূমি আছে তাঁর কাছে ব্রাহ্মণকে ‘ব্রহ্মোত্তর’ দেবে না। কিন্তু সেন রাজাদের ব্রহ্মোত্তর দানে দেখা যায় যে তার একসীমা ‘বুদ্ধবিহারী দেবমঠঃ’। কিন্তু বৌদ্ধদের প্রধান শত্রু রাজা বা ব্রাহ্মণরা ছিলেন না, ছিলেন শৈবযোগীরা। শেষদিকের বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে শৈবযোগীদের উপর তাঁদের রাগ দেখা যায়। চতুর্দশ শতকের শেষদিকে নেপালের রাজা যক্ষমল্লের সময়ে *স্বয়ম্ভুপুরাণ* লেখা হয়। এখানে শৈবদের প্রচুর গালি দেওয়া হয়েছে। বাংলাতেও সম্ভবত শৈবযোগীরা ক্রমে প্রবল হয়ে বৌদ্ধদের নাম পর্যন্ত লোপ করেছেন। চৈতন্যদেব অনেক নীচ অস্পৃশ্য জাতিকে উদ্ধার করেছেন। প্রাবন্ধিকের অনুমান, এঁরা বৌদ্ধ থেকে বৈষ্ণব হওয়ার ফলে বৌদ্ধধর্মের নাম ক্রমে লোপ পেয়েছে।

বাঙালির আশেপাশে বিশেষ করে উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ ছিল। দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, নেপালে অনেক বৌদ্ধ ছিল। চাটগাঁ ও ত্রিপুরার পাহাড়ে বরাবরই বৌদ্ধ ছিল। এঁদের মধ্যে ‘নেপালি বৌদ্ধেরাই সেকালের ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধদের উত্তরাধিকারী’। দার্জিলিঙ ও সিকিমের বৌদ্ধেরা তিব্বত থেকে বৌদ্ধধর্ম লাভ করেছে। চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ নন। প্রায় তিনশ বছর আগে তাঁরা আরাকান থেকে বৌদ্ধধর্ম লাভ করেন, সে ধর্মও বর্মা ও সিংহল থেকে এসেছে। রাঙামাটির বৌদ্ধরা

বর্তমানে চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের শিষ্য, তবুও তাঁদের অনেক আচার-ব্যবহার দেখে হরপ্রসাদ অনুমান করেছেন যে তাঁরা 'প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ', কিন্তু নিকটবর্তী চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের সংস্রবে এসে তাঁরা অনেক পরিমাণে হীনযান মত গ্রহণ করেছেন।

উড়িষ্যার জঙ্গলে বৌদ্ধধর্ম একেবারে লোপ পায় নি। সরাকি তাঁতিরা এখনো বৌদ্ধ। তাঁদের বিয়ের সময় বুদ্ধদেবের পূজা হয়ে থাকে। জঙ্গলমহল ছাড়াও পুরী জেলার দুয়েকটি থানায় এবং কটকের কয়েকটি থানায় সরাকি তাঁতি দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরাও স্পষ্ট বুদ্ধদেবের পূজা করে থাকে। বাংলার বাঁকুড়া ও বর্ধমানের সরাকিরা এখন সম্পূর্ণ হিন্দু হয়ে গেছে।

'এখনো একটু আছে' প্রবন্ধে হরপ্রসাদ বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধানের ইতিবৃত্ত ও নিজের মতপ্রকাশ করেছেন। পাঠানরা তিনশ-চারশো বছর এবং মোগলরা দুশো-আড়াইশো বছর রাজত্ব করেও ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বলে একটি ধর্ম ছিল – তা জানতেন না। ইউরোপীয়রা জানতেন যে সিংহল, বর্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশেই বৌদ্ধধর্ম চলত – সে ধর্মের ভাষা পালি, ধর্মযাজকেরা ভিক্ষু, বিবাহ করেন না ইত্যাদি। নেপাল রেসিডেন্সির হজসন সাহেব সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে এক নূতন রকমের বৌদ্ধধর্ম দেখতে পেয়েছিলেন।[৫৭] বৌদ্ধধর্ম বাংলা, বিহার থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, বাংলায় তার কোনো চিহ্নই দেখতে পাওয়া যায় না। *বঙ্গবাসী* পত্রিকার যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু সম্পাদিত *ধর্মমঙ্গল* পড়ে হরপ্রসাদ ধর্মপূজাকেই সম্ভবত বৌদ্ধধর্মের শেষ অবস্থা বলে মনে করেছিলেন।

ক্ষেত্রসমীক্ষার পর হরপ্রসাদ লিখেছিলেন যে পাটুলির কাছে সূঁয়াগাছি গ্রামে এক ময়রার বাড়ির কালো পাথরের ধর্মঠাকুর সবরকমের পেটের অসুখের নিরাময়কারী। তিনি 'তত্ত্বং তঞ্চ নিরঞ্জনং [ম] মরবরদ পাতু বঃ শূন্যমূর্তিঃ' রূপে পূজিত হন। মুক্‌সিমপাড়ার কাছে জামালপুরের ধর্মঠাকুর 'মঙ্গলদেবতা'র[৫৮] বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন – বড়ো রাগী, কোনোরকম মন্দ হলেই ক্ষতি করে বসেন। তিনি চালাঘরে থাকতে ভালোবাসেন। বৈশাখ মাসে পূর্ণিমার দিন মেলার 'স্থানে' হাজার থেকে বারোশো পাঁঠা, অনেক শুয়োর ও মুরগি বলি হয়। সেখানে দাওয়ার চালে অসংখ্য ন্যাকরার ফালি, কাপড়ের পাড়, পাটের দড়ি, শণের দড়ি, নারকেল দড়ি, ঢিল প্রভৃতি মানতের জন্য ঝোলানো থাকে। ১৮৯৩ – ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরের ক্ষেত্র সমীক্ষা করে হরপ্রসাদের লিখেছেন –

> আমার বোধ হইল মন্দিরের পিছনে একটা স্তূপ ছিল – তাহার গোল তলাটা মাত্র পড়িয়া আছে। তলা একেবারে মাটির সমান। মন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড মনসাসিজের গাছ, গাছের দুটা

ডালের মধ্যে একখানা একটু পালিশ করা পাথর। সিজগাছের দুটা ডালের মাঝখানে পাথরখানা অনেক দিন আগে রাখা হইয়াছিল – তার পর ডাল বাড়িয়া উঠিয়াছে – দু দিক হইতে পাথরখানাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। অনেক টানিয়া পাথরখানা বাহির করিলাম – দেখিলাম উহাতে একটি বড়ো কারিকুরি করা W লেখা আছে। এইরূপ W-ই প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্বে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের চিহ্ন ছিল।

ধর্মঠাকুরের পূজারী ব্রাহ্মণের নৈবেদ্য নিবেদনের তথ্য অনুযায়ী – এঁর নৈবেদ্য দুইভাগে দেওয়া হয়, কারণ – 'ইনি ধর্মঠাকুরও বটেন শিবও বটেন', এঁর মন্ত্র – 'শিবায় ধর্মরাজায় নমঃ'। কিংবদন্তী অনুসারে, ধর্মরাজ আগে গোয়ালাদের ঠাকুর ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণদের হস্তগত হলে হিন্দু আচার-ব্যবহার শুরু হয়। ১৮৯৮ – ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রাবন্ধিক দেখেন যে ধর্মঠাকুর মাটির বেদিতে নেই, গৌরীপট্টে আসীন। প্রাবন্ধিক কলকাতার জানবাজার রোডে ধর্মঠাকুরের একতলার মন্দিরে দেখেন যে ধর্মঠাকুরের আসন সকলের উপর, তাঁর নিচে গণেশ ও পঞ্চানন্দ, তাঁদের নিচে তিনটি পাথর, মাঝেরটি একটু ছোট, সম্ভবত 'ত্রিরত্নের মূর্তি', তাঁর নিচে শীতলা ও ষষ্ঠী আর ঘরের কোণে তিনটি মাথা ও তিনটি পা জ্বরাসুর। ধর্মঠাকুরের মানত করলে অনেকে পাঁঠা বলি দিলেও সেই সময় তাঁর সামনের কপাটটি বন্ধ করে রাখতে হয়, কারণ তিনি 'পরম বৈষ্ণব', প্রাণি-হিংসা চান না। বলরাম দে স্ট্রিটের ধর্মঠাকুরের মন্দির দর্শনের তথ্যের ভিত্তিতে প্রাবন্ধিক এই 'বিশ্বাস'-এ উপনীত হয়েছেন যে ধর্মঠাকুর 'বৌদ্ধধর্মের অবশেষ'।

প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদের দুইজন সহযোগী পণ্ডিত রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ ও বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ এই গবেষণায় যুক্ত ছিলেন। রাখালচন্দ্র বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শলপ স্থানে ধর্মের মন্দিরে ধ্যানস্থ বুদ্ধের মূর্তি দেখেন। বিনোদবিহারী ময়না অঞ্চলের তথ্য জানান যে ধর্মের মন্দিরে আগে তিনটি জিনিস পাথর, শঙ্খ ও ধর্মঠাকুর ছিল। ধর্মঠাকুর ব্যতীত বাকি দুটি জিনিস অন্তর্হিত হয়েছে। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাখালচন্দ্রের সংগৃহীত *ধর্ম্মমঙ্গল পূজাবিধি* পুথি অনুযায়ী, ধর্মঠাকুর শিব ও ব্রহ্মা নন, কারণ এঁরা সকলেই ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা, এঁদের ধ্যান, পূজা ও নমস্কার প্রভৃতির ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। ধর্মঠাকুর এঁদের থেকে বড়, তাঁর শক্তির নাম কামিন্যা, বল্লুকা নদীর তীরে বড়ওয়ান গ্রামে তাঁর প্রথম আবির্ভাব হয়। বল্লুকার মন্দিরের অধিকারিণী ও পূজারিণী জাতিতে ডোম, তবে পালাপার্বণে শাস্ত্র জানা ডোমপণ্ডিত আসেন। ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি। বৌদ্ধ ত্রিরত্ন বা উপাসনার বস্তু – বুদ্ধ (শাক্যসিংহ), ধর্ম (গ্রন্থাবলী) ও সংঘ (ভিক্ষুমণ্ডলী)। কোন কোন সম্প্রদায় ধর্মকে আগে স্থান দেওয়ায় তাঁদের ক্রম হত – ধর্ম, বুদ্ধ ও সংঘ। ক্রমে ধর্ম বলতে স্তূপ বোঝাত। মহাযান মতে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মন্দির ক্রমে স্তূপের গায়ে এসে উপস্থিত

হয়। স্তূপের গায়ে কাটা কুলুঙ্গিতে যথাক্রমে পূর্বদিকে অক্ষোভ্য, পশ্চিমদিকে অমিতাভ, দক্ষিণদিকে রত্নসম্ভব ও উত্তরদিকে অমোঘসিদ্ধি থাকতেন। প্রথম এবং প্রধান ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচন স্তূপের মধ্যস্থলে থাকায় দৃশ্যমান হতেন না। মানুষের দাবি মতো তাঁকে দৃশ্যমান করার জন্য দক্ষিণপূর্ব কোণে আরেকটি কুলুঙ্গি করায় পাঁচটি কুলুঙ্গিযুক্ত স্তূপ ঠিক কচ্ছপের মতো দেখতে হওয়ার জন্য 'শেষকালের স্তূপেরই অনুকরণ'কে প্রাবন্ধিক দায়ি করেছেন। স্তূপ, ধর্ম ও কচ্ছপাকৃতি ধর্মঠাকুরকে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের মূর্তির সঙ্গে 'ধর্মমূর্তির স্তূপ' বলে তিনি অনুমান করেছেন।

মহাযানে সংঘ বোধিসত্ত্বের রূপ ধারণ করেছে। বর্তমানে ভদ্রকল্প, অমিতাভের সময়। তাঁর বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, তিনি জগতের উদ্ধারকর্তা, স্তূপ থেকে তাঁকে পৃথক করা হয়েছে। ত্রিরত্নের স্থানে এখন কেবল কচ্ছপাকৃতি ধর্মঠাকুর রয়েছেন। নেপালে প্রত্যেক বিহারে ফটকের কাছে বসন্তের দেবতা হারীতির (বাংলা দেশের শীতলা) মন্দির থাকে। বিহারবাসী ভিক্ষুরা তাঁকে ভয় করতেন বলে তাঁর পূজা না দিয়ে বিহারে প্রবেশ করতেন না। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে শীতলার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। 'মাংসাশী ও মাতাল' গণেশ ও মহাকাল নেপালে বুদ্ধমন্দিরের দ্বার-দেবতা। বাংলায় মহাকালের স্থানে পঞ্চানন্দ হয়েছেন, গণেশ মাংস না খেলেও পঞ্চানন্দ বড়ো মাংসাশী।

চোখ স্তূপের একটি অঙ্গ। স্তূপের গোলের শেষে বর্গাকার চারদিকে চারটি চোখ থাকে। বুদ্ধদেব ভোরে উঠেই একবার চারদিক অবলোকন করতেন। তিনি চোখ থেকে শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের রশ্মি বের করে তিনহাজার 'মহা'হাজার লোকধাতুর শেষ পর্যন্ত 'অবলোকন' করতেন বলে এই লোকধাতুর নাম অবলোকিত। প্রাবন্ধিক বাংলার ধর্মঠাকুরেরও অনেক চোখ হওয়ায় তাঁকে 'পুরানো বৌদ্ধধর্মের শেষ' বলে মনে করেছেন। বৌদ্ধরা নিজেদের ধর্মকে 'সদ্ধর্মী' বলতেন। অশোকের শিলালিপিতে ও সংস্কৃত গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের নাম 'সধর্ম'। রামাই পণ্ডিত *ধর্মঠাকুরের পূজার পদ্ধতি*-এর 'নিরঞ্জনের উষ্মা' ছড়ায় ধর্মঠাকুরের পূজকদের 'সধর্মী' বলেছেন। ছড়ায় রয়েছে – ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত অত্যাচার করাতেই সধর্মীরা ধর্মঠাকুরের কাছে নিজেদের আপদ উদ্ধার প্রার্থনা করলে তিনি মুসলমান মূর্তি ধরে ব্রাহ্মণদের জব্দ করেন। 'ধর্মঠাকুরের পূজা' বৌদ্ধধর্মের মতো 'ব্রাহ্মণবিরোধী ধর্ম'। রামাই পণ্ডিতের মতে 'ধর্মঠাকুরের পূজা ও বৌদ্ধধর্ম এক' হওয়ায় প্রাবন্ধিক এর সাপেক্ষেও 'ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধধর্মের শেষ' বলে মনে করেন।

‘উড়িষ্যার জঙ্গলে’ প্রবন্ধে হরপ্রসাদ বৌদ্ধধর্মের অবশেষের অনুসন্ধানে উড়িষ্যার জঙ্গলের প্রতি অভিনিবেশ করেছিলেন। উড়িষ্যার গড়জাত মহলের মধ্যে একটি মহলের নাম বোধ অর্থাৎ বৌদ্ধ। গড়জাত ও কিল্লাজাত মহল, যেমন – মোগলবন্দি প্রভৃতি অনেক জায়গায়, পুরী ও কটক জেলার অনেক থানায় বাসকারী সরাকি তাঁতিদের বিবাহ প্রভৃতি শুভকাজে বুদ্ধদেবের পূজা হয়। ব্যুৎপত্তিগত বিচারে ‘সরাকি’ ‘শ্রাবক’ শব্দের অপভ্রংশ। সুতরাং, তাঁরা এককালে বৌদ্ধ ছিলেন এবং উড়িষ্যায় এখনো অনেকটা বৌদ্ধ রয়েছেন।[৫৯] মুসলমানদের হাতে বাংলার বৌদ্ধধর্ম অনেকটা নষ্ট হলেও উড়িষ্যাতে তাঁরা যেতে না পারায় সেইখানে সেইভাবে তা লোপ পায় নি। উড়িষ্যায় জগন্নাথদেব নিজেই বুদ্ধমূর্তি, তিনি নারায়ণের নবম অর্থাৎ বুদ্ধ অবতার। চূড়ামণি দাসের *চৈতন্যচরিত* গ্রন্থে জগন্নাথদেবকে বুদ্ধাবতার বলেছেন। উড়িষ্যার জঙ্গলে বৌদ্ধধর্ম সন্ধানে নগেন্দ্রনাথ বসু ক্ষেত্রসমীক্ষার পাশাপাশি বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক অনেক গ্রন্থ আবিষ্কার করেছিলেন।

হরপ্রসাদ মনে করেন যে অশোকের আগে উড়িষ্যায় বিশেষত ভুবনেশ্বরের চারপাশে বৌদ্ধধর্ম প্রবল হয়েছিল। স্পুনার সাহেবের দেওয়া কয়েকটি ওড়িয়া তালপাতার পুথি, উদয়গিরির দুয়েকটি লেখ পড়ে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে যে ঐর নামে একজন রাজা অশোকের অনেক আগে মগধের হাত থেকে উড়িষ্যা উদ্ধার করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী ঐররাজ অনেক মঠ ও গুহা নির্মাণ করেছিলেন। অশোক উড়িষ্যা জয় করে সেখানে বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। প্রাবন্ধিকের মতে, উড়িষ্যা ও কলিঙ্গ প্রায় একই দেশ। অশোকের সময় কলিঙ্গের রাজধানী ছিল তোষলি (তোষলি> ধৌলি)। এখানে অশোক শিলালেখে একটি অতিরিক্ত আজ্ঞায় শ্রাবণমাসের কোন্ কোন্ তিথিতে লোকদের এই আজ্ঞাগুলি শুনিয়ে দিতে হবে তার উল্লেখ রয়েছে। খণ্ডগিরি বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত ছিল। হিউয়েন সাঙের সময় উড়িষ্যা বজ্রযানের প্রধান স্থানে পরিণত হয়। উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি বজ্রবারাহীর পূজা প্রকাশ করেছিলেন। উড়িষ্যা, বাংলা, মগধ, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশে তাঁর মতের খুব আদর ছিল। তিনি ও তাঁর কন্যা লক্ষ্মীঙ্করা বজ্রযান মতের অনেক গ্রন্থ লিখেছিলেন। তিব্বতে জনপ্রিয় এই গ্রন্থগুলির তিব্বতি তর্জমা আছে। ইন্দ্রভূতির পর সোমবংশ, কেশরীবংশ, গঙ্গবংশ, গজপতিবংশ ও সর্বশেষে তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব (১৫৫৯ – ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দ) উড়িষ্যায় রাজত্ব করেছিলেন। এঁদের সময় উড়িষ্যায় বৌদ্ধ ও হিন্দু ছিলেন, ব্রাহ্মণের পাশাপাশি বৌদ্ধভিক্ষুদেরও প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু রাজা হিন্দু ও রাজসভায় ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি থাকায়,

মুসলমান লেখকরা হিন্দু ও বৌদ্ধের ভেদ করতে না পারায়, উড়িষ্যা হিন্দুর দেশ বলেই পরিচিত হত। মগধ ও বাংলার বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা লোপ হয়ে যাওয়ায় উড়িষ্যার বৌদ্ধেরা অতি হীনভাবে বাস করতেন। নগেন্দ্রনাথ বসুর উদ্ধার করা গ্রন্থানুযায়ী হরপ্রসাদ বলেছেন – প্রতাপরুদ্রের সময় (১৫০০ – ১৫৩৩) পর্যন্ত বৌদ্ধদের উপর উড়িষ্যার অত্যন্ত উৎপাত হয়েছিল। বড়ো বড়ো বৌদ্ধেরা বাইরে বৈষ্ণব সেজে থাকলেও তাঁদের মত প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। তাঁরা অলখ, অরেখ, নিরঞ্জন বা শূন্যপুরুষকেই বিষ্ণু মনে করে পূজা করতেন। অচ্যুতানন্দ দাস, বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস ও চৈতন্য দাস প্রমুখ এই বৈষ্ণবধর্মের প্রধান কবি। বলরাম দাসের *ব্রহ্মাণ্ড-ভূগোল-গীতা* ও বিরাট-গীতায় শূন্যবাদ ও ব্রহ্মবাদের 'অদ্ভুত মিলন', যিনি শূন্য, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পুরুষোত্তম। শূদ্র বলরাম দাসের *প্রণব গীতা*-এর ব্যাখ্যায় রাজা প্রতাপরুদ্র ও ব্রাহ্মণরা রুষ্ট হয়ে এই ব্যাখ্যা মেনে নিলেও পরে রাজসভায় বৌদ্ধদের আশ্রয়দান, বিতাড়ন ও অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছিল। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর বাইশ বছর পরে বৌদ্ধ তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব রাজা হলে পলাতক বলরাম দাস আবার ফিরে এসেছিলেন। লামা তারানাথের সাক্ষ্য অনুযায়ী, উড়িষ্যার রাজা তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব বৌদ্ধ এবং তাঁর রাজত্বে বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল।

আনুমানিক ঊনবিংশ শতকের সাতের দশকে গড়জাত মহলে নিচজাতির মধ্যে মহিমাধর্মের[৬০] উৎপত্তি হয়েছিল যার সঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট মিল রয়েছে। এই সন্ন্যাসীর ধর্মে অলেখ পুরুষ, শূন্য পুরুষের পূজা থাকলেও জাতিভেদ নেই। বৌদ্ধভিক্ষুদের *বিনয়পিটক*-এর নিয়ামাবলীর সঙ্গে এই নিয়মগুলির অনেক মিল রয়েছে যা বৈষ্ণবদের সঙ্গে একেবারেই নেই।

আমাদের আলোচ্য কালপর্বে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন গবেষণা ও আলোচনার ক্ষেত্রে যে নতুন পথের সূচনা করেছিলেন তা ভবিষ্যতের চর্চাকে প্রাণিত করেছে।

উপসংহার

মানব সভ্যতার উপর বুদ্ধের অভিসম্বোধির প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বেণীমাধব বড়ুয়ার *সিলোন লেকচার্স*-এ[৬১] (মার্চ, ১৯৪৪-এর বক্তৃতা, ১৯৪৫-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) বলেছেন যে বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন ঔপনিষদিক স্থিতিশীল দৃষ্টিকোণের পরিবর্তে এক নতুন গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছে। ব্যক্তি-

ভগবানে বিশ্বাসবিহীন এমন একটি ধর্মের সন্ধান পেয়েছে যা শীল-আচার ও চরিত্র গঠনের আদর্শ স্থাপন এবং সে সম্পর্কে শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য সম্যক রূপে ক্রিয়াশীল, বিশ্ব এমন এক শক্তিসম্পন্ন সেবা ও প্রচারমূলক ধর্মের সাক্ষাৎ লাভ করেছে যা এশীয় তথা বিশ্ব সভ্যতার একটি প্রাণবন্ত শক্তিতে পরিণত হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক পটভূমির উপর ভিত্তি রচনা করে সুন্দর একটি নৈতিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে যা মানসিক শীলাচারের মানকে উন্নীত করার সঙ্গে সংজ্ঞায়িত করেছে, সেইসঙ্গে মানুষের জীবন, প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়নকে উচ্চতা দান করেছে।

রেজাউল করীম পৃথিবীর চিন্তাধারার উপর বহু প্রভাব বিস্তারকারী বুদ্ধের মহান আদর্শের সক্রিয় ভূমিকার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৬২] বুদ্ধবাণী ও আদর্শের সার কথা সর্বজনীন শান্তি, ঔদার্য, পরম সহিষ্ণুতা এবং সর্বজীবে দয়া। তাঁর বাণী ও শিক্ষার মধ্যে এমন সব উপাদান আছে যা দেশ কাল নিরপেক্ষভাবে প্রযোজ্য। ধর্মের বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনিই শিখিয়েছিলেন। শিক্ষা, যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর সমস্ত পদ্ধতিকে 'যুক্তিমার্গ' বলা যায়। অন্ধ সংস্কার ও বিচারহীন আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মানুষকে নৈতিক আদর্শ ও জীবনের দিকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি নিজের জীবনে পরীক্ষিত ও অনুশীলিত বিষয়কে নীতি ও পন্থারূপে মানুষের মধ্যে প্রচার করেছেন। সেইজন্য তাঁর উপদেশ ছিল জীবন্ত সত্য এবং বাস্তব ধর্ম।

প্রত্যেক বৌদ্ধ অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে 'পঞ্চশীল' প্রার্থনার প্রসঙ্গ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এটি দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষার প্রায়োগিক দিক, যা জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে যে কেউ গ্রহণ করতে পারেন। প্রাণিহত্যা থেকে, চুরি থেকে, ব্যভিচার থেকে, মিথ্যা বাক্য থেকে, মদ-মাদকদ্রব্য সেবন ও প্রমাদ-বস্তু থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করার (পঞ্চশীল) সংকল্পের কথা বলে। রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু 'পঞ্চশীল' নীতির উদ্ভাবন করেছিলেন যার অনুপ্রেরণা বুদ্ধের 'পঞ্চশীল' নীতি।[৬৩] প্রত্যেক ধর্মই কোন না কোন এক কিংবা একাধিক নীতির উপর বেশি জোর দিয়েছে। শান্তির বাণী সকল ধর্ম প্রচার করলেও বৌদ্ধধর্ম সবচেয়ে বেশি শান্তি আনার জন্য জোর দিয়েছিল যা অতীতের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গেও যুক্ত ছিল। তারই ফলস্বরূপ মৌর্যযুগে ভারত পৃথিবীর ইতিহাসে অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে দেখা দিয়েছিল। বর্তমানে বৌদ্ধধর্ম বিশ্বশান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

হিন্দু ও বৌদ্ধ পুনরুত্থান আন্দোলন একই সময়ে ঘটায় সাময়িকপত্রের আলোচনায় এই দুই ধর্মের সম্পর্কের কথাই বারংবার উঠেছিল। ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক না কেন একটা বিতর্ক হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে চলে আসছে। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম কি এক না আলাদা এবং তারা পরস্পরের পরিপূরক কিনা এই নিয়ে প্রবল বিতর্ক ছিল যার রেশ এখনো রয়েছে। কেবল সামাজিক বা ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যে কীরকম রাজনীতির শিকার হতে হয় বা অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ কীভাবে সাহিত্যের পরিবেশকে গ্রাস করে সে সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র বাগচী *বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য* (১৯৫৩) পুস্তিকায় বলেছেন যে *ধর্মপদ* বৌদ্ধ গ্রন্থ না হলে এদেশে তা গীতার চেয়ে কম আদর পেত না। কিন্তু কেবলমাত্র ধর্মীয় পুনরুত্থানের ক্ষেত্রেই নয়, সৃষ্টিমূলক ও মানব হিতৈষণার কাজে তা মানুষকে প্রণোদিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বৌদ্ধধর্মের মানব হিতৈষণার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রাহ্মসমাজ ও বেদান্তপন্থী রামকৃষ্ণ মিশন বর্ণভিত্তিক ধর্মের বিরোধিতা করেছিল।

ঊনবিংশ শতকে ব্রাহ্মধর্ম নিজ তাত্ত্বিক কাঠামো গঠন, ধর্মীয় ও সামাজিক সাংস্কৃতিক ভাবকল্প রচনার স্বার্থে আদর্শরূপে বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করেছিল। পক্ষান্তরে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের ঔদার্য ও চর্চার ফলেই বৌদ্ধধর্ম শিক্ষিত বাঙালি তথা ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। প্রাথমিক পর্বে বৌদ্ধ আদর্শ প্রচারের কৃতিত্ব ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রধান মুখপত্র *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-এর প্রাপ্য। অনেকসময়ে এই পত্রিকার প্রাবন্ধিকদের ঔদার্য ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে একটা সমন্বয় এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বচর্চার পথ উন্মুক্ত করেছে। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনকে বাদ দিয়ে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন আলোচনা সম্ভব নয়। পূর্বপক্ষ বা উত্তরপক্ষে তার স্থায়ী আসন রয়েছে। এই বিষয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও নানা প্রবণতা রয়েছে। আমাদের আলোচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে কিছু লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে, যেমন – বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনকে স্বতন্ত্র প্রস্থানের তাৎপর্যে বিশ্লেষণ; বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনকে হিন্দুধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত করে দেখার প্রবণতা; বুদ্ধজীবনের নির্বাচিত অংশের ভিত্তিতে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনকে নির্মাণ, যা অত্যন্ত জনপ্রিয়; বুদ্ধজীবন নয়, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনসর্বস্ব আলোচনা যা পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ জনপ্রিয় নয় এবং হিন্দুদর্শনের সমালোচনা উপস্থাপনে বৌদ্ধদর্শন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দ্বারা সূচিত বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার সূচনাপর্বের প্রতিষ্ঠান বা স্কুলগুলি হল – ক) অ্যাংলো-জার্মান স্কুল: এর প্রবক্তারা হলেন রীস ডেভিডস, হারমেন ওল্ডেনবার্গ; খ) ফ্রাঙ্কো-বেলজিয়ান স্কুল:

এর প্রবক্তারা হলেন লা দে লা ভ্যেলে পুসোঁ, পল ডিমিভিলে, এতিন্নে লামোত্তে; গ) লেনিনগ্রাদ স্কুল: এর প্রবক্তারা হলেন ফিয়োডর সরবাটস্কি, ওত্তো রোসেনবার্গ, ই. ওবেরমিলার; ঘ) আমেরিকান স্কুল: এর প্রবক্তারা হলেন পল ক্যারুস, হেনরি ক্লার্ক ওয়ারেন, চার্লস রক্‌হিল লানমান; ঙ) ভিয়েনা স্কুল: ফ্রাউভালমার, স্টাইন্‌কেলনার প্রমুখ বৌদ্ধবিদ্যা বিশারদ।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বেণীমাধব বড়ুয়া প্রমুখের পরে বৌদ্ধবিদ্যাচর্চা ও পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন আনেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১৮৯৩ – ১৯৬৩)। তার আগে পর্যন্ত ভারতে দর্শনচর্চায় বৌদ্ধদর্শনের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধপুথি ও গ্রন্থকে মান্যতা না দিয়ে তাকে ন্যায় দর্শনের পূর্বপক্ষ হিসাবেই বিচার করা হত। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বিংশ শতকের তিনের দশক থেকে তাঁর আবিষ্কৃত বৌদ্ধপুথিগুলি প্রকাশ করে বৌদ্ধদর্শনকে ন্যায়ের পূর্বপক্ষ হিসাবে পড়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বৌদ্ধদর্শন পঠন-পাঠনের জন্য সরাসরি বৌদ্ধপুথি ও গ্রন্থ্ পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে এই ধারণাকে ভারত ও বিশ্বে জনপ্রিয় করে তোলেন। বৌদ্ধদর্শন ও মার্ক্সীয় সাম্যবাদের সৌসাদৃশ্যের বিষয়ে তিনি আলোকপাত করে মানুষের সার্বিক মুক্তির প্রসঙ্গে বৌদ্ধদর্শনকে তিনি জনপ্রিয় করে তোলেন।

অনান্য বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার ধারাগুলির মধ্যে ভারতের বেদান্ত স্কুল বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। এই স্কুল ঊনবিংশ শতকের জাতক হলেও এই মতবাদ নাকি আচার্য শঙ্করের (৭৪৪ – ৮২০) সময় থেকেই চলে আসছে বলে তাঁরা দাবি করেন। এই স্কুলের মূল প্রবক্তা হলেন স্বামী বিবেকানন্দ, তাত্ত্বিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় থেকে হাল আমলের শঙ্করাচার্য প্রমুখ এই মতের সমর্থক। এই স্কুলের মতে, বুদ্ধ একজন হিন্দু সাধক বা বিষ্ণুর অবতার। বৌদ্ধধর্ম বলে আলাদা কোন ধর্ম নেই, তা আসলে বেদান্তের জাতক এবং হিন্দুধর্মই। বৌদ্ধধর্ম বেদান্তপন্থী, তা মূলগতভাবে হিন্দুধর্মের সংস্কৃত রূপ বা শাখা বা বিদ্রোহী সন্তান, যার সমস্ত গৌরব হিন্দুধর্মের প্রাপ্য।

ঊনবিংশ শতকের বৌদ্ধ পুনরুত্থান আন্দোলন ভারতে কৃপাশরণ মহাস্থবির ও আনাগারিক ধর্মপালকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু তা সাধারণ মানুষের কাছে কতটা ছড়িয়ে পড়েছিল সে নিয়ে প্রশ্ন ওঠা সঙ্গত। সাধারণত ভারতের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর কাছেই তার প্রত্যক্ষ আবেদন ছিল। দেশের বৃহত্তর সমাজ, বিশেষত ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু সমাজের কাছে তা ধর্মীয় আন্দোলনের থেকেও অনেক বেশি ছিল বৌদ্ধিক আন্দোলন ছিল। তাঁরা বৌদ্ধ পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনকে বৃহত্তর হিন্দু পুনরুত্থানবাদী

আন্দোলনের অঙ্গীভূত করেই দেখতে চেয়েছিলেন এবং তা হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের সহায়তা ও সহানুভূতিতে বিকশিত হয়েছিল। বিক্ষিপ্ত কিছু ক্ষেত্র ছাড়া ব্যাপক অর্থে ভিন্নতার বোধ বিশেষ কাজ করেনি। তাঁরা ব্রাহ্মদের যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, অনেকটা সেই দৃষ্টি এই ক্ষেত্রে কাজ করেছিল। বেদ-উপনিষদের সনাতন ধর্মের মত বৌদ্ধধর্মকেও ভারতবর্ষের নিজস্ব ধর্ম হিসাবেই গ্রহণ করা হয়েছিল। এইরকম ঔদার্যের পিছনে বৌদ্ধধর্মের প্রায় অস্তিত্বহীন অবস্থাই কি সহানুভূতি আদায়ে সহায়তা করেছে? এর সঙ্গে এও ভুললে চলবে না যে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মকে কখনই ভারতীয় ধর্মের মর্যাদা দিতে এঁরা রাজি নন। 'হিন্দু'ধর্ম নয়, সনাতন বা ভারতধর্মের ধারার ভাবনাই এক্ষেত্রে জরুরি ছিল। জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষাপট এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারকের ভূমিকা পালন করেছে।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঊনবিংশ শতকের শেষপাদ আর বিংশ শতকের সূচনাপর্বের 'ভারতীয়' ধর্মের (হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মই এখানে পরস্পর প্রতিস্পর্ধী বলে গুরুত্বপূর্ণ, জৈন বা শিখধর্ম সেই অর্থে সমস্যাকর নয়) জটিল সহাবস্থানকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বলে চালিয়ে দেওয়া যাচ্ছিল, কোন পক্ষেরই তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতীয়' ধর্মের মধ্যে ভেদ টানার কৌশল হিসাবে স্যার জর্জ এলিয়টের তিন খণ্ডের বিশাল গ্রন্থ *Hinduism and Buddhism* প্রকাশিত হয়। ঔপনিবেশিক শোষণের স্বার্থে পালি বিদ্যাচর্চাকে সামনে রেখে শ্রীলঙ্কা ও ভারতে বৌদ্ধবিদ্যাচর্চা সূচিত হয়েছিল, এর সুফল ও কুফল দুইই রয়েছে। সুনীতিকুমার পাঠক অভিযোগ করেছেন যে *Hinduism and Buddhism* গ্রন্থ থেকেই নতুন করে ভারতীয় ধর্মে বিরোধের সূত্রপাত হয়। ভারতীয় ধর্মের ব্যবচ্ছেদ হয়ে দুটি ধর্মকে সামনে আনা হয়, ভারতসহ বিশ্বে এই ধারণাটাই ছড়িয়ে পড়ে – হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। কেমন দাঁড়ালো এই হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের অবস্থান? কুমারস্বামী দুটি ধর্মের আরণ্যক উৎস, প্রাচীন দর্শন ও সত্যকে পুনর্স্থাপন করার কথা বলেছেন। 'বৌদ্ধ' আনাগারিক ধর্মপাল *Buddhism in its Relationship with Hinduism* গ্রন্থে (১৯১৮) হিন্দু-বৌদ্ধের পারস্পরিক সম্পর্কের ভাবকল্প রচনায় ভারতীয় হিন্দুদের আহ্বান করেছেন। বিশ্বধর্ম মহাসভায় হিন্দু-বৌদ্ধ সম্পর্ক বিষয়ে বিবেকানন্দ 'Buddhism, the Fulfilment of Hinduism' (26 September, 1893) বক্তৃতায় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের অন্যোন্যনির্ভরতার কথা বলেছিলেন।

সাময়িকপত্রের আলোচনায় বৌদ্ধধর্মের প্রসঙ্গে ইসলামধর্মের আলোচনা প্রায় নেই বললেই চলে। হিন্দু বা ব্রাহ্ম বা খ্রিস্টানদের মতো ইসলামধর্মের আলোচকরা ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিংশ

শতকের প্রথমার্ধে বৌদ্ধধর্ম নিয়ে প্রায় কিছুই লেখেন নি। এইক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর ফরাসী ভাষায় প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিটের থিসিস *Les Chants Mystiques de Kanna at de Saraha* (1928) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি এই গ্রন্থটি *Buddhist Mystic Songs* (Dacca University Studies, Vol. IV, No. II, January, 1940) নামে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুথির চর্যাগান, আধুনিক বাংলা রূপান্তর এবং ইংরাজি অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনিসহ প্রকাশ করেন। তিনি শাস্ত্রীর প্রস্তাবিত 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নাম বর্জন করে পুথির সূচনায় দেওয়া মঙ্গলাচরণ শ্লোকে প্রাপ্ত 'আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়' নাম ব্যবহার করেন। শহীদুল্লাহ কাহ্নপাদ ও সরহপাদের দোহাকোষের সম্পাদনা করে টীকা-টিপ্পনীসহ সম্পূর্ণ ফরাসি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। তিনি উভয় কবির বাংলা চর্যাগান, তাঁদের জীবনী ও ধর্মীয় ভাবনা, দোহা ও চর্যাগানের ব্যাকরণ পর্যালোচনা করেছেন। প্রবোধচন্দ্র বাগচীর তিব্বতী চর্যাগান প্রকাশের আগে তিনি সর্বপ্রথম তিব্বতী অনুবাদের ভিত্তিতে বাংলা চর্যাগানের পাঠ সংশোধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। *বাংলা সাহিত্যের কথা* প্রথম খণ্ডে (১৯৫৩) 'তান্ত্রিক বৌদ্ধ মত বা সহজযান' এবং 'চর্যাপদ প্রসঙ্গে' অধ্যায় দুটিতে তিনি চর্যাগীতি, কাহ্ন ও সরহপাদের সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মমত, লেখক-পরিচয়, গানগুলির সাহিত্যিক মূল্য, বাংলার সমাজচিত্র, বৌদ্ধগানের ভাষা, চর্যাপদের পাঠ আলোচনা, চর্যাপদের ছন্দ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*-এর 'উপক্রমণিকা' এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে চর্যাগান সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তাঁর চর্যাগান বিষয়ক প্রবন্ধগুলি হল – 'বৌদ্ধগান ও দোহা: আলোচনা' (*বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ*, ৪ সংখ্যা, ১৩২৭), 'ভুসুকু' (*বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ*, ১ সংখ্যা, ১৩৪৮), 'বৌদ্ধগান ও দোহার পাঠ আলোচনা' (*বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ*, ২ সংখ্যা, ১৩৪৮), 'সিদ্ধ কানুপার দোহা ও তাহার অনুবাদ' (*বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ*, ১ সংখ্যা, ১৩৪৯), 'চর্যাপদের পাঠ-আলোচনা' (*সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২ সংখ্যা, শীত, ১৩৭০)। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনেক মুসলমান তাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

কোন কোন যুক্তিবাদী তাত্ত্বিকদের কাছে বুদ্ধের বিদ্রোহী সত্তা, যুক্তিবাদ, জাতিভেদ বিরোধিতা, নাস্তিকতা, সমাজমনস্কতা গুরুত্ব পেয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রশংসা বা সমালোচনার অত্যন্ত তাৎপর্যময় ধারার অনুসরণকারীর সংখ্যা কম হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারার মাত্রাগত ভেদে তাঁরা নিজেদের কেবল

তত্ত্বচর্চায় বৃত না রেখে রাজনীতিমুখী হয়েছেন বা রাজনীতির সাপেক্ষে বৌদ্ধবিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে *পরিচয়*-এর (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৩১, সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) মালিকানা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির হাতে হস্তান্তরিত হয়। পত্রিকা পরিচালনার প্রত্যক্ষ ভার দেওয়া হয় প্রগতি লেখক সংঘের হাতে। যুক্তিবাদ, নাস্তিকতা, সমাজতত্ত্ব, বিপ্লব, লোকায়ত প্রভৃতি নানা ধারাকে *পরিচয়* নিজের মধ্যে লালন করেছিল। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ভাবনা, দর্শন এই ধারা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। আধুনিক বাঙালির কাছে বৌদ্ধ ভাবনা যে চিন্তন ও মননের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে তা ধারাবাহিক চর্চার মাধ্যমে *পরিচয়* দেখিয়ে দিয়েছে।

বর্তমানে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন কেবলমাত্র ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। এইপ্রসঙ্গে ‘Green Buddhism’, ‘Engaged Buddhism’, ‘Applied Buddhism’ প্রভৃতির কথা বলা যায়। বৌদ্ধদর্শনের মধ্যে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা চিরকালীন, তাই বিশ্বধর্ম ও দর্শন রূপে তার সমাদর ও অনুসন্ধান উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। বর্তমানে পরিবেশ রক্ষা ও বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক।

টীকা, উৎস ও অনুষঙ্গ

১। ঊনবিংশ শতকের প্রেক্ষাপটে 'দয়া'র ধারণা যে কত বৈচিত্র্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সেই সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: গুহ, রণজিৎ। (২০১২)। *দয়া রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা*। কলকাতা: তালপাতা।

২। শীলভদ্র, ভিক্ষু। (অনূদিত)। (২০১১)। *দীঘ নিকায়*। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ-৬। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। ২১২ – ২২৪

৩। বড়ুয়া, দীপককুমার। (২০০৮)। *বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা। পৃ. ১৪ – ১৫

৪। *মিলিন্দ প্রশ্ন*, 'লক্ষণ প্রশ্ন', 'দ্বিতীয় বর্গ'-এ পুনর্জন্ম সম্পর্কে একটি সুন্দর উদাহরণ রয়েছে। রাজা মিলিন্দ আচার্য নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করেন যে যিনি পুনর্জন্ম গ্রহণ করবেন না তিনি কি জানতে পারেন যে তিনি পুনর্জন্ম গ্রহণ করবেন না? নাগসেন জবাবে বলেন যে আবার জন্ম গ্রহণের যা হেতু ও প্রত্যয় (কারণ) তাঁর উপসম হলেই তিনি এই কথা জানতে পারেন। উপমা দিয়ে তিনি বলেন যদি কোন কৃষক-গৃহপতি খেত কর্ষণ ও বপন করে ধান্যাগার পূর্ণ করে আর অন্য সময় কর্ষণ-বপন না করে সঞ্চিত ধান ভোগ, বিতরণ বা প্রয়োজন অনুসারে খরচ করেন, তবে কি তিনি জানতে পারেন না যে তাঁর ধান্যাগার আর পূর্ণ হবে না? মিলিন্দ বলেন যে ধান্যাগার পরিপূর্ণের যা হেতু ও প্রত্যয় তাদের উপশম হেতু তিনি এইকথা জানতে পারেন। নাগসেন বলেন, এইভাবেই পুনর্জন্মের সকল হেতু ও প্রত্যয় নষ্ট হলেই তিনি জানতে পারেন যে তিনি পুনর্জন্ম গ্রহণ করবেন না। মহাস্থবির, ধর্মাধার। (অনূদিত)। (২০১৩)। *মিলিন্দ-প্রশ্ন*।কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ৩৬ – ৩৭

৫। বড়ুয়া, দীপককুমার। (২০০৮)। *বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা। পৃ. ১৫ – ১৬

৬। শীলভদ্র, ভিক্ষু। (অনূদিত)। (২০১১)। *দীঘ নিকায়*। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ-৬। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। ২১২ – ২২৪

৭। বড়ুয়া, দীপককুমার। (২০০৮)। *বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা। পৃ. ১৬

৮। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৭ – ১৮ এবং ভট্টাচার্য, বেলা। (সম্পাদিত)। (২০০৭)। *বৌদ্ধকোষ*। ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য: ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০০৩)। *শান্তিনিকেতন*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। সপ্তম খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ৬৪৫ – ৬৪৯

৯। শীলভদ্র, ভিক্ষু। (অনূদিত)। (২০১৫)। ভিক্ষু, সুমনপাল। (সম্পাদিত)। *সুত্ত নিপাত*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ১৫৮

১০। বড়ুয়া, দীপককুমার। (২০০৮)। *বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা। পৃ. ১৯

১১। ভট্টাচার্য, বেলা। (সম্পাদিত)। (২০০৭)। *বৌদ্ধকোষ*। ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৮৫৫

১২। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদিত)। (২০১৩)। *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ৩৯২

১৩। দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। (২০০৪)। *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। পৃ. ১৭

১৪। ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ। (২০০৪)। *বৌদ্ধদের দেবদেবী*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন। পৃ. ১১১ – ১১৩

১৫। মহাস্থবির, ধর্মাধার। (অনূদিত)। (২০১৩)। *মিলিন্দ-প্রশ্ন*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ১০৮ – ১১২

১৬। ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ। (২০০৪)। *বৌদ্ধদের দেবদেবী*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন। পৃ. ১১১ – ১১২

১৭। বড়ুয়া, দীপককুমার। (২০০৮)। *বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা। পৃ. ১৯

১৮। দ্রষ্টব্য: মহাথের, ধর্মপাল। (২০০২)। *সদ্ধর্ম রত্নমালা*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা। পৃ. ১০৬ – ১০৭ ও শীলভদ্র, ভিক্ষু। (অনূদিত)। (২০১৫)। ভিক্ষু, সুমনপাল। (সম্পাদিত)। *সুত্ত নিপাত*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ৩১

১৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূলচন্দ্র। (১৯৬৬)। *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়। পৃ. ৪৪ – ৪৫

২০। রামদাসকৃত শুক্লধর্মের টীকাটি উদ্ধৃত হল –

> শুক্লধর্ম অর্থাৎ অহিংসা ধর্ম্ম। অহিংসা ধর্ম্মের শুক্ল সংজ্ঞা বৌদ্ধ ভাষার অন্তর্গত নহে। ইহা সংস্কৃত ভাষার অন্তর্গত। বেদ হইতে আকর্ষণ করিয়া প্রথমতঃ ব্যাস তৎপরে পতঞ্জলি, ইহার ব্যবহার করিয়াছিলেন।

২১। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: মহাস্থবির, ধর্ম্মরত্ন। (সংকলিত ও অনূদিত)। (১৯৪১)। মহাপরিনিব্বান সুত্তং। চট্টগ্রাম: প্রবর্ত্তক প্রেস।

২২। রামদাস প্রবন্ধে মিনিন্দ বা মিলিন্দ সম্পর্কে টীকায় লিখেছেন –

> ইনি যোন বা যবন রাজ মিনিন্দ (Bactrian King Menander) ভারতবর্ষীয় কোন কোন স্থলে ইনি খ্রীষ্ট জন্মের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্য করিয়াছিলেন। দেবামানত্ত্বিয় (Demetrius) ইঁহার পারিষদ ছিলেন। মিনিন্দের সহিত নাগসেনের ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর পালিভাষার "মিনিন্দপত্নে" লিখিত আছে।

২৩। Jecobs, Josaphat. (Edited and Induced). (1895). Introduction. *Barlaam and Josaphat*. London: David Nutt, in the Strand. p. xv

২৪। অভিষেক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: শাস্ত্রী হরপ্রসাদ, 'বৌদ্ধ-ঘণ্টা ও তাম্রমুকুট। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২ সংখ্যা, ১৩১৭। সূত্র: শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (২০০১)। চৌধুরী, সত্যজিৎ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন। ভট্টাচার্য, সুমিত্রা। (সম্পাদিত)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ২৩৩ – ৩৬

২৫। কর্তাভজা সম্প্রদায় একসময় পশ্চিমবঙ্গের বাউল পন্থা শক্তিশালী একটি 'সংঘ' ছিল। প্রতিবছর দোল পূর্ণিমার সময় একটি মেলার অনুষ্ঠানে পূর্বস্মৃতি রক্ষিত হয়। চব্বিশ পরগণায় বারাকপুরে ঘোষপাড়া গ্রামে 'কর্তাবাবা' রামশরণ পালের বাড়িকে ঘিরে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় বহু বাউল ও ফকির সমবেত হয়। কর্তাভজা সম্প্রদায় সহজিয়া ধর্মের উপাসক এবং এঁদের তত্ত্ব ও সাধন-পদ্ধতি সারা বাংলায় একই শ্রেণির সাধন-পদ্ধতির সমগোত্রীয়। কর্তাভজা ধর্মের আদি-বৃত্তান্ত বা সহজতত্ত্ব প্রকাশ গ্রন্থের মতানুসারে এই ধর্মের আদি-প্রবর্তক 'ফকির-ঠাকুর' বা 'ফকির আউলচাঁদ', 'কর্তাবাবা' বা আদিগুরু রামশরণ পাল এবং আদি-প্রচারক তাঁর পুত্র দুলালচাঁদ। দ্রষ্টব্য: ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ। (২০০১)। *বাংলার বাউল ও বাউল গান*। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। পৃ. ৬১ – ৬২

এইচ. এইচ. উইলসন তাঁর *Hindu Religious or An Account of the Various Religious Sects of India* (2nd edition, 1899) গ্রন্থে কর্তাভজাদের সম্বন্ধে লিখেছেন –

> Kartā Bhajās … are a sect of very modern origin … by Ram Sundar Pal, a Gawala, an inhabitant of Ghospara, a village near Sukhsagar in Bengal. The chief popularity of this sect is the doctrine of the absolute divinity of the guru, at least being the present Krishna or deity incarnate, and whom they, therefore, relinquishing every other form of worship, venerate as their Ista Devatā or elected God … the innovation is nothing, in fact, but an artful encroachment upon the authority of the old hereditory teachers or Gossains, and an attempt has been so far successful that it gave affluence and celebrity to the founder, to which, as well as his father's sancity, the son, Ram Dulal Pal, has succeeded. It is said to have numerous disciples, the greater portion of whom are women. This distinction of caste is not acknowledged amongst the followers of the sect … they eat together … once or twice a year: the initiating Mantra is supposed to be highly efficacious in removing disease and barrenness, and hence many infirm persons and childless woman are induced to join the sect.

দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত। পৃ. ৬৫। ১৮৭২ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচটি সেন্সাসের গৃহীত বিবরণ Bengal District Gazetteers (Nadia)-এ হিন্দুজাতির ধর্ম সম্প্রদায়ের বিবরণে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এছাড়াও অক্ষয়কুমার দত্তের *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* গ্রন্থেও এই সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা রয়েছে। সূত্র: প্রাগুক্ত। পৃ. ৬৫ – ৬৭

২৬। ভিক্ষুরা দুই অষ্টমী চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপোস (পোষধ ব্রত) করে কেবল ধর্মকথা শুনবেন। এইদিনগুলিতে ভিক্ষু ও গৃহস্থ সবাই বিহারে এসে ধর্মচর্চা করবেন।

২৭। জাপানী পণ্ডিত সুজুকির মহাযান সম্পর্কিত মত হরপ্রসাদ উল্লেখ করেছেন। অশ্বঘোষের *মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূত্র* তর্জমা করতে গিয়ে সুজুকি বলেছেন, অশ্বঘোষের আগেও মহাযান মত চলত। দ্রষ্টব্য: Suzuki, Daisetz Teitaro. (1900). *Asvaghosha's discourse on the Awakening of Faith in the Mahayana*. তথ্যসূত্র: শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (২০০১)। চৌধুরী, সত্যজিৎ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন। ভট্টাচার্য, সুমিত্রা। (সম্পাদিত)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ৩৪৯

২৮। 'দশভূমি' সম্পর্কে মহাবস্তু অবদান বলেছেন –

> যে শ্রীমান্ জিনগণ অনেক শত কল্পে আত্মা বা দেহ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাদের বৃত্তে বা চরিতে অপ্রতিম ধর্মদর্শনই হইল তাঁহাদের দশ ভূমি। হে পণ্ডিতগণ, এগুলিদ্বারা (অর্থাৎ দশ ভূমিদ্বারা) (তাঁহারা অর্থাৎ জিনগণ) বিকার বা পরিবর্তন লাভ করেন (বা বিভিন্ন প্রকারে কাজ করেন)।।

দ্রষ্টব্য: Basak, Radhagovinda. (1963). *Mahavastu Avadana*. Vol. I. Calcutta: Sanskrit College. p. 73

'দশভূমি'র দশটি দশা বা ভূমি হল – ১) দুরারোহা, ২) বর্ধমানা, ৩) পুষ্পমণ্ডিতা, ৪) রুচিরা, ৫) চিত্তবিস্তরা, ৬) রূপবতী, ৭) দুর্জয়া, ৮) জন্মনিদেশ, ৯) যৌবরাজ্য এবং ১০) অভিষেক। বোধিসত্ত্বদের ভূমিসমূহের পরিমাপ করা যায় না – যেহেতু অনেক ও অনন্ত কল্প পর্যন্ত সেগুলি থাকে। খণ্ডসংজ্ঞায় বা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় বোধিসত্ত্বদের সব সংসার বা প্রত্যেক জন্মকেই ভূমি বা পৃথিবীতুল্যা বলে পরিকল্পিত করা হয় – সেইজন্য এর নাম 'ভূমি' বলে গৃহীত হয়। বোধিসত্ত্বেরা কুশলমূল পরিপিণ্ডিত বা সমুচিত করে কৃতকার্য হয়ে নবম ভূমি সমতিক্রান্ত করে দশম ভূমির পরিপূরণ বা পূর্ণসম্পাদন করেছেন এবং যাঁরা তুষিতনামক ভবন প্রাপ্ত হয়ে (সেখান থেকে) মনুষ্যজন্ম আকাঙ্ক্ষা করে অপুনরাবর্তনের

জন্য অর্থাৎ এটিকেই শেষ জন্ম ধার্য করে মাতৃকুক্ষিতে অবতীর্ণ হন। cf. Ibid. p. 87, 90, 167. এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: Ibid. p. 73 – 186

২৯। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (সম্পাদিত)। (২০১৫)। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পৃ. ৩৮, ৫৪

৩০। প্রাগুক্ত। পৃ. ৫৩, ৭৫

৩১। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩০

৩২। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২, ২১, ৩৩

৩৩। সন্ধ্যাভাষা সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'মুখবন্ধ'-এ লিখেছেন –

> সন্ধ্যা ভাষার মানে, আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উচু (উঁচু) অঙ্গের ধর্ম্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে।

প্রাগুক্ত। পৃ. ১২ [৮]

৩৪। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে সায়নাচার্যের মতবাদ বিস্তারিতভাবে অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য: চক্রবর্ত্তী, সত্যজ্যোতি। (১৪১৬)। সায়ণ মাধবীয় *সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্যশ্রী। পৃ. ১৭ – ৪৭

৩৫। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরে পাঁচশ বছরের মধ্যে তাঁর ধর্ম বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শেষদিকে অনেক সম্প্রদায় লুপ্ত হয়ে চারটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত বর্তমান থাকে। তাঁর মধ্যে দুটি মহাযানের (মাধ্যমিক ও যোগাচার) এবং দুটি থেরবাদের (সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক) অন্তর্গত। মূলত দুটি সমস্যা থেকে এদের উৎপত্তি – ১) সৎ (বস্তু বা চিৎসৎ) আছে কিনা? ২) বাহ্যজগত কীভাবে জানা যায়? এর মধ্যে প্রথমটি বিষয়ে তিনপ্রকার উত্তর পাওয়া যায়। ক) মাধ্যমিক শূন্যবাদীরা মনে করেন সৎ (বস্তু বা চিৎ) বলেকিছু নেই, সকলই শূন্য। খ) যোগাচারী বিজ্ঞানবাদীরা মনে করেন যে শুধুমাত্র চিৎসৎ আছে, বস্তুসৎ বা বাহ্যজগৎ বলে কিছুই নেই। গ) সর্বাস্তিবাদীরা মনে করেন যে বস্তুসৎ আছে, চিৎসৎও আছে। দ্বিতীয় সমস্যা বিষয়ে দুটি উত্তর পাওয়া যায়। ক) সৌত্রান্তিকরা মনে করেন যে বাহ্যজগত বলে কিছুই নেই, শুধু অনুমান করা যায় মাত্র। এইজন্য তাঁদেরকে বাহ্যানুমেয়বাদী বলা হয়। খ) বৈভাষিকরা মনে করেন যে বাহ্যজগত প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়। সর্বাস্তিবাদ থেকেই সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল।

বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদিত)। (২০১৪)। *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ. ৩৩৫ – ৩৭৬

৩৬। দশবস্তু সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যা ব্যাখ্যা করেছিলেন সেইগুলি এইরকম –

১) কপ্পতি সিঙ্গিলোণ কপ্লো: অনেক ভিক্ষু সিঙের মধ্যে একটু নুন রাখতেন। ভিক্ষার পর সবসময় পাতে নুন পেতেন না। তাঁরা সবসময় নুন দেওয়া ব্যঞ্জন পাতে পেতেন না। প্রাবন্ধিক অনুমান করেছেন, পাতে নুন দেওয়ার সঙ্গে এঁটোর অনুষঙ্গ এনেছেন। ভিক্ষুর নুন সঞ্চয়ের প্রসঙ্গে পুরনোপন্থীরা আপত্তি তুললে বলেন নবীনপন্থীরা বলেন – পাত্র, চীবর, শয়নাসন তো ভিক্ষুদের থাকে, তবে একটু নুন সঞ্চয়ে সর্বনাশ হবে না।

২) কপ্পতি দ্বঙ্গুল কপ্পো: বুদ্ধদেব প্রবর্তিত নিয়ম ছিল – দুপুর বেলা বারোটার আগেই ভিক্ষুদের আহার করতে হবে। এরপর খেতে হলে জল বা ফলের রস খেতে হবে। সেকালে লোকে বেলায় রাঁধত আর খেত। ভিক্ষুদের সেই বেলার রান্না ভিক্ষা করে এনে খেতে হত। দুপুরের মধ্যে খাওয়া সমস্যাকর হত, অনেকে আধপেটা বা অভুক্ত থাকতেন। নবীনপন্থীরা মনে করতেন – দুই প্রহরের সময় ছায়া যেরকম থাকে, তার থেকে দুই আঙুল ছায়া সরে গেলেও খাওয়া চলতে পারে। এই নিয়ে মতান্তর উপস্থিত হয়।

৩) কপ্পতি গামান্তর কপ্পো: ভিক্ষুরা একই গ্রামে ভিক্ষা করবে, একদিনে দুই গ্রামে যেতে পারবে না, নিয়ম ছিল। বুদ্ধদেবের নিয়ম ছিল – গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ গেলে ঘরে খেয়ে যেতে পারবে না। প্রাচীনপন্থীরা এই নিয়ম সমর্থন করলেও পরিবর্তনপন্থীরা বলে, গ্রামান্তরে যেতে গেলে যদি পেটে কিছু না থাকে তাহলে যেতে বড় কষ্ট হয়। খেয়ে গেলে দোষ কি? এও বিবাদের কারণ।

৪) কপ্পতি আবাসকপ্পো: এক এক মঠে অনেক ভিক্ষু বাস করতেন। আবাস শব্দের অর্থ ঘর, অন্য অর্থ পরগনা বা ডিহি। বুদ্ধদেব নিয়ম করেছিলেন যে এক জায়গায় যত ভিক্ষু থাকবেন, সব এক জায়গায় এসে উপোষথ (উপবাস বা উপোস) করে ধর্মকথা শুনবেন। অষ্টমী, পুর্ণিমা ও অমাবস্যা উপোষথের দিন। কিন্তু পরিবর্তনকামীরা বললেন – এই নিয়ম বড়ো কড়া, যাঁর যেখানে ইচ্ছা, সে সেখানে উপোষথ করবেন। পৃথক পৃথক হয়ে পোষধ করলে, উপাসকদের সুবিধা হয়, তাঁদের ধর্মকথা শোনাবার সুবিধা হয়, তাঁদের ধর্মকথা শোনাবার সুবিধা হয় এবং তাতে ধর্মবৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধেরা বললেন, সকলে একত্র বসে উপবাস করলে, লুকিয়ে খাবার সুবিধা হয় না, পৃথক পৃথক উপবাস করলে সেটার সুবিধা হয়। এই নিয়ে বিবাদের সূচনা হয়।

৫) কপ্পতি অনুমতি কপ্পো: বৌদ্ধদের সকল কর্মই সংঘে নির্বাহিত হত, অর্থাৎ বিহারের যত ভিক্ষু সকলে একত্র বসে বিহারের কার্য নির্বাহ করতেন। সকল ভিক্ষু উপস্থিত না থাকলে, কোনো কোনো বিহারের ভিক্ষুরা অনুপস্থিত ভিক্ষুদের অনুমতি পাওয়া যাবে, এরকম মনে করে কার্য নির্বাহ করে নিতেন। এই বিষয়টি যে বিতর্কের সৃষ্টি করবে তা সহজেই অনুমেয়।

৬) কপ্পতি আচিণ্ণ কপ্পো: গুরু প্রদর্শিত পথেই চলতে হবে। বৃদ্ধেরা তথাগতের উপদেশের ব্যতিক্রমের বিরুদ্ধে ছিলেন। নবীনরা বলেন, বরাবর চলে আসছে, গুরুও করেছেন, তবে তাঁদের করতে অসুবিধা কোথায়? এটিও অনেক বিতর্কের বিষয়।

৭) কপ্পতি অমথিত কপ্পো: দুই প্রহরের পর ভিক্ষুরা জল ও ফলরস খেতে পারবেন। 'আমওয়া' দই ভিক্ষুর পক্ষে খাওয়া নিষেধ। ভিক্ষু বলেন, এই নিষেধের মাখন ফলের রস নয়, জলও নয়, সুতরাং সেটা খাওয়া উচিত নয়। সুতরাং মাখন খাওয়াও যা, 'আমওয়া' খাওয়াও তাই বলে নিষিদ্ধ। সুতরাং এটাও বিবাদের কারণ।

৮) কপ্পতি জলোগি কপ্পো: তথাগত মদ খাওয়ায় নিষেধ করেছেন। মদ গেঁজে উঠবার আগে বা তাড়ির আগে জল বলে তা খাওয়াকে বৃদ্ধেরা বলেন মদ খাওয়া হল, অন্যদিকে নবীনেরা তা মানতে না চাওয়ায় বিবাদ উপস্থিত হয়।

৯) কপ্পতি অদসকং নিসীদনং: ছিলেহীন কাটা-ছাঁটা সুন্দর আসনে ভিক্ষুদের বসা নিষিদ্ধ। এতে বসলে উচ্চাসন বা মহাসনে বসা হবে অর্থাৎ তথাগতের আদেশ লঙ্ঘিত হবে বলে বৃদ্ধেরা মনে করেন। বিরুদ্ধবাদীরা তা মানতে অস্বীকার করলে বিবাদ উপস্থিত হয়।

১০) কপ্পতি জাতরূপ রজতন্তি: সোনারূপা গ্রহণ করতে তথাগত নিষেধ করেছেন। কিন্তু বৈশালীর ভিক্ষুরা ছলে ও কৌশলে সোনারূপা নিতেন। যেমন ভিক্ষুরা উপাসকদের জলভরা পাত্রে কাহাপন ফেলতে বলতেন। জলে ফেলা সোনারূপা ভিক্ষুরা না ছুঁলেও নিজেদের লোক দিয়ে খরচ করতেন। এই নিয়ে বৃদ্ধ আর বিরুদ্ধবাদীদের বিবাদ সূচিত হয়।

৩৭। চব্বিশজন বুদ্ধ হলেন – দীপংকর, কৌণ্ডিন্য, মঙ্গল, সুমনস, রেবত, শোভিত, অনোমদর্শিন্, পদ্ম, নারদ, পদ্মোত্তর, সুমেধাঃ, সুজাত, প্রিয়দর্শিন্, অর্থদর্শিন্, ধর্মদর্শিন্, সিদ্ধার্থ, তিষ্য, পুষ্য, বিপশ্যী, শিখী, বিশ্বভু, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি এবং কাশ্যপ।

৩৮। দীপংকর তাঁর মেঘ নামের এক ব্রাহ্মণ শিষ্যকে বলেছিলেন, অনাগতকালে তুমি শাক্যমুনি বুদ্ধ হবে, কপিলাবাস্তু তোমার জন্মভুমি হবে, শুদ্ধোদন তোমার পিতা হবে ইত্যাদি। এই চব্বিশজনের মধ্যে আরো দুই-চারজন শাক্যমুনি বুদ্ধ সম্পর্কে কিছুকথা বলে গেছেন।

৩৯। অনুমান করা যায় যে আর্যভট্ট (আনুমানিক ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর গাণিতিক গবেষণায় চব্বিশ সংখ্যাটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

৪০। প্রকৃতিচর্যায় বোধিসত্ত্ব মাতৃভক্ত, পিতৃভক্ত, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণে ভক্তিমান দশ কুশলকর্ম পথের পথিক, লোককে সর্বদাই দান ও পুণ্যকর্ম করতে উপদেশ দেন, বুদ্ধদের পূজা করেন, কিন্তু তিনি বোধিলাভে ইচ্ছুক নন। এরপর প্রণিধানচর্যায় বুদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়। এর পাঁচটি অংশ আছে, এক একটি অংশের নাম প্রণিধি। প্রথম প্রণিধি – আমি বুদ্ধ হব। দ্বিতীয় প্রণিধি – আমি বুদ্ধকে অনেক বস্তু দান করলাম। তৃতীয় প্রণিধি – যতকালই হোক, তাতে কিছু ক্ষতি নেই, আমাকে বুদ্ধ হতেই হবে। চতুর্থ প্রণিধি – বুদ্ধ ও সংঘের জন্য অনেক গুহা, অনেক বিহার দান করা। পঞ্চম প্রণিধি – জগৎ অনিত্য এটি বুঝতেই হবে। প্রণিধানচর্যার অনুকূল যা কিছু তা অনুলোমচর্যায় করতে হয়। অনিবর্তনচর্যায় বোধিলাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিত্ত অন্যদিকে ফিরে আসতে চায় না। চর্যার এই ব্যাকরণের নাম ব্যাখ্যা বা ভবিষ্যদ্‌বাণী। অর্থাৎ কোন বুদ্ধ তাঁর শিষ্য বোধিসত্ত্বকে বলে দেন যে তিনি ভবিষ্যতে কোন না কোন সময়ে বুদ্ধ হবেন।

৪১। শাক্যসিংহের প্রকৃতিচর্যার নিদান অপরিমিতধ্বজ বুদ্ধ। অতীতজন্মে শাক্যমুনি একজন চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। তিনি ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে দশ কুশলকর্মের পথিক হন। প্রণিধানচর্যায় শাক্যমুনি বুদ্ধের নিদান একজন অতীত শাক্যমুনি বুদ্ধ। তিনি তখন বণিকশ্রেষ্ঠী ছিলেন। তিনি বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে ভবিষ্যতে কপিলাবাস্তুর শাক্যমুনি বুদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। অনুলোমচর্যায় শাক্যমুনির নিদান সমিতাবী বুদ্ধ। তখন শাক্যমুনি বুদ্ধ একজন চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। এই চর্যার অনেক নিদানের মধ্যে দীপংকর বুদ্ধ তাঁর ব্যাকরণ করেছিলেন। দীপংকরের পরে আরো অনেক বুদ্ধ সেই ব্যাকরণের অনুব্যাকরণ করেছিলেন। সর্বাভিভু ভগবান বুদ্ধ অনু-ব্যাকরণ করেছিলেন। বিপশ্যী,

ক্রকুচ্ছন্দ, কাশ্যপ শাক্যমুনির ব্যাকরণ করেছিলেন। কাশ্যপ চক্রবর্তী রাজাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন। যৌবরাজ্যে অভিষেক থেরাবাদীদের মধ্যে নেই, চব্বিশ জনের বেশি বুদ্ধও নেই। কিন্তু মহাসাংঘিকদের মতে সহস্র সহস্র বুদ্ধ।

৪২। রাজার উৎপত্তি সম্পর্কে রাধাগোবিন্দ বসাক তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখেছেন –

> In analyzing the theory of state i.e. the philosophy of sovereignty, the ancient Indian political thinkers and teachers discussed the idea of the sinful aspect of human nature which always tends to interfere with the rights and liberties of others over their own security and property, and to violate morals and manners. Hence they thought that a governmental institution was a necessity for controlling and coercing human viciousness and wickedness and for keeping secure the life and property of the people, and also for preserving their assigned social duties. It is, they felt, the proper administration of the power of punishment (*daṇḍa*) by a kingly person that can save the society from passing into the condition of lawlessness and anarchy. They formed the opinion that the fear of indignation and punishment of such a kingly person ought to be the basis of the social order and of the ultimate welfare and security of the people. This political idea also struck the mind of the ancient Indian people. So we find the *Mahāvastu* telling us (I. 347 – 48), when it relates the history of the homes and origin of Śākyasand Koliyas, that being oppressed by the three sinful acts of (1) theft, (2) falsehood and (3) violence perpetrated by the anti-social elements in society on account of which there appeared in society wrong and injustice, people wandered hither and thither, met together, discussed and ultimately selected from amongst themselves the most worthy and authoritative person to be their king and they addressed the chosen person…

cf: Basak, Radhagovinda. (1963). *Mahavastu Avadana*. Vol. I. Calcutta: Sanskrit College. p. xix. ও Ibid. The lineage of kings, and the origin of the name of the Koliyas. p. 441 – 464

৪৩। *দীঘ নিকায়* চৌত্রিশটি সূত্র নিয়ে তিনবর্গে বিন্যস্ত – শীলক্‌খন্ধ বগ্‌গ, মহাবগ্‌গ ও পাটিক বগ্‌গ। পাটিক বগ্‌গের অন্তর্গত ‘অগ্‌গিঞ্‌ঞ সুত্ত’। এই সূত্রের প্রতিপাদ্যটি এইরকম – একদিন বুদ্ধ শ্রাবস্তির পূর্বারামে চংক্রমণ করছিলেবাসেট্‌ঠ এবং ভারদ্বাজ নামে দুইজন ব্রাহ্মণ বুদ্ধের কাছে গিয়ে ব্রাহ্মণদের জাতি শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করে বলেন যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ থেকে জন্মগ্রহণ করায় জাতিতে শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধ এই বক্তব্য খণ্ডন করে বলেন – পৃথিবীর সকল মানুষ মাতা-পিতার মাধ্যমে জন্ম নেয় এবং ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যতিক্রম হয় না। শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের নিজের জ্ঞানের মধ্যে নিহিত থাকে। তাই ধর্মই শ্রেষ্ঠ। যে কোন জাতিতে জন্ম নিয়ে মানুষ মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে ভুলকর্ম করেন। যাঁরা কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক কর্মে সংযত থাকেন এবং বোধিপক্ষীয় ধর্মের অনুশীলন করেন তাঁরা বর্তমান জন্মে সকল প্রকার আস্রব ক্ষয় করে বিমুক্ত হন যা দেবলোকে তথা মনুষ্যলোকে শ্রেষ্ঠ কর্ম।

দ্রষ্টব্য: সুগত, ভিক্ষু। (২০১১)। *ত্রিপিটক পরিচিতি*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা। পৃ. ৩৮

৪৪। শীলভদ্র, ভিক্ষু। (অনূদিত)। (২০১১)। *দীঘ নিকায়*। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ-৬। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ. ৪৩৮ – ৪৪৯

৪৫। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: চৌধুরী, সাধনকমল। (২০০৬)। *উপনিষদ ও বুদ্ধ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। Dharmapala, Anagarika Hewavitarne. (1997). *Buddhism in its Relationship with Hinduism*. Calcutta:

Maha Bodhi Book Agency. Oldenberg, Harmann. (1997), Shrotri, Shridhar B. (Translatrd). *The Doctrine of the Upaniṣadas and the Early Buddhism*. Delhi: Motilal Banarsidass Publications.

৪৬। বৌদ্ধদর্শন ও সাংখ্যদর্শনের সম্পর্ক বিষয়ে কুমারস্বামীর আলোচনার আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া হল –

> …to understand the cardinal of Buddhism, which differ chiefly from those of the Sāmkhya in their tacit denial of Purusha, or perhaps we should rather say, in their refusal to discuss aught but the nature of the 'soul' and the practical means of deliverance; Buddhism and the Sāmkhya, with the Vedānta no less, are agreed that pleasure and pain are alike suffering – for the impermanence of any pleasure constitutes an eternal skeleton at the feast.

cf. Coomaraswamy, Ananda K. (2003). *Buddha and the Gospel of Buddhism*, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited. এছাড়াও বৌদ্ধ ও খ্রিস্টধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে দ্রষ্টব্য: Yu, Chai-Shin. (1999). *Early Buddhism and Christianity*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited.

৪৭। বৌদ্ধেরা ঈশ্বর ও অপদেবতা বা শয়তানে বিশ্বাস না করলেও জৈনেরা তা করেন। কিন্তু বৌদ্ধদের মত বুদ্ধ বা জিনদের জৈনরা সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেন। মনিয়র উইলিয়মস লিখেছেন –

> Both Jainas and Buddhists – but especially Jainas – believe in the existence of gods and demons, and spiritual beings of all kinds, whom they often designate by names similar to those used by the Hindus. These may possess vast supernatural and extra-mundane powers in diffierent degrees and kinds, which they are capable of exterting for the benefit or injury of mankind; but they are inferior in position to the Jina or Buddha. They are merely powerful beings temporary heavens and hells.

cf. Muller, F. Max. Williams, Monier. Stephen, Reginald. Childers, Robert C. (1953). *Studies in Buddhism*. Calcutta: Susil Gupta (India) Ltd. p. 96

৪৮। Ibid. p. 112

৪৯। প্রবন্ধে আলোচিত 'প্রকাশিত' শব্দটি উইলিয়ম কেরী প্রমুখ খ্রিস্টান মিশনারিদের অনূদিত *বাইবেল*-এর 'নূতন নিয়ম' পর্বের 'যোহনের নিকটে প্রকাশিত বাক্য' অংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য: কলিকাতাস্থ বাপ্তিষ্ট মিশনারিগণ কর্ত্তৃক অনুদিত। (১৯০৯)। ধর্ম্মপুস্তক অর্থাৎ পুরাতন ও নূতন নিয়মের অন্তর্গত গ্রন্থসমূহ। কলিকাতা: ব্রিটিশ ও ফরেণ বাইবেল সোসাইটী। পৃ. ২৩৫ – ২৫০

৫০। Muller, F. Max. Williams, Monier. Stephen, Reginald. Childers, Robert C. (1953). *Studies in Buddhism*. Calcutta: Susil Gupta (India) Ltd. p. 83

৫১। Ibid. p. 83

৫২। Ibid. p. 83 – 84

৫৩। হরপ্রসাদ জানিয়েছেন যে মহাযানে নির্বাণ লাভের উপায়স্বরূপ একটি একটি করে ধ্যানীবুদ্ধমূর্তি – অমিতাভ, অক্ষোভ্য, বৈরোচন, রত্নসম্ভব ও অমোঘসিদ্ধি থাকত। চৈত্য বা স্তূপের চারদিকে চারটি তথাগতের মূর্তি – প্রথমে স্তূপের মধ্যে বৈরোচন, তাঁর জন্য স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গি কাটা না হওয়ায় ক্রমে তিনি অগ্নিকোণে আসীন হলেন। উপায়স্বরূপ শাক্যসিংহ বুদ্ধের স্তূপে স্থান না হয়ে বিহারের মাঝের মন্দিরে তাঁর স্থান হয়েছে। তখনকার বৌদ্ধদের মতে, তিনি পঞ্চ তথাগত বা ধ্যানীবুদ্ধের কলম মাত্র। ক্রমে এই পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের পাঁচটি শক্তি– লোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা ও আর্যতারিকা বহুকাল

যন্ত্রে পূজিত হবার পর ক্রমে মূর্তি হলেন। পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের পঞ্চ বোধিসত্ত্বদের মধ্যে প্রধান হলেন মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বর। বর্তমান কল্প অর্থাৎ ভদ্রকল্পে অমিতাভ প্রধান ধ্যানীবুদ্ধ, করুণার মূর্তি অবলোকিতেশ্বর তাঁর প্রধান বোধিসত্ত্ব। অবলোকিতেশ্বর (উৎসাহ অনুযায়ী বহু হাত, পা, মাথাবিশিষ্ট) ও তারাদেবী নানা রূপে পূজা পাওয়ার পর অনেক ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিনী, ভৈরব বৌদ্ধদের উপাস্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৫৪। প্রাণিহিংসার একান্ত বিরোধী বুদ্ধদেবের মুখ দিয়ে *তথাগত গুহ্যক*-এ গুহ্য সিদ্ধিলাভের জন্য বলানো হয়েছে – ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য হাতি, ঘোড়া, কুকুরের মাংস খাওয়া উচিত। তা না হলে অন্নগ্রহণ করবে। ব্রতধারী খাদ্য বা পেয় অল্পমাত্রায় আহার করবে। বিষ্ঠা, মুত্র ও মাংস সহযোগে তা প্রস্তুত করতে হবে। সর্বপ্রকার কামোপভোগ করে সেবা করলে (যেমন – সদাশয় চণ্ডালের বারো বছরের কন্যাকে সাধক বিশেষভাবে প্রত্যহ নির্জনে সেবা করলে) শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হবে।

৫৫। সহজিয়া বৌদ্ধধর্মে ব্যভিচার প্রবেশ করেছিল সন্দেহ নেই, সব ধর্মের ক্ষেত্রেই তা সত্য। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রবহমান তন্ত্রের ধারায় বিকৃতির দায় বৌদ্ধদের উপর চাপানোর পাশাপাশি বৌদ্ধ সহজিয়া তত্ত্ব না বুঝেই যুক্তি নয়, কেবল বিশ্বাসের দ্বারাই তিনি চালিত হয়েছিলেন –

> ... যে সকল তন্ত্র প্রচলিত আছে, বৌদ্ধেরাই তাঁহার আদিম স্রষ্টা। ঐ সকল তন্ত্র আমাদিগের বামাচারবাদ হইতে আরও ভয়ঙ্কর (উহাতে ব্যভিচার অতি মাত্রায় প্রশ্রয় পাইয়াছিল), এবং ঐ প্রকার immorality (চরিত্রহীনতা) দ্বারা যখন (বৌদ্ধগণ) নির্বীর্য হইল, তখনই [তাহারা] কুমারিল ভট্ট দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছিল।

দ্রষ্টব্য: বিবেকানন্দ, স্বামী। (২০১২)। স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত পত্র (ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০)। পত্রাবলী। *স্বামীজীর বাণী ও রচনা*। ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়। পৃ. ২৪৭

৫৬। চূড়ামণি দাসের চৈতন্যচরিত *গৌরাঙ্গবিজয়*-এ চৈতন্যের জন্মের পর সাধারণ মানুষের আনন্দ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বৌদ্ধরাও আছেন –

> বৌদ্ধ তার্কিক মৈমাংসিক বৈদান্তিক।
> সভাকার নাটে কহে ইবে দেখি ধিক।।
> সবলোকে নাচে কান্দে করে কিবা কাজ।
> ভাল লোক নাচে কান্দে না বাসএ লাজ।।

দ্রষ্টব্য: সেন, সুকুমার। (১৯৫৭)। (সম্পাদিত)। চূড়ামণি দাসের *গৌরাঙ্গবিজয়*। কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি। পৃ. ১৪

৫৭। উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম আবিষ্কারের ইতিহাস সম্পর্কে হরপ্রসাদ লিখেছেন – ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পণ্ডিত *ধর্ম্মকোষ সংগ্রহ* নামে একটি বৌদ্ধগ্রন্থ সংস্কৃতে লিখে হজসনের হাতে দেন। হজসনের নেপাল ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক গ্রন্থগুলির অনেক মালমসলা এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত। মহাযান বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে চীন, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে চীন ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত অনেক সংস্কৃত পুথির তর্জমা দেখতে পাওয়া যায়। হজসন পুথিগুলি নকল করে কলকাতা, পারিস ও লণ্ডনে পাঠিয়ে দেন। নেপাল রেসিডেন্সির ড্যানিয়াল রাইট অনেকগুলি তালপাতা ও কাগজের বৌদ্ধপুথি সংগ্রহ করে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিকে দেন। হজসন কলকাতায় যে পুথিগুলিকে পাঠান রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তার ক্যাটালগ লিখতে আরম্ভ করেন এবং হরপ্রসাদের সহায়তায় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে তা

The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal নামে বের হয়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে রাইট কেম্ব্রিজের পুথিগুলির ক্যাটালগ *Catalogue of Buddhist Sanskrit Mss. In the University Library of Cambridge* প্রকাশ করেন।

৫৮। আনুমানিক খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে যে বিশেষ শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য প্রচলিত ছিল তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবস্থার মুখোমুখি হয়ে বাংলা দেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছিল, মঙ্গলকাব্যগুলিতে তার পরিচয় রয়েছে। অশোকের সময় থেকে সমগ্র ভারতে বৌদ্ধধর্মের একাধিপত্যের প্রতিক্রিয়ারূপে জনগণের অবলম্বিত ধর্মবিশ্বাস ও হিন্দুধর্মের মূলগত আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য করে এক নবসংস্কার প্রবুদ্ধ হিন্দুধর্মের উন্মেষ হয়েছিল। পালরাজাদের মময় থেকেই সম্ভবত বাংলায় প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে স্থানীয় কতগুলি লৌকিক ধর্ম সংস্কারের সংমিশ্রণ সূচিত হয়েছিল। তাঁর ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মিশ্র কতগুলি লৌকিক ধর্মমতের উদ্ভব হয়েছিল। মঙ্গলকাব্যের মিশ্রসত্ত্ব লৌকিক দেবতাই মঙ্গলদেবতা। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন যে মঙ্গলকাব্যের দেবতার চরিত্রমাত্রই অমঙ্গলকারী। অতেব এদের অমঙ্গলকারিণী শক্তিকে প্রশমিত করার কিংবা মনোমধ্যে এর বিষয় স্থান না দেবার প্রবৃত্তি থেকেই তাঁদের মাহাত্ম্যসূচক গানকে মঙ্গলগান বলে উল্লেখ করা হয়। মঙ্গলদেবতা যেমন – মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, শিব প্রমুখ।

দ্রষ্টব্য: মঙ্গলদেবতা ভট্টাচার্য, আশুতোষ। (২০১৫)। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*। কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ ও সপ্তর্ষি প্রকাশন। ৮ ১১, ৪৫

৫৯। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে আদমশুমার অনুযায়ী বিহার, উড়িষ্যা এবং অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী ১৮,৭০৭ জন সরাক জাতীয় মানুষের মধ্যে ১৬,৬৫৯ জন হিন্দু, ২১৫ জন জৈন এবং ১,৮৩৩ জন বৌদ্ধ।

দ্রষ্টব্য: Gait, E. A., (1911), Census of India, Vol-I, part II Tables, p. 222. দ্রষ্টব্য: শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (২০০১)। চৌধুরী, সত্যজিৎ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন। ভট্টাচার্য, সুমিত্রা। (সম্পাদিত)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ৪০২

৬০। এর প্রধান গুরু ভীমভোই বা ভীমসেন ভোই অরক্ষিতদাসের প্রধান গ্রন্থের নাম *কলি ভগবত*, তাঁর বহু ভজন ও পদাবলী রয়েছে। ভীমভোই একবার সদলবলে পুরীর মন্দির দখল করতে গিয়ে মার খেয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। *যশোমতী মালিকা* গ্রন্থে এই ধর্মের ইতিহাস পাওয়া যায়। মহিমাধর্মের মতে বুদ্ধদেব অলেখ ব্রহ্মের উপাসনা প্রচার ও জগৎ উদ্ধারের জন্য বোধ মহলের গোলাসিংহা নামক স্থানে বাস করেছিলেন। জগন্নাথদেব নীলাচল ছেড়ে বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা করে তিনি কার আজ্ঞায় এসেছেন জিজ্ঞাসা করলে অলেখের আজ্ঞার কথা জানিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব জগন্নাথকে সমাধিস্থ হয়ে কপিলাশে থাকতে বললে তিনি বারো বছর দুধ ও জল খেয়ে কপিলাশে ছিলেন। সমাধির শেষে জগন্নাথ ভীমভোইয়ের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়ে অন্তর্ধান হয়েছিলেন। বুদ্ধের উদ্দেশে লেখা ভীমভোইয়ের গান আংশিক উদ্ধৃত হল –

অনাকার অরূপ ব্রহ্ম-মূরতি হে।

... ...

ভকত হিতকারী করুণা কৃপাধারী,
মায়াসিন্ধুসাগরু এবে উধার করি,
পিণ্ডপ্রাণকু দেই কর ভকতি করি।
...   .
নির্ব্বেদরু প্রকাশ মহিমা দীক্ষা রস,
ভজি যেতে পারিব জীব পুর্ব্ব কল্মষ,
তেবে পাইব সদগতি মুকতি হে।।

৬১। বেণীমাধব বড়ুয়ার *সিলোন লেকচার্স* থেকে নির্বাচিত অংশের অনুবাদ করেছেন অজিতকুমার বড়ুয়া। *জগজ্জ্যোতি* বুদ্ধ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৫৯-য় অনুবাদটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

দ্রষ্টব্য: চৌধুরী, হেমেন্দুবিকাশ। (১৯৯৫)। (সম্পাদিত)। বড়ুয়া, বেণীমাধব। বুদ্ধের মহত্ত্ব ও অবদান। *জগজ্জ্যোতি* বুদ্ধচর্চা বিষয়ক প্রবন্ধ সঙ্কলন। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা। পৃ. ১৬

৬২। চৌধুরী, হেমেন্দুবিকাশ। (১৯৯৫)। (সম্পাদিত)। রেজাউল করীম। বুদ্ধদেবের আদর্শ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৯

৬৩। United Nations Treaty Series (Vol. 299)-এ 'পঞ্চশীল' বা 'Five Principles of Peaceful Coexistence' ভারতবর্ষ এবং জনগণতন্ত্রী চীনের সম্পর্কের নির্ধারক পাঁচটি নীতি। চীন এবং ভারতবর্ষের তিব্বত অঞ্চল সংক্রান্ত বাণিজ্য এবং অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এই চুক্তি (২৯ এপ্রিল, ১৯৫৪) চীনের পিকিং-এ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। পঞ্চশীলের পাঁচটি নীতি হল – ১ ও ২। প্রত্যেকের অপরের ভূখণ্ডের উৎকর্ষ ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন; ৩। পারস্পরিক অনাগ্রাসী অবস্থান; ৪। প্রত্যেকে অপরের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা; ৫। পারস্পরিক লাভের স্বার্থে সাম্য এবং সহযোগিতা। পৃথিবী রক্ষার্থে শান্তির সপক্ষে, যুদ্ধ, ধ্বংস ও হত্যালীলার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে এই নীতি কার্যকরী ও অবিকল্প।

চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য

ভূমিকা

ত্রিপিটক বৌদ্ধ পারিভাষিক অর্থে বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি সম্বলিত বিরাট শাস্ত্র। সাধারণত *সূত্রপিটক, বিনয়পিটক* ও *অভিধর্মপিটক* – এই তিনটি ত্রিপিটকের ক্রম। অনেকসময় বৌদ্ধেরা সূত্রের স্থানে বিনয়কে প্রথমে রেখেছেন। স্থবিরবাদ সম্প্রদায়ের মত অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির বিভিন্ন ভাষায় রচিত ত্রিপিটক ছিল। থেরবাদ বা স্থবিরবাদের ভাষা ছিল পালি, সর্বাস্তিবাদের মিশ্র সংস্কৃত, সম্মিতীয়দের অপভ্রংশ ও মহাসাংঘিকদের প্রাকৃত। মহাসাংঘিকদের সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম, প্রকীর্ণক এবং ধারণী – এই পাঁচভাগে বিভক্ত পিটক ছিল। স্থবিরবাদীদের পালি ত্রিপিটক ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ ত্রিপিটক পাওয়া যায় নি – মূলগ্রন্থ অধিকাংশই বিলুপ্ত। তবে দুই একটি সম্প্রদায়ের মূলগ্রন্থ তিব্বতী ও চীনা অনুবাদে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সর্বাস্তীবাদের ত্রিপিটকের সূত্র, বিনয় ও অভিধর্মের কয়েকটি গ্রন্থের খণ্ডিত পুথি মধ্য এশিয়া ও গিলগিটে (কাশ্মীর) পাওয়া গেছে। এই ত্রিপিটকের ভাষা ছিল সমীকৃত আংশিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত যা মিশ্র সংস্কৃত বা বৌদ্ধ সংস্কৃত (মধ্য ভারতের চলতি ভাষা) নামে পরিচিত।[১]

বুদ্ধদেবের মুখের ভাষা পালি মাগধীতে রচিত স্থবিরবাদের সম্পূর্ণ ত্রিপিটক পাওয়া যায়। অনেকের মতে এটি পালি পৈশাচী প্রাকৃত ভাষার সাহিত্যরূপ। কেউ কেউ পালিকে কলিঙ্গের ভাষা, আবার অনেকে শৌরসেনী প্রাকৃতকেই পালির বুনিয়াদ বলেছেন। কথিত রয়েছে সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সমস্ত ত্রিপিটক শাস্ত্র মুখস্ত করে সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য সিংহলে যান। খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে রাজা বট্টগামিনীর নির্দেশে সিংহলে এই ত্রিপিটক প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। সিংহলী বৌদ্ধদের মতে সিংহলে সংকলিত ত্রিপিটক ও সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সংগীতিতে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৫) সংকলিত ত্রিপিটক এক ও অভিন্ন। অনেকে সিংহলী ত্রিপিটককে একটি সংস্করণ বলেছেন। মূল মাগধী ভাষায় রচিত ত্রিপিটক থেকে পালি ও সংস্কৃত ত্রিপিটক উদ্ভূত – কেউ কেউ একথাও বলেন। প্রাপ্ত সংস্কৃত ত্রিপিটকের খণ্ডিতাংশ থেকে এই মত সমর্থিত হয়।[২] খ্রিস্টপূর্ব যুগে পালি ত্রিপিটক ভারতবর্ষে সংকলিত হলেও পরবর্তীকালে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড ও কম্বোডিয়ায় শত শত পালি টীকাগ্রন্থ,

অনুটীকা, সারগ্রন্থ, কাব্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি সংকলিত হয়েছিল।[৩] রচিত এই গ্রন্থগুলি সাহিত্য ও দর্শনের ইতিবৃত্তের দিক থেকেও অত্যন্ত মূল্যবান।

বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটকে নয়টি বিভাগ দেখা যায়। যথা – ১) সুত্ত (সূত্র) – গদ্যে উপদেশ; ২) গেয্য – গদ্যে ও পদ্যে ধর্ম উপদেশ; ৩) বেয্যাকরণ (ব্যাকরণ) – ব্যাখ্যা, টীকা; ৪) গাথা – শ্লোক; ৫) উদান – সারগর্ভ বচন; ৬) ইতিবুত্তক – ক্ষুদ্র ভাষণ; ৭) জাতক – বুদ্ধের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত; ৮) অব্ভূত ধম্ম (অদ্ভূত ধর্ম) – অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ এবং ৯) বেদল্ল – প্রশ্নোত্তর ছলে ধর্মোপদেশ বা নবাঙ্গশাস্তাশাসন (নবঙ্গসত্থুসাসন)। পালিসাহিত্যে এই নয় সাহিত্যের নয় প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি নয়। এগুলি নয় প্রকার রচনার নিদর্শন। কারণ, *থেরগাথা, থেরীগাথা, ইতিবুত্তক* এবং *জাতক*-এ গাথা, ইতিবুত্তক ও জাতক জাতীয় রচনার লক্ষণ পাওয়া যায়। *অঙ্গুত্তর নিকায়*-এ এই নয় প্রকার রচনারই লক্ষণ রয়েছে।[৪]

আধুনিক সাহিত্যকে শ্রীবৃদ্ধি দান করার ক্ষেত্রে বৌদ্ধসাহিত্যের অবদান উপেক্ষনীয় নয়। আপাতভাবে বৌদ্ধ *জাতক*-এর গল্পগুলি *ঈসপের গল্প* বা সংস্কৃত *পঞ্চতন্ত্র* প্রভৃতির অনুরূপ ও তাদের সঙ্গে এক শ্রেণিভুক্ত। বৌদ্ধধর্মের মহিমা প্রচার ও বুদ্ধের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দানই এদের উদ্দেশ্য হওয়ায় অনৈসর্গিক, অতিপ্রাকৃত ব্যাপার এদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। প্রচুরতর বাস্তব রসধারা, সবজায়গায় সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, গল্প বলবার বিশেষ নিপুণতা ও কৌশল এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ এদেরকে সমজাতীয় অন্যান্য গল্প থেকে পৃথক করে রেখেছে।[৫]

গল্প হিসাবে বৌদ্ধজাতকগুলি *পঞ্চতন্ত্র* ও *ঈসপের গল্প* থেকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। বাস্তব-জীবনের চিহ্ন, বাস্তব সমস্যার ছাপ এদের প্রত্যেকটির উপর গভীরভাবে মুদ্রিত। হিন্দুধর্মে কোন বিরল প্রয়োজন ছাড়া তপোবন ও গার্হস্থাশ্রমের মধ্যে কোনো চিরস্থায়ী সংযোগ-সেতু নির্মিত হয় নি। বৌদ্ধধর্মে এর সম্পূর্ণ বিপরীতে আশ্রম ও গার্হস্থজীবনের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ রয়েছে। ভিক্ষুরা প্রতিদিনই গ্রাম বা নগরের মধ্যে ভিক্ষাচর্যা ও ধর্মদেশনার জন্য গিয়ে গৃহস্থজীবনের সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত হতেন। গ্রামবাসীরা তাঁদের প্রত্যেক তুচ্ছ কলহ বা অশান্তির কারণ নিয়ে বুদ্ধের কাছে নিবেদন করতে আসতেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সমাধানের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ নিয়ে ফিরতেন। এই সাধারণ জীবনের সঙ্গে নৈকট্যই বৌদ্ধ জাতকগুলির গল্পাংশে উৎকর্ষের কারণ হয়েছে। ভিক্ষুদের ধর্মজীবনের সমস্যা, নানা প্রলোভন, ধর্মবিষয়ক প্রত্যেক প্রকারের মতভেদ ও বাদানুবাদ, ভিক্ষুদের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য ও ঈর্ষা,

ধর্মোপদেশ পালনে নিষ্ঠা ও শৈথিল্য, ভক্তি ও ভণ্ডামি ইত্যাদি বিষয়ে একটি নিখুঁত জীবন্ত ছবি জাতকের মধ্যে অঙ্কিত হয়েছে। নানা প্রকারের বাস্তবজীবনের ঘটনার সন্নিবেশে জাতকগুলি বিশেষ উপভোগ্য ও সরস হয়ে উঠেছে। আবার গার্হস্থ্যজীবনের বর্ণনাতেও এই বাস্তবতার প্রাধান্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। বিষয় নির্বাচনে ও বর্ণনাভঙ্গিতে একটা নূতনত্ব, সাধারণ পরিচিত প্রণালীকে অতিক্রম করবার চেষ্টা সর্বত্রই পরিস্ফুট। সাধারণত গল্প যে সমস্ত বাঁধাধরা গতানুগতিক ঘটনাতে আবদ্ধ থাকে, জাতকে তা হয় নি। জাতকের গল্পগুলির মধ্যে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ লোকের কাহিনি যে পরিমাণে স্থান পেয়েছে, ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের অন্য কোনো বিভাগে তেমন দেখা যায় না। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে জনসাধারণের যেমন প্রভাব দেখা যায়, হিন্দুধর্মে ও সংস্কৃত সাহিত্যে তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। উচ্চশ্রেণির বর্ণনাগুলি অনেকটা মামুলি ধরণের ও বিশেষত্ব বর্জিত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণির চিত্রে জাতকের গল্পগুলির সত্যানুরাগ ও বাস্তবানুগামিতার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার বুদ্ধচরিত্র এখানে যথাসম্ভব অতিরঞ্জিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বোধিসত্ত্বের চরিত্র বর্ণনায় বাস্তবানুরক্তির পরিচয় দিয়ে জাতকে আশ্চর্য সাহস দেখানো হয়েছে, তা প্রাচীন সাহিত্য দুর্লভ।[৬] *জাতক* সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য –

> প্রাচীন সাহিত্যে বাস্তবতার এই বিরাট দৈন্যের মধ্যে জাতকগুলির বাস্তব প্রতিবেশ যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য বস্তুর ন্যায় আরও উপভোগ্য হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যে ঔপন্যাসিক উপাদানের প্রাচুর্য দেখিয়া সত্যই মনে হয় যে, পরবর্তী যুগে যদি এই গল্পের ধারা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত থাকিত, বাস্তবের সহিত নিবিড় স্পর্শের বাধা না ঘটিত, তবে বোধ হয় আমারাই সর্বপ্রথমে উপন্যাস-আবিষ্কারের গৌরব লাভ করতে পারতাম...।[৭]

চর্যাগান বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন। এর থেকে আধুনিক কবিতা, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ সমালোচনা সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রের নানা ক্ষেত্রে বৌদ্ধ প্রভাবের চিহ্ন রয়েছে। সাম্প্রতিক সাহিত্যেও বৌদ্ধ নিদর্শন অপ্রতুল নয়।

নির্বাচিত সাময়িকপত্রে প্রকাশিত সাহিত্য রচনায় বৌদ্ধপ্রসঙ্গ

চর্যাগান

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষে বাংলা পুথি সংগ্রহের দায়িত্ব পেয়ে ১৮৯৭ – ৯৮ খ্রিস্টাব্দে দু'বার নেপালে যান। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বার নেপাল গিয়ে রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে *চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়*, সরোরুহবজ্র বা সরহের *দোহাকোষ*-এর সঙ্গে অদ্বয়বজ্রকৃত সংস্কৃত টীকা, কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নপাদের একটি *দোহাকোষ* এবং *ডাকার্ণব* নামে আরেকটি মহাযোগিনীতন্ত্রের পুথি পান। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে *চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়*, সরহ ও কাহ্নের *দোহাকোষ* ও টীকা এবং *ডাকার্ণব* – এই চারটি পুথি একসঙ্গে *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* নাম দিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশ করেন।[৮] এই গ্রন্থ প্রকাশের পর চর্যাগীতির ভাষা, তার সময়কাল ইত্যাদি নিয়ে পণ্ডিতমহলে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিধুশেখর শাস্ত্রী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন চর্যাগীতির নানা বিষয়ে হরপ্রসাদের মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে পারেননি। প্রিয়রঞ্জন সেন বিভিন্ন পূর্বাঞ্চলীয় ভাষার সঙ্গে চর্যাগীতির ভাষার সাদৃশ্য দেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যে সাধারণ ভাষা থেকে বাংলা, ওড়িয়া, মৈথেলী, অসমিয়া, হিন্দি ভাষার উদ্ভব হয়েছে, চর্যাগীতিগুলি সেই ভাষায় লিখিত হয়েছে। পরবর্তীকালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, অতীন্দ্র মজুমদার প্রমুখ চর্যাপদের উপর নানা বিতর্কের সমাধান করতে উদ্যোগী হন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বিজয়চন্দ্র মজুমদার চর্যার সময়কাল, কবিদের জাতিপরিচয় এবং চর্যার ভাষা নিয়ে এক সার্বিক বিতর্কের সূত্রপাত করেন। কার্যত, তিনি তৎকালীন গৃহীত সকল সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে চর্যাগান চর্চায় নূতন প্রস্তাবনা করেন।[৯] *বঙ্গবাণী*-তে প্রকাশিত তার প্রবন্ধগুলি হল – 'বৌদ্ধগান ও দোহা আলোচনার ভূমিকা' (পৌষ, ১৩৩২), 'চর্যার ও দোহার রচয়িতাদের পরিচয়' (মাঘ, ১৩৩২), 'বৌদ্ধগান ও দোহার ভাষা' (চৈত্র, ১৩৩২) ও 'বৌদ্ধগানে কাহ্নুর রচনা' (কার্তিক, ১৩৩৩)।

হরপ্রসাদ সম্পাদিত *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* বৌদ্ধদের রচনা কিনা, তা 'হাজার বছরের পুরাণ' কিনা আর তার ভাষা 'বাঙ্গালা' কিনা – এই কয়েকটি কথাই নিপুণভাবে বিজয়চন্দ্র বিচার করতে চেয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে হরপ্রসাদ 'নিপুণ বিচার' করেননি। ভাষাতত্ত্বের ও প্রাচীন বাংলার সামাজিক অবস্থার বিচারের জন্য ওই রচনাগুলি আলোচনার প্রয়োজন আছে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে তিনি 'বৌদ্ধগান ও দোহা আলোচনার ভূমিকা' প্রবন্ধটি লিখেছেন। প্রাবন্ধিক অভিযোগ করেছেন হরপ্রসাদ মূল পুথিগুলি নিজের কাছে রেখে অন্যের সাহায্যে ছাড়াই তা সম্পাদনা করেছেন। তিনি পুথিগুলি নেপালে ফেরৎ পাঠানোয় পাঠের বিশুদ্ধতা ও গ্রন্থের প্রামাণিকতা বিচার করার

ক্ষেত্রে সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছে। গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদিত পুথি অন্যান্য পণ্ডিতদের দিয়ে পরীক্ষা ও বিচার করানোটাও জরুরি যা হরপ্রসাদ করেননি বলে বিজয়চন্দ্র অভিযোগ করেছেন। তিনি রচনাগুলির ছন্দ, রাগ বা সুর ও টীকা অবলম্বিত পাঠ ধরে সম্পাদিত গ্রন্থের কিছু ভুল চিহ্নিত করেছেন। তাঁর অভিযোগ – সম্পাদক একদিকে অসাবধানে ভুল পদ্ধতিতে পুথি পড়েছেন এবং অন্যদিকে সেই ভুল পাঠের ভিত্তিতে প্রাচীন প্রাকৃতের ব্যাকরণ সম্বন্ধে ভুল সিদ্ধান্ত করেছেন। এই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল – হরপ্রসাদ তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের মুখবন্ধে পদকর্তাদের গানের প্রত্যেক কথার সূচি প্রস্তুত করতে তাঁর 'ভ্রমণকারী পণ্ডিত' ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর 'পুথিখানার মালিক' বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সাহায্যের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।[১০] কাজেই গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে অন্যান্য পণ্ডিতদের সহযোগিতা ব্যাতিরেকেই হয়েছে একথা মানা সম্ভব নয়।

বিজয়চন্দ্র লিখেছেন যে একশ্রেণির সহজিয়ারা তাঁদের সাধনপদ্ধতি বা আচরণের রীতি চর্যাপদগুলি এক একটি রাগিণীর সুরে হিন্দিতে পরিচিত চতুষ্পদী বা চৌপাই বৃত্তে পাওয়া যায়। টীকাতে স্পষ্টভাবে লিখিত হয়েছে যে গানগুলির 'চৌপাই' হিন্দির অনুরূপে লিখিত। পদ্যটির প্রথম চারটি ছত্র হয়েছে প্রথম ধুয়ার পদ ও পরবর্তী অংশের প্রতি দুই ছত্রে এক একটি পদ হয়ে মোট দশটি ছত্রে রচিত হয়েছে। ১০ ও ২২ সংখ্যক পদে যথাক্রমে ১৪ ছত্র, ৭ পদ এবং ১২ ছত্র, ৬ পদসংখ্যা থাকলেও তা বাঁধা কাঠামো মেনেই হয়েছে। এই চৌপাই রচনা বাংলায় অজ্ঞাত। এটি চর্যাগান সম্পাদনায় বিশুদ্ধ পাঠ রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারত। চৌপাইয়ের মত দোহাও বাংলার বাইরে হিন্দি সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট রচনা কাঠামো। প্রাবন্ধিক চর্যাগানের ছন্দ ও ধরণানুসারে হিন্দির সঙ্গে বেশি মিল বলে দাবি করেছেন।

হরপ্রসাদের সম্পাদিত গ্রন্থের উপর প্রাবন্ধিক সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেননি। প্রত্যেকটি গান সযত্নে বিশ্লেষণ করে টীকার দিকে দৃষ্টি রেখে পাঠ নির্ধারণের কথা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন – হরপ্রসাদের ত্রুটি ধরে সমালোচনা করা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হল তাঁর সংগৃহীত রচনাগুলির যথার্থ পরিচয় দেওয়া। সম্পাদক রচনাগুলির সম্বন্ধে ভুল মন্তব্য ও ব্যাখ্যা প্রচার করেছেন। ঠিক পাঠ নির্ধারণে 'খাঁটি অর্থ' বোঝা যায়, অন্যদিকে সেই শ্রেণির ধর্মমত জানা না থাকলে অর্থবোধ হওয়া অসম্ভব। অথচ সম্পাদক এই ধর্মমত সম্পর্কে পরিচিত থাকলেও রুচিগত কারণে সে সম্পর্কে আলোকপাত না করার জন্য অনেক ব্যাখ্যা দূষিত হয়েছে। প্রাবন্ধিক প্রকাশিত টীকার দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে লিখেছিলেন –

গানে আসল কথাকে প্রচ্ছন্ন রাখার চেষ্টার জন্য টীকাকার এই ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলেছেন।[১১] টীকায় এবং মূল গানে বলা হয়েছে এটি গুরুমুখী বিদ্যা এবং নানা সহজিয়া গ্রন্থে তার উল্লেখ রয়েছে। এর খোলা ব্যাখ্যা পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য না হলেও 'ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের খাতিরে পদগুলির অর্থের কিছু কিছু আভাস' দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর আরোও অভিযোগ, গ্রন্থ সম্পাদক যে বিনা বিচারে চর্যাগানগুলি ও দোহাকোষ দুটিকে এক হাজার বছর আগেকার বাংলা ভাষা বলেছেন, সেই উক্তিটি ধরলে সম্পাদকের বিচার-ক্ষমতার অভাব স্পষ্ট দেখা যাবে। চর্যাগান ও দোহাকোষগুলির ভাষা ভিন্নযুগের। সম্পাদক রচনাগুলির ভাষা বুঝবার জন্য প্রাচীন প্রাকৃত অথবা অপভ্রংশের বিচার এবং রচনার মধ্যে নেপালি, মৈথেলী, ওড়িয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার কোন প্রাদুর্ভাব আছে কিনা, তা ব্যাকরণের পদগুলি বিশ্লেষণ করে বুঝতে চেষ্টা করেননি। তিনি পাঠকের কাছে আবেদন রেখেছেন – 'নানাদিকের নানা বিচারে রচনাগুলির বয়স, ভাষা ও রচনার প্রতিপাদ্য বিষয়ের নিপুণ আলোচনার প্রয়োজন আছে'। কোন সাংস্কৃতিক বিষয়ে সমালোচনা হলে তা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। হরপ্রসাদ সম্পাদিত চর্যাগানের সমালোচনা করে বিজয়চন্দ্র তৎকালীন সারস্বত সমাজে একটা আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

'চর্য্যার ও দোহার রচয়িতাদের পরিচয়' প্রবন্ধে বিজয়চন্দ্র মজুমদার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত গ্রন্থে সংকলিত সিদ্ধাচার্যদের গানের সংখ্যা সম্পর্কে একটি প্রয়োজনীয় তালিকা দিয়েছেন। দোহাগুলির একভাগের পদকর্তার নাম সরহ বা সরোহবজ্র[১২], আর অন্য ভাগের পদকর্তার নাম কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নু[১৩]। দোহার আর চর্যাগানের সরহ ও কাহ্নুকে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে প্রাচীন টীকাকার উল্লেখ করেছেন। প্রাবন্ধিকের মতে, দোহা ও চর্যাগানের ভাষা আলাদা এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লেখা, কাহ্নু ও সরহের ভাষা ভিন্ন। এই দুইজন চর্যারচয়িতা ব্যতীত আরো উনিশজনের নাম ও চর্যাসংখ্যা হল – ১) লুই[১৪] (১ ও ২৯), ২) কুক্কুরী[১৫] (২ ও ১০), ৩) বিরুআ বা বিরূপ[১৬] (৩), ৪) গুণ্ডরী[১৭] (৪ ও ৪৭), ৫) চাটিল্ল[১৮] (৫), ৬) ভুসুকু[১৯] (৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩ ও ৪৯), ৭) কম্বলাম্বর[২০] (৮), ৮) ডোম্বী[২১] (১৪), ৯) শান্তি[২২] (১৫ ও ২৬), ১০) মহীধর[২৩] (১৬), ১১) বীণা[২৪] (১৭), ১২) শবর[২৫] (২৮ ও ৫০), ১৩) আর্য্যদেব[২৬] (৩১), ১৪) ঢেন্‌ঢন্[২৭] (৩৩), ১৫) দারিক[২৮] (৩৪), ১৬) ভাদে[২৯] (৩৫), ১৭) তাড়ক[৩০] (৩৭), ১৮) কৌঙ্কন[৩১] (৪৪) ও ১৯) জয়নন্দী[৩২] (৪৬)। এই গুহ্য সাধকদের বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য অন্য ভাষার সাহিত্য ও টীকাগ্রন্থের

সাহায্য নেওয়ার কথা প্রাবন্ধিক বলেছেন। তাঁর বিবেচ্য বিষয়গুলি হল – ক) এঁরা এক দেশের এক সময়ের না নানাদেশের বিভিন্ন সময়ের লোক? খ) এঁদের নামে কেবল এক একজন নির্দিষ্ট পদকর্তার নাম না একই নামে একই গুহ্যসাধনার অনেক পদকর্তার নাম সূচিত হত? গ) প্রাপ্ত নামগুলি কি নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা তাঁদের সাধনপ্রণালীর নির্দেশক? ঘ) টীকাকার কবে, কোথায় টীকা লিখেছিলেন? ঙ) চর্যাপদ ও দোহাকোষের সংগ্রাহকরা কবে, কি অবস্থায়, কোথায় এগুলি সংগ্রহ করেছিলেন?

দোহা ও চর্যাগানগুলির সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিজয়চন্দ্র হরপ্রসাদের পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন। যেমন – আকরগ্রন্থ *তেঙ্গুর* অবলম্বনে হরপ্রসাদ যে বক্তব্যগুলি উপস্থাপন করেছেন তার মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। হরপ্রসাদ লিখেছিলেন –

> ইংরাজি ৭ হইতে ১৩ শতের মধ্যে তিব্বতীরা সংস্কৃত বহি খুব তর্জ্জমা করিত, শুদ্ধ সংস্কৃত কেন, ভারতবর্ষের সকল ভাষার বহি তর্জ্জমা করিত, অনেক সময়ে তাহারা তর্জ্জমার তারিখ পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াছে। তাহা হইলে এই বাঙ্গালা বহিগুলি ৭ শত হইতে ১৩ শতের মধ্যে লেখা হইয়াছিল ও তর্জ্জমা হইয়াছিল। খ্রিষ্টীয় ৮.৯.১০.১১.১২ শতে এই সকল বহিগুলি লেখা হইয়াছিল বলা যায়।[৩৩]

বাংলা গ্রন্থের লেখা ও তর্জমার ক্ষেত্রে তিনি কোন যুক্তিতে সপ্তম ও ত্রয়োদশ শতক বাদ দিয়ে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ধরলেন সে প্রসঙ্গে বিজয়চন্দ্র প্রশ্ন তুলেছেন। হরপ্রসাদ নানাস্থানের অবধূত পদকর্তাদের উল্লেখ পেয়েও সকলকেই কি উপায়ে বাংলার লোক বলে বিবেচনা করেছেন এই বিষয়েও প্রাবন্ধিক সমালোচনা করেছেন। চর্যার পদকর্তা ভুসুকুর বাঙালিত্ব তাঁর গান থেকেই হরপ্রসাদ প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃত করেছেন –

> আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী
> ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।।

সহজ-মতে তিনটি পথ আছে – অবধূতী, চণ্ডালী, ডোম্বী বা বঙ্গালী। অবধূতীতে দ্বৈতজ্ঞান থাকে, চণ্ডালীতে দ্বৈতজ্ঞান আছে বললেও হয়, না বললেও হয়, কিন্তু ডোম্বীতে কেবল অদ্বৈত। গানে বলা হয়েছে – রে ভুসুকু নিজের ঘরিণী 'অবধূতী'কে চণ্ডালী করে বাঙালি অর্থাৎ পূর্ণ অদ্বৈত হলেন।[৩৪] এই মতের বিরোধিতা করে বিজয়চন্দ্র লিখেছেন যে ৪৯ সংখ্যক চর্যাগানের রচয়িতা ভুসুকু যে শ্রেণির সাধনার কথা লিখেছেন সেই সাধনার নাম 'বঙ্গাল' সাধনা, অবধূতদের অন্যান্য পদ্ধতির সাধনার মধ্যে (যথা – ডোম্বী, শবর, কুক্কুরী সাধনা প্রভৃতি) এই সাধনাটি যে কোন দেশের যে কোন সাধক অবলম্বন করতে পারতেন। বঙ্গাল

সাধনায় দীক্ষিত হয়ে পদকর্তা 'বঙ্গালী' হলেন বললেও তা ভুসুকুর বাঙালি জাতি পরিচয়ের অনুকূল নয়। ৪৯ সংখ্যক গানে নানা ছলে গুপ্ত সাধনার কথা বলতে গিয়ে নদীর খালে নৌকা বাইবার দৃষ্টান্ত দিয়ে উক্ত সাধনায় নিজের স্ত্রীকে 'চণ্ডালী' রূপে ব্যবহার করতে হয় তা উল্লিখিত হয়েছে। শবর সাধনার পদকর্তাকে হরপ্রসাদ উড়িষ্যা সীমান্তের শবর জাতির লোক না বলে বাঙালি বলেছেন। অন্যান্য পণ্ডিতদের মতামত আলোচনা করে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে লিখেছেন –

> (ধ্যানের পরিপাক অবস্থা ছাড়িয়া) [তাহার ফলস্বরূপ] আজ [তুমি] বঙ্গালী [অদ্বৈতজ্ঞানারূঢ়] হইলে; (যেহেতু তুমি অপরিশুদ্ধাবধূতি) নিজ গৃহিণীকে (প্রকৃতিপ্রভাস্বররূপিণী) চণ্ডালী [করিয়া] লইয়াছে।[৩৫]

শশিভূষণ দাশগুপ্তের চর্যাগানের অনুবাদে ভুসুকুর বাঙালিত্বের প্রসঙ্গ এসেছে –

> বজ্রনৌকা পদ্মাখালে বাহিলাম, দয়াহীন বঙ্গালে ক্লেশ লুটিয়ে লইল। আজ ভুসুকু বাঙালী হইল, নিজ গৃহিণী চণ্ডালী লইল।[৩৬]

সুকুমার সেন এই অংশের অনুবাদ করেছেন –

> আজ, (আমি) ভুসুকু, বাঙ্গালী হইলাম। চণ্ডালীকে নিজ গৃহিণী করিয়াছি।[৩৭]

তিনি এর সঙ্গে ৩৯ সংখ্যক চর্যাগানের তুলনা টেনেছেন –

> বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাঙ্গেল তোহার বিণাণা।।[৩৮]

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী এই অংশের অর্থ ও টীকা টিপ্পনীতে এঁকে 'বঙ্গালকর্তৃক দেশলুণ্ঠনের রূপক' আখ্যায়িত করে ব্যাখ্যায় লিখেছেন –

> নির্দয় বঙ্গালে দেশ লুঠ করিল। ভুসুকু (জাত হারাইয়া) আজ বঙ্গালী হইলেন। দগ্ধ করার জন্য চণ্ডাল তাহার গৃহিণীকে গ্রহণ করিল। ... বঙ্গাল অদ্বয়বোধের প্রতীক। সেই বোধ সকল ইন্দ্রিয়-বিষয় (রোগ, দ্বেষ, মোহ) লুণ্ঠন করে। বজ্র-পদ্ম যোগে চণ্ডালী প্রজ্বলিত হয়, তাহাতে নিজের ঘর ঘরণী দগ্ধ হইয়া যায়। এইভাবেই চিত্ত চতুষ্কোটি বিচারের অতীত সর্বশূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহাসুখে অবস্থান করে। ... এখানে বঙ্গালের লুণ্ঠন ও চণ্ডালের দাহন বর্ণনায় বস্তুদৃষ্টির পরিচয় মিলে।[৩৯]

নির্মল দাশ গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যায় জাহ্নবী-অনুসারী হয়ে বাচ্যার্থে লিখেছেন –

> ভুসুকু, চণ্ডালে-নেওয়া নিজের ঘরণী আজ বাঙালি (=ভ্রষ্ট) হল (অর্থাৎ নিজের ঘরণীকে চণ্ডালে হরণ করায় সেই ঘরণী জাতিচ্যুতা বা কুলভ্রষ্টা হল)।[৪০]

ভুসুকু প্রসঙ্গে বিজয়চন্দ্রের মতটি গৃহীত হয়নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতকেই সমকালীন ও পরবর্তীকালের সমালোচকেরা সমর্থন করেছেন। আমরাও ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকতার নিরিখে ভুসুকুর বাঙালিত্বকেই সমর্থন করছি।

বিজয়চন্দ্র আরো যুক্তি দিয়েছেন অবধূতের গোটাকতক নাম খাঁটি ডাকনাম। যেমন – কাহ্নু, মহীধর, জয়ানন্দী ও ভাদে। ভাদ্রমাসে জন্ম ধরে পশ্চিম উড়িষ্যার অনেক লোকের নাম ভাদো বা ভাদে, আবার কৃষ্ণনামের অপভ্রংশ কাহ্নু নামও বেশ প্রচলিত। অন্য নামগুলি যে সাধনার অনুরূপ নাম, তা পরিষ্কার করে বুঝবার প্রয়োজন আছে; কারণ বিভিন্ন সময়ে ও নানা দেশে সাধনের পন্থা ধরে বিভিন্ন লোকের একই নাম হতে পারে। ফলে নামের সমতা ধরে একটি সাধনপন্থার কবিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের লোক বলে ধরা কঠিন। অন্য নামে ও নামের সমতা ধরে কিছু ঠিক করা শক্ত হলেও সেখানে রচনার বিষয় ধরে পদকর্তাকে নির্দিষ্ট করা অনেকটা সহজ হয়। কিন্তু নাম যেখানে সাধনপন্থার অনুরূপ, সেখানে নানা সময়ের ও নানা দেশের পদকর্তা নির্দিষ্ট একটি সাধনের কথা লিখতে পারেন। যেমন – ২৮ ও ৫০ সংখ্যক চর্যাগানে শবর ভাবের সাধনার উল্লেখ রয়েছে।[৪১] উড়িষ্যা সীমান্তের শবরদের পার্বত্য বাসস্থান ও রীতিনীতির দৃষ্টান্ত দিয়ে সাধনের কথা বর্ণিত হয়েছে। সেই গানদুটির কবির নাম ভণিতায় নেই, কিন্তু সাধনপ্রণালী দেখে টীকাকার তাঁর নাম দিয়েছেন শবরীপাদ। ২ ও ২০ সংখ্যক গানে কুকুরের মত আচরণের গুহ্যকথাকে ভিত্তি করে টীকায় পদকর্তার নাম কুক্কুরীপাদ বলা হয়েছে।[৪২] তেমনি ৪৪ সংখ্যক গানে কঙ্কণের ধ্বনি বা নাদ সাধনা অনুযায়ী পদকর্তার নাম কঙ্কণপাদ[৪৩]; ১৭ সংখ্যক লুপ্ত গানের ভণিতাহীন গানে বাণীসাধনের সাপেক্ষে পদকর্তার নাম বীণাপাদ[৪৪] এবং ২৫ সংখ্যক লুপ্ত গানের টীকার 'সূত্র বাতদ্বয়' (বীণা ও তান) অনুসারে পদকর্তার নাম তন্ত্রীপাদ বলা হয়েছে। শান্তিপাদের নামের গানদুটিতে শান্তিভাব সাধনের[৪৫] কথা আর ভুসুকুর গানে সহজানন্দের জন্য বুভুক্ষার[৪৬] কথা রয়েছে। হরিণী মাংসের জন্য বুভুক্ষার গানটিতেও সহজিয়াদের আনন্দের কথাই ধ্বনিত। ধ্বনিতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলে পাই, ভুসুকু> ভুক্ষস> ভুক্ষু (ভুখা সাধনে সিদ্ধ)। সম্ভবত, লুই নামটি লুবই সাধন থেকে এসেছে। পাখি শিকারীদের 'লুব' বলা হত। লুইপাদের ২৯ সংখ্যক গানে জাল, বাণ-চিহ্ন প্রভৃতির কথা রয়েছে।[৪৭]

প্রাবন্ধিক অনুমান করেছেন যে বিশেষ কারণে প্রসিদ্ধিলাভ করে একজন লুই, একজন শান্তি ও একজন ভুসুকু সেই সেই নামে বিশিষ্টরূপে পরিচিত ও চিহ্নিত হয়েছিলেন। সাধনার হিসাবে দুটি বিভাগ করে চর্যাগান সংগ্রহ করা হয়েছিল। প্রথম থেকে আঠাশ এবং উনত্রিশ থেকে শেষ পর্যন্ত। এই দুই পর্বের সূচনাসূচক গানের রচয়িতা লুইপাদ। এই বিচারেও একজন নির্দিষ্ট লুইকে 'আদি সিদ্ধাচার্য্য' বলা যায় কিনা এই বিষয়েও প্রাবন্ধিক প্রশ্ন তুলেছেন। টীকায় লুইকে অন্যান্যদের মতোই সিদ্ধাচার্য বলা হয়েছে।

কেবলমাত্র একটি স্থানে তাঁকে 'আদি সিদ্ধাচার্য্য' বলা হয়েছে। এই 'আদি' শব্দটি সম্পাদক ভুল করে বসিয়েছেন কিনা এ নিয়ে প্রাবন্ধিক সংশয় প্রকাশ করলেও কোন যুক্তি দেননি। সম্পাদক হরপ্রসাদ স্পষ্টতই লুইপাদকে রাঢ়ী বাঙালি বলেছেন।[৪৮] প্রাবন্ধিকের অহেতুক সন্দেহের বদলে হরপ্রসাদের বক্তব্যকেই আমরা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছি।

বিজয়চন্দ্র টীকাগুলি আলোচনা করে লেখকদের নাম ও সময় নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন। *তেঙ্গুর*-এ লিখিত রয়েছে, একজন চন্দ্রকীর্তি *চর্য্যাগীতি কোষবৃত্তি* তিব্বতি ভাষায় তর্জমা করেছিলেন। অদ্বয়বজ্র (শবরসিদ্ধ) সরোহের *দোহাকোষ পঞ্জিকা* নামে দোহাকোষের টীকা লিখেছিলেন। অমিতাভ নামে একজন *কৃষ্ণ বজ্রপাদ দোহাকোষের টীকা* লিখেছিলেন। মুদ্রিত *মেখলা* টীকা সেই টীকা হতে পারে। বৈরোচন মহাযোগী কোশলবাসী সেই টীকাটি তিব্বতিতে তর্জমা করেছিলেন। অদ্বয়বজ্রের দোহাকোষের টীকা তিব্বতি অনূবাদকের নাম বৈরোচন বজ্র। এইসকল টীকা ধরে পদকর্তাদের ক্রম প্রাবন্ধিক নির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। সাহিত্য পরিষদের মুদ্রিত *চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়*-এর টীকাকার (মুনিদত্ত) দোহাকোষ ও চর্যাগানের সরহকে এক ও অভিন্ন বলেছেন। দোহাকোষের ভাষা ও চর্যার ভাষা অনেক আলাদা। টীকাকার দোহাকোষ ও চর্যাগানের কাহ্ণু ও তাঁর ভাষাকে এক বলেছেন। হরপ্রসাদ টীকাগ্রন্থ অনুসরণ করে দোহা ও চর্যার ভাষাকে এক সময়ের বাংলা বলেছেন, যদিও উভয়ের মধ্যে অত্যধিক প্রভেদ রয়েছে। টীকা অনুযায়ী, ৩৪ সংখ্যক গানের কর্তা দারিককে লুইয়ের শিষ্য বা বংশধর বলা হয়েছে।[৪৯] সিদ্ধাচার্য দারিক যদি *বজ্রযোগিনী*-টীকা ও *ব্যক্ত ভাবানুগত তত্ত্বসিদ্ধি*-র সঙ্গে এক হন, তাহলে তিনি উড়িষ্যার ইন্দ্রভূতির[৫০] কন্যা ও *বজ্রযোগিনীসাধন* ও *ব্যক্তভাবসিদ্ধি*-এর রচয়িতা লক্ষ্মীঙ্করার[৫১] পরে আবির্ভূত। দারিকের চর্যাগানে রয়েছে যে তিনি পারিম নদীর কূলে বাস করতেন।

লুইয়ের পরে আরেকজন পরবর্তী আচার্যের নাম কিলপাদ।[৫২] *হেবজ্র* সাধনপ্রণালীর পথিকৃৎ সরহ বা সরোরুহ পদ্মাচার্য্য *হেবজ্রসাধন* গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁকে প্রাবন্ধিক প্রথম সরহ বলেছেন। জালন্ধরিপাদ[৫৩] *সিদ্ধাচার্য্যশুদ্ধি বজ্র-প্রদীপ* নামে হেবজ্র সাধনের এক টিপ্পনী লিখেছিলেন, ৩৬ সংখ্যক চর্যার পদকর্তা ও *বজ্রগীতি*-এর কৃষ্ণাচার্য জালন্ধরিপাদের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। দোহাকোষের কৃষ্ণাবজ্র উক্ত কৃষ্ণাচার্যের সঙ্গে অভিন্ন কিনা তা বিবেচ্য। টীকাকার দুইজনকেই এক ব্যক্তি বলেছেন।[৫৪] কৃষ্ণাচার্যের শিষ্য পরম্পরায় যে 'ধেতন'-এর নাম পাই, তিনিই ঢেন্‌ঢন্‌, আর ধামপাদ[৫৫] ও মহিমপাদকেও কৃষ্ণের বংশধররূপে পাই।[৫৬]

এই কৃষ্ণাচার্যের বংশে একজন সরহকেও পাই, যিনি *বসন্ত তিলক-দোঁহাকোষগীতিকা* লিখেছেন। এই সরহকে মুদ্রিত দোঁহাকোষ ও চর্যার সরহ থেকে ভিন্ন ধরে এঁকে তৃতীয় সরহ বলা যেতে পারে। চর্যার মধ্যে একজন বিরূআ (অর্থাৎ বিরূপ সাধনের অনুগামী) পাই যিনি বিরূআ বা বিরূপ কৃষ্ণাচার্যের দোঁহার অংশ অঙ্গীভূত করে দোঁহাকোষ লিখেছিলেন, তাঁকে প্রাবন্ধিক দ্বিতীয় বিরূআ বলেছেন। এই বিরূআ তাঁর পূর্ববর্তী বিরূআর *কর্ম্মচণ্ডালিকা-দোহাকোষগীতি* অবলম্বনে *শ্রীবিরূপাদ চতুরশীতি* সংকলন করেছিলেন। লক্ষনীয় যে প্রথম বিরূপ চর্যার কাহ্নুর ১৮ সংখ্যক গানে বিরূআকে লক্ষ্য করে 'বিরূআ বোলে' লিখিত হয়েছে।[৫৭]

চর্যাগানের কম্বলাচার্য অথবা কম্বলাম্বরপাদ *অভিসময় নাম পঞ্জিকা* গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কঙ্কণ এই কম্বলের পরবর্তী সিদ্ধাচার্য ছিলেন ও তিনি *চর্য্যাদোহাকোষ-গীতিকা* লিখেছিলেন। শবরসিদ্ধ সম্প্রদায় বজ্রযোগিনীসাধন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে যিনি *মহামুদ্রা বজ্রগীতি* ও *চণ্ড মহাবোধন* লিখেছিলেন, তাঁর নাম হয়েছিল শবরপদ বা শবরীশ্বর। কম্বলাম্বরপাদ লক্ষ্মীঙ্করার পর বজ্রযোগিনীসাধন পদ্ধতির প্রচারক। তিনি শবরীপাদের ব্যাখ্যা ধরে *অজপাণিপাদ* গ্রন্থ লিখেছিলেন। সরহমহাশবর নামে আরেকজন সরহ *দোহাকোষনামমহামুদ্রেপদেশ* লিখেছিলেন। এই সরহ ছাড়া শবর সাধনের আর একজন সরহকে পাই যাঁকে মহাব্রহ্মণ ও মহাযোগী বলা হয়েছে। এই চতুর্থ সরহও একটি দোহাকোষ রচনা করেছিলেন। আবার কৃষ্ণ বা কাহ্নুর অনুবর্তী যে সরহকে পাই, তাঁকে হয়ত তৃতীয় সরহ বলে নির্দেশ করা চলে। মুদ্রিত দোহাকোষের লেখক সরহ মহাশবর যদি *হেবজ্রসাধন*-এর রচয়িতা হলে এই সরহকে প্রথম সরহ বলা যায়। কৃষ্ণপাদ বা কাহ্নুর গুরু জালন্ধরপাদ সরহের *হেবজ্রসাধন*-এর একটি টিপ্পনী লিখেছিলেন। এই যুক্তিক্রমে কাহ্নু সরহ-পরবর্তী পদকর্তা। কাহ্নু বজ্রধরকে (সরোজবজ্র বা সরহকে) শবর বলেছেন, এই নির্দেশ জাতিবাচক না সাধনবাচক তা ধরা কঠিন। সরহ মহাশবরের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে কমলশীল *ডাকিনী বজ্রগুহ্য-গীতি* রচনা করেছিলেন। সরহ মহাশবর *মহামুদ্রোপদেশবজ্রগুহ্যগীতি*-এর রচয়িতা। তাঁর রচিত *দোহাকোষপঞ্জিকা*-এর টীকাকার অদ্বয়বজ্রকে শবরসিদ্ধ উপাধিযুক্ত পাওয়া যায়।

প্রাবন্ধিক লিখেছেন যে এক নামের অনেক সিদ্ধাচার্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই বিষয় নিয়ে নানা গ্রন্থ লিখেছিলেন। চর্যাসংগ্রহে যাঁদের নাম পাই তাঁরা বিভিন্ন সময়ের লেখক। যে সময়ে সঙ্গীতকারদের মুখ থেকে ওই চর্যাগুলি সংগৃহীত হয়েছিল, তখন মূল রচনার ভাষা সঙ্গীতকারদের মুখে পরিবর্তিত অথবা

কোন কোন প্রাদেশিক ভাষা অল্পাধিক পরিমাণে তাতে জড়িত হয়েছিল কিনা তা বিশেষভাবে বিবেচ্য হতে পারে। দোহাকোষ দুটি যে বিভিন্ন সময়ের লেখা তাও ধরা পড়েছে। টীকাকারের মতের অনুরূপে দোহার সরহ আর চর্যার সরহ যদি এক হন, তবে স্বীকার করতে হবে যে চর্যাগানগুলির ভাষা রচনার ভাষা থেকে বহু পরিমাণে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে।

সরোহবজ্র ও কাহ্নপাদের দোহাকোষ দুটির আলাদা ভাষার সঙ্গে চর্যাগানগুলির নানারকমের ভাষাকে এক করা চলে না বলে 'বৌদ্ধগান ও দোহার ভাষা' প্রবন্ধে বিজয়চন্দ্র অভিমত পোষণ করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত সহযোগে তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন। যেমন – সরহের দোহাকোষের মধ্যেই যে কারক বিভক্তি ও ক্রিয়া প্রভৃতির রূপ একরকমের নয়। তিনি সরহের দোহাকোষের একটি পদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন –

বক্ষণে হি নজানন্ত হি ভেড।

[ভেড = ভেদ, উকার দিয়ে কর্মকারক] এবই [এইরূপে] পটিঅউ [পঠিত] এ চউবেঅ [চতুর্ব্বেদ]। এইশ্রেণির প্রাকৃত বা অপভ্রংশকে বাংলা বললে প্রাচীন সকল প্রাকৃত ও অপভ্রংশকে, এমনকি বেদের ভাষাকেও বাংলা বলতে হয় বলে তিনি অভিমত পোষণ করেছেন। তিনি কাহ্নুর *দোহাকোষ*-এর দৃষ্টান্তে চর্যাগানগুলিকে ওড়িয়া ভাষাবহুল বলতে চেয়েছেন। যেমন –

বহি নিক্কলিত্তা কলিত্তা সুন্নাসুন্ন পইঠত্তা।

সুন্নাসুন্ন বেণী মাজ রে বট কিংপি নহি দট্টা।

বহিঃনির্গতত্ব এরকম ভাব আকলন করে (কলিত্তা = কলিত্বা – অসমাপিকা ক্রিয়া) শূন্যাশূন্যে প্রবেশ করে (পইঠত্তা – ত্বা) শূন্যাশূন্য এই দুইয়ের মধ্যে (বেণী = উভয়) হে মূঢ়, কিছুই কি দৃষ্ট হয় না? [ছাপায় মূল শ্লোকে 'মাজরে' একটি শব্দ রয়েছে, তাতে ওড়িয়া 'মাঝরে' = মধ্যে – এরকম হয়। কিন্তু 'রে'টিকে স্বতন্ত্র করেই অর্থ করা গেল। 'বেণী' শব্দটি ঠিক প্রাকৃত বা অপভ্রংশের বটে, কিন্তু তা এই অর্থে কেবল ওড়িয়াতেই ব্যবহৃত হয়। অন্য একটি দোহায় 'স্থান' অর্থে 'থাব' আছে; এই 'থাব' = ঠাব ঠিকস্থান অর্থে ওড়িয়ার সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। সরহের নামে প্রচলিত চর্যাগানের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত সহযোগে বিজয়চন্দ্র সরহ ও কাহ্নুর দোহাকোষের ভাষার প্রভেদ দেখিয়েছে। তিনি কাহ্নুর কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করে সংক্ষেপে ভাষার কাঠামো বা ব্যাকরণ প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। তার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধারযোগ্য –

নগর বাহিররে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ

ছইছোই যাই সো বাক্ষ নাড়ি আ।

মূলের ‘বারিহ’ শব্দটির টীকায় ‘বাহির’ আছে। সপ্তমী পদ যেখানে সংস্কৃত ‘বাহ্যে’ হবে, সেখানে ‘এ’ বিভক্তির স্থলে ‘রে’ বিভক্তি রয়েছে। অধিকরণের ‘রে’ বিভক্তি যা কেবল ওড়িয়া ভাষার বিশেষত্ব, তা কাহ্নুর রচনার বহুস্থানে রয়েছে। প্রাচীন মাগধী প্রাকৃত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষারূপে পরিণত হওয়ায় সেই সকল প্রত্যয় ও বিভক্তি বিশেষ বিশেষ ভাষার বিশেষত্ব হয়েছে। প্রাবন্ধিক সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কাহ্নুর রচনা বাংলা নয়, চর্যার কাহ্নুর ভাষা দোঁহার কাহ্নুর ভাষা থেকে ভিন্ন, দোঁহা দুটির ভাষাও প্রাচীন প্রাকৃত বা অপভ্রংশ। প্রাচীন সময়ের পূর্বাঞ্চলের মাগধীভাষা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ছাঁচে গড়ে উঠবার পর কোথাও হিন্দি, কোথাও ওড়িয়া ও কোথাও বাংলা হয়েছে। এরকম বিশেষত্ব জন্মাবার আগের ভাষাকে কোন প্রাদেশিক ভাষা বলা চলে না। গোটাকতক শব্দের মোহে হরপ্রসাদ ভুল করেছেন বলে তিনি মনে করেছেন। তিনি চর্যাগানে ওড়িয়া প্রাদেশিকতার প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। যেমন – গানে ব্যবহৃত বালকের স্ত্রীলিঙ্গ ‘বালি’ ও মালা ‘মালি’রূপে কেবল ওড়িয়াতেই প্রাচীনকাল থেকে পাওয়া যায়। লুইপাদের ১ ও ২৯ সংখ্যক গানগুলিকে হরপ্রসাদ বাংলা বললেও বিজয়চন্দ্র তাকে হিন্দি বলে দাবি করেছেন।[৫৮] তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী – নানা প্রদেশের সহজিয়াদের পুরুষ-মেয়েরা খুব সম্ভব উত্তর-পশ্চিমের কোন একটি স্থানে অবস্থান করে এইসকল গান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখেছিলেন। পূর্বাঞ্চলের মাগধী ভাষার কাঠামোর মধ্যে (অনেক স্থলে প্রাচীন মাগধীর প্রাধান্য বজায় রেখে) ওড়িয়া, হিন্দি, নেপালি, মৈথেলী, বাংলা কি অবস্থায় ঢুকেছে তার ব্যাখ্যার উপর বিজয়চন্দ্র গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতকে তিনি নিজের যুক্তির স্বপক্ষে ব্যবহার করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে – গানগুলিতে যে অপভ্রংশ বা প্রাকৃতের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই ভাষাতেই অনেককাল ধরে সহজিয়া সম্প্রদায়ের রচনা করবার পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই পদ্ধতি অনুসারে একালের লোকেরা প্রাচীন অপভ্রংশ পদ রচনা করতে গিয়ে যে যাঁর নিজের প্রাদেশিকতা রচনায় স্থান দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রকাশিত বৌদ্ধগান ও দোহা গ্রন্থে যে সকল গান ও দোহা কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নুর নামাঙ্কিত, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার সটীক ব্যাখ্যাসহ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি কেবল ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে গান ও দোহাগুলিতে ব্যবহৃত শব্দগুলির বিচার করবার জন্যই এই টীকা লিখেছিলেন, তার আদত অর্থ প্রকাশের জন্য নয়। তাতে ব্রীড়া ও জুগুপ্সাব্যঞ্জক কথা বাদ দিয়ে মোটামুটি বাহ্যিক অর্থ স্পষ্টতর করেও লেখা যেতে পারত। ‘বৌদ্ধগানে কাহ্নুর রচনা’ প্রবন্ধে বিজয়চন্দ্র শহীদুল্লাহের

সম্পাদনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সমালোচনার পাশাপাশি তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে নিজ মতের সমর্থনে ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি শহীদুল্লাহের ব্যাখ্যাত ১২ সংখ্যক চর্যাগানের কথা বলেছেন।[৫৯] গানটিতে দাবাখেলার বর্ণনার ছল করে নিগূঢ় কথা উক্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও অনায়াসে দাবাখেলার কল্পনায় কীভাবে পদটি রচিত হয়েছে তা বলা যেত। কিন্তু শহীদুল্লাহ তা না করে এমনভাবে তার অর্থ লিখেছেন, যা ভাষাতত্ত্ব শিক্ষার্থীদেরও উপযোগী নয় আর অনুবাদে মূলকে অধিকতর অস্পষ্ট করা হয়েছে। তিনি মূলের 'করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅ বল' প্রভৃতির ব্যাখ্যায় লিখেছেন –

> করুণা দূর করিয়া (আমরা) নয় বল খেলি। সদগুরু বোধে (আমরা) ভববল জিতিলাম। দুই দূরে যাউক। তুই ঠাকুরকে কিছুই দিস্ না।

গানটির সপ্তম ছত্রে দাবাখেলার অনুষঙ্গে রাজাকে 'মাত' করবার কথা আছে তা বুঝেও তিনি ব্যাখ্যায় লিখেছেন – 'মাত দ্বারা (আমরা) ঠাকুরকে পরিনিবৃত্ত করিলাম।' প্রাবন্ধিক মন্তব্য করেছেন যে এখানে রাজাকে পরিনিবৃত্ত ও অবশ করবার অর্থে মাত (আরবী) শব্দটির ব্যবহার থেকে এই গানটিকে পঞ্চদশ শতকের পরবর্তীকালের বলা চলে। কারণ, তার আগে বাংলা, উড়িষ্যা প্রভৃতিতে মুসলমানদের সঙ্গে সেরকম সামাজিকতা ঘটে নি। নিদেনপক্ষে ত্রয়োদশ শতকের আগে ওই শব্দের আমদানি ঘটে নি। সুতরাং গানটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা ও ওড়িয়াভাষা সম্পূর্ণ প্রচলিত হওয়ার সময়ের লেখা হলেও গানের ভাষার মূল কাঠামোটি এক সময়ের মৃতভাষায় লিখিত হয়েছিল। চর্যাগানের সহজিয়ারা তাঁদের সমাজের রীতি অনুসারে বিস্মৃত যুগের ভাষায় গান রচনা করে অনেক স্থলে নিজের নিজের প্রদেশিক শব্দ যুক্ত করেছিলেন।

শহীদুল্লাহ দোহার ভাষা সম্বন্ধে হরপ্রসাদের মতকে সমর্থন না করে বলেছেন যে দোহার ভাষা অতি দূর সম্পর্কেও বাংলা নয়। শহীদুল্লাহের এই পরোক্ষ স্বীকৃতিতে প্রাবন্ধিক নিজ মতের সমর্থন খুঁজেছেন যে চর্যা ও দোহার অবধূতেরা এমন অপ্রচলিত ভাষায় রচনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন যার সঙ্গে তাঁদের নিজেদের ভাষার সম্পর্ক ছিল না। শহীদুল্লাহ চর্যা ও দোহার কাহ্নুকে এক এবং অভিন্ন বলে চর্যা ও দোহার ভাষাকে আলাদা করেছেন। কাহ্নুর গানের ভাষা তাঁর নিজের ভাষা কিনা – প্রাবন্ধিক এর উত্তরের সন্ধানে শহীদুল্লাহের মত অনুসরণ করেছেন। শহীদুল্লাহের মতে, *চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়*-এর কৃষ্ণাচার্যপাদ জালন্ধরিপাদের শিষ্য এবং তিব্বতীয় ইতিবৃত্তের ওড়িয়া ব্রাহ্মণ কহন বা বড় কৃষ্ণাচার্য জালন্ধর গুরুর শিষ্য। চর্যাগান ও তিব্বতীয় ইতিবৃত্তের কাহ্নুপাদকে তিনি এই প্রমাণের সাপেক্ষে এক ও

অভিন্ন বলে অনুমান করেছেন। এইসূত্রে প্রাবন্ধিক দাবি করেছেন যে ওড়িয়া ব্রাহ্মণ কাহ্নের অপ্রচলিত ভাষায় লেখা গানে বাংলা শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। শহীদুল্লাহ তিব্বতীয় দলিলের অনুবাদ উদ্ধার করে বলেছেন যে 'সোমপুর'-এ ওড়িয়া কাহ্নুর নিবাস ছিল। ওই 'সোম' অন্য স্থানে 'সোন'রূপে ও 'পুর'কে পুত্ররূপে পাওয়া যায়। এই স্থান সম্বলপুরের সোনপুর হতে পারে। এই অঞ্চলের ওড়িয়ারা লরিয়া-হিন্দিভাষীদের খুব কাছের প্রতিবেশী ও সেখানকার ওড়িয়া ভাষায় অনেক লরিয়া কথা চলে। যেমন – লরিয়া ভাষায় কর্তৃকারকের পদে 'লা' খুব বেশি যুক্ত যা খাঁটি হিন্দির 'নে' কথার মত। চর্যাগানে কর্তৃকারকের 'কাহ্নিলা' সম্বলপুরের লরিয়াদের রীতিসিদ্ধ। এই অঞ্চলে শবরদের বাস আর চর্যাগানগুলির শবরপন্থার বিবরণের সঙ্গে ওই স্থানের পাহাড় ও সামাজিক রীতি মেলে। শহীদুল্লাহ বলেছেন, চর্যাগানগুলিতে বৌদ্ধদের পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা ও সহজিয়া ধর্মমতের সঙ্গে বৌদ্ধমতের কোন মিল নেই। চর্যাগানগুলির খাঁটি অর্থের আভাস পেয়েও প্রাবন্ধিক তাকে 'ঠিক বৌদ্ধগান' বলে মানতে চান নি। হরপ্রসাদের দেওয়া গ্রন্থনামের সমালোচনা করে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বৌদ্ধগান ও দোহার ভাষাকে হাজার বছরের পুরানো বাংলা বলা চলে না। গান বিশেষে বাংলা ভাষার প্রভাব আছে মাত্র।

চর্যাগান ও দোহার ভাষা বাংলা কিনা এই নিয়ে নানা মতান্তর রয়েছে। প্রাবন্ধিকের চর্যাগান ও দোহার ওড়িয়া ভাষার দাবি স্বীকৃত হয় নি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ওড়িয়ার দাবি সম্পর্কে লিখেছেন –

> Oṛiyā is very closely related to Bengali. West Bengali and Oṛiyā seem to have developed from one form of Māgadhī Apabhaṙanśa, as current in South-west Bengal in the 7^{th}-8^{th} centuries.[৬০]

তিনি চর্যার উপর হরপ্রসাদ প্রস্তাবিত বাংলার দাবিকেই সমর্থন করেছেন –

> The dialect of the 'Caryās' alone is Old Bengali, … The two 'Dōhā-kōṣas' present the same dialect, which is a kind of Western (Śaurasēī) Apabhraṅśa, as its ‹‹-u›› nominatives, its ‹‹aha›› genitives, its ‹‹-ijja-›› passives, and its general agreement in forms with the literary Western Apabhaṙanśa amply indicate.[৬১]

অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষাটি স্থানগতভাবে চর্যাগানে আরোপিত ভাষা ছিল। সচেতনভাবেই গান রচনায় এই সাহিত্যিক শিষ্টরূপটি চলে এসেছিল। এটি পূর্ব ভারতের ভাষা নয়। এটি শিষ্ট জনোচিত সর্বজনীন বোধগম্য যোগাযোগের ভাষা (lingua franca) যা পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব ভারতের শিক্ষিত উচ্চসমাজের মানুষের যোগাযোগ রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হত।[৬২]

সহজ বুদ্ধিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাগীতির ভাষাকে বাংলা বলেছেন। বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে বিচার করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীরা তাকে বাংলা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। চর্যাগীতির ভাষায় কিছু কিছু শব্দ ও পদ আছে যা পরবর্তীকালের ভাষায় পাওয়া যায় নি। এইগুলিতে সুনীতিকুমার শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব দেখেছেন এবং দুটি ক্রিয়াপদ (‘ভণথি’, ‘বোলথি’) মৈথেলী থেকে আগত বলেছেন যা বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। সুনীতিকুমারের ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে এবং নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষার গৌরব বাড়াতে গিয়ে বাংলার প্রতিবেশীরা চর্যাগীতিকে নিজেদের বলে দাবি করেছেন। বাংলা ছাড়াও হিন্দি, মৈথেলী, ওড়িয়া, অসমীয়া এর দাবিদার। চর্যাগীতির ভাষাও যে বাংলাই তা পদ, ইডিয়ম ও প্রবচন থেকে বোঝা যায়। সুনীতিকুমার যে সব শব্দ ও পদ শৌরসেনী অপভ্রংশের সেগুলি সূক্ষ্মবিচারে অবহট্‌ঠের প্রভাবজাত বলেছেন। যখন চর্যাগীতি রচিত হচ্ছিল তখন অবহট্‌ঠ সমগ্র আর্যভাষী ভারতবর্ষের অন্যতম সাধুভাষা, সংস্কৃতের পরেই তাঁর মর্যাদা। চর্যাগীতি-কবিদের মধ্যে অন্তত দুইজন সরহ ও কাহ্নু, এই সাধুভাষাতেই দোহা রচনা করেছিলেন। চর্যাগীতির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে অবহট্‌ঠের সঙ্গে চর্যাগীতি ভাষা ও ছন্দের নিকট সম্বন্ধ সম্পর্কে জানা যাবে। সুকুমার সেন চর্যার ‘জাহের বাণ-চিহ্ন রূব ণ জাণী’ ও দোহার ‘ঝাণ-বাহিঅ কি কী অই বাণে’ পদের ভাষার নিকট সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন –

> বাঙ্গালা ভাষার সেই শিশুকালে অবহট্‌ঠের শব্দ ও পদ না থাকাই বিস্ময়ের বিষয় হইত এবং চর্যাগীতির অকৃত্রিমত্বে সন্দেহ জাগাইত।[৬৩]

তিনি *চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়*-এর ভাষাকেই কেবল বাংলা ভাষা বলেছেন –

> শুধু প্রথম পুথি চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের ভাষাই বাঙ্গালা, অপরগুলি অপভ্রংশে-অবহট্‌ঠে রচিত...।[৬৪]

তিনি হিন্দির দাবিকে খারিজ করে দিয়ে এক মূল পূর্বপ্রান্তীয় কথ্যভাষা থেকে উদ্ভূত চর্যার ভাষাকে ‘প্রাচীন বাঙ্গালা’ বা ‘প্রাচীন ওড়িয়া’ বা ‘প্রাচীন অসমীয়া’ বলতেও কুণ্ঠিত নন। অর্থাৎ চর্যার ভাষা পূর্বী মগধীয় নব্য ভারতীয় আর্য শাখার অন্তর্গত বাংলা, ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষার প্রত্নরূপ।[৬৫]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতে, বাংলাভাষার অব্যবহিত পূর্ববর্তী ভাষা ‘গৌড় অপভ্রংশ’। ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে গৌড় অপভ্রংশ থেকে সর্বপ্রথম বিহারী উৎপন্ন হয়ে পৃথক হয়ে যায়, তারপরে ওড়িয়া, বঙ্গ-কামরূপী ভাষাও পৃথক হয়ে যায়। এই বঙ্গ-কামরূপী ভাষা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বাংলা ও আসামীতে পরিণত হয়েছে।[৬৬] পরেশচন্দ্র মজুমদারের মতে –

প্রকৃতপক্ষে, অপভ্রংশ-সম্পৃক্ত আঞ্চলিক মাগধী অপভ্রংশ (কল্পিত) অথবা আন্তর্ভারতীয় শিষ্ট অবহট্‌ঠ নয়, বাঙলা ভাষার জননী হলো আঞ্চলিক কথ্য প্রাকৃত (প্রাকৃত বৈয়াকরণদের সংজ্ঞানুযায়ী দেশী বা লৌকিক)। আর অনুমিত এই আদর্শ কথ্য প্রাকৃতের আঞ্চলিক বিভেদ ও বৈচিত্র অঙ্গীকার করেই জন্মলাভ করেছে অন্যান্য আধুনিক ভাষাগুলি...।[৬৭]

হরপ্রসাদ আবিষ্কৃত চর্যাগানগুলি যখন লিখিত হয়েছিল তখন পূর্বভারতের মাগধী অপভ্রংশ থেকে নব্যভারতীয় আর্যভাষার একটি পূর্বী শাখার বিকাশ ঘটেছে, যা শুধু জনগণের ব্যবহৃত 'প্রাকৃত' ভাষা বা কথ্য ভাষা রূপে পূর্বভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। বক্তব্যের সমর্থনে লুইপাদের গান সম্পর্কে মুনিদত্ত টীকার কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি টীকায় লিখেছেন – 'শ্রীলূইপাদঃ ... প্রাকৃতভাষয়া রচয়িতুমাহ'।[৬৮] ভাষাতত্ত্বের পরিভাষায় একে প্রত্ন-মগধীয় নব্যভারতীয় আর্যভাষা বলা যায়। তবে চর্যার প্রত্ন-ভাষায় বঙ্গীয়-প্রত্ন উপাদানের মাত্রা অনেক বেশি। গানগুলি রচনার সময়কালে পূর্বভারতে বাংলার পালরাজবংশের প্রবল আধিপত্য হওয়ায় তাঁদের রাজধানীর সন্নিহিত উপভাষারূপে বঙ্গীয় উপভাষা তখন সমগ্র মগধীয় নব্যভারতীয় আর্যভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল। এই কারণে চর্যার ভাষায় বাংলা উপভাষার উপাদান এত বেশি। যাঁদের চর্যায় এইসব উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে তাঁরা সকলে বাংলার নাও হতে পারেন। বাংলা উপভাষার সামাজিক গুরুত্বের জন্য অন্য এলাকার বাসিন্দা হয়েও তাঁরা এই উপাদান ব্যবহার করেছেন বা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই চর্যার প্রত্ন-ভাষায় বাংলা উপাদানের আনুপাতিক আধিক্য থাকায় আলোচ্য মগধীয় প্রত্ন-ভাষাকে 'প্রত্ন-বঙ্গীয়' বলে নির্মল দাশ অভিমত পোষণ করেছেন।[৬৯] চর্যার ভাষা বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সংকেত (code) ও পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাতাত্ত্বিক গঠনগত বৈশিষ্ট্যে অপরিবর্তনীয় কৃত্রিম ভাষা। তাই একে 'চর্যা-ভাষা' নামেই এর অস্তিত্ব ও পরিচিতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃতির শ্রেয় বিবেচনা করা যেতে পারে কিনা অলিভা দাক্ষী তার প্রস্তাব দিয়েছেন।[৭০]

আমরা চর্যার ভাষাকে যুক্তিমতো 'প্রত্ন-বাংলা' হিসাবেই গ্রহণ করতে চাই। তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে দোহার ভাষায় বাংলা উপাদান থাকলেও তাকে সরাসরি বাংলা ভাষা বলা যাবে না।

কবিতা

আমাদের কালসীমার মধ্যে বৌদ্ধবিষয়ক চারটি কবিতা পাচ্ছি, চারটিই *বঙ্গবাণী*-তে প্রকাশিত হয়েছিল। প্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'বুদ্ধগয়ার পথে' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), সুনীতি দেবীর 'নির্ব্বাণ' (ফাল্গুন, ১৩৩০),

সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অন্ধ কুণাল’ (কার্তিক, ১৩৩১), অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়ের ‘বৌদ্ধ ভারত’ (ভাদ্র, ১৩৩৩) সাময়িকপত্রটিকে বৈচিত্র্য দান করেছে।

ক) বুদ্ধগয়ার পথে: প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্তের বুদ্ধগয়া ভ্রমণের স্মৃতিচারণা ‘বুদ্ধগয়ার পথে’ কবিতায় কাব্যরূপ পেয়েছে। ‘বুদ্ধগয়ার শুদ্ধ পথে’ চলার জন্য মনকে শীলবান করার উদ্দেশে কবি বলেছেন, ‘মন রে আমার, শান্ত থেকো, ক্রুদ্ধ নহে, কোন মতে’। বুদ্ধবচনে বলা হয়েছে – ‘কোধং জহে’ অর্থাৎ ক্রোধ সংবরণ কর।[৭১] বুদ্ধদেব সংযমী-চর্যার পথ নির্দেশ করেছেন –

দুন্নিগ্‌গহস্‌স লহুনো যথকামনিপাতিনো
চিত্তস্‌স দমথো সাধু চিত্তং দন্তং সুখাবহং।

অর্থাৎ দুর্দমনীয়, লঘুগতি, যথেচ্ছ বিচরণশীল চিত্তের দমন মঙ্গলজনক, দমিত চিত্ত সুখাবহ হয়।[৭২] কবি বুদ্ধগয়ার পথের বর্ণনা দিতে গিয়ে সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কারের অন্তর্গত সমাসোক্তি অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন –

বাম দিকেতে ফল্গু রোগা বইছে ধীরে ঝিরি ঝিরি –
শিয়রে তার বিরাট-বপু পাহারা দেয় বিন্ধ্যগিরি;
কোন্ সে গিরি ফল্গু-জনক – কার স্নেহে সে বক্ষ ভরে?
নিদয় তাহার এ কি পিতা। – নেই কি স্নেহ ফল্গু তরে?
কাতর চলে করুণ সুরে ফল্গু চলে বিষাদিনী –
বালির তটের বুক মেলে সে ভাব্‌ছে উদাস – কি না জানি!
বট-অশথে আমের গাছে বুদ্ধগয়ার পথটী ঢাকা –
এ কি মোহন, এ কি শীতল, এ কি আঁচল স্নেহমাখা!

প্রস্তুতের উপর অপ্রস্তুতের ব্যবহার আরোপিত হলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়। এইক্ষেত্রে অপ্রস্তুত আপন রূপটি ঢেকে রেখে প্রস্তুতের উপর শুধু নিজের ব্যবহারটুকু আরোপ করে প্রস্তুতকে মধুর বৈশিষ্ট্য দান করে। এইক্ষেত্রে প্রস্তুতটি বাচ্য, অপ্রস্তুতটি প্রতীয়মান। আরোপিত ব্যবহার থেকে অপ্রস্তুতের প্রতীতি হয়।[৭৩] উদ্ধৃত অংশে ফল্গু নদীর উপর অপ্রস্তুত ‘রোগা’ শব্দটি এবং বিন্ধ্যগিরির উপর অপ্রস্তুত ‘বিরাট-বপু’ আরোপ করা হয়েছে। ফলে ফল্গু তন্বী নায়িকার ‘ঝিরি ঝিরি’ অভিসারিকার রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। অন্যদিকে

স্থূলদেহী বিন্ধ্যপর্বত তার পাহারায় নিযুক্ত রয়েছে। ফল্গু নদীর উৎপত্তি স্বভাবত পর্বত হওয়াই সঙ্গত। সেই পাষাণের গুণ আরোপ করে ফল্গুর জনক 'নিদয়' বলে উক্ত হয়েছে। ফল্গু বিষাদিনী, উদাসিনী নায়িকা। আর বট-অশত্থ-আম গাছে ঢাকা বুদ্ধগয়ার পথটি স্নেহময়ী মাতৃরূপকল্প লাভ করেছে – 'এ কি মোহন, এ কি শীতল, এ কি আঁচল স্নেহমাখা!' এই মানবিক (সং)বেদনার উৎসমুখ ভগবান বুদ্ধ। বেদনা-দুঃখ-দৈন্যকে স্বীকার করে, চিত্তজয়ের উত্তরণে তিনি 'আত্মবলের শিখায়' অশঙ্ক, আত্মপ্রতিষ্ঠ। বুদ্ধবচনের সারকথাই এই ভাবনায় কাব্যরূপ পেয়েছে –

অত্তনা চোদয়ত্তানং পটিমাসে অত্তমত্তনা,
সো অত্তগুত্তো সতিমা সুখং ভিক্‌খু বিহাহিসি।

অর্থাৎ 'নিজেই নিজেকে প্রেরণা দাও, নিজেই নিজের পরীক্ষা কর। হে ভিক্ষু! যিনি আত্মগুপ্ত ও স্মৃতিমান্ তিনি সুখে বিহার করেন'।[৭৪]

সমগ্র কবিতাটি বুদ্ধগয়ার পথকেন্দ্রিক, পথের সামগ্রিক স্মরণ। কিন্তু এই স্মরণ বা অনুভব তথাগত বুদ্ধের মহাজীবনকে স্মরণ করাচ্ছে –

যতই চলি চক্ষে আমার উঠ্‌ছে ভেসে সেই সে কথা –
সেই শুদ্ধোদনের তনয় ঘর ছেড়ে যায়, - নিজনতা
নিজনতা কোথায় মিলে? – কোথায় মিলে একটী কোণে
সবার আড়ে একটু যে ঠাঁই গুহায় কিবা গহন বনে –
যেথায় বসে' বুঝ্‌তে পারে জগৎ-জোড়া দুখের ব্যথা,
জগৎজন-বেদন-পেষণ, দুষ্ট শোকের কঠোরতা, ...
কেমন করে' জিনবে মানুষ এই বেদনে?...

এখানে বুদ্ধগয়ার পথ দেখে কবির রাজপুত্র সিদ্ধার্থের কথা মনে পড়েছে। *সাহিত্যদর্পণ*-কার লিখেছেন, 'সদৃশানুভবাদ্বস্তুস্মৃতিঃ স্মরণমুচ্যতে'। কোনো পদার্থের অনুভব থেকে যদি তৎসদৃশ অন্য বস্তুর স্মৃতি মনে জাগে, তবে সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কারের স্মরণোপমা অলঙ্কার হয়।[৭৫] স্মরণ উপমা এই কারণে যে এখানে উপমেয় 'শুদ্ধোদনের তনয়', উপমান 'বুদ্ধগয়ার পথ' এবং সাধারণ ধর্ম 'নিজনতা'। একই ভাবে এই কথা নীচের অংশটি সম্পর্কেও প্রযোজ্য –

আজকে বুদ্ধগয়ার পথে আড়াই হাজার বর্ষকথা
মনের মাঝে উঠছে ভেসে – ভাব্‌ছি এই সে নিজনতা

এইখানে ত ব্যাকুল বুকে এল ব্যাকুল যুবক ঋষি ...

এই পথে সে গিছ্‌ল না কি? – আছে সে পথ আজো বেঁচে?

মানুষের দুঃখ-বেদনার অনুভূতিতে সিদ্ধার্থ রাজপুত্রের বিলাস বৈভব অস্বীকার করে চিত্তজয়ের সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। দুঃখ-বেদনাগ্রস্ত মানুষ যেন মাতৃহীন অর্থাৎ সহায়সম্বলহীন হরিণবৎস আর সিদ্ধার্থ মহাকারুণিক, কবির ভাষায় 'বৎসহারা হরিণ'। বুদ্ধগয়ার পথে 'দুঃখত্রাণের গূঢ় বাণী' যিনি শুনিয়েছিলেন সেই তথাগত বুদ্ধের সন্ধানে কবি ফিরেছেন। বুদ্ধগয়ার মাটি-বিন্ধ্যগিরি-ফল্গু-হাওয়া কি তাঁর সেই 'বেদন-ব্যথা'কে নিজের মধ্যে লালন করছে? এই সবকিছুর মধ্যেই 'দূরের হাওয়া'র অনুভূতিতে দূরযানী কবি লিখেছেন –

চল্‌ছি ধীরে মনটা যেন কিসের্‌ ঝোঁকে পড়্‌ছে নুয়ে

সেই যে মহান্‌ বিরাট প্রাণের আভাস মোরে যাচ্ছে ছুঁয়ে,

যাচ্ছে ছুঁয়ে যাচ্ছে চুমে! – উথ্‌লে ওঠে নুইয়ে পড়ে

পরাণ আমার চিত্ত আমার কোন্‌ প্রীতিতে ভক্তিভরে!

কবিতাটির ভক্তিভাবের। 'শম্‌' কবিতাটির স্থায়ী ভাব, তা থেকে 'শান্ত' রসে পরিণত হয়েছে। সঞ্চারী ভাব হিসাবে প্রায়শই উৎসাহ এবং বিস্ময় এসেছে। বিস্ময়ের দৃষ্টান্তরূপে এই অংশটি উদ্ধারযোগ্য –

চল্‌ছি আমি চল্‌ছি আমি বুদ্ধ গয়ার শুদ্ধ পথে

শুদ্ধ পথে শুদ্ধ বনে, বুদ্ধদেবের প্রেমের রথে

ডাক এসেছে ডাক এসেছে, বইবে যেন আমায় তাহা

কোন্‌ সে লোক! – কী সে আলো! – কী সে পরম জ্যোতি আহা।

চিত্ত জাগে, চিত্ত দোলে চিত্ত ভাসে আলোর স্রোতে –

দুঃখ-ব্যথার অতীত আলো মুক্ত জগৎ-কলুষ হাতে। –

এতটুকু নেইক গ্লানি, নেইক তাতে আবিলতা,

মন ভরেছে প্রাণ ধুয়েছে সেই আলোরি অমলতা।

আবার সঞ্চারী ভাব রূপে 'উৎসাহ'-এর সঞ্চার ঘটেছে কবিতার কোনও কোনও অংশে। যেমন –

বুদ্ধ পরম। বুদ্ধ গুরু। সর্ব্বদুখের কারণ-জ্ঞাতা,

দুঃখ সয়ে দুঃখজেতা! বেদন-নত-জনের ত্রাতা!

উৎসাহী ভাবের প্রতীক 'বীর' সিদ্ধার্থের এই ভাবনা কবির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। যদিও দুর্দশা-দুঃখগ্রস্ত মানুষের অসহায়তার হা-হুতাশজাত শোক সঞ্চারী ভাব হিসাবে এসেছে। কিন্তু তা বুদ্ধের প্রেরণায় উৎসাহ ভাবের অভিসারী হয়েছে –

আজ পেয়েছি অভয়-বাণী, পথ সে কোথায় বল মোরে –
কেমন করে' জিন্‌ব ব্যথা জড়িয়ে থেকে ব্যথার ডোরে?
শক্তি সে দাও, দাও সে আশা, দাও পরম বুদ্ধি তব
বুদ্ধ গয়ার ক্ষুদ্র কোণে জাগ্‌ল যাহা অভিনব!

রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মানুষের 'দুঃখনাশের ব্যাকুল বেদন'-এর সাক্ষী বুদ্ধগয়ার পথ। সিদ্ধার্থ বোধিসত্ত্বের এই পথকেই কবি তাঁর অন্বিষ্ট করতে চেয়েছেন। তাই সবার জীবনের দুঃখ অনুভবন ও মোচনের ঈপ্সায় কবি বোধিসত্ত্বযানী হতে চান। তাঁর কবিতায় সেই শুভৈষণা ধরা পড়েছে –

এই পথে মোর ক্ষুদ্র পরাণ সেই পরাণে-হউক হারা,
হউক হারা হউক সারা, পার হয়ে যাক্‌ সকল ক্লেশে –
এ পথ মোরে যাক্‌ নিয়ে যাক্‌ সেই মহানের মানস-দেশে।

খ) নির্ব্বাণ: সুনীতি দেবী

'নির্ব্বাণ' কবিতায় সুনীতি দেবী 'নির্বাণ'কে নেতিবাচক অর্থে বুঝেছেন এবং তার বিপ্রতীপে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। কবিতাটি দশটি প্রশ্নচিহ্ন কণ্টকিত। স্বগতোক্তির ধরণে লেখা কবির নিজস্ব জীবনদৃষ্টি এখানে ধরা পড়েছে। তিনি নির্বাণকে 'মুক্তি' হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। হিন্দু মুক্তি ভাবনা এবং বৌদ্ধ নির্বাণ ভাবনা এক নয়, ভিন্নার্থক। হিন্দু-ভাবনা ঈশ্বরনির্ভর কিন্তু বৌদ্ধ-ভাবনা আত্মনির্ভর। নির্বাণ হল নি+বান অর্থাৎ বান বা তৃষ্ণা থেকে নির্গমণ। চিত্তের তৃষ্ণা ক্ষয়ের অবস্থার নাশ ক্লেশ (কারণের) নির্বাণ বা সউপাধিশেষ নির্বাণ; তৃষ্ণামুক্তের মৃত্যু স্কন্ধ (কার্যের) নির্বাণ বা অনুপাধিশেষ নির্বাণ, বৌদ্ধ সাধনার চরম লক্ষ্য। *ধম্মপদ*-এ এর গুণবাচক প্রতিশব্দ হল – অমৃত, যোগক্ষেম, অনাক্খাত, অগতংদিসং, জাতিক্খয়।[৭৬] কবিতায় নির্বাণ শব্দটির বিপরীতে 'প্রাণ'কে রাখা হয়েছে –

খুঁজিছ নির্বাণ?
হায় রে অবোধ নর, চাও না এ প্রাণ?

কবি প্রশ্ন করেছেন – সুখে-দুঃখে উদ্বেলিত হৃদয় চাও না? হাসি-অশ্রু মিশিয়ে জীবন কাটাতে চাও না? চাও শুধু অন্ধকার অনন্ত অসীম আর চির-জড়তার হিম? একটি ফুৎকারে একেবারে নিভে যেতে চাও? কবিতার শুরুতেই রয়েছে কাকুবক্রোক্তি শব্দালঙ্কারের প্রয়োগ। বক্তার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীর উপর এটি নির্ভরশীল। এতে কণ্ঠধ্বনির বিশেষ ভঙ্গীর ফলে নিষেধ বিধিতে এবং বিধি নিষেধে পর্যবসিত হয়ে শ্রোতার দ্বারা গৃহীত হয়।[৭৭] কবির কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীর মধ্যেই উত্তর রয়েছে, কবি উপরন্তু উত্তর দিয়েছেন, 'এই যদি মুক্তি হয়, আমি তবে চাই না নির্ব্বাণ।' কবি 'জীবন-সূর্য্যের' চারপাশে পৃথিবীর মত চিরভ্রাম্যমান হতে, নিত্য ধরণীর মধ্যে নব নব সাজে ফুটে উঠতে চান। কবিতার পরবর্তী অংশে মর্ত্যভাবনার আনুষঙ্গিক ধরা পড়েছে –

> বসুন্ধরা-বক্ষ হতে পান করি সুধা,
> মিটাইতে চাই তুচ্ছ তৃষ্ণা কিংবা ক্ষুধা।
> তাই চাই বারে বারে বাঁচি আর মরি।
> উত্তাল জীবন-সিন্ধু মাঝে বেয়ে চলি তরি,
> কভু ভয়ে দুলি, কভু ভেসে চলি স্রোতে।
> কখনও বা ঘুরে ফিরে পথ হতে পথে।
> রৌদ্র-তপ্ত দিনে উঠি শ্বসি'
> পথ-প্রান্তে বসি
> ঝড়ের বেগেতে যাই ছুটি,
> নিমেষে ধুলার 'পরে লুটি।
> কাঁপি বিদ্যুতের কম্পনেতে,
> ...　　...　　...
> ঢাকা রাখি বিকচ যৌবন
> বসন্তে বিকশি উঠি আবার নূতন!

উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *সোনার তরী* কাব্যগ্রন্থের 'বসুন্ধরা' কবিতার অক্ষম অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে আমরা উদ্ধার করছি –

> ... দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
> বসন্তের আনন্দের মতো; বিদারিয়া
> এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ

সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার, হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
… … …
যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে
মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা
শত লক্ষ আনন্দের স্তন্যরসসুধা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান।[৭৮]

ধরিত্রী মায়ের কোলে স্থানাভিলাষী কবি সুনীতি দেবী নির্বাণ চান না। 'নির্ব্বিকার' নির্বাণের বদলে তিনি হাহাকার, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, দ্বেষ, ভোগ, সুখ, ব্যথা, ভয়, ক্লেশ, ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার নিয়েই বাঁচতে চান। পরকালের ভয়ে তিনি আনন্দকে ক্ষয় করতে চান না। তাঁর মতে, 'কাপুরুষ', 'ক্ষীণ-প্রাণ'-রাই নির্বাণ প্রার্থী। পরলোক যদি নাও থাকে, তবুও তিনি সর্বদেশ ব্যাপ্ত হয়ে রইবেন। তাঁর দেহের ভস্মই জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে প্রাণের উন্মাদনা বয়ে নিয়ে যাবে। আকাশে বাতাসে জলের কল্লোলে সর্বত্রই নূতন প্রাণের সঞ্চার ঘটবে। পরিশেষে কাকুবক্রোক্তি অলঙ্কার প্রয়োগে কবি নির্বাণ নয়, জন্ম-মৃত্যু ভরা জীবনকেই তিনি সমর্থন করেছেন –

জন্ম-মৃত্যু ভরা থাকে অপরূপ নব-চেতনায়।
হায়, ভ্রান্ত মূঢ় নর নির্ব্বাণ কোথায়?

রবীন্দ্রনাথের ভাবের অক্ষম অনুকরণাত্মক এই কবিতায় কবি বৌদ্ধদর্শনের 'নির্বাণ' সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল নন। আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে ধারণা না থাকায় আক্রমণ যথাযথ হয়নি, কবিতাটি আবেগপুঞ্জের আস্ফালন ছাড়া আর কিছুই নয়।

গ) অন্ধ কুণাল: সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা গ্রন্থের অন্তর্গত 'কুণালাবদান' কাহিনি অবলম্বনে সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'অন্ধ কুণাল' কবিতাটি লেখেন। মূলকে অনুসরণ করলেও কবিতাটিতে কিছু পরিবর্তন করে কবি আরও

বাস্তবানুগ হতে চেয়েছেন। মূল কাহিনির বৌদ্ধ চিহ্নগুলি কবিতায় সাধারণীকৃত হয়ে সহজবোধ্য হয়েছে। অশোক, কুণাল, কাঞ্চনলতা (মালা), রাজ্ঞী (তিষ্যরক্ষা) কবিতার চরিত্র। অশোক ও কুণালই কবিতার সক্রিয় চরিত্র। মগধ প্রাসাদে উৎসব বন্ধ, প্রাসাদ শোভমান নয়, পুরদ্বার রুদ্ধ, সানাইয়ের তান স্তব্ধ, তমাল গাছে পিকধ্বনি অশ্রুত, সরোবরে মরাল-মরালী নেই। কবিতায় এগুলির উল্লেখে একটা অনৈসর্গিক, অশুভ আবহ তৈরি হয়েছে। কুমার কুণাল স্ত্রী কাঞ্চনলতাকে নিয়ে বিলাসসুখ ত্যাগ করে গভীর নিশীথে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। পরদিন কুণালের উদ্দেশে সম্রাট অশোক বুদ্ধ-স্মরণ করেন। শারদ প্রভাতে মধুর বাঁশির ধ্বনি শ্রুত হয়। পুরদ্বারে রাজা অশোক এসে দেখেন কাঞ্চনের সঙ্গে তোরণে 'ভিক্ষাচ্ছলে' অন্ধ কুণাল দাঁড়িয়ে রয়েছেন। রাজার প্রশ্নের উত্তরে কুণাল তাঁর চক্ষুবিনষ্টির কারণ রূপে জানান –

নটী মঞ্জুষা হরে'ছে বিশ্বলোক,
পাপতৃষা তার মিটাতে পারিনি
অন্ধ করেছে চোখ।

কবি স্বয়ং বলেছেন নটী মঞ্জুষা কাল্পনিক নাম। আমরা মূল কাহিনিতে দেখি বিনষ্টচক্ষু কুণালকে দেখে কাঞ্চনমালা সংজ্ঞা হারান। তাঁর সংজ্ঞা ফিরলে ধীরস্বভাব কুণাল অনিত্যতা চিন্তাদ্বারা সত্যদর্শন ও স্রোতাপন্ন প্রাপ্ত হয়ে কাঞ্চনমালাকে বলেন –

> মুগ্ধে! ধৈর্য অবলম্বন কর। মোহ ও দৈন্যে বিহ্বল হইয়া কাতর হইও না। হে ভীরু! মনুষ্যের নিজ কর্ম্মের ফল অবশ্য ভোগ করিতে হয়।[৭৯]

প্রাজ্ঞ কুণাল অহেতুক কল্পিত নটী মঞ্জুষার নামে নিজের অন্ধত্বের দায় চাপালে হয়ত কুচক্রী বিমাতার প্রতি বেশি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া যেত, কিন্তু তা কোনমতেই শোভনসুন্দর হত না। সম্রাট অশোক কুণালের কথা শুনে গণিকাকে বধ করতে আদেশ দিলে কুমারের মিনতিতে সত্য কথা ব্যক্ত হয়েছে – 'মাতারে আমার ক্ষমা কর পিতা রাজ কোপ সম্বরি'। কিন্তু স্রোতাপন্নপ্রাপ্ত কুণাল বিমাতাকে রক্ষার জন্য অনৃত ভাষণ করবেন এটি বৌদ্ধ পারিভাষিক অর্থে কবিতাটির ত্রুটি বলেই বিবেচিত হবে। কুণালের কণ্ঠে আত্মোপলব্ধি ধ্বনিত হয়েছে –

ফুটে গেছে মোর জ্ঞানের নয়ন
ভেঙ্গে গেছে ভুল ভ্রান্তি
টুটে গেছে আজ বিলাসের নেশা
পেয়েছি আলোক-কান্তি।

মূল কাহিনিতে সত্যবলে নেত্রদ্বয়ের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। অশোক কুণালকে যৌবরাজ্য গ্রহণে বিমুখ জেনে অন্য পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। অশোক তিষ্যরক্ষাকে উপযুক্ত দণ্ডবিধান করেন। এরপর সঙ্ঘস্থবির কুণালের পূর্বজন্মের কাহিনি ব্যক্ত করেন।[৮০] এই সমগ্র অংশ কবিতায় পরিত্যক্ত হয়েছে। কুণাল মাকে (তিষ্যরক্ষার নাম উল্লিখিত হয় নি) ক্ষমা করেন যা বৌদ্ধ পারমীগুণের অনুসারী।

ঘ) বৌদ্ধ ভারত: অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়ের 'বৌদ্ধ ভারত' একটি চতুর্দশপদী কবিতা। অজ্ঞান, মোহান্ধ জীব ধরণীর বুকে দিকহারা, জরা-মৃত্যু-দুঃখে তাদের দিন কাটে। জীবের দুঃখ মোচনের জন্য শাক্যমুনি বুদ্ধদেব শিষ্যদের দিকে দিকে সত্যধর্ম বিতরণের আদেশ করেন। তাঁর আদেশে সম্ভ্রমে রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে ভাণ্ডার-দ্বার উন্মুক্ত করেন। শ্রেষ্ঠী এনে দেন রত্নধন, গৃহীরা শ্রদ্ধা-অবিচলিত ভাবে পুত্র-কন্যাকে মহৎ কাজে উৎসর্গ করেন, দলে দলে ভিক্ষুরা পর্বত-তুষার লঙ্ঘন করে অগ্রসরমান হন। সকল জীবের শুভৈষণার জন্য বুদ্ধদেব যেভাবে ভারতের জনমানসে পারমী গুণের সঞ্চার করেছিলেন, সেইভাবে সকলে নিজেদের উজার করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ভাবগত দিক থেকে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমাকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের একটি রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক নয়, ধর্মগত বা ভাবগত ধারণা তৈরি হয়েছিল। তাঁর উদ্দেশে কবি বলেছেন –

> সেদিন ভারত
> যে দৃশ্য দেখালে তুমি – পুণ্য অভিযান
> সাম্য মৈত্রী করুণার – সেই গরীয়ান
> অপার্থিব ইতিহাস মহৈশ্বর্য্যময়
> আজও মানুষের বুকে জাগায় বিস্ময়।

ঙ) শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনস্মৃতি-এর 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়ে (*প্রবাসী*, ফাল্গুন, ১৩১৮) ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের স্মৃতিচারণায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তাঁর পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা 'স্বদেশাভিমান' স্থির দীপ্তিতে

জেগে ছিল। এই স্বদেশাভিমান তাঁকে ভারতেতিহাসের ঐতিহ্য ও রিক্‌থকে পুনরুদ্ধারে প্ররোচিত করেছিল। *কথা* (১৯০০) কাব্যগ্রন্থের মূল আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই এই ভাবনা বিলসিত হয়েছে –

হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও।[৮১]

তিনি 'পিতামহদের কাহিনী' শুনিয়ে পরাধীন ভারতবর্ষে দেশবাসীর মনে জাত্যভিমান তৈরি করতে চেয়েছিলেন। *কথা* কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় তিনি ভারতের অতীত গৌরবময় বৌদ্ধ ইতিহাসকে অবলম্বন করেছিলেন। তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* (১৮৮২) গ্রন্থ থেকে *কথা* কাব্যগ্রন্থের বৌদ্ধ উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। কবিজীবনচর্যার কারণেই রবীন্দ্রনাথ মহাযানপন্থ বৌদ্ধ। মহাযান বৌদ্ধধর্মে জ্ঞানের সংযম না থাকলেও তা 'ভক্তির প্রবল উচ্ছাসে' নানা বিচিত্র রূপ রস সৃষ্টিকারী – রবীন্দ্রনাথকে এই বিষয়টি আকর্ষণ করেছিল। বুদ্ধদেব অনাগারিক। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপথিক। বিশ্বের দুই শ্রেষ্ঠ মনীষার মানবহিতৈষণার ভাবনা কোথাও এক ভাবৈকরসে একীভূত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধ ও বৌদ্ধচর্চা বিশ্ব তথা মহামানবের উপলব্ধির অনুসন্ধিৎসা।

রবীন্দ্রনাথ *অবদানশতক*-এর কাহিনি অবলম্বনে 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' (৫ কার্তিক, ১৩০৪) কবিতা লিখেছিলেন তা *কথা* কাব্যগ্রন্থে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত হয়।[৮২] তাঁর 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধ (*বঙ্গবাণী*, ভাদ্র, ১৩৩৩) সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ বলে বিবেচিত হয়। এই প্রবন্ধে 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। একদিন শীতের ভোরে বুদ্ধতিষ্য অনাথপিণ্ডিক[৮৩] নগরে ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। তিনি মেঘমন্দ্রস্বরে অচেতন মানুষের উদ্দেশে বুদ্ধবার্তা শুনিয়েছেন। তাঁর ঘুমভাঙানিয়া আহ্বান শুধু জৈবিক নয়, আত্মিক সচেতনতারও উদ্বোধনমন্ত্র –

শুন, মেঘ বরিষার
নিজের নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার,
সর্ব ধর্ম মাঝে ত্যাগধর্ম সার
ভুবনে।

বৌদ্ধদর্শন ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞেয়বাদী। কিন্তু পরবর্তী মহাযান দর্শনে এই অবস্থান সেতুসাধ্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'বুদ্ধদেব' প্রবন্ধে (*প্রবাসী*, আষাঢ়, ১৩৪২) বৌদ্ধধর্মের ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভারতবর্ষের কথা শুনিয়েছিলেন –

> বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ যখন প্রেমের সেই ত্যাগধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিল তখনি সমাজে এমন একটি বিকাশ ঘটিয়াছিল যাহা য়ুরোপে সম্প্রতি দেখিতেছি। ... ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার দুঃখরূপকে বিকাশ করিয়াই ভক্তগণকে বীর্যবান মহৎ মনুষ্যত্বের দীক্ষা দান করিয়াছিল। সেইজন্যই ভারতবর্ষ সেদিন ধর্মের দ্বারা কেবল আপনার আত্মা নহে, পৃথিবীকে জয় করিতে পারিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিকতার তেজে ঐহিক পারত্রিক উন্নতিকে একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ 'বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ' প্রবন্ধে (*তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, পৌষ, ১৩৩৮) বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব একদিকে 'কঠোর ত্যাগ' অন্যদিকে 'উদার প্রেম'-এর কথা বলেছেন। এটিকে কেবলমাত্র জ্ঞান ও ধ্যানের ধর্ম মানতে রবীন্দ্রনাথ নারাজ। ত্যাগের তাৎপর্য বিশ্লেষণে তিনি বলেছেন যে বাসনায় ক্ষয়েও কিছু বাকি থাকে। সেখানে সমস্ত আসক্তি ও রিপুর আকর্ষণ দূর হয়ে যায় বলেই দয়া প্রেম আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই পরিপূর্ণতাই ব্রহ্মের স্বরূপ। অতএব ব্রহ্মভূত বা ব্রহ্মের স্বরূপে বিরাজিত জনকে কেবল ত্যাগের রিক্ততা নয়, 'ত্যাগের দ্বারা প্রেমের পূর্ণতা' লাভ করতে হবে। 'উৎসবের দিন' (*বঙ্গদর্শন*, মাঘ, ১৩১১) প্রবন্ধে ত্যাগের দৃষ্টান্তরূপে জলভরা মেঘের উপমাকে তিনি উপস্থাপিত করেছেন –

> বুদ্ধদেবের করুণা সন্তান-বাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে – তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপর বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য।

'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' কাব্যকাহিনির 'ত্যাগধর্ম সার' শব্দবন্ধের অর্থ বোধিসত্ত্বচর্যা বা পারমিতার ধারণার সঙ্গে যুক্ত। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে জন্ম-জন্মান্তর ধরে যে সমস্ত সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন তা পারমিতা (পরম্+ই+তা) বা পারমী।[৮৪] শান্তিদেবের *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদের দশম শ্লোকে দান-পারমিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে –

> ফলেন সহ সর্বস্বত্যাগচিত্তাজ্জনেহখিলে।
> দানপারমিতা প্রোক্তা তস্মাৎ সা চিত্তমেব তু।।

অর্থাৎ, চিত্ত থেকে সর্বস্ব (সর্ব-কাম্যবস্তু) সর্বজনের জন্য ত্যাগ করতে হবে। এই ত্যাগের যে ফল (স্বর্গাদি) তাও সর্বজনকে দান করতে হবে। এইরূপ ক্রমাগত ত্যাগ অভ্যাসের দ্বারা যে মাৎসর্যবিহীন, নির্মল, নিরাসক্ত চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাই 'দানপারমিতা' বলে উক্ত হয়। সুতরাং, চিত্তই (অর্থাৎ চিত্তের অবস্থাবিশেষই) 'দানপারমিতা'।[৮৫] প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করে তার অভাব দূর করা বোধিসত্ত্বের দান পারমিতার উদ্দেশ্য। দানের পূর্ণতার জন্য ফলাকাঙ্ক্ষা, আত্মভাব এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের

কুশলমূলেরও পরিত্যাগ করে বোধিসত্ত্ব সর্বপ্রাণির মঙ্গলসিদ্ধি চেয়েছিলেন। বোধিসত্ত্ব ভাবনা মানব হিতৈষণার চূড়ান্ত ভাবনা।[৮৬]

রবীন্দ্রনাথ ‘শান্তিনিকেতন’ বক্তৃতামালার ‘আদেশ’-এ (৯ চৈত্র, ১৩১৫) বলেছেন, আত্মার ‘বিশুদ্ধি’ স্বরূপটি বুদ্ধদেবের মতে শূন্যতা বা নৈষ্কর্ম নয়। তা মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ নয়, প্রেম বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ, প্রেমের বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে লাভ করে।[৮৭] ‘শান্তিনিকেতন’ বক্তৃতামালার ‘ভূমা’-য় (১৪ চৈত্র, ১৩১৫) বলেছেন, বুদ্ধদেবের ‘দুঃখনিবৃত্তির পথ’-এর তাৎপর্য হল – অত্যন্ত দুঃখ স্বীকারের মাধ্যমে মানুষ আপনাকে বড় করে জানে, বৃহৎ ‘ত্যাগ ব্রতপালন’-এর মাহাত্ম্য মানুষের শক্তিকে বড়ো করে দেখায়।[৮৮] কবিলিখিত বৌদ্ধকাহিনি কাব্যের সারাংশ হল – অনাথপিণ্ডিকের আহ্বানে রাজা-গৃহী সবার মধ্যে অনিত্যতার বোধ জাগ্রত হলে ললিত সুখকে তাঁদের মনে হয় ‘গত যামিনীর স্থলিত দলিত শুষ্ক কামিনীর মালিকা’। একক ‘ভিখারী’ অনাথপিণ্ডিক প্রভু বুদ্ধের উদ্দেশে ভিক্ষা চান। ধণিক-বণিক মুঠো মুঠো রত্নকণা, কেউ কণ্ঠহার, মাথার মণি, কেউ থলিভর্তি স্বর্ণ এনে দেন। কিন্তু ভিক্ষুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি শূন্য ঝুলি নিয়ে পৌরজনের কাছে ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে ‘সর্বশ্রেষ্ঠ দান’ চাইছেন। ধনী থেকে সাধারণ মানুষ লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকেন। মহানগরীর পথ পরিক্রমা শেষ হলে তিনি কাননে প্রবেশ করলে এক দীনা নারী এসে তাঁকে প্রণাম করে। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে মেয়েটি তার পরনের একমাত্র জীর্ণ চীরটি মহাভিক্ষু বুদ্ধের উদ্দেশে দান করলে অনাথপিণ্ডিক বলেন, ‘অনেকে অনেক দিয়েছে, কিন্তু সব ত কেউ দেয় নি। এতক্ষণে আমার প্রভুর যোগ্য দান মিল্‌ল, আমি ধন্য হলুম।’ *দীর্ঘনিকায়* গ্রন্থের ‘চক্কবত্তি-সীহনাদ সূত্রান্ত’-এ দরিদ্রের অভাবের কারণে চৌর্যবৃত্তির উল্লেখ রয়েছে।[৮৯] আমাদের আলোচ্য কাহিনিতে দীনা নারী চৌর্যবৃত্তি তো নয়ই, বরং তার সর্বস্ব বুদ্ধের উদ্দেশে দান করেছে। মূল কাহিনিতে দরিদ্রা নারীকে মূল্যবান ভূষণে সাজিয়ে বুদ্ধের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের যুক্তিতে তা অপ্রয়োজনীয়, তাই ত্যক্ত হয়েছে। বৌদ্ধ-তিতিক্ষার আলোকে ধন্যা নারীকে বুদ্ধশিষ্য অনাথপিণ্ডিক স্বীকৃতি জানিয়েছেন –

চলিলা সন্ন্যাসী ত্যাজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর
সঁপিতে বুদ্ধের চরণনখর
আলোকে।

রবীন্দ্রনাথ ‘তথ্য ও সত্য’ প্রবন্ধে জানিয়েছেন – একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ধার্মিক খ্যাতিমান লোক তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা’ কবিতাটি পড়ে ‘বড় লজ্জা’ পেয়ে বলেছিলেন, ‘এ ত ছেলে-মেয়েদের পড়বার যোগ্য কবিতা নয়’। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে চাপা ব্যঙ্গ করে লিখেছেন –

> যদি বা বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থ থেকে আমার গল্প আহরণ করে’ আন্‌লুম, সেটাতেও সাহিত্যের আব্রু নষ্ট হল। নীতিনিপুণের চক্ষে তথ্যটাই বড় হয়ে উঠ্‌ল, সত্যটা ঢাকা পড়ে’ গেল।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত *সাহিত্য* (১৮৯০) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সাহিত্যের স্বাস্থ্যহানির অভিযোগ উঠেছিল। ‘সাহিত্যের স্বাস্থ্য-রক্ষা’ রবীন্দ্র-সমকালীন সাহিত্যক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের বিষয় ছিল, আর রবীন্দ্রসাহিত্যই ছিল এর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য তত্ত্বের ব্যাখ্যায় লেখেন – তথ্যের দিক থেকে ভিখারিণীর কাছ থেকে দান নেওয়াটাই ‘অধর্ম’। যদি নিতেই হত তাহলে তার পাতার কুঁড়ের ভাঙা ঝাঁপটা কিম্বা একমাত্র মাটির হাঁড়িটা নিলে ‘সাহিত্যের স্বাস্থ্য-রক্ষা’ হতে পারত। এমনকী কবিও তথ্যের জগতে ভিক্ষা করতে বেরলে গর্হিত কাজ হত না এবং তথ্যের জগতে পাগলা গারদের বাইরে ভিখারিণী কোথাও মিলত না যে নিজের গায়ের একখানি কাপড় ভিক্ষা দিত। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে-ক্ষেত্রের পরিচয়দান কালে ব্যতিক্রমের বিষয়টি দৃষ্টান্তসহ বুঝিয়ে দিয়েছেন –

> ... সত্যের জগতে স্বয়ং ভগবান্‌ বুদ্ধের প্রধান শিষ্য এমন ভিক্ষা নিয়েছেন এবং ভিখারিণী এমন অদ্ভুত ভিক্ষা দিয়েছে; এবং তাঁর পরে সে মেয়ে যে কেমন করে’ রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে যাবে সে তর্ক সেই সত্যের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তথ্যের এতবড় অপলাপ ঘটে ও সত্যের কিছুমাত্র খর্বতা হয়না – সাহিত্যের ক্ষেত্রটা এমনই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যদর্শন সম্পর্কে ‘তথ্য ও সত্য’ প্রবন্ধে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন –

> রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এবং এক মূল্য নয়। ... রস জগতে ভিখারীর জীর্ণ চীরখানা থেকেও নেই, তার মূল্যও তেমনি লক্ষপতির সমস্ত ঐশ্বর্যের চেয়ে বড়ো। এমনি উল্টোপাল্টা কাণ্ড। ... সাহিত্য ও ললিতকলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ, এই জন্যে তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। এই স্বাদটি হচ্ছে একের স্বাদ, অসীমের স্বাদ।

বৌদ্ধ কাহিনি-কথাকাব্যের রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ‘অসীমের স্বাদ’ কেই-বা দিতে পারতেন!

কথাসাহিত্য

গল্প

কথাসাহিত্য রচনায় ভারতবর্ষই যে বিশ্বে পথিকৃতের মর্যাদা লাভ করতে পারে তা ঊনবিংশ শতকের ভারততত্ত্ববিদ ও জাতীয়তাবাদী লেখকেরা মনে করতেন। বৌদ্ধ নীতিগল্পগুলি ও বুদ্ধদেবের জীবনী গ্রন্থ এই মতকে পরিপুষ্টি দান করেছিল। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতের নীতি গৌরব' প্রবন্ধে (*আর্য্যদর্শন*, ভাদ্র, ১২৮৫) প্রাচীন ভারতীয় কথাসাহিত্যের সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দ্বারা সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার ফলে ভারতবর্ষ সম্পর্কে পাশ্চাত্যবাসীর অনেক ভ্রান্ত ধারণা ঘুচে গিয়েছিল। পাশ্চাত্যে প্রচলিত অনেক নীতিসম্ভব গল্প খ্রিস্টান ধর্মের সারাংশ বলে পরিগণিত হয়। রোম নগরে বা লিসবন শহরের গির্জায় রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে যাঁরা পরম পবিত্র খ্রিস্টান ঋষি বলে পূজিত হন, তাঁরা 'বুদ্ধমূর্তির বিকৃতি' মাত্র বলে প্রাবন্ধিক মনে করেছেন। 'অজ্ঞ গোঁড়া' পাদ্রিদের চেষ্টায় বুদ্ধ নামান্তর ও রূপান্তরপ্রাপ্ত হয়েছেন। নীতিপ্রচার সম্বন্ধে সভ্য সমাজে ভারতের সর্বোচ্চ আসনের দাবি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। গল্প ও নীতিকথার প্রাচুর্যে সংস্কৃত সাহিত্য শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। পণ্ডিতদের মতানুসারে, পশুপক্ষী সংক্রান্ত নীতিকথা ভারতবর্ষ থেকেই অনান্য দেশে প্রচলিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে এইরকম গল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তকেরা দরিদ্র, কাঙাল, নীচ জাতি, মূঢ়দের নিজ ধর্ম অবলম্বন করাবার চেষ্টায় ছিলেন বলে সর্বজনবোধ্য গল্প তাঁদের প্রচারের স্বার্থে আবশ্যক ছিল যা রচিত হয়ে মৌখ পরম্পরায় বাহিত হত। ৫৫০ খ্রিস্টাব্দের আগে এই গল্প ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারিত হয়। ম্যাক্সমূলারের মতে এই গল্পগুলি খ্রিস্টজন্মের পূর্ববর্তী কালের রচনা।

নীতি সম্পর্কে ভারতের কাছে সমস্ত সভ্য রাষ্ট্রের ঋণ প্রমাণ করতে লেখক একটি উপাখ্যান উপস্থাপিত করেছেন। মহাত্মা জোসেফঠ করনেল সকল খ্রিস্টিয় সম্প্রদায়ের পূজ্য। পূর্বাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে প্রতি বছর ২৬ ও ২৭ নভেম্বরে তাঁর অর্চনা হয়ে থাকে, হুগলি নগরের কাছে বানাতগাড়ির গির্জায় তা দেখা যায়। এই সাধুর সৃষ্টি কৌশল অতি কৌতুকজনক। বাগদাদের যে খলিফা আলমানসায়ের দরবারে সরজিয়স নামের খ্রিস্টান রাজকোষাধ্যক্ষের জন নামে এক সন্তান ছিলেন। জন কোন ইতালিয়ান পাদ্রি দ্বারা শিক্ষিত ও ধর্মনীতিতে দীক্ষিত হন, পিতার মৃত্যুর পরেই জন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিছুকাল

পড়ে তিনি দামাসকাস নগরে মঠবাসী সন্ন্যাসী হয়ে ধর্মালোচনায় নিযুক্ত হন। এই সময়ে নানা গ্রন্থে বারলেম ও জোসেফট (আনুমানিক পঞ্চম-ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ)[৬০] সাধুদের বিবরণ জন কর্তৃক প্রচারিত হয়। খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাই এই পুস্তকগুলি লেখার উদ্দেশ্য ছিল। এই পুস্তকের রাজপুত্র খ্রিস্টিয় সমস্ত চার্চেই সমান পূজ্য। তাঁর গল্পটি প্রথমে গ্রিক ভাষায় লিখিত হয়, পরে নানা ভাষায় অনূদিত ও প্রচারিত হয়। সেই গল্প এইরকম –

> ভারতবর্ষে এক রাজা ছিলেন। তিনি খ্রিস্টানদের চিরশত্রু ও পীড়ক। তাঁর একমাত্র সন্তান ছিল। জ্যোতিষীরা গণনা করে বলেছিলেন যে সে রাজকুমার নবধর্ম অর্থাৎ খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করবেন। তার জন্য যাতে কুমার পৃথিবীর দুঃখ যাতনা থেকে দূরে বিলাস সম্ভোগে কালযাপন করতে পারেন সেই বিষয়ে রাজা চেষ্টিত হলেন। কিন্তু কোনো খ্রিস্টান সন্ন্যাসী রাজকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, তাতে রাজকুমার কেবল নবধর্ম অবলম্বনে ক্ষান্ত না হয়ে ঐহিক সমস্ত অর্থ ত্যাগ করেন। পরে নিজ পিতাকেও নবধর্মে দীক্ষিত করে বনে চলে যান।

প্রাবন্ধিক *ললিতবিস্তর*-এর বুদ্ধদেবের কাহিনির সঙ্গে বারলেম ও জোসেফটের জীবনবৃত্তান্তের তুলনা করেছেন। বুদ্ধের পিতাও রাজা ছিলেন, তাঁর জন্মের প্রাক্কালে জ্যোতির্বিদরা ভবিষ্যতবাণী করেন তিনি হয় মহারাজা নয়তো রাজসিংহাসনত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে সর্বজ্ঞান লাভ করবেন। যাতে তিনি সর্বত্যাগী বৌদ্ধসন্ন্যাসী না হন রাজা তাঁকে বিলাস-সম্ভোগী করবার জন্য রম্যোদ্যানে স্থিত করেন। কিন্তু পরে তিনি মানব দুঃখ দর্শন করে বৌদ্ধ হন। জোসেফট ও বুদ্ধ নিজ নিজ পিতাকে নব ধর্মাবলম্বী করেন। উভয়েই মৃত্যুর আগে ধর্মাত্মা বলে মানবমণ্ডলীতে পূজ্য হন। জন আরো লিখেছেন যে তাঁর গল্প ভারতবর্ষ থেকে প্রত্যাগত বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনেছিলেন। প্রাবন্ধিক প্রশ্ন করেছেন – 'খ্রীষ্টিয়াবতার অবতার সেন্ট জোসেফট গৌতম শাক্যমুনির রূপান্তর মাত্র বলা কি অসঙ্গত'? জন লিখিত জোসেফটের জীবনবৃত্তান্ত ও বুদ্ধদেবের চরিতাবলীর সৌসাদৃশ্য বিচার করে ম্যাক্সমূলার অনুমান করেন যে জন কেবল বাচনিক কথার উপর নির্ভর করে নয়, বোধহয় *ললিতবিস্তর* যথার্থই দেখেছিলেন। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি উভয় ধর্মাত্মার পরিভ্রমণ বিবরণী উল্লেখ করে লিখেছেন যে সংস্কৃতে মানবজীর্ণতার প্রসঙ্গে যে যে কথা ব্যবহার হয়েছে, জন-কৃত গ্রিকপুস্তকে অবিকল সেইগুলিই প্রযোজিত দেখা যায়। প্রাবন্ধিক দাবি করেছেন –

> ... জোসেফট বৌদ্ধ অবতারের প্রতিরূপ – খ্রীষ্টিয়ানদের মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার করা উচিত। বৌদ্ধদেবের মত এরূপ অকৃত্রিম স্বর্গীয় পুরুষ আর কে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? প্রকৃত দয়ার সাগর সত্য-নিষ্ঠ শাক্যসিংহের ন্যায় আর কাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়? মানব জাতির উদ্ধার হেতু তাঁহার মত যৌবন-সুখ,

> রাজ্য-সুখ, সংসার-সুখকে অবলীলা ক্রমে ত্যাগ করিয়া "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" প্রচারের সন্ন্যাসাশ্রম আর কে গ্রহণ করিয়াছেন? কোন্ সাধুর চরিত্রে ও জীবনে এই রাজকুমার সন্ন্যাসী এবং সাধুর সহিত তুলনা হইতে পারে?

এই পুরাবৃত্তটিকে প্রাবন্ধিক ভারতবাসীদের 'প্রকৃত গৌরব স্থল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আবেগতাড়িত ভাষায় দাবি করেছেন, প্রতি বৎসর ২৭ নভেম্বর নবেনা উৎসবে এই ভারতক্ষেত্র বেণ্ডেল প্রভৃতি গির্জার স্থানে স্থানে 'যে শত শত দ্বীপ চঞ্চল শিখায়' জ্বলে থাকে তা 'ভারতের প্রদীপ্ত গৌরব-শিখা' বলে সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকের স্বীকার করা উচিত।

ক) উপ্‌পলা

উপ্‌পলা চরিত্রটি *জাতক* কাহিনির 'মহাজকনকজাতক', 'শ্যামজাতক' এবং 'খণ্ডহালজাতক'-এ জন্মান্তরে সমুদ্রদেবতা, দেবকন্যা, শৈলজা রূপে ছিলেন।[৯১] জাতকের কাহিনি অবলম্বনে রচিত একটি অস্বাক্ষরিত গল্প 'উপ্‌পলা'কে (*বঙ্গবাণী*, কার্তিক, ১৩৩০) 'সেকালের গল্প' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৌদ্ধ বিষয় নিয়ে লেখা হলেও গল্পে অবৌদ্ধচিত সুর ধরা পড়েছে। গল্পটিকে নাটকীয় করে তোলার উদ্দেশ্য গোড়া থেকেই লক্ষ করা যায়। সূচনাটি বৌদ্ধরীতি অনুসারেই সূচিত হয়েছে –

> তখন জেতবনে ভগবান বুদ্ধদেবের বৈঠক চলিতেছিল। উপ্‌পলা আপনার দুঃখের বোঝা আর বহিতে পারিতেছিল না; সে ভাবিল, – আর একবার বুদ্ধদেবকে দেখিয়া আসি, ...। ভাবিতে ভাবিতেই তার সারা শরীরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল...।

যে সর্বস্ব হারিয়েছে, তবুও তার বাঁচার ইচ্ছা এবং শান্তির সন্ধান কেন – তাই ভেবে উপ্‌পলা আকুল হয়। প্রাণের মধ্যে বসবাসকারী 'রাক্ষসী' তাকে শান্তি খুঁজবার পথে ঠেলছে বলে তার মনে হয়। এখানে কারণ এবং কার্যের বৈষম্য বা বিরূপতা ঘটেছে, কারণ থেকে ইচ্ছানুরূপ ফলের পরিবর্তে অবাঞ্ছিত ফল এসেছে। একাধারে একান্ত অসম্ভব ঘটনার মিলন হয়েছে বলে এটি অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী 'বিষম' অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।[৯৩] তরুণী উপ্‌পলার কোনও কুলে কেউ ছিল না। স্বামী, শিশু সব গত হবার সঙ্গে তার সব সম্পত্তিও চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে। তথাগতের কাছে গেলে সকল জ্বালা জুড়ায় এইকথা শুনে সে একদিন বুদ্ধদেবকে দেখতে গিয়েছিল। নির্বাণপ্রাপ্ত তথাগতের প্রশান্ত সৌম্য মূর্তি, তাঁর জ্ঞানের বাণী তাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। বুদ্ধদেবের সামনে বিপুল জনতা দেখে সে ভয়ে পালিয়েছিল। পাড়ার পাতানো

মাসী শ্যামার মা তাকে দু-বেলা খেতে দেন। উপ্‌পলা তার কাছে অতি অলক্ষ্যে যে শান্তি পায়, তা 'হয়ত' তার পক্ষে দ্বৈতবনে বা জেতবনে পাওয়া 'অসম্ভব' ছিল। শ্যামার মায়ের সঙ্গে ঘর-সংসারের কথা বলতে বলতে উপ্‌পলা খাচ্ছিল। এমন সময় শ্যামা তার দাদার শিশু ছেলেটিকে কোলে করে সেখানে আসে। শ্যামার মা বলেন – নানা অসুখে বৌমার বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায় নাতিটাকে শান্ত রাখা যায় না। উপ্‌পলা শিশুটিকে টেনে কোলে নিয়ে তাকে স্তন্যপান খাওয়ায়। উপ্‌পলার মানসিকতার পরিবর্তন হয়। সে এখন থেকে দু-বেলা পেট ভরে খাবার কথা ভাবে। তার নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য নয়, শিশুটিকে যথেষ্ট দুধ খাওয়ানোর তাগিদেই তার মনে এই অভিপ্রায় জাগে। শ্যামা তার মাকে জিজ্ঞাসা করে 'ধম্ম কি, নিব্বাণ কি?' শ্যামার মা বলেন –

> সব্বজ্ঞ ঠাকুরের সকল কথা কি আমরা বুঝতে পারি মা? আমাদের কাছে মায়া - সে ঘরসংসার; ঠাকুরের সে সব কিছুই নাই।

এটা যদি বৌদ্ধ ভাবাপন্ন গল্প হোত তাহলে প্রশ্নটির কোনও না কোনও ভাবে অনুসন্ধান থাকত। এই গল্পে সেই চেষ্টা সযত্নে পরিহার করা হয়েছে তা গল্পটির শেষে স্পষ্ট হয়েছে। উপ্‌পলা ও শিশুটির একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ার ছবির পর গল্পের শেষে বন্ধনীর মধ্যে বলা হয়েছে –

> মানুষ বাঁচে পরের "আহা" পাইয়া ও প্রাণ বিলাইয়া; গুরু কাড়িয়া নয়, ধর্ম্ম-তত্ত্ব কুড়াইয়া নয়।

পালি জাতক ৫টি অংশে বিভক্ত। ১) পচ্চুপন্নবত্থু (প্রত্যুৎপন্ন বস্তু) বা বর্তমান কাহিনি – কাহিনির শুরুতে মুখবন্ধে বুদ্ধ কখন, কোথায়, কোন ব্যক্তির কোন্‌ ঘটনা প্রসঙ্গে জাতক বিবৃত করেছেন তার বর্ণনা রয়েছে। ২) অতীত বত্থু বা অতীত জন্মকাহিনি – বুদ্ধের অতীত কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে এবং এটিই প্রকৃত জাতক কাহিনি। ৩) গাথা – গদ্য-পদ্য মিশ্রিত অতীত বস্তুর পদ্যাংশ। ৪) বেয্যাকরণ – গাথার অব্যবহিত পরে গদ্যে গাথার টীকা বা ব্যাখ্যা থাকে। ৫) সমোধান বা সমাধান – পচ্চুপন্নবত্থুতে উল্লিখিত চরিত্রগুলির সঙ্গে অতীতবস্তুর চরিত্রগুলির অভিন্নতা বা সনাক্তকরণ গদ্যে বর্ণিত হয়।[৬২] আমাদের আলোচ্য গল্পে জাতকের কাহিনি অনুসরণে ১) পচ্চুপন্নবত্থুর আংশিক উপাদান পাচ্ছি। ২) অতীতবত্থু এই গল্পে নেই, পুরোটাই বর্তমানের। ৩) গাথা এখানে নেই কিন্তু নাটকীয়তা রয়েছে। ৪) বেয্যাকরণের উপস্থিতি বন্ধনীর মধ্যে থাকা গল্পকারের বক্তব্যে উপস্থিত যদিও তা জাতকোচিত নয়। ৫) সমোধান এই গল্পে নেই। আগ্রহী পাঠক *জাতক* গ্রন্থে উপ্‌পলা নামের সঙ্গে যুক্ত কাহিনি অনুসন্ধান করতে পারেন মাত্র। আলোচ্য গল্পটিতে

জাতকের ভাবনার বিপরীত ভাবনা ও দর্শনই স্থান পেয়েছে। কৌশলে বৌদ্ধধর্মকে বিরোধিতা করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি স্নেহ-বাৎসল্যময় ঘর-সংসারের দিকেই ফেরানোর চেষ্টা রয়েছে।

উপন্যাস

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দ্বিতীয় উপন্যাস *কাঞ্চনমালা* (*বঙ্গদর্শন*, আষাঢ়, ১২৮৯ – মাঘ, ১২৮৯) এবং তৃতীয় উপন্যাস *বেনের মেয়ে* (*নারায়ণ*, কার্তিক, ১৩২৫ – অগ্রহায়ণ, ১৩২৬) 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'রূপে বিবেচ্য হতে পারে। *কাঞ্চনমালা*-য় তিনি প্রচলিত ধারাকে অস্বীকার করে একটি সম্ভাবনাময় বৌদ্ধ কথাসাহিত্যের ধারার প্রস্তাব করেন। বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের দিনের ছবি-সম্বলিত *কাঞ্চনমালা*-র কাল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক এবং বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের বিলোপের ছবি-সম্বলিত *বেনের মেয়ে*-র কাল খ্রিস্টিয় একাদশ শতক। উপন্যাসগুলির পরিকল্পনায় হরপ্রসাদ একটি যুগ-সংস্কৃতির বৃত্তকে সম্পূর্ণ করেছেন। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ *কাঞ্চনমালা*-র বিভিন্ন খণ্ডের শিরোভাগ পরিকল্পনায় নানাসময়ে অধ্যায়, ভাগ, পরিচ্ছেদ, খণ্ড মুদ্রিত ছিল। গ্রন্থ প্রকাশনাকালে হরপ্রসাদ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদটি বাদ দিলেও প্রথম সংস্করণে পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদটি যুক্ত করেন। *বেনের মেয়ে* চোদ্দটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, ঊনিশটি পরিচ্ছেদ সংখ্যার উপরে কখনো কখনো অধ্যায় ছাপা হয়েছিল। *কাঞ্চনমালা* ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ও *বেনের মেয়ে* ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। *কাঞ্চনমালা* সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রীত হন নি। বঙ্কিমের আশঙ্কা ছিল গল্প লিখে হরপ্রসাদ তাঁর নিজ ইতিহাসনিষ্ঠ ক্ষেত্র থেকে ভ্রষ্ট হতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর অভিমানবশত উপন্যাস রচনা থেকে তিনি নিজেকে প্রত্যাহার করেছিলেন। দীর্ঘ ছত্রিশ বছর পর তিনি *বেনের মেয়ে* লিখেছিলেন।[৯৩]

ক) *কাঞ্চনমালা:* হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ললিতবিস্তর, মহাবস্তু অবদান, অবদানশতক প্রভৃতি বহু সংখ্যক প্রকাশিত অপ্রকাশিত বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর হৃদয়ে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের সুদূর অতীত যুগের একটি স্বপ্নমধুর চিত্র জেগে উঠেছিল। এই চিত্রকে কল্পনায় মণ্ডিত করে দেশ ও কালের উপযোগী করে তিনি উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং *কাঞ্চনমালা* উপন্যাস আকারে প্রকাশিত হলেও এর রচনাপ্রণালী এবং ভাবমাধুর্যে এমন একটি

বৈচিত্র লক্ষিত হয় যা এই যুগে সম্পূর্ণরূপে অভূতপূর্ব ছিল বলে গোপীনাথ কবিরাজ মনে করেছেন।[৯৪] হরপ্রসাদ *কাঞ্চনমালা*-র ভূমিকায় (১ ফাল্গুন, ১৩২২) লিখেছেন –

> ত্রিশ বৎসর পূর্বে যাহাদের জন্য এই পুস্তক লেখা হইয়াছিল তাহাদের নাতিরা এই পুস্তক কি চক্ষে দেখিবেন বলিতে পারি না।

কোনো উপন্যাসকে ঐতিহাসিক বলে আলাদা করে দেগে দেওয়ায় আমাদের আপত্তি রয়েছে; কারণ প্রত্যেকটি লেখাই ইতিহাসের অংশ, তাই কোনো তকমা দেওয়ার অর্থ বিষয়টিকে সংকীর্ণ করা দেওয়া। তবুও বিশেষ অর্থে *কাঞ্চনমালা*-কে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলা যায়। ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তুকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য তাকে কল্পনাবলে সুশোভিত করতে হয়। ইতিহাস – 'ইতি-অ-হাস', অর্থাৎ পূর্বকালে এইরকম ছিল বা হয়েছিল। এই অর্থে কাঞ্চনমালা ও কুণালের সুখদুঃখের কথাকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলা যায়। বৌদ্ধ অবদান গ্রন্থমালার *দিব্যাবদান* গ্রন্থে 'কুণাল অবদান' নামে একটি অবদানে এই কাহিনি পাওয়া যায়। কাশ্মীরি মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র রচিত *বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা*-য় 'কুণাল অবদান' রয়েছে। ইহজন্মে পূর্ব জন্মার্জিত পাপ ও পুণ্যের পরিণামকে স্পষ্টভাবে সমাজের সামনে তুলে ধরা অবদান গ্রন্থের একটি উদ্দেশ্য, যাতে মানুষ শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি ও কর্ম সংযত করে কায়-বাক-চিত্তের উন্নতিবিধান করতে পারে।[৯৫]

বৌদ্ধধর্মের মহিমা প্রচার ও প্রজাহিতৈষণার কাজে সম্রাট অশোকের[৯৬] অবদান তুলনারহিত। *দিব্যাবদান* বা *বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা*-য় কুণালের মাতার নাম দেবী পদ্মাবতী বা অসন্দিমিত্রা। অশোকের বার্ধক্যকালে অসন্দিমিত্রার তিরোধানের পর তিষ্যরক্ষিতা(রক্ষা) পাটরানি হন। রানি অসন্দিমিত্রার গর্ভে কুণালের জন্ম হয়েছিল। 'কুণাল' হংসের মতো মনোরম নয়নের অধিকারী ছিলেন বলেই নবজাত শিশুর এই নামকরণ হয়েছিল। অশোকমহিষী যুবতী তিষ্যরক্ষা কুণালের আয়তচক্ষুর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি আসক্তা হয়েছিলেন। তিনি কুণালের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাঁর আয়তচক্ষুর অহংকার ঘোচানোর জন্য প্রতিজ্ঞা করেন। কুণাল তিষ্যরক্ষিতার কুপ্রস্তাবে ভীত হয়ে তাঁর সান্নিধ্য পরিত্যাগ করেন। অন্তঃপুরিকা দুশ্চরিত্রা স্ত্রী কীভাবে রাজা, রাজকুমার, রাজ্য ও রাজধর্মকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করতে পারে তা এখানে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। অবদান সাহিত্যানুযায়ী রাজা অশোক তক্ষশিলাধিপতি কুঞ্জরকর্ণকে জয় করার জন্য কুণালকে তক্ষশিলায় প্রেরণ করেন। এই প্রক্রিয়া সাম্রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হলেও ঔপন্যাসিক এটিকে তিষ্যরক্ষার কৌশলী ষড়যন্ত্ররূপে উপস্থাপিত করে নাটকীয় দ্বন্দ্ব তৈরি করেছেন। অবদান কাহিনি অনুসারে উপন্যাসে তিষ্যরক্ষা উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করে অশোককে কঠিন ব্যাধি থেকে মুক্ত করেন।

অবশেষে কৃতজ্ঞ অশোকের থেকে একবছর (অবদানে ছিল সাতদিন) সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা পেয়েছিলেন। তিষ্যরক্ষার আদেশে কুণালের চক্ষু উৎপাটিত হলে রাজপুত্রবধূ কাঞ্চনমালা অন্ধস্বামীর হাত ধরে পথে গান গেয়ে ভিক্ষার্জিত অর্থে জীবিকানির্বাহ করতেন। তাঁরা ভিক্ষাজীবী হয়েই পদব্রজে সুদূর তক্ষশীলা থেকে মগধে প্রত্যাবর্তন করেন। সচ্চরিত্র, ধীমান, দিব্যকান্তি, সর্বশাস্ত্রবিশারদ, যুদ্ধবিদ্যাকুশলী, শাসনকাজে দক্ষ, সর্বজনপ্রিয়, সদ্ধর্মের প্রচারক কুণাল বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রত্যহ চৈত্য দর্শন এবং বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রতি শ্রদ্ধা করতেন। রাজপুত্র কুণালের বিনা কারণে চক্ষুনাশ ও শুদ্ধচরিত্রা পতিব্রতা কাঞ্চনমালার শোকভার কাহিনিকে করুণ করে তুলেছে। অশোকের দেওয়া যৌবরাজ্যকে প্রত্যাখ্যান করে কুণাল সদ্ধর্মের প্রচারকার্যেই মনোনিবেশ করেন। তিষ্যরক্ষা উন্মাদগ্রস্ত হন এবং শেষে তাঁর ভাবান্তর লক্ষিত হয়। অবদান সাহিত্যে সত্যক্রিয়াবলে কুণালের চক্ষুলাভ ঘটেছে। অন্যদিকে উপন্যাসে কুণালের চক্ষুপ্রাপ্তি বৌদ্ধ চণ্ডালের গুরুদক্ষিণা রূপে গৃহীত হয়েছে যা যুক্তিগ্রাহ্য হলেও অমানবিক। হরপ্রসাদের '*কাঞ্চনমালা* বৌদ্ধ কান্তি ও সেবার মূর্ত প্রতীক এবং কুণাল ক্ষমা ও তিতিক্ষার জীবন্ত বিগ্রহ'। বৌদ্ধধর্ম অনুধ্যানের ফলে এঁরা যে 'গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও ঔদার্য' লাভ করেছেন, তার কাছে ঈপ্সিত বস্তু বা সুখদুঃখও তুচ্ছ হয়ে গেছে। 'প্রাণের গভীরতম অনুভূতির আনন্দে' তাঁরা চরম শত্রুকেও ক্ষমা করে গেছেন।[৯৭]

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা-এর কুণাল অবদানে রাজপুত্র কুণালের চক্ষু উৎপাটন ও ফিরে পাওয়ার পিছনে অতীত জন্মার্জিত পাপ-পুণ্যফলই ক্রিয়াশীল ছিল। কুণাল অতীত জন্মে কাশীপুরে এক লুব্ধক ছিলেন। সেই লুব্ধক হিমালয়ের তটে গুহায় প্রবিষ্ট হয়ে পাঁচশ মৃগকে চক্ষু উৎপাটন করে প্রয়োজনমতো বধ করেছিলেন। অন্য জন্মে কুণাল মুগ্ধ নামে শ্রেষ্ঠীপুত্র হন। বালকাবস্থায় মোহবশত তিনি অস্ত্রদ্বারা চৈত্যের বুদ্ধপ্রতিমার চক্ষু উৎপাটন করেছিলেন। পরে জ্ঞানোদয় হলে ইন্দ্রনীল মণি দিয়ে সেই প্রতিমার চক্ষুনির্মাণ করেছিলেন। পরের জন্মে তিনি একটি জীর্ণ চৈত্যের সংস্কার ও পূজা করেছিলেন। অশোকপুত্র কুণাল রূপে জন্মে পূর্বজন্মে বনে মৃগদের চক্ষু উৎপাটন এবং বাল্যকালে চৈত্যে জিন প্রতিমার চক্ষুনাশ করার জন্য রাজপুত্র এই জন্মে কৃতকর্মের জন্য অন্ধ হয়েছিলেন। আবার বুদ্ধপ্রতিমার বিনষ্ট নেত্র পুনরায় রত্ননির্মিত করার জন্য তিনি নিজের দৃষ্টি ফিরে পান এবং জীর্ণ চৈত্য সংস্কার করার জন্য প্রসাদগুণযুক্ত ও কান্তিমান হয়েছিলেন।[৯৮] *কাঞ্চনমালা*-য় এই অংশ পরিত্যক্ত হয়ে উপন্যাসকে আরো বাস্তবানুগ হতে সাহায্য করেছে।

ঊনবিংশ শতকের ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *অঙ্গুরীয় বিনিময়*-এর (১৮৫৭) নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। ঐতিহাসিক তথ্যবিশিষ্ট পাশ্চাত্য রীতির এই উপন্যাসে ইতিহাসের ফাঁক পূরণে কল্পনার প্রয়োগ ঘটেছে। এই হিন্দু স্বাজাত্যাভিমানে সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক রোমান্সের ধারা পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রে সঞ্চারিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫), *মৃণালিনী* (১৮৬৯) ও *রাজসিংহ* (১৮৮২) এবং বঙ্কিমানুসারী রমেশচন্দ্র দত্তের *বঙ্গবিজেতা* (১৮৭৪), *মাধবীকঙ্কণ* (১৮৭৭), *মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত* (১৮৭৮) ও *রাজপুত জীবনসন্ধ্যা* (১৮৭৯) এই পর্যায়ে পড়ে। বঙ্কিমানুসারী হরপ্রসাদের উপন্যাসের মধ্যেও স্বাজাত্যাভিমান রয়েছে, তবে তা হিন্দুকেন্দ্রিক হয়েও মুখ্যত বৌদ্ধমুখীন, এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। নবজাগ্রত চেতনার চিন্তকদের কর্মে ও সাধনায় সংকোচনশীল ও প্রসারণশীল পদ্ধতিতে ভারতানুসন্ধান বঙ্গানুসন্ধানে এবং বঙ্গানুসন্ধান ভারতানুসন্ধানের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তাঁর 'বাংলার বৌদ্ধ সমাজ: হিন্দু ও বৌদ্ধ' (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ১৩৩৬) প্রবন্ধটির কথা এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি –

> বাংলাদেশ যে বৌদ্ধময় হইয়া গিয়াছিল, তাহা এখন রিসার্চ করিয়া বাহির করিতে হয়। প্রথম তো বিশ্বাসই হয় না, তাহার পর ঘাড় পাতিয়া লইলে চক্ষু ফুটে – তখন বাংলার অনেক রহস্য জলের মতো বুঝিতে পারা যায়; বৌদ্ধদের অমিত শক্তি অনুভব করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বাঙালি ব্রাহ্মণের অমিত শক্তি, অমিত ধৈর্য ও অমিত পরাক্রম স্মরণ করিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। ... রহস্য জাল ভেদ করিয়া এই কথাটি খুলিয়া দিলে বাঙালির চক্ষু স্পষ্ট দেখিতে পায় – তাহারা কী ছিল, কী হইয়াছে ও ভবিষ্যতে কী হইতে পারে। অতীতে তাহাদের অগৌরবের কিছুই নাই, সবই গৌরবময়।

কাঞ্চনমালা উপন্যাসের পটভূমি মগধ ও তক্ষশীলা হলেও রচনাকৌশলে তার মধ্যে বাংলাদেশেরই আশা আকাঙ্ক্ষার অলক্ষ উপস্থিতি রয়েছে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের 'অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির সম্বোধন' (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অষ্টম অধিবেশনের কার্য-বিবরণ ১৩২১) প্রবন্ধে হরপ্রসাদ প্রাচীন বাঙালির কয়েকটি পৃথক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা চর্যাগানে উল্লিখিত বাঙালি সমাজ জীবনের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। হরপ্রসাদ বাঙালির রেশম বস্ত্রবয়ন শিল্পে দক্ষতা, নৌ চালনা, নাট্যকলার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষতার কথাও উল্লেখ করেছেন। আর্যরা নাকি হাতি চিনত না, বাঙালিরাই চিনত। হাতি ধরা, পোষ মানানো, চিকিৎসা, সেবা এবং যুদ্ধের জন্য তাকে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বাংলা দেশই পথিকৃৎ।[৯৯] *কাঞ্চনমালা*-য় হাতি সংক্রান্ত এই তথ্যগুলির সন্ধান পাওয়া যাবে। অষ্টম পরিচ্ছেদের একটি যুদ্ধ প্রস্তুতির চিত্রে বঙ্গদেশের প্রাচীন গৌরবের পরোক্ষ নির্মাণ উল্লেখযোগ্য –

> মণিপুর, পৌণ্ড্রবর্ধন, অঙ্গ, ওড্র, বিদেহ, সমতট প্রভৃতি করদ রাজগণকে সুরক্ষিত (সুশিক্ষিত) হস্তী প্রেরণের জন্য পত্র লেখা হইল। ... সৈন্যেরা নগর প্রান্তরে সর্বদা যুদ্ধ অভ্যাস করিতে লাগিল, এবং যুদ্ধের উপকরণ বহিবার জন্য অযুত অযুত শকট ও অযুত অযুত নৌকা আনীত হইতে লাগিল।

কুণালকে তক্ষশীলার বিদ্রোহ দমনে সেনাপতি করা হইয়াছিল। যে-সমস্ত জাতি থেকে সৈন্য সংগৃহীত হয়েছিল তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য বঙ্গদেশের সৈন্যরাও তাঁর 'একান্ত অনুগত' ছিলেন। বাঙালির বৌদ্ধরাজানুগত্য ও বীরত্বের চিত্রও এখানে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে গঙ্গার প্রসঙ্গ রয়েছে যার বৈশিষ্ট্য সমভূমি অঞ্চলের চিত্রকেই তুলে ধরে, এখানেও বাংলা দেশের উপস্থিতি লক্ষণীয় –

> মৃদু পবনহিল্লোলে গঙ্গাতরঙ্গ দুলিতেছে ও খেলিতেছে। ... বক্ষস্থলে ছায়াকাশ ধারণ করিয়া গঙ্গাবক্ষ প্রেমভরে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। তদুপরি ক্ষুদ্র নৌকাসমূহ সারি দিয়া পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় যাইতেছে, নাবিকেরা প্রাণ খুলিয়া গাইতে গাইতে যাইতেছে, তাহার স্বরের দূরস্থ তরঙ্গ, গঙ্গা সমীরণে শীতল হইয়া মৃদু মৃদু কানে লাগিতেছে।

এই প্রসঙ্গে চর্যাপদের নদীর বর্ণনা, নৌকা পারাপারের ছবি, নদীবক্ষে 'স্বরের দূরস্থ তরঙ্গ'-এ বাংলার ভাটিয়ালি গানের কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।[১০০] চতুর্দশ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্রের *বিষবৃক্ষ*-এর হীরা মালিনীর আদলে তৈরি তিষ্যরক্ষার গানের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। অপ্রকৃতিস্থা তিষ্যরক্ষা গেয়েছেন –

> কে দিল নয়নমণি
> কহ কহ লো সজনি!

চর্যাপদাবলীর উত্তরাধিকার রূপে বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনের ভাষাকে আমরা চিনে নিতে পারি। এছাড়াও বাংলার নিজস্ব রীতির 'চূর্ণী' লেখার প্রসঙ্গের কথা ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছিলেন। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য *কাঞ্চনমালা*-এর মুখবন্ধে একটি 'সাংঘাতিক সংস্কৃতভূয়িষ্ঠ' ভাষার অংশ উপন্যাস থেকে উদ্ধার করে দেখিয়েছেন। যদিও এই অংশ পড়লে বানভট্টের *কাদম্বরী*-এর কথা মনে পড়ে, তবুও ভাষায় সংস্কৃত অলঙ্কার সমৃদ্ধের কুশলতা বাংলার নিজস্ব বলেই আমরা দাবি করতে পারি। বঙ্কিমী আদলে অনুপ্রাণিত হরপ্রসাদ 'সরু মোটা' ভাষায় লেখা অভ্যাস করেছিলেন। তাই স্থানে স্থানে কঠিন ও দুর্বোধ্য সমাসবহুল ভাষা, আবার স্থানে স্থানে সহজ, ঘরোয়া ও অতি পরিচিত ভাষা তাঁর উপন্যাসে পাওয়া যায়। অবশ্য এই ভাষারীতি তাঁর গদ্যচর্চায় স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল।[১০১] আমরা প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করছি –

> সেই ঘোরা দ্বিপ্রহরা, শান্তনলিনী, কুমুদগন্ধামেদিনী, ঝিল্লীররুতমারুত-সংসবিনী, বিহগকুলকলরববিধ্বংসিনী, পুঞ্জপুঞ্জমঞ্জুতারকারাজিব্যাপ্তা, যামিনী যখন সভয়কচিদ্যুৎক্ষিপ্ত-নয়না, কামিনী

ধৌতবিধৌতসুরাভিচর্চিত বদন শাট্যাঞ্চলে আচ্ছাদন করে, আপন আপন প্রাণকান্তের নিকটাভিসারিকা হতেছেন, তখন প্রহরাধিক গাঢ়প্রগাঢ় বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য মেধ্যামনঃসংযোগবৎ, পুরীতকীমলঃসংযোগবৎ, রুদ্ধবাহ্যকরণকধ্যানের পর সহসা কাঞ্চনমালার মনে প্রফুল্লতার সঞ্চার হইল।

হরপ্রসাদ ‘অক্ষয়চন্দ্র সরকার’ প্রবন্ধে (*ভারতী*, ভাদ্র, ১৩২৯) *কাঞ্চনমালা* সম্পর্কে জরুরি তথ্য দিয়েছেন যার মধ্যে উপন্যাস রচনায় তাঁর নিরীক্ষা-প্রবণতা প্রমাণিত হয় –

আমি বঙ্গদর্শনে ‘কাঞ্চনমালা’ নামে একটি প্রবন্ধ লিখি। ... অক্ষয়বাবু প্রবন্ধটির সমালোচনা করিলেন – ভাষাটি বেশ সুন্দর, পরিষ্কার, কিন্তু মাঝখানে এ-কি কক্কড়-কক্কড়-ক্কড়াৎ। আমি পড়িয়া হাসিলাম, মনে হইল, অক্ষয়বাবু বোধ হয় কথকতা ভালো করিয়া শুনেন নাই। নইলে কথকের চূর্ণী তিনি ধরিতে পারিলেন না কেন? কথকের চূর্ণীগুলিকে আমি বাংলা ভাষার অতুলনীয় সম্পত্তি বলিয়া মনে করি। তাল ও লয়ের সহিত উচ্চারণ করিলে হাজার হাজার লোক মুগ্ধ হইয়া যায়, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

কাঞ্চনমালা উপন্যাসে *ললিতবিস্তর*-এর অভিনয় হরপ্রসাদের মৌলিক ভাবনাজাত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কাঞ্চনমালা ও কুণালের মারপত্নী ও মার সেজে বুদ্ধদেবের ধ্যান ভাঙাতে যাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কাঞ্চনের পুষ্পাভরণ হারিয়ে যাওয়ায় একটা আশু বিপদের আশঙ্কায় সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। চর্যাপদে ‘বুদ্ধনাটক’ অভিনয় প্রাচীন বাঙালির পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নয়। এই উপন্যাসে বুদ্ধনাটকের আরোপ ঘটেছে যা হরপ্রসাদের অতীত বাঙালি গৌরবগাথা প্রকল্পেরই অঙ্গীভূত। তাঁর রচনারীতি এবং ভাবনা এতটাই বঙ্কিমলগ্ন যে, *কাঞ্চনমালা* পড়তে পড়তে বহু পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন। ঐতিহাসিক রোমান্সের আবহ সৃষ্টিতে দুইটি ফুল, দুইটি পাখির মিলনের প্রসঙ্গ টানা হয়েছে –

পাখি ও ফুলের মিল সুন্দর বটে, কিন্তু যদি ঐরূপ সমবিকশিত সমপ্রস্ফুটিত, সমসুরভি মানুষের মিল হয়, তাহার চেয়ে সুন্দর জিনিস পৃথিবী তে আর আছে কি?

দুর্লভ মানুষের এই মিলন বর্ণনায় হরপ্রসাদ দুই হাজার বছর আগেকার পাটলিপুত্র নগরের কুণাল ও কাঞ্চনমালার প্রেম কাহিনির অবতারণা করেছেন। এই প্রেমের আবহ সৃষ্টিতে তিনি প্রাচীন *কামসূত্র*-এর ঐতিহ্যানুসারী। মাল্যরচনার কৌশল ‘মাল্যগ্রথনবিকল্প’ *কামসূত্র*-এর চৌষট্টি কলার অঙ্গীভূত।[১০২] কুণাল এবং কাঞ্চনমালার পুষ্পাভরণ তৈরির কথা গ্রন্থকারের মৌলিক সৃষ্টি। কিন্তু বিচ্ছেদের মাধুর্যের আয়োজনে কাঞ্চনমালার ফুল ফুরিয়ে যায়। হরপ্রসাদের অপূর্ব রোমান্টিক আবহ সৃষ্টিকারী ভাষায় তা অধরা মাধুরী হয়ে রয়েছে –

> রমণীর অঙ্গে সমস্ত পুষ্প আভরণ, পুষ্পের কঙ্কণ, পুষ্পের মুকুট, পুষ্পের হার, পুষ্পের অঙ্গদ, পুষ্পের অবতংস, পুষ্পনির্মিত গ্রীবা-ভূষণ। তিনি মালা গাঁথিতেছেন, ... পুষ্পরাশি যত কমিয়া আসিতেছে, দুজনে তত নিকট হইতেছেন, ততই কাছে আসিতেছেন। ... কিন্তু এখনো ফুলধনু প্রস্তুত হয় নাই, এখনো পঞ্চশর প্রস্তুত হয় নাই, ফুল ফুরাইয়া গেল।

হরপ্রসাদের সৃষ্টিশীলতার পরিচয়ের চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে উপগুপ্ত কর্তৃক অলোক, তিষ্যরক্ষা, কুণাল ও কাঞ্চনমালার দীক্ষার কাহিনিতে। তাঁর মহৎ বিরাট স্পর্শে, বিরাট ও বিচিত্র মানসিক বিপর্যয়ের বিবরণ সম্পূর্ণ নতুন ও অভূতপূর্ব কল্পনা রূপে অসামান্য। উপগুপ্তের হাত মাথায় পড়বার পর অশোক দেখলেন, অনন্ত বোধিদ্রুমে জগৎ ব্যাপ্ত হয়েছে এবং প্রতি বোধিদ্রুমতলে এক-একজন বোধিসত্ত্ব ধ্যানমগ্ন। পাটরানি তিষ্যরক্ষা দেখলেন, ভয়ঙ্কর অন্ধকার মধ্যে চুরাশি নরককুণ্ড। কুণাল দেখলেন, স্বয়ং ভগবান বুদ্ধদেব জেতবনে সদ্ধর্ম উপদেশ দিচ্ছেন। কাঞ্চনমালার দৃষ্ট বিষয়টি বিশেষভাবে উদ্ধারযোগ্য –

> তিনি নিজে বোধিসমুদ্রতলে ধ্যানমগ্না, তাঁর নির্বাণ সময় উপস্থিত, প্রায় দশম ভূমি উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন ব্রহ্মাণ্ডস্থ পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ দেবদানব সিদ্ধাচারগণ তাহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল – "মাতঃ! আমাদের কি উপায় করিয়া গেলে?" বলিয়া রোদন আরম্ভ করিল। তখন কাঞ্চনমালা প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, "আমিও অবলোকিতেশ্বরের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ব্রহ্মাণ্ডে এক প্রাণী নির্বাণশূণ্য যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ আমি নির্বাণ প্রত্যাশী নহি।" অমনি সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল, পৃথিবী চৌরাশি নরক হইতে তাঁহার জয়ধ্বনি উঠিল, দেখিলেন ভগবান তেজঃপুঞ্জ অবলোকিতেশ্বর তাঁহার দেহে মিলাইয়া গেলেন।

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য *কাঞ্চনমালা*-এর চারটি দৃশ্য সম্পর্কে একটি ধর্মীয় বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, গুরুর মত গুরু হলে, গুরু নিজে সিদ্ধ হলে, তিনি যদি তাঁর হাত শিষ্যের মাথায় স্পর্শ করেন তাহলে হাত থেকে তীব্র শক্তি সঞ্চারিত হতে থাকে এবং সেই শক্তি শিষ্যের মনে প্রাণে চিন্তায় ও কল্পনায় বিচিত্র আলোড়নের সৃষ্টি করে। এইরূপ আলোড়ন ও মানসিক পরিবর্তনের চিত্র গ্রন্থকার উপন্যাসে দেখিয়েছেন। কাঞ্চনমালার প্রতিজ্ঞা পরবর্তী বৌদ্ধ মহাযানসূত্র *কারণ্ডব্যূহ*-তে বিবৃত অবলোকিতেশ্বরের প্রতিজ্ঞার ছায়া অবলম্বন করে লিখিত।[১০৩] উল্লেখ্য যে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দেবযান* (১৯৪৪) উপন্যাসে কাঞ্চনমালার এই ভাবনার প্রতিগ্রহণ ঘটেছে। বৌদ্ধ অনুষঙ্গের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনো যোগ না থাকলেও যতীনের দেহাতীত প্রেয়সী পুষ্পের সঙ্গে এই উপন্যাসের এক ভাবনাগত প্রতিগ্রহণ লক্ষ করা যায়।[১০৪]

কাঞ্চনমালা-এর সপ্তম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে – লোকে কাঞ্চনমালাকে স্বর্গীয় দেবী বলে মনে করতেন। যেন নূতন ধর্ম প্রচারের জন্য, আর্ত ব্যক্তির আর্তি নিবারণের জন্য এবং আপামর সাধারণ লোককে নির্বাণ প্রদানের জন্য ভগবান 'অবলোকিতেশ্বর' রমণীবেশে পাটলিপুত্র নগরে ভ্রমণ করছেন। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে সম্রাট অশোক কুণালকে 'বোধিসত্ত্ব' আখ্যায়িত করেছেন। অবলোকিতেশ্বর মহাযানী বৌদ্ধদেবতামণ্ডলের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় দেবতা। অমিতাভ বুদ্ধ ও তাঁর শক্তি পাণ্ডরা থেকে এঁর সৃষ্টি। শাক্যমুনি বুদ্ধের নির্বাণ লাভের সময় এবং অনাগত কালের মৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাবকালের মধ্যে এঁর স্থিতি। কারণ্ডব্যূহ অনুযায়ী তিনি করুণার প্রতিমূর্তি। প্রাণিকুলের জন্য করুণাবশত করুণাসমাধি থেকে উত্থিত হয়ে তিনি সকল অবলোকন করেন ('মহাকরুণা সমাপত্তিতো বুট্‌ঠায় লোকং বোলোকেন্তো'। *ধম্মপদার্থকথা*। ১। ৩৬৭)। গুণকারণ্ডব্যূহের বর্ণনানুযায়ী তিনি জীবকূলের প্রতি অপার করুণাবশত নির্বাণ গ্রহণে অস্বীকৃত হন এবং সমস্ত জীবের বোধিজ্ঞান লাভের কাল পর্যন্ত অপেক্ষমান থাকেন। সুখাবতীব্যূহ অনুযায়ী বৌদ্ধদেবী তারা অবলোকিতেশ্বরের প্রধান শক্তি। অবলোকিতেশ্বরের জনপ্রিয়তা ভারতের বাইরেও প্রসার লাভ করে। চীন দেশে ইনি 'কুয়ান-শিন-ইন' নামে পরিচিত। এখানে তিনি সূচনাপর্বে পুরুষ দেবতা ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম প্রসারের দ্বিতীয় পর্যায়ে ইনি অনুবাদ সংক্রান্ত ভুলের কারণে স্ত্রী দেবতায় পরিণত হন।[১০৫] আমাদের ধারণা, হরপ্রসাদ 'বোধিসত্ত্ব' কুণালকে অবলোকিতেশ্বর ও 'রমণীবেশে' অবলোকিতেশ্বর বলতে অবলোকিতেশ্বর শক্তি তারাকে বুঝিয়েছেন। হরপ্রসাদ কি এই ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন?

ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রে বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিশেষ বিশেষ অধিকার ও ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমভুক্ত লোকের জন্য কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের সুযোগ সুবিধা ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি যা অশোকের আদেশে বন্ধ হয়ে যায়। কার্যত তিনি ব্রাহ্মণ, শূদ্র অন্ত্যজের মধ্যে কোন ভেদই রাখেন নি। এর উপর বৌদ্ধধর্ম-মহামাত্র নিযুক্ত হলে তাঁরা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের স্থান গ্রহণ করেন। ফলে, ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদীরা প্রতিশোধস্পৃহ হন। অশোকের পরাক্রমী শাসনকালে এই ব্রাহ্মণ্য প্রতিবাদীরা বিশেষ কিছু করতে পারতেন না। তদানীন্তন দেশের এই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বৌদ্ধবিরোধী মনোভাবকে ঔপন্যাসিক কাঞ্চনমালায় বার বার ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন এবং বিশেষ কৃতকার্যও হয়েছেন।[১০৬] 'কুণাল অবদান' অনুসারে *কাঞ্চনমালা*-তেও শল্যচিকিৎসা ও শারীরবিজ্ঞান বিদ্যার ঔৎকর্ষ প্রদর্শিত হয়েছে।

তিষ্যরক্ষা মূলত নাপিতকন্যা বলেই হয়ত অস্ত্রোপচারে কৃতিত্ব দেখিয়ে কৌশলে রাজত্ব শাসনের উপায় অবলম্বন করতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণকান্তের উইল* (*বঙ্গদর্শন*, পৌষ – ফাল্গুন, ১২৮২; বৈশাখ – মাঘ, ১২৮৪)-এর অনুকরণে হরপ্রসাদ *কাঞ্চনমালা*-য় তিষ্যরক্ষার মধ্যে 'সু' ও 'কু'-এর দ্বন্দ্ব আনতে চেয়েছেন। *কৃষ্ণকান্তের উইল*-এর অষ্টম পরিচ্ছেদে (*বঙ্গদর্শন*, মাঘ, ১২৮২) রোহিণীর মনে গোবিন্দলালের সঙ্গে অনুরাগের টানাপোড়েন-জাত সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্বটি গ্রন্থ পরিকল্পনায় অভূতপূর্ব। আমরা রোহিণীর মনের দ্বৈতসত্তার কাল্পনিক সংবদলের আংশিক উদ্ধৃত করছি –

> সুমতি নামে দেবকন্যা ও কুমতি নামে রাক্ষসী, এই দুইজন সর্ব্বদা মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে বিচরণ করে; এবং সর্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে। রোহিণীকে লইয়া সেই দুইজনে সেইরূপ ঘোর বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল।

এই দ্বন্দ্বে সুমতির পরাজয়ের পর নবম পরিচ্ছেদে (*বঙ্গদর্শন*, মাঘ, ১২৮২) বঙ্কিমচন্দ্র আরো জটিল চিত্র ও তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। রোহিণীর গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্তি এবং কুমতির পুনর্বার জয়ের প্রেক্ষাপটকে তিনি অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধারযোগ্য –

> ... নিত্য কলসি কক্ষে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়; নিত্য কোকিল ডাকে; নিত্য সেই গোবিন্দলালকে পুষ্পকাননমধ্যে দেখিতে পায়; নিত্য সুমতি কুমতিতে সন্ধিবিগ্রহ উভয়ই ঘটনা হয়। সুমতি কুমতির বিবাদ বিসংবাদ মনুষ্যের সহনীয়; কিন্তু সুমতি কুমতির সদ্ভাব অতিশয় বিপত্তিজনক। তখন সুমতি কুমতির রূপ ধারণ করে, কুমতি সুমতির কাজ করে। তখন কে সুমতি, কে কুমতি চিনিতে পারা যায় না। লোকে সুমতি বলিয়া কুমতির বশ হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিনবত্বের তুলনায় হরপ্রসাদের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কুণাল-প্রত্যাখ্যাত তিষ্যরক্ষার মনের ভিতরের সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্ব একেবারে উৎরোয় নি। তবে এটিও ঠিক যে বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণকান্তের উইল*-এর সঙ্গে পরিচিত পাঠকের পক্ষে হরপ্রসাদের তিষ্যরক্ষার ভাব ও আচরণগত দিক নব-পরিচয়ের আস্বাদ দেবে। হরপ্রসাদের সুমতি-কুমতি তত্ত্বকণ্টকিত নয়, অনেক সরল ও স্পষ্ট। তিষ্যরক্ষার প্রতিশোধস্পৃহ সুমতি-কুমতি সম্মিলিতভাবে কুণালকেই প্রত্যাশা করেছে –

> সুমতি। বলি অপমানটার শোধ লও না কেন? যে ভরসায় যাইতেছ সে ভরসা নাই।
>
> কুমতি। এই ভালো পরামর্শ, খানিকটে জব্দ হইলে উহাকে বশে আনা সুকর হইবে।
>
> সুমতি। তবে সেই ভালো, যাও।

এই বলিয়া দুজনে নিরস্ত হইল। তিষ্যরক্ষা লতাকুঞ্জ ত্যাগ করিয়া কোথায় গেল।

বঙ্কিমচন্দ্রের *বিষবৃক্ষ* (*বঙ্গদর্শন*, বৈশাখ, ১২৭৯ – ফাল্গুন, ১২৭৯), *চন্দ্রশেখর* (*বঙ্গদর্শন*, শ্রাবণ, ১২৮০ – ভাদ্র, ১২৮১) উপন্যাসদুটির ভাবনার অনুবর্তন *কাঞ্চনমালা*-য় ঘটেছে। *চন্দ্রশেখর*-এর শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের অংশটি তিষ্যরক্ষার দীক্ষা গ্রহণের পূর্বের দৃশ্যে অনুসৃত হয়েছে। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এ দৃশ্য বর্ণনায় যে রীতিগত সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে তা *কাঞ্চনমালা*-য় অনুপস্থিত। *চন্দ্রশেখর*-এর চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদের (*বঙ্গদর্শন*, শ্রাবণ, ১২৮০) সঙ্গে *কাঞ্চনমালা*-এর ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ তুলনীয়। হরপ্রসাদের তিষ্যরক্ষার পরিণতিতে আতিশয্য রয়েছে, এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রও যে মুক্ত এমন দাবি করা চলে না। *বিষবৃক্ষ*-এর হীরা আর *কাঞ্চনমালা*-এর তিষ্যরক্ষার প্রভেদ নেই। *বিষবৃক্ষ*-এর পঞ্চাশতম পরিচ্ছেদে (*বঙ্গদর্শন*, ফাল্গুন, ১২৭৯) হীরার আচরণের সঙ্গে *কাঞ্চনমালা*-এর ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পরিচ্ছেদের তিষ্যরক্ষার আচরণের মিল শুধুমাত্র তাদের মস্তিষ্কের বিকৃতিতে। কিন্তু চরিত্র হিসাবে তিষ্যরক্ষার উত্তরণ ঘটলেও তা হীরায় দেখা যায় না। দুটি ঔপন্যাসিকের রসনিষ্পত্তির বিষয় ভিন্নমুখী। *বিষবৃক্ষ*-এর চতুস্ত্রিংশতম পরিচ্ছেদে (*বঙ্গদর্শন*, মাঘ, ১২৭৯) সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ আর *কাঞ্চনমালা*-এর দ্বাদশ পরিচ্ছেদে কাঞ্চনমালার গৃহত্যাগ সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে ঘটেছে। তাঁদের স্বামীদের সমস্যাও ভিন্ন। নগেন্দ্র যেখানে অসংযমী, স্ত্রীর প্রতি অবিচারকারী; সেখানে কুণাল সংযমী, ভাগ্যলাঞ্ছিত হলেও মহৎ। সূর্যমুখীর সমস্যা ব্যক্তিকেন্দ্রিক; অন্যদিকে কাঞ্চনমালার সমস্যা শুধু ব্যক্তিগত নয়, রাষ্ট্রগতও বটে। কিন্তু তিনি এই সমস্যায় সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যান নি, বরং বহুজনহিতের স্বার্থেই বৌদ্ধভিক্ষুণী হয়েছেন। *কাঞ্চনমালা*-র বর্ণনায় অতিশয়োক্তি আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে বুদ্ধতিষ্যা হওয়ার ঘটনা অতুলনীয়, ত্যাগ পারমিতার গুণে ভাস্বর –

> কাঞ্চনমালা শাক্যভিক্ষুণি সাজিলেন। রক্তবস্ত্র পরিধান করিলেন, স্বহস্তে আপাদলুণ্ঠিত কেশরাশি ছেদন করিলেন। ... ধর্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধকে প্রণাম করিলেন; ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন; করিয়া অনন্ত পিচ্ছিল অন্ধকার সমুদ্রে একাকিনী ঝাঁপ দিলেন।

লক্ষণীয় যে হরপ্রসাদ থেরবাদী ঐতিহ্যানুযায়ী কাঞ্চনমালাকে বুদ্ধতিষ্যা করেন নি। ‘ধর্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধ’ এই ক্রম এবং ‘রক্তবস্ত্র’ দেখলেই বোঝা যায় এটি মহাযানী আদর্শানুসারী। অশোক স্বয়ং থেরবাদী বৌদ্ধপন্থ হওয়ায় থেরবাদ রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। তাঁর সময়ে মহাযানে দীক্ষিত হওয়া তাঁরই পুত্র ও

পুত্রবধূর পক্ষে স্বাভাবিক কি? ঔপন্যাসিক হরপ্রসাদ রোমান্সের ক্ষেত্রকে উৎখাত করতে রাজি নন – তাই ইতিহাস নয়, শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে তিনি স্বপ্নকল্প রূপ রচনা করেছেন।

খ) বেনের মেয়ে

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে (*বঙ্গদর্শন,* অগ্রহায়ণ, ১২৮৭) বাংলার ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। বাংলার 'ভরসা'র স্বার্থে তিনি বাংলার ইতিহাস চেয়েছিলেন। 'কে লিখিবে'? – এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি আশ্চর্য সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন –

> তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইঁহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই?

বঙ্কিমচন্দ্রের এই এষণা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *বেনের মেয়ে* উপন্যাসে রূপ পেয়েছে। হরপ্রসাদ বঙ্কিমী ভাবনানুসারী হলেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও ব্যতিক্রমী প্রতিভা এখানেই যে তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদে আক্রান্ত নন, বরং বিকল্প বৌদ্ধবাদ-সন্ধানী ও হিন্দু-বৌদ্ধ সমন্বয়বাদী। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে লেখা গ্রন্থকারের 'মুখপাত' অংশটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য –

> "বেনের মেয়ে" ইতিহাস নয়; সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেননা, আজকালকার 'বিজ্ঞান-সঙ্গত' ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না। আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কখনো হইতেও চাই না। 'বেনের মেয়ে' একটা গল্প। ... তবে এতে এ-কালের কথা নাই। সব সেই সে কালের, যে কালে বাংলার সব ছিল। বাংলার হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল। ... বাঙালি এখন কেবল এ-কেলে "গণিকাতন্ত্রের" উপন্যাস পড়িতেছেন। একবার সে-কেলে সহজিয়াতন্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখটা বদলাইয়া লউন না কেন?[১০৭]

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে (*প্রবাসী,* মাঘ, ১৩৩০) *বেনের মেয়ে*-কে উপন্যাস নয় – 'ইতিহাসের এসেন্স', 'শর্করা-মণ্ডিত গুটিকা', 'সহজিয়াবাদের সুন্দর সুললিত ম্যানুয়েল', 'ঐতিহাসিক সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত' অভূতপূর্ব গ্রন্থ বলেছেন। যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধদর্শনের পাঠ্য বলে বিবেচনা করা গেলেও একে সাধারণের পাঠযোগ্য বাংলা উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা করা কষ্টকর। সুকুমার সেনের মতে, 'ভারতীয় বিদ্যার অনুসন্ধিৎসা অধ্যেতা' এবং 'বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির ব্যাখ্যাতা' হরপ্রসাদের *বেনের মেয়ে*-তে বাংলার বৌদ্ধধর্মের ক্রমক্ষীয়মানতার ছবি আঁকা হয়েছে। *বেনের*

মেয়ে ‘পরিপূর্ণ উপন্যাস অথবা ঐতিহাসিক চিত্র’। এর স্টাইলে হরপ্রসাদের নিজস্ব রচনারীতির সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে লেখকের স্বকল্পিত এবং সে নিজস্ব কল্পনা তাঁরই আবিষ্কৃত বস্তু ও ঘটনার উপর নির্ভর করেছে। *বেনের মেয়ে* বাংলা দেশের তথা পূর্ব ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির পাল-সেন ইতিহাসের বেশ খানিকটা, হরপ্রসাদের আবিষ্কৃত সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*, সরহ ও কৃষ্ণাচার্যের *দোহাকোষ, চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, ডাকার্ণব, সাধনমালা* ইত্যাদি পুথির সাহায্যে গঠিত ‘ইতিহাসেরই একটুকরো illustration’।[১০৮]

বেনের মেয়ে উপন্যাসের পটভূমি বাংলার মুসলমান অধিকার-পূর্ব সামাজিক ইতিহাস। রাজবৃত্তের বিবরণ বা শাসনকর্তৃত্বের পরিবর্তন ধারার ইতিহাসকেই দেশের ইতিহাস মনে করা হত। এর পাশে হরপ্রসাদের ইতিহাসবোধ, ইতিহাসের দৃষ্টি এক তাৎপর্যময় ব্যতিক্রম। দেশের মানুষের সামগ্রিক জীবনচর্যার তথ্যকেই তিনি প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান বলে মনে করতেন। প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে তিনি বাঙালি ও বাংলার প্রাচীন সমাজের সম্ভাব্য প্রত্যক্ষ জীবন্ত পরিচয় উপস্থাপিত করেছেন। *বেনের মেয়ে*-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে উপন্যাসের সময়কাল ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লিখিত হয়েছে। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে ‘প্রবল শত্রু’র হানা দেবার ঘটনা রয়েছে। সুলতান মাহমুদের আক্রমণ একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের ঘটনা। থানেশ্বর ১০১৪ খ্রিস্টাব্দে এবং কণৌজ ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে আক্রান্ত হয়। উপন্যাসটি একাদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের পটে বিন্যস্ত। বেনে বিহারী দত্তের মেয়ে মায়ার শৈশব থেকে যৌবনে উত্তরণ, বিয়ে, বৈধব্য ও পোষ্যপুত্র নেওয়ার কথা আঠারো থেকে বিশ বছরের পরিসরে বলা হয়েছে। অন্যদিকে এই কালসীমার মধ্যেই বৌদ্ধ প্রভাবের বিলয় এবং হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জটিল সামাজিক ইতিহাসকে আনা হয়েছে, যদিও তা আরো দীর্ঘ সময় জুড়ে সমাজের স্তরে স্তরে বিভিন্ন শক্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতর দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছিল। তা সামাজিক রূপান্তরের ধারার সঙ্গে যুক্ত বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তির উদ্যোগ ও প্রভাব বিস্তারের কাহিনি। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বৃত্তি-আশ্রিত জাতিগুলির সামাজিক মর্যাদার ওঠানামা, সামাজিক বিন্যাসের পরিবর্তন এক্ষেত্রে জরুরি বিষয়। এই সুদীর্ঘ প্রক্রিয়াকে মাত্র দুটি দশকে আরোপিত সময়সীমার মধ্যে আনার বাধ্যবাধকতায় উপন্যাসে কালাতিক্রমণ দোষ ঘটেছে। বাংলার ইতিহাসের এই পর্বে অনেক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি (যেমন – হরিবর্মা বা ভবদেব ভট্ট) এসেছেন যাঁরা উপন্যাসের

কালসীমার অন্তর্গত বা সমসাময়িক নন এবং তাঁদের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্যও তখনো পর্যন্ত জ্ঞাত নয়। কিন্তু এই ঐতিহাসিক বিচ্যুতিও কাহিনি রচনার সহায়ক হয়েছে।[১০৯] বিশেষত দূরযানী দৃষ্টিতে হরপ্রসাদ তৎকালীন মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক মান-মর্যাদার রকমফের, সাংস্কৃতিক আবহ সমেত সমাজের অখণ্ড রূপকে উপস্থাপিত করে বিরল সৃষ্টি-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

বেনের মেয়ে উপন্যাস বাংলা ও বাঙালিকেন্দ্রিক। তারাপুকুরের রূপা বাগদি সাতগাঁয়ের বৌদ্ধরাজা। তাঁর রাজত্বকালের প্রথম গাজন ও বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠার জন্য ধূমধাম উৎসবে লুইসিদ্ধা তাঁর শিষ্য বিক্রমণিপুরের রাজপুত্র 'গুরুপুত্র'কে নিয়ে অনুষ্ঠানে এসেছেন। সাতগাঁয়ের ক্ষমতাবান বণিক বিহারী দত্ত আর তাঁর মেয়ে মায়া গুরু-শিষ্যকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। পরমাসুন্দরী মায়াকে দেখে গুরুপুত্রের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটলেও গুরুর প্রতিষ্ঠার কথা ভেবে তিনি নিবৃত্ত হন। সাতগাঁয়েরই ধনী জীবনের সঙ্গে মায়ার বিয়ে হলেও দুইবছর বাদে নিঃসন্তান মায়া বিধবা হন। উত্তরাধিকারীহীন বিহারী আর মায়ার সম্পত্তি করায়াত্ত করার দিকে সহজিয়া বৌদ্ধেরা আগ্রহী হয়। তাঁরা মায়াকে মহাবিহারে ভিক্ষুণী করে সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে চায়। রূপজ মোহ থেকে মায়ার প্রেমে পড়েন গুরুপুত্র। কিন্তু মায়া এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। বৌদ্ধরা চক্রান্ত করে মায়াকে প্রলোভন দেখান যে তার স্বামীর মাটির মূর্তি গড়ে তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হবে। পতিনিষ্ঠ মায়াও এই ফাঁদে পা দেন। রূপা রাজার ইচ্ছা ছিল মায়া গুরুপুত্রের সাধন-সঙ্গিনী হোক। তাই তিনি তার মহাবিহারে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। গুরুপুত্র চেয়েছিলেন মায়া তার মহাসুখ সাধনার উৎস সাধন-সঙ্গিনী হোক।

বিহারী দত্ত সহজিয়া বৌদ্ধদের পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে সতর্ক হন। তিনি হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দকে ডেকে মায়াকে রক্ষা করতে বলেন। হিন্দুরা বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। মস্করীর ছদ্মবেশে পিশাচখণ্ডীর এক ব্রাহ্মণ গোপনে মায়াকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যান। মায়ার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সাতগাঁয়ে প্রবল আন্দোলন সূচিত হয়। মায়ার অন্তর্ধানের জন্য হিন্দুরা বৌদ্ধদের দায়ী করে। রূপা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। রাজা হরিদেববর্মা হিন্দু ঐক্যকে সমর্থন করে বিহারীর পক্ষে যোগ দেন। উভয়পক্ষ যুদ্ধের আয়োজনে ত্রুটি রাখে নি। দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর, হরিদেববর্মা, বিহারী দত্তের নেতৃত্বে বেনেরা একদিকে; অন্যদিকে মহীপাল আর রূপা রাজা। হিন্দু-বৌদ্ধের যুদ্ধে হিন্দুরা জয়ী হয়, রূপা রাজার মৃত্যু ঘটে এবং বিহারী সাতগাঁর রাজা হন। মায়ার প্রত্যাবর্তনে বিহারীর আনন্দের সীমা থাকে না।

পিশাচখণ্ডীর ব্রাহ্মণকে পুরস্কারের প্রস্তাব দিলে তিনি এর পরিবর্তে একটি রাজসভা অনুষ্ঠানের জন্য প্রার্থনা জানালে বিহারী ও ভবদেব সম্মত হন। বিপুল সমারোহ করে মায়া আর বিহারী আলাদাভাবে দুটি পোষ্যপুত্র নিয়ে সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

এক ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হিন্দুরাজা বিহারীর আহূত রাজসভায় প্রতিযোগিতার জন্য দেশ দেশান্তর থেকে বিদগ্ধ পণ্ডিত, কবি ও শিল্পীদের সমাগম ঘটে। নানারকম শিল্প প্রতিযোগিতার পর শেষে কাব্য আসরে কবিতা পড়েন চর্যাপদকার চাটিল, বীণা, সরহোপাদ প্রমুখ। মায়ার স্বরচিত পতিবিরহ-বেদনার কবিতা পাঠ বিশেষভাবে সভায় প্রশংসিত হয়। শেষে আসরে গুরুপুত্র চর্যাপদের ভাষায় গান ধরেন –

বহই নাবী মাঝ সমুদারে, দুপ্পহর বেলা।
দারুণ পিয়াসা, হিঅ মোর বাধই, কণ্ঠ শোষ গেলা।।
নিঅহি পাণী, পিব ন সকই, অহণিসি তিষি বাধই।
চেব ন সকই, লোণ পইসই, অহণিসি তিষি বাঢ়ই।।
অকট জোই, নিবাণ চাহই, জোইনী বিনু নাহি পাইব।
জোইনি সত্তি, জোইনি ভত্তি, তবহু নিবাণ সাধব।।
জোইনি সাধী রহই, বিমুহি মোরে, নাহি পাতআই।
নঅনের কোণে কভু নহি হেরই, বিনু ফল মোর জনু জাই।।

যোগী নির্বাণ আকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু শক্তি নেই। যাকে শক্তি করতে চান, তিনি সামনে থাকলেও ফিরেও চান না। তার জীবন বৃথা যাচ্ছে। মায়াকে উদ্দেশ করে গুরুপুত্রের স্বরচিত এই গানের পরই পরিবেশ থমথমে হয়ে যায়। লুইসিদ্ধা বেগতিক টের পেয়ে সভাশেষে কৌশলে গুরুপুত্রকে পালাবার পরামর্শ দেন। গুরুপুত্র বাগদিদের জোগাড় করে হিন্দুরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি করেই রেখেছিলেন। তিনি যুদ্ধযাত্রায় যেতে চাইলে লুইসিদ্ধা তাঁকে নিবৃত্ত করে করুণাময় মহাযান পন্থা অবলম্বন করতে সুবর্ণদ্বীপে যাওয়ার পরামর্শ দেন। গুরুপুত্র একরাশ বেদনা বহন করে দেশান্তরী হবার উদ্যোগ করেন।

কাহিনির জটিলতা বা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্ব গুরুপুত্রের গৃহী উপাসিকা মায়ার প্রতি চোরা প্রেমকে কেন্দ্র করে পল্লবিত হয়েছে। হরপ্রসাদ চমৎকার কৌশলে গুরুপুত্রের চরিত্রটি গড়ে তুলেছিলেন। হরপ্রসাদ যুগের চাহিদা অনুযায়ী চরিত্রসৃষ্টির প্রয়োজনে ইতিহাসকে নিজের মত করে সাজাতে চেয়েছেন। বাঙালির চারিত্র্য অনুযায়ী গুরুপুত্রকে প্রেমমুখী, আবার বাঙালি হিন্দুঘরের নিষ্ঠাবতী গৃহবধূ মায়াকে আঁকলেন। সহজিয়া চর্যাগানের অনুকরণে মায়া আর গুরুপুত্রের গান হরপ্রসাদের মৌলিক

সৃষ্টির পরিচায়ক। গুরুপুত্র চরিত্রটিকে সিদ্ধাচার্য হিসাবে উত্তরণ ঘটানোর ইচ্ছা হয়ত হরপ্রসাদের মনে ছিল, তাই পুরস্ত্রী বিধবা মায়ার প্রতি গুরুপুত্রের পরকীয়া প্রেমের আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও তিনি এই চরিত্রটিকে শীলবান, সংযমী করেই গড়ে তুলেছেন। মায়ার প্রতি গুরুপুত্রের প্রেম নিবেদনে সভার লোক বিমূঢ় হলেও তাঁকে তিরস্কারের বদলে পুরস্কৃতই করা হয়েছে; যা শিল্পের প্রতি, গুণীর প্রতি বাঙালির কদরের পরিচায়ক। গুরুপুত্রের আচরণ শিল্পীসুলভ হলেও মোটেও সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্বসুলভ নয়, তা বৌদ্ধধর্মের অবনতিরই পরিচায়ক। তবুও হরপ্রসাদ তাঁর প্রতি বঙ্কিমসুলভ কঠোরতা দেখালেন না কেন? এ কি কেবল বৌদ্ধপ্রীতি? নাকি সর্বগুণান্বিত একজন বাঙালি যুবকের প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে কোথাও তিনি স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন? মায়ার প্রতি গুরুপুত্রের প্রেম সহজিয়া তত্ত্বকে অবলম্বন করে প্রকাশমুখ খুঁজে ফিরেছিল –

> ... অদ্বয় হইলাম, শূন্য হইলাম, শূন্য বুঝিলাম, ... সেই শূন্য মহাসুখময় – তখন, শূন্যটাও যেন ভরা ভরা হইয়া উঠিল। শূন্যের শূন্যত্ব, শুষ্কত্ব শেষ হইয়া গেল। ... শূন্যতা তখন দেবী, আমি তখন ভৈরব, আমরা দুজনে এক হইয়া শুদ্ধ যুগনদ্ধ অবস্থায় নহে – লবণে ও জলে যেমন এক হইয়া যায়, তেমনি শূন্যে ও আমায় এক হইয়া গিয়া, মহাসুখে অনন্তকাল রহিলাম। এই মহাসুখময় ধর্ম, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম আর কি হইতে পারে?

গুরুপুত্রের এই সাধনার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে যায় 'বিষাদমাখা মুখখানি'। মায়ার মুখই তাঁর মনে পড়ে, সাধকসত্তাকে পিছনে ফেলে শিল্পীসত্তা, প্রেমিকসত্তাই বড় হয়ে ওঠে –

> এ মুখ আমার মনে পড়ে কেন? আর মনে পড়িলেই এত আনন্দ হয় কেন? আনন্দ না হইলেই বা সে মুখখানি দেখিবার জন্য এত অধীর হই কেন? ... মন দিয়া যখন আমরা কাব্য পড়ি বা নাটক দেখি বা গান শুনি, তখনো এইরূপ বিমল, বিশুদ্ধ, স্বসংবেদ্য, 'বিগলিত-বেদ্যান্তর' আনন্দের উদয় হয়। তবে কেন আমি এই মুখখানিকে কাব্য ... নাটক ... গানের তাল-লয় করি না? কাজ কি সে আসল মুখে? যে মুখ আমার হৃদয়ে চির-অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমি কেন মহা-সুখসমাধিতে ডুবিয়া যাই না?

বেনের মেয়ে-তে হরপ্রসাদ হিন্দু-বৌদ্ধযুগের প্রেক্ষিতে সহজযানী বাংলার এক মনোরম ছবি এঁকেছেন। সে যুগের বাংলায় হিন্দু-বৌদ্ধ জীবনধারায় বহু বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও মূলগত জীবনধারায়, তাঁদের নিষ্ঠা, বিশ্বাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি – সামগ্রিক যাপনে এক সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যই মূর্ত হয়ে উঠেছিল। হিন্দুবৌদ্ধের পারস্পরিক মিলন ও সমন্বয় দ্বারা পূর্ণায়ত সার্বিক বাঙালি জীবনাদর্শের চিত্রই এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন – বিহারী দত্তের ধর্ম ঠিক কি তা স্পষ্ট ভাবে বলা যায় না। একথা সেকালের বেনেদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তাঁরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কার পালনের সঙ্গে বুদ্ধমন্দিরে উপাসনা করতেন,

ব্রাহ্মণদের ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধা করতেন এবং উভয়ধর্মের লোককেই যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। সপ্তগ্রাম বিহারের মহাস্থবির শান্তশীলের আশীর্বাদে তাঁর একমাত্র কন্যাসন্তান হওয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রতিই তাঁর বেশি টান ছিল। উপন্যাসে হরিবর্মা ধরমবিহার অধিকার করলেও বৌদ্ধধর্মস্থানে কোন অত্যাচার করেন নি। তাঁর আহূত 'গুণীজন মহাসভা'য় নিজে সনাতন ধর্মের সঙ্গে জৈন-বৌদ্ধ নির্বিশেষে গুণীজনদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। বৌদ্ধ কবি, চিত্রকর, ভাস্কর, স্বর্ণকার, সূত্রধর, জ্যোতিষী, চিকিৎসকদের তিনি পুরস্কৃত করেন। তাঁর আহূত গুণীজন সমাগমে বাংলা দেশ ভারতীয় ঐতিহ্যের সমস্ত বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যকণিকা আহরণ করে তার যথার্থ মূল্যদান করেছেন। এই সৃষ্টি কল্পনায় হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্য যেন এক সুরে, সৌন্দর্যে সুষমায় একাত্ম হয়ে গেছে। সর্বাত্মক বঙ্গ-সংস্কৃতির বাহক রাজা হরিবর্মা শিল্পরসিক, তাঁর ভাবৈকরসে হিন্দু-বৌদ্ধশিল্প সব সমধর্মা। তাই এই রাজসভায় বিষ্ণুমূর্তি নির্মাতা শিল্পীর নাম শাক্যসিংহ সেগরা, আবার বৌদ্ধ লোকেশ্বর মূর্তির নির্মাতা লোকনাথ চাকি দুই ভাস্করই সম্মানিত হন। জ্যোতিলিঙ্গ শিব মূর্তি, সোনার তারের গয়নায় দশাবতার, হাতির দাঁতের মুখ, মন্দিরের শিলাপাত্র, *অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা, চক্রসম্বরতন্ত্র,* হিন্দুকবির কাব্য জাতিধর্ম নির্বিশেষে জাতীয় ঐতিহ্যরূপে রাজকীয় স্বীকৃতিতে ভূষিত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই হরপ্রসাদ সোনার তাড়ের দশাবতার গয়না প্রসঙ্গ উত্থাপন করে হিন্দু-বৌদ্ধ সম্পর্কের খণ্ডচিত্র আশ্চর্য কুশলতায় বুনে দেন। গয়নায় দশাবতার ক্রম – 'মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বুদ্ধ (জগন্নাথ), বামন, রাম, বলরাম ও কল্কি'। 'বুদ্ধের স্থান তো নবম হওয়া উচিৎ' – রাজার এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মস্করীর প্রত্যুত্তরের মধ্যেই হিন্দু-বৌদ্ধ সম্পর্কের চাপা আততি ফুটে উঠেছে –

> বুদ্ধকে দশের মধ্যে লওয়াই হইয়াছে অল্পদিন। কিন্তু উহার স্থান এখনো ঠিক হয় নাই; যাহারা বুদ্ধকে মানুষ বলিয়া মনে করে, তাহাদের কাছে উনি নবম, আর যাহারা উঁহার আকার-প্রকার দেখিয়া মানুষ বলিয়া মনে করে না, তাহারা বামনের পূর্বেই উঁহার জায়গা করে, অর্থাৎ এখনো তিনি মানুষ হয়েন নাই উঁহার হাত পা এখনো ঠিক হয় নাই।

হরপ্রসাদ বাঙালি লোকরুচির এক সমৃদ্ধ ছবি উপহার দিয়েছেন। যেমন – সেকালে সবার ছবি আঁকার 'বাতিক' ছিল। অন্ত্যজদের ঘরের দেওয়ালে দুটো ময়ূর, বেনেদের বাড়ির দুইপাশে দুটো টাকার থলি, একটা শাঁখ ও একটা পদ্ম আঁকা থাকত। ঔপন্যাসিক তঞ্চক-সরল বয়ানে বাঙালির সাংস্কৃতিক ভাবনার আদর্শ চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। রূপদক্ষের সৃষ্টিতে পরমসত্য দ্বিরূপে – অনন্তশয়ানে নারায়ণ ও

মহাপরিনির্বাণে বুদ্ধদেবের মূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বিষয়বৈভবে ও চিন্তনমাহাত্ম্যের সঙ্গে আশ্চর্য সরল গদ্যে হরপ্রসাদ লিখেছেন –

> যে-দুখানি ছবি রাজাকে দেখানো হইল, তাহার একখানিতে দুই শালগাছের মধ্যে বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করিতেছেন। দুইটিই শোয়ামূর্তি। দুইটিই ডানপাশে শুইয়া আছেন; ডান হাতটি গালে। বাঁ হাতটি আজানুলম্বিত, উরথের উপর অলসভাবে পড়িয়া আছে। রাজা বিষম ফাঁপরে পড়িলেন, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দুইজন শিল্পীকেই সমান পুরস্কার দিলেন। দুই জনের ডাক হইল, একজনই দুই বার আসিল ও দুইটি পুরস্কার লইয়া গেল। রাজা আরো আশ্চর্য হইয়া গেলেন।

বেনের মেয়ে-তে প্রাচীন বাঙালির গৌরবের কথা প্রসঙ্গে ব্যবসায়িক সমৃদ্ধিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, বাঙালির সামুদ্রিক অভিযান সম্বন্ধে দেশময় শত শত রূপ-কথা ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এক সময়ে ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভৃতি জাতির বিচার দ্বারা লৌকিক মতে আভিজাত্য নির্ণীত হত না। রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্র দুজনেই পদ-প্রতিষ্ঠায় প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। গুপ্ত ও পাল-রাজত্ব বৈশ্য-প্রাধান্যের যুগ। তখন চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর কাব্যের নায়ক ছিলেন। এঁদের সময়ে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব খুব বেশি ছিল না, বণিকেরা ব্রাহ্মণের টোলে কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ করতেন। অবশ্য পাল-রাজত্বের শেষদিকে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব বৃদ্ধি পায়, সেটি দণ্ডপাণি, বৈদ্যদেব প্রমুখের যুগ। মুসলমান বিজয়ের আগে পর্যন্ত সাহসী বাংলার নাবিকরা বিশাল সমুদ্রপথে যাত্রা করতেন। তাঁরা সিংহল, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে চীনের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[১১০] বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ ও উৎকীর্ণ লিপির সাক্ষ্য থেকে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধি বহুলাংশে ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর ছিল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সওদাগরদের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাহিনিগুলি এর প্রমাণস্বরূপ। অষ্টম শতকের আগের লিপিগুলিতে দেখা যায় রাষ্ট্র ও সমাজে স্বার্থবাহদের সঙ্গে শ্রেষ্ঠীদেরও যথেষ্ট আধিপত্য ছিল। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌ-শিল্পের প্রচলন ছিল। *চর্যাচর্যাবিনিশ্চয়* থেকে *প্রাকৃত-পৈঙ্গল* পর্যন্ত প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় রচিত অসংখ্য গান ও পদে নদ-নদী-নৌকা সংক্রান্ত রূপক ও উপমার সংখ্যা থেকে অনুমিত হয়, 'নৌ-বাণিজ্যই প্রবলতর ও প্রশস্ততর' ছিল। ব্রহ্মদেশ ও যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ ও পূর্ব-দক্ষিণ বৃহত্তর ভারতের দ্বীপগুলির সঙ্গে বাংলা দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও অনুমান করা যায়। মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের লিপিতে (চতুর্থ – পঞ্চম শতক), মেঘবর্মণ-সমুদ্রগুপ্ত (চতুর্থ শতক) প্রসঙ্গে, রাজা বালপুত্রদেবের

নালন্দা লিপিতে (দশম শতক), ইৎসিঙের (সপ্তম শতক) ভ্রমণবৃত্তান্তে, বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত ধর্মকীর্তির জীবন-ইতিহাসের মধ্যে (একাদশ শতক) যবদ্বীপ সুবর্ণদ্বীপের সঙ্গে পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রের দেশ ও দ্বীপগুলির সম্বন্ধের প্রমাণ আছে। খ্রিস্টপূর্ব থেকে শুরু করে আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত কালপর্বকে ‘বাঙলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ’ বলা যায়, এরপর আদিপর্বে বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের সেই যুগ আর ফিরে আসেনি।[১১১] আমাদের আলোচ্য উপন্যাসটির নামকরণের মধ্যেই বাণিজ্যের স্বীকৃতি রয়েছে। মায়ার নিজস্ব পরিচয় নয়, তার পিতা বণিক বিহারী দত্তের পরিচয়েই তাঁর পরিচয়। ‘বেনের মেয়ে’ এখানে গৌরবার্থে ব্যবহৃত শব্দবন্ধ। উপন্যাসে বিহারী দত্ত, জীবন ধনী প্রমুখের সমৃদ্ধির ছবি রয়েছে। বিহারীর বাণিজ্যযাত্রায় তাঁর মেয়ে ও গৃহিণী সঙ্গ দিয়েছেন। স্ত্রী-কন্যা নিয়ে বিদেশযাত্রা নিন্দার্হ, কিন্তু বিহারী তাঁদেরকে নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন, আচার্য মহাশয়ও দিনক্ষণ দেখে এই যাত্রাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিহারীর দাপট যে কেবল বাণিজ্যের সঙ্গে নয়, রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনেও কার্যকরী ছিল, তা এই ঘটনার সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়। মঙ্গলকাব্যের নৌযাত্রার অনুসরণে বিহারীর সাগরসঙ্গম যাত্রা বর্ণিত হয়েছে –

> বিহারী দত্তের ডিঙা ভাসিল। ডিঙা একখানা নয়, দুইখানা নয়, এক এক সাংঘায় সাতখানি করিয়া ডিঙা – এমন সাত সাঙ্ঘা ডিঙা ভাসিল। প্রত্যেক সাঙ্ঘায় এক এক জন বুড়া পাটনি। আর মধুকর নামে যে ডিঙায় বিহারী দত্ত ও তাঁহার পরিবার ছিল, তাহার পাটনি এই সকল সাঙ্ঘার কর্তা। প্রত্যেক সাঙ্ঘায় এক-একখানি ডিঙায় ১০০ জন করিয়া জোয়ান পুরুষ তীর, ধনুক, ঢাল, তরবাল লইয়া ডিঙা রক্ষা করিবার জন্য আছে। সব নৌকার খোলে মাল বোঝাই, এসব বিক্রির মাল – ভালো কাপড়, বারাণসী শাড়ি, ঢাকাই মস্‌লিন, খেলনা, গাঁজা, সিদ্ধি, চন্দনকাঠ, পাট, থলে, রেশম, তসর, গরদ, ক্ষীরোদ, এণ্ডী।

মঙ্গলকাব্যের চরিত্র চাঁদ সদাগর, ধনপতি, শ্রীপতি সদাগরদের অনুসরণে বিহারী দত্তের বাণিজ্য যাত্রা লিখিত হয়েছে। সাগরে ঝড়ের সাক্ষাৎলাভ এবং তার থেকে পরিত্রাণ লাভ মঙ্গলকাব্যের নায়কদের বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সঙ্গে তুলনীয়। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক বর্ণনা, ভৌগলিক বিবরণ অনেকসময়ই ক্লান্তিকর। কিন্তু হরপ্রসাদের নিজস্ব বর্ণনারীতিতে সমুদ্রযাত্রার বাড়তি প্রসঙ্গ যথাসম্ভব বর্জিত একমুখীন ও নির্মেদ হয়ে যাত্রাপথটিকে অত্যন্ত মনোগ্রাহী করে তুলেছে। ঔপন্যাসিক নির্দিষ্ট স্থান-কালের বেড়াকে সবক্ষেত্রে না মানলেও বিগত যুগের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে আত্মপ্রসাদের নিবিড়তায় উপলব্ধি করেছেন। তিনি বাঙালির ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাচুর্য-ঐশ্বর্য, বালিদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থান ভ্রমণকে ফুটিয়ে তুলবার পাশাপাশি মাঝি-মাল্লাদের অসহায়, করুণ অবস্থার কথাও পাঠকের গোচরে এনেছেন।

বঙ্কিমের শিষ্য হরপ্রসাদ সাগরসঙ্গম প্রসঙ্গে যথেষ্ট মৌলিক এবং স্বতন্ত্রের পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬) উপন্যাসের সাগর বর্ণনা এইপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু হরপ্রসাদ *বেনের মেয়ে*-তে মায়ার দৃষ্টির নব নব বিস্ময়ের মধ্যেই সমুদ্র বর্ণনাকে অনন্য মাত্রা দিয়েছেন। আমরা তিনটে খণ্ডচিত্র উদ্ধার করছি –

> ক) ... ভোরবেলায় ... সূর্য জলের ভিতর থেকে উঠছে। সূর্য উঠবার আগে আলোগুলো বাহির হইতে লাগিল – ঠিক যেন দড়ি। দেশে যে দেখি, সূর্যের হলুদ রঙ, দেখিতেও খুব ছোটো; কিন্তু এখানে দেখি যেন একটা প্রকাণ্ড রাঙা জালা। দড়ি দিয়ে কে যেন জালাটাকে উপরে টেনে তুলছে। সূর্য জল থেকে যখন বাহির হইল, তখন ক্রমে ক্রমে রাঙা রঙ ঘুচিয়া যাইতে লাগিল। আর আমাদেরই দেশের মতো চক্‌চকে হলুদ রঙ হয়ে দাঁড়ালো।
>
> খ) ... জলটা যেন গোল হয়ে গিয়াছে, আর তাহার ওদিকের জল, যেন নামিয়া গিয়াছে, ঠিক যেন একটা খুরা দেওয়া বাটি উবুড় করিয়া রাখিয়াছে।
>
> গ) আজ সূর্যকে ডুবিতে দেখিয়াছি। রাঙা জালাটির মতো আস্তে, আস্তে, আস্তে জলের ভিতরে পড়িয়া গেল।

বাঙালির বীরত্ব এককালে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মহাকবি ভার্জিলের *Georgics* (III, 27) কাব্যে, কালিদাসের *রঘুবংশ*-এর ৪ সর্গে, কল্‌হনের কাশ্মীরের ইতিহাস *রাজতরঙ্গিণী*-তে বাঙালির বীরত্বের উল্লেখ রয়েছে।[১১২] হরপ্রসাদ সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* অবলম্বনে *বেনের মেয়ে*-এর যুদ্ধের পটভূমিকা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধবর্ণনা *ধর্মমঙ্গল* কাব্য অনুসারী। তৎকালীন সাধারণ যোদ্ধা জাতি ছিল ডোম ও বাগ্‌দি। উপন্যাসের বর্ণনাটি দেখা যাক –

> রাজা হুকুম দিলেন, "সব বাগ্‌দি সাজো।" বাগ্‌দিরা কেবল লড়ে। কিন্তু রাস্তা তৈয়ার করা, শত্রুর গতিবিধি দেখা ডোমেদের কাজ আর ঘোড়সওয়ারও ডোম। দশ হাজার বাগ্‌দি সাজিলে, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ হাজার ডোমও সাজিল। তাহারা আগে গিয়া রাস্তা দেখিতে ও তৈয়ার করিতে লাগিল, বাজনা বাজাইতে লাগিল, ঘোড়ায় চড়িয়া দেশের অবস্থা দেখিতে লাগিল। গান উঠিল –
>
> আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে
> ডাল মৃগল ঘাঘর বাজে।
> বাজ্‌তে বাজ্‌তে পড়লো সাড়া,
> সাড়া গেল বামনপাড়া।

ডোমেদের সাড়া বামনপাড়ায় গেলে তাহারা ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে সাড়া ক্রমে হরিবর্মার তাঁবুতে পৌছিল।

হরপ্রসাদ ব্যবহৃত এই ছড়ার আরো চারটে পাঠান্তর রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধে (সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০১) সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু 'বামনপাড়া'র সংযোজন ঔপন্যাসিকের নিজস্ব অভিপ্রায়ে ঘটেছে। হরপ্রসাদ 'ডাক ও খনা' প্রবন্ধে (*প্রাচী*, শ্রাবণ, ১৩৩০) জানিয়েছেন, 'বজ্রডাক হেরুকতন্ত্র প্রভৃতি বৌদ্ধদের তন্ত্রের মাঝে মাঝে চলিত ভাষায় গান ও ছড়া পাওয়া যায়'। গান ও ছড়ার ব্যবহার করে তিনি প্রচলিত লোকস্মৃতি ও শ্রুতির মৌখ ইতিহাসের সন্ধান করেছেন। ভোজ-বর্মদেবের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় জাতবর্মা দিব্য ও গোবর্ধনকে পরাজিত করেন। কৈবর্ত বিদ্রোহের অধিনায়ক দিব্য *রামচরিত*-এ দিব্বোক নামে অভিহিত। রামচরিতের টীকা থেকে জানা যায় দ্বিতীয় মহীপাল বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে নিহত হন। রামপাল কৈবর্ত বিদ্রোহের অধিনায়ক দিব্যের বংশধর ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছিলেন। ঐতিহাসিক সূত্রানুযায়ী কৈবর্ত বিদ্রোহকে দমন করার জন্য জাতবর্মা, দ্বিতীয় মহীপাল এবং রামপালের নাম উল্লিখিত হয়েছে। জাতবর্মার বংশধর হরিদেববর্মার সঙ্গে দিব্যের বিদ্রোহের কোনো সম্বন্ধ নির্ণীত হচ্ছে না। সুতরাং, *বেনের মেয়ে*-তে উল্লিখিত বাগদি বিদ্রোহের সঙ্গে কৈবর্ত বিদ্রোহের সম্বন্ধ স্থাপন দুরূহ। আবার উপন্যাসে মহীপাল রূপা রাজার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। ইতিহাসে রয়েছে তিনি কৈবর্তদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী দিব্যকে 'ভবস্যআপদম্' এবং বিদ্রোহকে অলীক বিদ্রোহ বলেছেন। হরপ্রসাদের বর্ণনায় ঐতিহাসিকতা না থাকলেও তিনি কৈবর্ত বিদ্রোহের সাদৃশ্যেই বাগ্‌দী বিদ্রোহের চিত্র এঁকেছেন।[১১৩]

আমাদের মতে দ্বিতীয় নয়, প্রথম মহীপালই হরপ্রসাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি। প্রথম মহীপালের রাজত্বকালের সঙ্গেই উপন্যাসের কালক্রম মেলে। প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে (আনুমানিক ৯৮৮ – ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দ) দণ্ডভুক্তি, দক্ষিণ রাঢ় এবং বঙ্গদেশ স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের লিপি অনুযায়ী, মহীপালের বাহিনী ১০২১ – ১০২৩ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ রাঢ়ের রাজা রণশূরকে পরাস্ত করেন। বর্মণরাজ জাতবর্মার পুত্র হরিদেববর্মা পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় তিনি একাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করেন, রাজধানী বিক্রমপুর। নিশ্চিতভাবে তিনি উপন্যাসের কালসীমার পরের মানুষ। হরপ্রসাদ নেপালে হরিদেববর্মার ১৯ রাজ্যাঙ্কে লেখা *অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা* এবং ৩৯ রাজ্যাঙ্কে লেখা কালচক্রযানটিকা *বিমলপ্রভা*-এর পুথি আবিষ্কার

করেন। অপরজন ভবদেব ভট্ট রাঢ়ীয় সাবর্ণ গোত্রজ ব্রাহ্মণ। ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের প্রশস্তিলিপি ও অন্যান্য সূত্রানুযায়ী, তিনি বর্মণরাজ হরিবর্মার সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী ছিলেন এবং সম্ভবত হরিবর্মার পুত্রের রাজত্বকালে তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন। ভবদেব একাদশ শতাব্দীর শেষ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। সুতরাং একাদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের পটভূমিতে লিখিত উপন্যাসে ভবদেব চরিত্রকে রাখায় কালাতিক্রমণ দোষ ঘটেছে। তবে বাংলার সামাজিক জীবন থেকে বৌদ্ধ-প্রভাব উচ্ছেদে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[১১৪]

বেনের মেয়ে উপন্যাসে কয়েকজন খ্যাতনামা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য, দার্শনিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের উপস্থিতি বিশেষ মাত্রা সংযোজিত করেছে। উপন্যাসে সিদ্ধাচার্য লুইয়ের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাসে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে – ‘কলিযুগপাবন সাক্ষাৎ গৌতমবুদ্ধের ন্যায় সিদ্ধাচার্য শ্রী শ্রী ১০৮ লুইদেব’। তৎকালীন প্রেক্ষিতে লুইসিদ্ধার গুরুত্ব রূপরাজার লুই-প্রশস্তিতে ধরা পড়েছে –

> গুরুদেব, আপনি জগতের যে উপকার সাধন করিয়াছেন স্বয়ং বুদ্ধ গৌতমও তাহা পারেন নাই। তাঁহার নির্বাণ বহুজন্মব্যাপী বহু- আয়াসসাধ্য ধ্যান ধারণা, তপ-জপ ও কঠোর সাধনার ফল। কিন্তু আপনার নির্বাণ অতি সহজ, আমার মতো মহাপাপীও আপনার উপদেশে অনায়াসে নির্বাণ পথের পথিক হইতে পারে।

আদি সিদ্ধাচার্য লুই বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি। তাঁর সময়কাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতান্তর আছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতে সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাবকাল সপ্তম – অষ্টম শতাব্দী। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে এই সময়কাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। তিব্বতি ভাষায় অনূদিত লুইয়ের পাঁচটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় – *বজ্রসত্ত্বসাধন, বুদ্ধোদয়, ভগবদ্‌ভিসময়, অভিসময়বিভঙ্গ* ও *তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষগীতিকাদৃষ্টি*। *অভিসময়বিভঙ্গ* গ্রন্থটির সহ রচয়িতা এবং তিব্বতী ভাষায় অনুবাদক রূপে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম থাকায় লুইকে তাঁর সমকালীন মনে করা যায়। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে, ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিক্রমশীল বিহার থেকে তিব্বতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। *বেনের মেয়ে* উপন্যাসের কাল আর লুইয়ের সমকাল একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।[১১৫] হরপ্রসাদের মতে, আদি সিদ্ধাচার্য লুই রাঢ়ী বাঙালি। লুইয়ের নামের তিব্বতি রূপান্তর মৎস্যান্ত্রাদ। হরপ্রসাদ এই নাম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, ‘রাজার গুরু মাছের আঁতড়ি খাইতে ভালোবাসেন, পোঁটা ও তেল খাইতে ভালোবাসেন’।[১১৬] উপন্যাসে লুইগুরু মাছ খেতে ভালোবাসেন, তাই তারাপুকুরে মাছ ধরবার রাজকীয় আয়োজন দেখা যায়। নালন্দার সর্বজ্ঞ পণ্ডিত বজ্রদত্ত[১১৭] উপন্যাসের কালসীমার অনেক আগের মানুষ,

বিক্রমশীল বিহারের পণ্ডিত টীকাকার প্রজ্ঞাকরমতি[১১৮] সমসাময়িক কালের, বজ্রযোগিনীসাধনের প্রবর্তক উড্ডীয়ানের রাজা ইন্দ্রভূতি এবং তাঁর মেয়ে (মতান্তরে বোন) লক্ষ্মীঙ্করা (যদিও উপন্যাসের সময়কালে লক্ষ্মীঙ্করা গত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর গ্রন্থটির প্রতিপত্তি ও প্রচলন ব্যাপক ছিল)[১১৯], তাঁর শিষ্যা প্রকটনিতম্বা সহজিয়া বৌদ্ধদের মধ্যে প্রসিদ্ধা এবং কাব্য রচনায় সরস্বতীস্বরূপা, বিক্রমশীল মহাবিহারের রত্নাকর শান্তি[১২০]; স্মৃতিগ্রন্থ প্রণেতা শুভাকরগুপ্ত; তন্ত্রাচার্য নাড় বা নাঢ়পাদ[১২১] ও তাঁর স্ত্রী নিগু[১২২] এই উপন্যাসে তাঁদের ব্যক্তিত্ব মহিমায় সমুজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হয়েছেন। মতাদর্শ নিয়ে সিদ্ধাচার্যদের বিভেদের ইঙ্গিত করে হরপ্রসাদ উপন্যাসে লিখেছেন –

> নাঢ়পণ্ডিতের স্ত্রী বা শক্তিনাঢ়ী ... জ্ঞান-ডাকিনী। ... নাঢ়া ও নাঢ়ীর সঙ্গে বহুশত নাঢ়া ও নাঢ়ী আসিয়াছে।

নাড় ও নাড়ীর অনুগামীরাই কি পরবর্তীকালে সহজিয়া বৈষ্ণব নেড়া-নেড়িতে পরিণত হয়েছিল? এছাড়াও সিদ্ধাচার্য সহজিয়া দারিক, ভেদে, ঢেন্টন এবং পদকর্তা রূপে চাটিল, বীণা, সরহপাদ প্রমুখের উল্লেখে প্রাচীন বাংলার গুণীসমাগমের চমৎকার চিত্র উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে।

উৎসবমুখর বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতিজ্ঞাপক গাজনের ছবি হরপ্রসাদের লেখনীতে জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। গাজনের দলে প্রথমে বাজনদার, পদাতিক সৈন্য, ঘোড়সওয়ার, ঘোড়ায় টানা রথ, হাতির পিঠে রাজা, পাত্র-মিত্র সভাসদ, মহিষী, রাজকন্যারা সঙ্গে চলেছেন। এরপরে কয়েকখানা গোরুর গাড়িতে সঙ – বানর, রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর, মারসেনা, মারকন্যা। তারপরে কতকগুলি 'চৌপাল্লায়' নাটক। বাঙালিদের লিখিত ও অভিনীত 'বেশন্তর' নাটককে ঘিরে উন্মাদনার ছবি রয়েছে। তারপর গুরুদেবের হাতির পিছনে তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ খোল-করতাল নিয়ে দেহতত্ত্বের কীর্তনগান গাইতে গাইতে চলেছে। তার পিছনে নেঢ়া-নেঢ়ীর দল। নানা সম্প্রদায়ের গুরু চলে গেলে খোলা ঘোড়ার রথে গণেশ, দুর্গা, সূর্য, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ, রাম, নানা রকমের সঙ, তার পিছনে হই-হই, লোকজন, রঙ্গরস, তামাসা-ফস্টি।

বেনের মেয়ে উপন্যাসকে সহজিয়া বৌদ্ধতত্ত্বের প্রবেশক গ্রন্থ রূপে বলা যেতে পারে। মায়াকে ভিক্ষুণী করার উদ্দেশ্যে তাকে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা চলে। ভিক্ষুণীদের সাজানো সংলাপে হরপ্রসাদের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত উপলব্ধি ও প্রজ্ঞার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাঁর ভাষার সহজবোধ্যতা এবং উপস্থাপনের প্রসাদগুণের ফলে জটিল তত্ত্ব সহজেই অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে। যেমন –

> নির্বাণ আর-কিছুই নয়, কেবল শান্তি। দীপ যেমন নির্বাণলাভ করিলে, পৃথিবীতেও থাকে না, অন্তরীক্ষেও থাকে না, কোনো দিকেও যায় না, বিদিকেও যায় না, কেবল তৈলক্ষয় হেতু শান্ত হইয়া যায়, মানুষও

> তেমনি নির্বাণ পাইলে পৃথিবীতেও যায় না, অন্তরীক্ষেও যায় না, কোনোদিকেও যায় না, ক্লেশক্ষয় হয় বলিয়া কেবল শান্ত হইয়া থাকে।

সহজিয়া সাধনতত্ত্ব সহজভাবে উপস্থাপনে হরপ্রসাদের কবি ও তাত্ত্বিকমনের যুক্তবেণী লক্ষ করা যায় –

> বজ্রগুরু ভিন্ন গতি নাই। বজ্রগুরু ভেদাভেদ দেখাইয়া দেন। গুরুর উপদেশ অমৃত-রস। ... সব শূন্য, সব করুণা, পাপ নাই, পুণ্য নাই, সব সমান। তখন সমাজের বন্ধন থাকে না। লোকে 'ভব আর নির্বাণ', 'ভব আর নির্বাণ' করিয়া আপনাকে বদ্ধ করে, কিন্তু গুরুর উপদেশে দেখিতে পাইবে, ভবও নাই, নির্বাণও নাই। সংসারে যাহা পাপ ও পুণ্য, ... তাহার কিছুই থাকে না। ... পঞ্চকামোপভোগে দোষ তো নাই-ই, বরং উহা মহাসুখময় সহজধামে লইয়া যায়। ... সহজ সমস্ত ত্রিভুবন ব্যাপিয়া আছে। 'অহরহ সহজ যারন্ত।' সহজতরু প্রকাণ্ড তরু; আকাশে আকাশে তাহার ডাল উঠিয়াছে, তাহার ফুল যখন হয়, তখন সব প্রভাস্বরময় হইয়া যায়। আবার যখন সে ফুল ফোটে, তখন ত্রিভুবন মহাসুখে মত্ত হয়। সে গাছের ফল অমৃত ফল। সে ফলের নাম মহা-উপকার। ... করুণা করো, পর-উপকার করো। গুরু কাড়ো, গুরুর কাছে উপদেশ লও, দেখিবে সব শূন্য, সব ফক্কা, আছে কেবল করুণা, আর পর-উপকার। ... শূন্যও মহাসুখ, বিজ্ঞানও মহাসুখ, সবই এক মহাসুখ। মহাসুখই করুণা, মহাসুখই সহজ, আর সকলেরই এক ফল পর-উপকার।

বেনের মেয়ে সম্পর্কে বাঙালি পাঠকের উদাসীনতার কারণ সম্ভবত কাহিনিটির দুর্বলতা। গল্পটি শিথিল এবং চরিত্রগুলির বিশেষ উত্থান-পতন, বিকাশও লক্ষিত হয় না। গুরুপুত্রের ভালোবাসার দাবি মনোযোগ আকর্ষণ করলেও তাঁকে ঘিরে প্রত্যক্ষ ঘটনা নেই। উপন্যাসের বিশ্লেষণ তেমনভাবে লক্ষিত হয় না। ভবদেব, মায়া, বিহারী, লুইসিদ্ধা চরিত্রগুলির পরিবর্তন ঘটেনি। রাজারাজড়াদের চরিত্রচিত্রণও বিশেষত্বহীন। হরিবর্মদেবের রাজ্যবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কাহিনির সমাপ্তি এবং পরবর্তী অংশের বর্ণনা শিথিল হওয়ায় উপন্যাসটির উপর দ্বিধাবিভক্তির অভিযোগ আনা যায়।[১২৩] তবুও, সামগ্রিক বিচারে গ্রন্থটির মূল্য অনস্বীকার্য। ঔপন্যাসিকের ভিন্নমুখী উদ্দেশ্য সাধনে তা সার্থক। প্রচলিত উপন্যাসের বাইরে লিখিত উপন্যাসে ইতিহাসের আধারে রোমান্সের আতিশয্য নেই। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে গল্পাকারে ঐক্যসূত্রে বেঁধে দিয়ে হরপ্রসাদ বাঙালির ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে তুলে এনেছেন। আশা দাশ বলেছেন যে 'বাংলাদেশে বৌদ্ধ মননচিন্তার পুষ্টি ও ঋদ্ধির পটভূমিকায়' তাঁর 'শ্রেষ্ঠতম উপন্যাসের বিকাশ' ঘটেছে। পুরাতাত্ত্বিক হরপ্রসাদ অষ্টম-দশম শতাব্দীর বৌদ্ধ বাঙালি জীবনযাপনের জ্ঞান ও সমৃদ্ধির অতলস্পর্শতা অনুভব করে এই যুগের অনুসন্ধিৎসুদের দাবিকেই চরিতার্থ এবং নৈর্ব্যক্তিকতায় সাবলীলতা দান করেছেন। সুদূর অতীতের অজ্ঞাত পটভূমিকায় রচিত হলেও উপন্যাসের চিন্তার স্বচ্ছতার সঙ্গে তৎকালীন

যুগপরিবেশে ঔপন্যাসিকের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে। *বেনের মেয়ে* স্বপ্নলব্ধ বাঙালির সাংস্কৃতিক যাপনের উপন্যাস।

পুস্তক-পরিচয় বা গ্রন্থ ও সাময়িকপত্রের সমালোচনা

সাময়িকপত্রের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, সম্পাদক ও পাঠকবর্গের নিজস্ব মতামত আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে, সমকালীন বিদ্যাচর্চার বা নানা বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বার্তাবাহীরূপে এই অংশটি জরুরি। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের বৌদ্ধসংস্কৃতির নানা তথ্য সাময়িকপত্রের এই অংশগুলিতে বিধৃত রয়েছে।

অস্বাক্ষরিত 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' (*আর্য্যদর্শন*, চৈত্র, ১২৮৯) শীর্ষক অংশে লিখিত হয়েছে – 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ; শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত। নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, মূল্য ৩।।০ টাকা।' এই গ্রন্থ ভারতীয় এবং বিশেষত বাঙালির চিন্তার গতি ফিরিয়ে দিয়েছে – কী প্রণালীতে অধ্যয়ন, প্রলুপ্ত সত্য উদ্ধারের চেষ্টা করতে হয়, তা এই গ্রন্থ থেকে শিক্ষণীয়। নির্জীব, জড়, উৎসাহবিহীন বাঙালির মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। এই গ্রন্থে বৌদ্ধবিষয়ক নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। সমালোচকের ভাষায় – 'ইহাতে ২৮২ পৃষ্ঠা উপক্রমণিকা ব্যতীত ... জগন্নাথ, ৪ প্রকার স্তূপ ৪টা, সঙ্ঘ যন্ত্র, বুদ্ধযন্ত্র ইত্যাদির চিত্র আছে'। এই গ্রন্থকে 'বঙ্গের রত্ন-বিশেষ' বলে আখ্যায়িত করে *আর্য্যদর্শন* জহুরীর পরিচয় দিয়েছে। অস্বাক্ষরিত 'পুস্তক পরিচয়' (*বঙ্গবাণী*, আশ্বিন, ১৩৩১) রচনাটিতে 'বিক্রমশীলা (৪৮ পৃষ্ঠার গল্প) – শ্রীফণিন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। মূল্য আট আনা'-র সমালোচনায় বলা হয়েছে – একদিন নালন্দা ও বিক্রমশীলা সুশিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্র ছিল, সেখানে তিব্বতের লোকেরা শিক্ষার জন্য আসতেন। তিব্বতের অধিপতির নিমন্ত্রণে অনেক বড় বড় পণ্ডিত তিব্বতে গিয়ে ধর্ম-শিক্ষা দিতেন। এই স্থানগুলির বিবরণ ও সেখানকার কার্য-কলাপের কথা সকলের জানা উচিত। ইতিহাস পড়তে লোকে নারাজ হবে ভেবে গ্রন্থকার অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ গল্পচ্ছলে লিখেছেন। বাঙালির ইতিহাস বিমুখতার সমালোচনা ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অনেক লেখায় উঠে এসেছে। এই প্রবণতাকে হয়তো স্মরণে রেখে পরিশেষে বলা হয়েছে – 'গল্প পড়িয়া যদি ইতিহাস শেখে, ভাল কথাই'।

অস্বাক্ষরিত 'বঙ্গবাণীর নৈবেদ্য' প্রবন্ধের (*বঙ্গবাণী*, ফাল্গুন, ১৩৩৩) শিরোটীকায় বলা হয়েছে –

> ... 'বঙ্গবাণীর' বর্ত্তমান নূতন বৎসর হইতে আমরা 'নৈবেদ্য' বিভাগে প্রতি মাসে বিদেশের মসিক পত্রাদি হইতে শিল্পকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত (ভারতবর্ষের উন্নতি অবনতির সহিত যাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ আছে) প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া দিব। নব নব উন্নতিশীল পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জাতি সমূহের ভাবধারার সহিত পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখাই এই বিভাগের উদ্দেশ্য।

'ভারতীয় শিল্প' শীর্ষক সমালোচনায় আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর লেখাকে ভিত্তি করে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার অভ্যুত্থানের পূর্বে ভারতীয় চিত্রকলার অবস্থা আলোচিত হয়েছে। ভারতীয় শিল্পকলার আলোচনার সূচনাতেই বৌদ্ধযুগের শিল্পের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। বৌদ্ধযুগের সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পে অদম্য প্রাণশক্তি ছিল। এই চিত্রশিল্প অত্যল্পকালের মধ্যেই ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারকদের সহায়তায় জাভা শ্যাম কম্বোজ চীন জাপান প্রভৃতি দেশেও অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেও এটি আফগানিস্তান, পারস্য ও আরবের মধ্য দিয়ে সুদূর মিশর পর্যন্ত আংশিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। তৎকালীন ও তার অল্পকাল পরবর্তী চিত্রশিল্পের (প্রস্তরমূর্তি প্রভৃতি ব্যতীত) পরিচয় অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি গুহাগাত্রে খোদিত আছে। অজন্তা (সপ্তম শতাব্দী), সিগিরি (পঞ্চম শতাব্দী) এবং সিংহলের পোলোন্নারুভ (দ্বাদশ শতাব্দী) শিল্পচর্চায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই যুগের পর থেকে খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতীয় চিত্রশিল্পের কোনও নিদর্শন আমরা পাই না। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটার পর ভারতীয় শিল্পের প্রতি গুণগ্রাহিতা জন্মে। শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে বাংলা দেশ সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়। এখানে প্রাচ্য-ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি (National School of Painting) গড়ে ওঠে। হ্যাভেল সাহেবের উদ্যোগে ভারতীয় চিত্রশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। ভারতীয় শিল্পবিদ্যা চর্চার সূচনা এবং শ্রেষ্ঠকাল যে বৌদ্ধযুগ এবিষয়ে নিঃসন্দেহে বলা চলে। অনেক উত্থানপতন বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রাচ্য-ভারতীয় চিত্রকলার ধারা সূচিত হয় সেখানেও বৌদ্ধযুগের শিল্পকলা পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি ফেরানোর কথা আধুনিক চিত্রশিল্পী ও তাত্ত্বিকরা বলেছেন। ভারতবর্ষের বৌদ্ধ চিত্রশিল্পের ট্র্যাডিশন এখনও চলছে।

অস্বাক্ষরিত 'পুস্তক-পরিচয়' অংশে (*বঙ্গবাণী*, আশ্বিন, ১৩৩২) *Ashoka* গ্রন্থের (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রদত্ত কারমাইকেল বক্তৃতামালার লিখিত রূপ) সমালোচনায় বলা হয়েছে – 'পৃথিবীর ইতিহাসে মৌর্যরাজ অশোকের কীর্ত্তিকাহিনী অতি অপূর্ব্ব'। এ পর্যন্ত প্রকাশিত অশোক বিষয়কগ্রন্থগুলির মধ্যে এটি 'সর্বশ্রেষ্ঠ'। এটি প্রস্তর লিপিগুলির সুস্পষ্ট প্রমাণের সাহায্যে

লিখিত হওয়ার ‘বিশেষ গৌরব’ লাভ করেছিল। অশোক লিপি বহু পণ্ডিত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু ভাণ্ডারকরের ব্যাখ্যা ‘সংযত ও নিপুণ বিচারে প্রতিষ্ঠিত’। সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার গ্রন্থে ‘পুণ্যকীর্তি অশোক’ সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলা হয়েছে, ‘গ্রন্থকারের ধীরতা, পাণ্ডিত্য ও বিচারপটুতা’ অতি প্রশংসনীয়। অশোক চর্চার ক্ষেত্রে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ অতীব গুরুত্বময়। এই বছর জেমস্ প্রিন্সেপ দিল্লির তোপরা অশোক স্তম্ভ লিপিতে প্রথমবার সফলভাবে পাঠোদ্ধারে সক্ষম হন। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে *JASB*-এর ৬ সংখ্যক খণ্ডে এবং ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে *JASB*-এর ৭ সংখ্যক খণ্ডে অশোকলিপির অনুবাদ ও আলোচনা প্রকাশ করেন। পঞ্চাশের দশকের প্রথম পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন প্রিন্সেপ, বুর্ণুফ এবং উইলসন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে অশোকলিপির উপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আলেকজাণ্ডার কানিংহামের আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ *Corpus Inscription Indicarnum*-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। অশোক চর্চার শেষ পর্যায় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে হুলহিচ ‘*Corpus*’-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশের মধ্যমে সূচিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে অশোক চর্চায় এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়। অশোকচর্চায় সেনার্টের *Inscriptions de Piyadasei* (১৮৮১) এবং বুহ্‌লারের অশোকের আদেশনামার সংস্করণ যা 2DMG এবং *Epigraphia Indica*-তে প্রকাশিত হয়। ভাণ্ডারকর ব্যতীত অশোক চর্চায় ও. ফ্র্যাঙ্কে, ভিন্টসেন্ট স্মিথ, ফ্লিট, মিকেলসন, লুডেরস, এফ. ডব্লিউ টমাস, বেণীমাধব বড়ুয়া, কে. পি. জয়সওয়াল, এ. সি. উলমার, অমূল্যচন্দ্র সেন, প্রবোধচন্দ্র সেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[১২৪] *বঙ্গবাণী*-র *Asoka* গ্রন্থ সম্পর্কিত বক্তব্যে সারবত্তা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এটাই যে শেষ কথা এমনটি মেনে নেওয়ার যুক্তিযুক্ত নয়।

‘বঙ্গবাণীর নৈবেদ্য’ অংশটির পরিকল্পনা বিচিত্র বিদ্যার চর্চাকে গুরুত্বদান করেছে। ‘যীশুখৃষ্ট কি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন?’ অংশে (*বঙ্গবাণী*, চৈত্র, ১৩৩৩) চমকপ্রদ তথ্য পাই। তৎকালীন গবেষণার তাজা খবর এখানে উল্লিখিত হয়েছে। অন্যান্য কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এই সাময়িকপত্র নিউইয়র্কের একটি কাগজের মন্তব্য উদ্ধার করে লিখেছে যে বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক জর্জ নিকোলাস রোয়েরিচ (১৯০২ – ১৯৬০) মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কার-অভিযানকালে তিব্বতের একটি বুদ্ধমঠে, যিশুখ্রিস্টের বৌদ্ধধর্ম অনুশীলনের জন্য ভারতবর্ষে আসার প্রমাণ-সম্বলিত অনেক পাণ্ডুলিপি পেয়েছেন। যিশুখ্রিস্ট ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে ঊনত্রিশ বছর বয়সে জেরুজালেমে প্রত্যাবর্তন করেন। অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে বৌদ্ধধর্ম থেকেই খ্রিস্টধর্ম উদ্ভুত হয়েছিল। *বঙ্গবাণী*-এর রোয়েরিচের গবেষণার প্রতি যে আস্থা ছিল তা

বোঝা যায় এই বক্তব্যে – 'অধ্যাপক রোয়েরিচ কর্তৃক আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলি হইতে সম্ভবতঃ এই সিদ্ধান্ত নিঃশেষে প্রমাণিত হইবে।' 'পুস্তক-পরিচয়' অংশে (*বঙ্গবাণী*, ভাদ্র, ১৩৩৪) *বুদ্ধবাণী* গ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে –

> বুদ্ধবাণী (বুদ্ধদেবের উপদেশ সংগ্রহ) – শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী। সিদ্ধেশ্বর প্রেস, কলিকাতা, পৃ: ৩৫ মূল্য ১০ আনা। অনুক্রমণিকায় বুদ্ধদেবের জীবনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। পরিশিষ্টে প্রধান চারটি বৌদ্ধতীর্থের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সার ও মূল ভিত্তি হইতেছে বুদ্ধদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃত বাণী। গ্রন্থকার সেই উপদেশ-বাণীর কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। ভাষা ও ভঙ্গী বেশ সরল ও সহজ। "গৃহধর্ম্ম" নামক পরম উপদেয় অধ্যায়টি মনীষী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বাংলায় অনুবাদচর্চার ক্ষেত্রে ও বার্মায় রেঙ্গুণ বৌদ্ধ মিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সমসাময়িক কাজ রূপে *বুদ্ধবাণী* গ্রন্থটির ভূমিকা প্রশংসনীয়।

উপসংহার

ভারতের সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বৌদ্ধধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যের সঙ্গে ভারতের পরিচিতি আড়াই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে আজও অব্যাহত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত মৌখিক আলোচনায় আমায় বলেছেন যে কেবল আঞ্চলিক নয়, প্রদেশকে ছাড়িয়ে সর্বভারতীয় অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৌদ্ধদর্শন ও সাহিত্য পথিকৃতের মর্যাদার অধিকারী। বহির্ভারতের সঙ্গে ভারতের সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্যে যোগসূত্রের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। বৌদ্ধপদ বা গান, নাটক এবং কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রেও বৌদ্ধসাহিত্যের অসামান্য অবদান রয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের আদিকাব্য বা গানের সূচনা চর্যাগানের মধ্যে দিয়ে ঘটেছে। বৌদ্ধধর্মের গণ্ডী পেরিয়ে চর্যাগান বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। দোহার সঙ্গেও বাংলার ও বাঙালির যোগসূত্র স্বীকৃত হয়েছে। চর্যাগানের উপর বাংলার ন্যায়সঙ্গত অধিকারের ইতিহাসও আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের কবিতা, নাটক ও কথাসাহিত্যের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বৌদ্ধপ্রসঙ্গ এসেছে, সেই ধারা আজও অব্যাহত। সাময়িকপত্রে বৌদ্ধ-বিষয়ক অজস্র কবিতা ও কাব্য প্রকাশিত

হয়েছে। অন্যান্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হাতে তার সিদ্ধি যে কী লাবণ্যমণ্ডিত হতে পারে তাও আলোচিত হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *কাঞ্চনমালা*-য় বঙ্কিমি আদর্শ ক্রিয়াশীল। আদর্শ দাম্পত্যচরিত্র অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা রয়েছে কুণাল আর কাঞ্চনমালার দাম্পত্যের মধ্যে। এই অনুসন্ধান গার্হস্থ্য জীবন ছাড়িয়েও সন্ন্যাস জীবনের মধ্যেও প্রসারিত হওয়ায় তা আরও গভীরতা পেয়েছে। কুণাল আর কাঞ্চনমালা একে অপরকে পরম নির্ভরতায় সর্বক্ষণই অবলম্বন করেছেন, সে রূপময় ও বৈভবের জীবনই হোক বা রূপহীন বীভৎস উঞ্ছবৃত্তিলাঞ্ছিত দুর্ভাগ্যপীড়িত জীবনই হোক না কেন। সার্বিক অর্থেই হরপ্রসাদ *বেনের মেয়ে* উপন্যাসে নতুন পথের অনুসন্ধান করেছেন – ভাষা, বিষয়, ভাবনা, অভিপ্রায় সকল অর্থেই এটি স্বাতন্ত্রমণ্ডিত। আমাদের আলোচ্য গল্প-আখ্যানগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ কথাসাহিত্যের ক্ষেত্র যে কতটা সম্ভাবনাপূর্ণ তা সাম্প্রতিক কালের কথাসাহিত্য রচনার দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়। এইক্ষেত্রে এপার বাংলার থেকে ওপার বাংলার ভূমিকা অনেক গুরুত্বময়। ইহমুখীন বৌদ্ধসাহিত্য আধুনিক মানুষের অতি সাম্প্রতিক সংবেদনের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হওয়ায় তা আধুনিক মানুষের জীবন জটিলতার নানা বিষয়ের সন্ধান বা উত্তরণের নির্দেশকও হতে পারে। তাই মানবকেন্দ্রিক বৌদ্ধসাহিত্য ভাবনা অত্যন্ত সম্ভাবনাময় আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্র রূপে বিবেচিত হতে পারে।

টীকা ও উৎস নির্দেশ

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূলচন্দ্র। (১৯৬৬)। *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়। পৃ. ৯৬ – ৯৭

২। প্রাগুক্ত। পৃ. ৯৭ – ৯৮

৩। চৌধুরী, বিনয়েন্দ্রনাথ। (সম্পাদিত)। (১৯৯৫)। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ সাহিত্য*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। মুখবন্ধ। পৃষ্ঠাঙ্কবিহীন।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূলচন্দ্র। (১৯৬৬)। *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়। পৃ. ৯৮

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। (২০১১ – ২০১২)। *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। কলকাতা: মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৪

৬। প্রাগুক্ত। পৃ. ৫ – ৬

৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ৬

৮। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (সম্পাদিত)। (২০১৫)। সরকার, পবিত্র। ভূমিকা। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পৃ. ৯

৯। মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন। (সম্পাদিত)। (২০১২ – ২০১৩)। অস্বাক্ষরিত। 'বিজয়চন্দ্র মজুমদারের পাঁচটি প্রবন্ধ'। *বিষয়: চর্যাপদ*। কলকাতা: *দশদিশি*। পৃ. ৪১

১০। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (সম্পাদিত)। (২০১৫)। ভূমিকা। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পৃ. [১৭]

১১। প্রাগুক্ত। সরকার, পবিত্র। ভূমিকা। পৃ. ১২ এবং শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। ভূমিকা। [১৭]

১২। প্রাগুক্ত। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। ভূমিকা। পৃ. [২৬ – ২৭] এবং চট্টোপাধ্যায়, অলকা। (২০১০)। *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী*। কলকাতা: অনুস্টুপ। পৃ. ১২৩ ১২৭

১৩। প্রাগুক্ত। পৃ. [২৪ – ২৫] এবং প্রাগুক্ত। পৃ. ৮৭ – ৮৮

১৪। প্রাগুক্ত। পৃ. [২১ – ২২] এবং প্রাগুক্ত। পৃ. ১৫২ – ১৫৩

১৫। প্রাগুক্ত। পৃ. [৩২] এবং প্রাগুক্ত। ৮৯ – ৯৪

১৬। প্রাগুক্ত। পৃ. [২৮]

১৭। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* সংকলনের ৪ সংখ্যক পদটি গুণ্ডরীপাদের। কবি পরিচিতিতে হরপ্রসাদ তাঁকে ধামপাদ বা ধর্ম্মপাদের সঙ্গে অভিন্ন বলেছেন। প্রাগুক্ত। পৃ. [২৫]

১৮। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (সম্পাদিত)। (২০১৫)। ভূমিকা। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পৃ. [২৯]

১৯। প্রাগুক্ত। পৃ. [২৩ – ২৪] এবং চট্টোপাধ্যায়, অলকা। (২০১০)। *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী*। কলকাতা: অনুস্টুপ। ১৬১ – ১৬৫

২০। প্রাগুক্ত। পৃ. [২৭] এবং প্রাগুক্ত। ১৪৫ – ১৪৮

২১। প্রাগুক্ত। পৃ. [৩১] এবং প্রাগুক্ত। ৯৪ – ৯৬

২২। প্রাগুক্ত। পৃ. [২৮ – ২৯] এবং প্রাগুক্ত। ১১০ – ১১৩

২৩। প্রাগুক্ত। পৃ. [২৬] এবং প্রাগুক্ত। ১৫৬ – ১৫৭

২৪। প্রাগুক্ত। পৃ. [৩১ – ৩২] এবং প্রাগুক্ত। ১০৯ – ১১০

২৫। প্রাগুক্ত। পৃ. [২৯] এবং প্রাগুক্ত। ৯৬ – ৯৯

২৬। প্রাগুক্ত। পৃ. [৩০]

২৭। প্রাগুক্ত। পৃ. [২৬]

২৮। প্রাগুক্ত। পৃ. [৩০] এবং চট্টোপাধ্যায়, অলকা। (২০১০)। *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী*। কলকাতা: অনুস্টুপ। ২১৪ – ২১৬

২৯। প্রাগুক্ত। পৃ. [৩১] এবং প্রাগুক্ত। ১৩৭ – ১৩৮

৩০। প্রাগুক্ত। পৃ. [৩১]

৩১। প্রাগুক্ত। পৃ. [২৭] এবং চট্টোপাধ্যায়, অলকা। (২০১০)। *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী*। কলকাতা: অনুস্টুপ। ১৪৩ – ১৪৫

৩২। প্রাগুক্ত। পৃ. [৩০] এবং প্রাগুক্ত। ১৮৮ – ১৮৯

৩৩। প্রাগুক্ত। পৃ. [৬]

৩৪। প্রাগুক্ত। পৃ. [১২]

৩৫। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (সম্পাদিত)। (২০১৫)। ভট্টাচার্য, তারাপ্রসন্ন। পাঠসংস্কার ও ব্যাখ্যা। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পৃ. ৩৬

৩৬। দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। (২০০৪)। *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। পৃ. ৯৬

৩৭। সেন, সুকুমার। (২০০২)। *চর্যাগীতি পদাবলী।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১৫০

৩৮। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৫০

৩৯। চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার। (২০০৪)। *চর্যাগীতির ভূমিকা*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরি। পৃ. ২৪৫

৪০। দাশ, নির্মল। (২০১০)। *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ২২২

৪১। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (সম্পাদিত)। (২০১৫)। ভট্টাচার্য, তারাপ্রসন্ন। পাঠসংস্কার ও ব্যাখ্যা। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পৃ. ২১, ৩৬

৪২। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (সম্পাদিত)। (২০১৫)। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পৃ. ৫ – ৭, ৩৫ – ৩৬

৪৩। প্রাগুক্ত। ভট্টাচার্য, তারাপ্রসন্ন। পাঠসংস্কার ও ব্যাখ্যা। পৃ. ৩২ – ৩৩

৪৪। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৪ – ১৫

৪৫। শান্তিদেবের ১৫ ও ২৬ সংখ্যক পদ। প্রাগুক্ত। দ্রষ্টব্য: পৃ. ১৩, ১৯ – ২০

৪৬। ভুসুকুপাদের ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪০, ৪৯ সংখ্যক পদ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৬ – ৭, ১৭ – ১৮, ১৯, ২২ – ২৩, ৩২, ৩৫ – ৩৬

৪৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ২২

৪৮। ক) লুইপাদকে তেঙ্গুরে বাঙালি বলা হয়েছে। রাঢ়ীয় বাঙালি। তিনি আদি সিদ্ধাচার্য। সংস্কৃতে তাঁর চারটি পুথি – *বজ্রসত্ত্বসাধন, বুদ্ধোদয়, শ্রীভগবদভিসময়, অভিসময়বিভঙ্গ*। তাঁর একটি 'নিশ্চয় বাঙ্গালা' পুথি – *তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষগীতিকা দৃষ্টি*। *লুহিপাদগীতিকা* তাঁর একটি বাংলা সংকীর্তনের পদাবলী। এর দুটি পদ পাওয়া গেছে। দ্রষ্টব্য: শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (সম্পাদিত)। (২০১৫)। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পৃ. [২১]

খ) তিব্বতি সূত্র থেকে প্রাপ্ত চুরাশিজন সিদ্ধদের তালিকা পাওয়া যায়। সেখানে শুরুতেই লুইয়ের নাম। তাঁর জাতি ও বৃত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে – রাজপুত্র; মাছের অন্ত্র খেতেন, তাই এই নাম। তাঁর গুরু বা দীক্ষাদাত্রী শুঁড়িনী লোকডাকিনী। দেশ বা বাসস্থান সালিপুত্র। দ্রষ্টব্য: চট্টোপাধ্যায়, অলকা। (২০১০)। *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী*। কলকাতা: অনুস্টুপ। পৃ. [৩১]। আরো বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত। পৃ. ৮৭ – ৮৮

৪৯। ৩৪ সংখ্যক গানের টীকা। দ্রষ্টব্য: শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (সম্পাদিত)। (২০১৫)। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পৃ. ৫৩ – ৫৪

৫০। চট্টোপাধ্যায়, অলকা। (২০১০)। *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী*। কলকাতা: অনুস্টুপ। পৃ. ১৬৫ – ১৬৬

৫১। প্রাগুক্ত। পৃ. ২২২ – ২২৪

৫২। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (সম্পাদিত)। (২০১৫)। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পৃ. [২৫]

৫৩। চট্টোপাধ্যায়, অলকা। (২০১০)। *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী*। কলকাতা: অনুস্টুপ। পৃ. ১৭১

৫৪। ৩৬ সংখ্যক গানের টীকা। দ্রষ্টব্য: শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (সম্পাদিত)। (২০১৫)। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পৃ. ৫৫ – ৫৬

৫৫। ধামপাদ বা ধর্ম্মপাদ সম্পর্কে হরপ্রসাদ বাঙালিত্বের জোরালো দাবি করে লিখেছেন – এঁর অন্য নাম গুণ্ডরীপাদ। মূল গানে ধামপাদ থাকলেও পুথিতে তাঁর গানের মাথায় তাঁকে গুণ্ডরীপাদ বলা হয়েছে। তাঁর দুটি গানের মধ্যে বিরানব্বইটি শব্দ রয়েছে। তাঁর মধ্যে একুশটি সংস্কৃত, এর মধ্যে একমাত্র 'মণিকুল' বৌদ্ধ শব্দ। আর বাকিগুলি বাংলায় চলিত রয়েছে। সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন চৌদ্দটি শব্দ রয়েছে। সে সকল শব্দ কেবল একটু বানানের পরিবর্তন ছাড়া বাঙালির বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। যেমন – ধুম = ধূম, ণবগুণ = নবগুণ, মুহ = মুখ, বাহ্ম = ব্রাহ্ম, সুজ = সূর্য ইত্যাদি। চুয়াল্লিশটি পুরানো বাংলা কথা রয়েছে, তার মধ্যে 'কুন্দুরে' একটি বৌদ্ধ শব্দ, বাকিগুলি পুরানো বাংলায় পাওয়া যায়। তেরটি চলিত বাংলা, সবগুলিই কথাবার্তায় চলে। ধর্ম্মপাদের বাংলা গ্রন্থের নাম *সুগতদৃষ্টিগীতিকা*। দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত। পৃ. [২৫]

আরো তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: চট্টোপাধ্যায়, অলকা। (২০১০)। *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী*। কলকাতা: অনুস্টুপ। পৃ. ১৭৩ – ১৭৪, ২৪৫

৫৬। কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নুপাদের বংশধরেরা অনেকেই বাংলায় গান ও দোহা লিখেছেন। এঁদের মধ্যে সরহ, ধর্ম্মপাদ, ধেতন ও মহীপাদের বাংলা গান পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত। পৃ. [২৫]

৫৭। কৃষ্ণবজ্রপাদ ১৮ সংখ্যক গানে লিখেছেন –

কেহে কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।

বিদুজণ লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলঈ।।

দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত। পৃ.৩২। তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এই অংশের অনুবাদে লিখেছেন – (স্বরূপে অনভিজ্ঞ) কেউ কেউ (তোমাকে না জানার জন্য কর্মবশতা প্রাপ্ত হয়ে সংসার দুঃখানুভববশতঃ) তোমাকে বিরূপ (বিরুদ্ধ কথা) বলে। দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত। ভট্টাচার্য, তারাপ্রসন্ন। পাঠসংস্কার ও ব্যাখ্যা। পৃ. ১৫

৫৮। লুইপাদের ১ ও ২৯ সংখ্যক গানের জন্য দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত। পৃ. ১ ও ৪৫

৫৯। ১২ সংখ্যক গানের জন্য দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত। পৃ. ২২

৬০। Chatterji, Suniti Kumar, (1975). *The Origin and Development of the Bengali Language*. Calcutta: Rupa & Co. p. 105

৬১। Ibid. p. 112

৬২। দাক্ষী, অলিভা। (২০১১)। *চর্যা-গীতি ভাষা ও শব্দকোষ*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। পৃ. ৯১

৬৩। সেন, সুকুমার। (২০০২)। *চর্যাগীতি পদাবলী।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৪২ – ৪৩

৬৪। সেন, সুকুমার। (২০০৪)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৫৫

৬৫। প্রাগুক্ত। পৃ. ৫৫

৬৬। শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ। (১৯৯৮)। বাঙলা সাহিত্যের কথা। প্রথম খণ্ড। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স। পৃ. ৯

৬৭। মজুমদার, পরেশচন্দ্র। (১৯৯২)। *বাঙলা ভাষা পরিক্রমা*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ২৩

৬৮। দাশ, নির্মল। (২০১০)। *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৩১

৬৯। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৩

৭০। দাক্ষী, অলিভা। (২০১১)। *চর্যা-গীতি ভাষা ও শব্দকোষ*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। পৃ. ১০০

৭১। মহাস্থবির, ধর্মাধার। (অনূদিত)। (১৯৫৪)। কোধবগ্গো। *ধম্মপদ*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার। পৃ. ৮১

৭২। প্রাগুক্ত। চিত্তবগ্গো। পৃ. ১৫

৭৩। চক্রবর্ত্তী, শ্যামাপদ। (২০০৪)। *অলঙ্কার-চন্দ্রিকা*। কলকাতা: কৃতাঞ্জলি প্রকাশনী। পৃ. ১৩৬ – ১৩৭

৭৪। মহাস্থবির, ধর্মাধার। (অনূদিত)। (১৯৫৪)। ব্রাহ্মণবগ্গো। *ধম্মপদ*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার। পৃ. ১৩৭

৭৫। চক্রবর্ত্তী, শ্যামাপদ। (২০০৪)। *অলঙ্কার-চন্দ্রিকা*। কলকাতা: কৃতাঞ্জলি প্রকাশনী। পৃ. ৬২

৭৬। মহাস্থবির, ধর্মাধার। (অনূদিত)। (১৯৫৪)। শব্দার্থ কোষ। *ধম্মপদ*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার। পৃ. ১৬৯

৭৭। চক্রবর্ত্তী, শ্যামাপদ। (২০০৪)। *অলঙ্কার-চন্দ্রিকা*। কলকাতা: কৃতাঞ্জলি প্রকাশনী। পৃ. ৪১

৭৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০১২)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পৃ. ৫৯০, ৫৯৮

৭৯। দাস বাহাদুর, রায় শরচ্চন্দ্র। (অনূদিত)। (২০০০)। ক্ষেমেন্দ্র, মহাকবি। *বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ৫৩৫

৮০। প্রাগুক্ত। পৃ. ৫৪৩ – ৫৪৪

৮১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০১২)। প্রবেশক কবিতা। *কথা*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পৃ. ৯৯

৮২। *অবদানশতক*-এর কাহিনির সংক্ষিপ্তসার রূপটি রবীন্দ্র অনুসৃত *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* থেকে উদ্ধৃত হল –

> Anāthapuindka obtained permission from the king to solicit alms for the Lord, for the benefit of the whole population of the city. On an elephant role the patriarch, receiving metallic vessels, bracelets and other ornaments as alms from his neighbors. A poor women, who had an only cloth, threw it over the elephant from behind a hedge. The beggar knew instantly what the matter was, and bestowed on her rich presents. She went to the Lord and received the knowledge of truth from him.

Cf. Mitra, Rajendralālā. (1971). 'Avadāna Sataka'. *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*. Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar. p. 33

৮৩। অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধের একজন প্রধান তিষ্য। *থেরগাথা* অনুযায়ী, ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহের সামনে যেতবনে বাস করার সময় শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও স্রোতাপত্তি ফলপ্রাপ্ত হন। দ্রষ্টব্য: স্থবির। (অনুবাদক)। (১৯৩৫)। *থেরগাথা*। রেঙ্গুন: রেঙ্গুন বৌদ্ধ-মিশন প্রেস। পৃ. ৩

৮৪। ভট্টাচার্য, বেলা। (২০০৪ – ২০০৫)। *বৌদ্ধকোষ*। পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: পালিবিভাগ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৬৬০।

৮৫। মুখোপাধ্যায়, সুজিতকুমার। (অনূদিত)। (১৯৪৭)। *শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ২৫

৮৬। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদিত)। (২০১৩)। *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ৩৯৪

৮৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০০৩)। 'আদেশ'। *শান্তিনিকেতন*। রবীন্দ্র-রচনাবলী। সপ্তম খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ৬৪৩

৮৮। প্রাগুক্ত। 'ভূমা'। পৃ. ৬৫৩

৮৯। শীলভদ্র, ভিক্ষু। (অনূদিত)। (২০১২)। পাটিকবগ্‌গ। *দীঘনিকায়*। তৃতীয় খণ্ড। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ – ৬। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ৪৩০

৯০। Jecobs, Josaphat. (Edited and Induced). (1895). Introduction. *Barlaam and Josaphat*. London: David Nutt, in the Strand. p.

৯১। ঘোষ, ঈশানচন্দ্র। (অনূদিত)। (২০০১)। মহাজনক জাতক। শ্যামজাতক। খণ্ডহালজাতক। *জাতক*। ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ১৭ – ৪০, ৪১ – ৫৬, ৭৪ – ৯১

৯২। ভট্টাচার্য, বেলা। (সম্পাদিত)। (২০০৩ – ২০০৪)। *বৌদ্ধকোষ*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৫৯৯

৯৩। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (১৯৯১)। চৌধুরী, সত্যজিৎ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন। ভট্টাচার্য, সুমিত্রা। (সম্পাদিত)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ১৫ – ১৮

৯৪। চৌধুরী, সত্যজিৎ। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। (সম্পাদিত)। (১৯৭৮)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ*। কলকাতা: সান্যাল প্রকাশনী। পৃ. ১৮১

৯৫। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (১৯৯১)। চৌধুরী, সত্যজিৎ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন। ভট্টাচার্য, সুমিত্রা। (সম্পাদিত)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ৫৮৭ – ৫৮৮

৯৬। মৌর্যসম্রাট অশোক ২৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণকাল সম্ভবত ২৬১ – ২৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। ২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি লোকান্তরিত হন। দ্রষ্টব্য: Smith, Vincent. (2013). Hunter. W. W. A. (Edited). *Asoka The Buddhist Emperor of India*. New Delhi: Low Price Publications. p. 73, 78, 74

৯৭। দাশ, আশা। (১৯৬৯)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। পৃ. ৪৩৩- ৪৩৪

৯৮। দাস বাহাদুর, রায় শরচ্চন্দ্র। (অনূদিত)। (২০০০)। ক্ষেমেন্দ্র, মহাকবি। *বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ৫৪৩ – ৫৪৪

৯৯। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (১৯৮৯), চৌধুরী, সত্যজিৎ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন। ভট্টাচার্য, সুমিত্রা। (সম্পাদিত)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ১৫২ – ১৭৩, ১৫৫

১০০। ভট্টাচার্য, বেলা। (সম্পাদিত)। (২০০৭)। চন্দ, কবিতা। হরপ্রসাদ নির্মিত বাঙালিজীবন। *হরপ্রসাদ স্মরণে*। কলকাতা: পালি বিভাগ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ১০৬

১০১। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (১৯৯১), চৌধুরী, সত্যজিৎ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন। ভট্টাচার্য, সুমিত্রা। (সম্পাদিত)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ৫৮৫

১০২। বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, মানবেন্দু। (সম্পাদিত ও অনূদিত)। (২০০৩)। মহর্ষি-বাৎস্যায়ন প্রণীতং *কামসূত্রম্*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। পৃ. ৫৪

১০৩। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (১৯৯১), চৌধুরী, সত্যজিৎ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন। ভট্টাচার্য, সুমিত্রা। (সম্পাদিত)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ৫৯২

১০৪। দ্রষ্টব্য: বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। (১৯৯৬)। বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা। মিত্র, গজেন্দ্রকুমার। (সম্পাদিত)। বিভূতি-রচনাবলী। পঞ্চম খণ্ড। *দেবযান*। (১৯৪৪)। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড।

১০৫। হাজরা, কানাইলাল। দাশ, আশা। (সম্পাদিত)। (১৯৮৫ – ১৯৮৬)। *বৌদ্ধকোষ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৮৩ – ৮৪

১০৬। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (১৯৯১)। চৌধুরী, সত্যজিৎ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন। ভট্টাচার্য, সুমিত্রা। (সম্পাদিত)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ৫৯০

১০৭। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (১৯৯১)। চৌধুরী, সত্যজিৎ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন। ভট্টাচার্য, সুমিত্রা। (সম্পাদিত)। *বেনের মেয়ে*। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ১৯৮

১০৮। চৌধুরী, সত্যজিৎ। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। (সম্পাদিত)। (১৯৭৮)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ*। কলকাতা: সান্যাল প্রকাশনী। পৃ. ২৪১ – ২৪২

১০৯। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (১৯৯১)। চৌধুরী, সত্যজিৎ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন। ভট্টাচার্য, সুমিত্রা। (সম্পাদিত)। *বেনের মেয়ে*। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ৩৯১ – ৩৯২

১১০। সেন, দীনেশচন্দ্র। (২০০৬)। ভূমিকা। প্রথম খণ্ড। *বৃহৎ-বঙ্গ*। দে'জ পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১।৵০, ১।৶০

১১১। রায়, নীহাররঞ্জন। (২০০৫)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস*। আদিপর্ব। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. পৃ. ১৫৫ – ১৫৭, ১৫৯

১১২। সেন, দীনেশচন্দ্র। (২০০৬)। ভূমিকা। *বৃহৎ-বঙ্গ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ১৶০,

১।০

১১৩। ভট্টাচার্য, বেলা। (সম্পাদিত)। (২০০৭)। চন্দ, কবিতা। হরপ্রসাদ নির্মিত বাঙালিজীবন। *হরপ্রসাদ স্মরণে*। কলকাতা: পালি বিভাগ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ১১০

১১৪। দত্ত, বিজিতকুমার। (২০১২). *বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ২২৬

১১৫। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (১৯৯১)। চৌধুরী, সত্যজিৎ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন। ভট্টাচার্য, সুমিত্রা। (সম্পাদিত)। *বেনের মেয়ে*। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ৩৯২ – ৩৯৩

১১৬। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (১৯৪৬)। *প্রাচীন বাংলার গৌরব*। কলকাতা: বিশ্বভারতী। পৃ. ৪৪

১১৭। বজ্রদত্ত ছয়টি ভাষায় কবিতা রচনা করতে পারতেন। তাঁর *লোকেশ্বর-শতক* বৌদ্ধদের কাছে সমাদৃত গ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থে অবলোকিতেশ্বরের বন্দনা-স্তোত্র রয়েছে। তিনি নবম শতাব্দীর কবি, রাজা দেবপালের (আনুমানিক ৮১০ – ৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) সমসাময়িক। তিনি *বেনের মেয়ে*-এর কালসীমার অনেক আগের মানুষ। দ্রষ্টব্য: শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (১৯৯১)। চৌধুরী,

সত্যজিৎ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন। ভট্টাচার্য, সুমিত্রা। (সম্পাদিত)। *বেনের মেয়ে*। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ৪০১

১১৮। আচার্য শান্তিদেবের রচিত *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের টীকাকার প্রজ্ঞাকরমতি আমাদের আলোচ্য সময়ে নালন্দায় বাস করতেন। প্রজ্ঞাকরমতি বিক্রমশীল বিহারের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সম্ভবত একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন। দ্রষ্টব্য: পূর্বোক্ত। পৃ. ৪০১

১১৯। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মহাযোগপীঠ উড্ডীয়ানের রাজা ইন্দ্রভূতি এবং তাঁর মেয়ে (মতান্তরে বোন) লক্ষ্মীঙ্করা। তাঁরা সম্ভবত অষ্টম (বিনয়তোষ ভট্টাচার্য) মতান্তরে নবম (M. J. Shendge) শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। *তেঙ্গুর* তালিকায় ইন্দ্রভূতির লেখা *সিদ্ধবজ্রযোগিনীসাধন, জ্ঞানসিদ্ধিনামসাধনোপায়িকা, সহজসিদ্ধি* প্রভৃতি তেইশটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দ্রভূতি এবং লক্ষ্মীঙ্করা বজ্রযোগিনীসাধনের প্রবর্তক। বজ্রযান সাধনার ধারায় লক্ষ্মীঙ্করার *অদ্বয়সিদ্ধি* গুরুত্বপূর্ণ। দ্রষ্টব্য: পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৯৯

১২০। চুরাশি সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম বিক্রমশীল মহাবিহারের পূর্বদ্বারপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অন্যতম গুরু রত্নাকর শান্তি। *তেঙ্গুর* তালিকা অনুযায়ী *হেবজ্রপঞ্জিকা, সুখদুঃখদ্বয়পরিত্যাগদৃষ্টি, বজ্রতারাসাধন* প্রভৃতি আঠারোটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত। হরপ্রসাদের অনুমান করেছেন, ১৫ ও ২৬ সংখ্যক চর্যাগান রচয়িতা কবি শান্তিপাদ এবং রত্নাকর শান্তি একই ব্যক্তি। দ্রষ্টব্য: পূর্বোক্ত। পৃ. ৪০২

১২১। চুরাশি সিদ্ধাচার্যের অন্যতম তন্ত্রাচার্য নাড় বা নাড়পাদের জন্ম বরেন্দ্রভূমিতে। তিনি বিখ্যাত বৈয়ায়িক জেতারির ছাত্র। তিনি রাজা নয়পালের (আনুমানিক ১০৩৮ – ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দ) সমসাময়িক। বিক্রমশীল মহাবিহারের উত্তরদ্বার পণ্ডিত নাড় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অন্যতম আচার্য। তিনি হেরুক ও হেবজ্র প্রভৃতি যুগনদ্ধমূর্তির উপাসক ছিলেন। তাঁর প্রভাব ভারতবর্ষ ও তিব্বতে প্রসারিত ছিল। তাঁর তিনটি পদাবলীর মধ্যে দুটির নাম *বজ্রগীতিকা* এবং *নাড়পণ্ডিতগীতিকা*। দ্রষ্টব্য: পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৯৩

১২২। নাড়ের স্ত্রী নিগু। *তেঙ্গুর* তালিকায় জ্ঞান-ডাকিনী নিগু বা নিগু-মায়ের *উপায়মার্গচণ্ডালিকাভাবনা, চক্রসম্বরমণ্ডলবিধি, প্রণিধানরাজ, মহামারজ্ঞান* প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে। দ্রষ্টব্য: পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৯৩ –৩৯৪

১২৩। দত্ত, বিজিতকুমার। (২০১২)। *বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ২২৭

১২৪। সেন, অমূল্যচন্দ্র। (২০১৬)। সুমনপাল ভিক্ষু। (সম্পাদক)। পুনর্মুদ্রণের ভূমিকা। *অশোকলিপি*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ. ১৪ – ১৬। অশোকের লিপিচর্চায় কৃতবিদ্য অমূল্যচন্দ্র সেন 'সম্রাট অশোকের শিলালিপি' (*পরিচয়,* চৈত্র, ১৩৪৬*;* বৈশাখ, ১৩৪৭*;* জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭*;* পৌষ, ১৩৪৭*;* ফাল্গুন, ১৩৪৭*;* চৈত্র, ১৩৪৭) গবেষণা প্রবন্ধমালায় ভারতের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। অশোকচর্চা বাঙালি পণ্ডিত বেণীমাধব বড়ুয়া, প্রবোধচন্দ্র সেন প্রমুখ পণ্ডিতের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

বুদ্ধচরিত সাহিত্য

ভূমিকা

বুদ্ধদেবের জীবনী একটি বিরাট চিত্রশালা, দিব্যদর্শন, বিপুল সাধনা; তার বিস্তারও মহাকাব্যিক। *ধম্মপদ*-এর 'বুদ্ধবগ্‌গো'-এর ৪ সংখ্যক শ্লোকে কথিত আছে –

কিচ্ছো মনুস্‌সপটিলাভো কিচ্ছং মচ্চানজীবিতং,

কিচ্ছং সদ্ধম্মসবনং কিচ্ছো বুদ্ধানং উপ্পাদো।

অর্থাৎ, মানবজন্মলাভ দুষ্কর, মানবজীবন বিপদসঙ্কুল। সদ্ধর্ম-শ্রবণ আয়াস সাধ্য, বুদ্ধদের আবির্ভাব সহজ নয়।[২]

বুদ্ধজীবনী *ললিতবিস্তর*-এর ষড়বিংশ অধ্যায় 'ধর্মচক্র প্রবর্তন পরিবর্ত'-এ রয়েছে – 'দুরবাপ্যং মানুষ্যং বুদ্ধোৎপাদঃ সুদুর্ল্লভঃ।' *বোধিচর্য্যাবতার*-এর প্রথম পরিচ্ছেদে বলছেন – 'মনুষ্যং দুর্লভং লোকে বুদ্ধোৎপাদ অতি দুর্লভঃ।' শান্তিদেব *বোধিচর্য্যাবতার*-এর নবম পরিচ্ছেদ 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র ১৫৯ সংখ্যক শ্লোকে লিখেছেন – 'বুদ্ধেৎপাদোহতিদুর্ল্লভঃ'। ভিক্ষু প্রজ্ঞাকরমতি এর টীকায় লিখেছেন – 'বুদ্ধানাং সমস্ত জগদালোককারিণাং সর্ব্বদুঃখনিদাজভূত ক্লেশশল্যাপহারিণামৎপাদঃ প্রাদুর্ভাবঃ অতিদুর্ল্লভঃ।' সমস্ত দুঃখের নিদানভূত ক্লেশশল্যের অপহারী, সমস্ত জগতের আলোককারী বুদ্ধদের প্রাদুর্ভাব অতি দুর্লভ। এই অতি দুর্লভ বস্তুর আলোচনায় দুঃখশল্য উৎপাটিত হয়ে পরম জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হয়, আমাদের কিছু না কিছু হবেই। *বোধিচর্য্যাবতার*-এর প্রথম পরিচ্ছেদ 'বোধিচিত্তানুসংশা'র ৩-সংখ্যক শ্লোকে লিখেছেন –

মম তাবদনেন যাতি বৃদ্ধিং কুশলং ভাবয়িতং প্রসাদবেগঃ।

আয় মৎসমধাতুরের পশ্যেদ্‌ অপরোহাপানমতোহপি সার্থকোহয়ং।।

অর্থাৎ, এর দ্বারা আমার কুশল ভাবনার হেতুভূত প্রসাদবেগ বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ নির্মলচিত্তের প্রবাহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। আর আমার সমধাতু অন্য কেউও এটি দেখবেন। অতএব, এটি সার্থক। এইরূপ কুশল চরিত্রের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনাও আমাদের পক্ষে প্রভূত কল্যাণপ্রদ।[৩]

ধর্মপদ-এর বুদ্ধবগ্‌গো-এর ১৭-১৮ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হয়েছে –

পূজারহে পূজয়তো বুদ্ধে যদি ব সাবকে,

পপঞ্চসমতিক্কন্তে তিণ্ণসোকপরিদ্দেবে।

তে তাদিযে পূজয়তো নিব্বুতে অকুতোভয়ে,

ন সক্কা পুঞ্ঞঞং সংখাতুং ইমেত্তম'পি কেনচি।

অর্থাৎ, যাঁরা (তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মানাদি) প্রপাতে অতিক্রমকারী, শোক পরিতাপোত্তীর্ণ, নির্বাণমুক্ত ও নির্ভয় হয়েছেন, তার মত পূজার্হ বুদ্ধদেব অথবা তাঁদের শ্রাবকদের যাঁরা পূজা করেন, কেউ তাঁদের পুণ্যের পরিমাণ করতে সমর্থ হন না।[৪]

তাই কি বুদ্ধচরিত রচনা বা আলোচনার প্রতি জনমানসের এত আগ্রহ?

বুদ্ধদেবের জীবনীতে 'নবরস' সমন্বিত কাব্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর জীবনী ও বাণীর আলোচনা ও অনুশীলন মঙ্গলজনক। মহামানব বুদ্ধের জীবনী মানুষের ভিতর দেবত্বের অমিয়বার্তা দান করে। তাঁর জীবনবেদে আমরা যে সনাতন গাথা, চিরন্তন কাহিনি পাই তা অভিনব, নিত্যনব। এই সব বাণী যে বিশ্বগুরুতে মূর্ত বিগ্রহ, ভাবতনুরূপে প্রকট হয়েছিল, তা যে কেবল 'The Light of Asia' নয়, তা যথার্থই 'জগজ্জ্যোতি'। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে *ললিতবিস্তর* গ্রন্থের ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র সরস মন্তব্য করেছেন –

> But great as was the success of this renowned teacher, the history of his life is involved in mysteries which the light of modern research has yet scarcely dispelled. India never had her Xenophon or Thucydides, and her heroes and reformers, like her other great men, have to look for immortality in the ballads of her bards, or the legends of romancers.[৫]

ভারতে বুদ্ধদেবের জীবনবেদ প্রধানত *দীঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায়, সংযুক্ত নিকায়, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, জাতকনিদানকথা, সুত্তনিপাত, মিলিন্দপঞ্হ, মহাবত্থু, ললিতবিস্তর,* অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত, মেত্তিপকরণ, সদ্ধম্মপুণ্ডরীক, প্রজ্ঞাপারমিতা, দিব্যাবদান, মালালঙ্কারবত্থু,* সিংহলী বুদ্ধদত্তের *জিনচরিত* প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। তাঁর সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক কথা ও কাহিনি *ত্রিপিটক*-এর 'বিনয়', 'সুত্ত' ও 'অভিধম্ম'-এর নানা খণ্ডেই লভ্য। প্রথমে সুত্ত বা সূত্রাকারে তাঁর কথা ও কাহিনি রচিত হয়। পরে তার কতগুলি সংগ্রহ করে 'সুত্তন্ত' প্রস্তুত হয়। *দীঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়* প্রভৃতি গ্রন্থের অনেক স্থানে বুদ্ধদেবের আত্মচরিত কথনের ধরণটি বিশেষভাবে দেখা যায়।

অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* আর সর্বাস্তিবাদীদের বুদ্ধচরিত *ললিতবিস্তর*-কে কেন্দ্র করেই বুদ্ধচরিত আলোচনা করার সাধারণ প্রবণতা বিলসিত হয়েছে। এই দুই মহাগ্রন্থের কাব্যসুষমা পরবর্তী বুদ্ধজীবনী সংকলকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। *ললিতবিস্তর*-কে নানা গ্রন্থকার নানা সময়ে নতুন রূপে সাজিয়েছেন।

এটি ঠিক কোন সময়ে পূর্ণরূপ ধারণ করে তা অজ্ঞাত। প্রচলিত মতবাদ অনুসারে এর প্রথম চৈনিক অনুবাদ খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ মতবাদ ভ্রান্ত। বরং নবম শতকের অনূদিত তিব্বতী *ললিতবিস্তর* যথেষ্ট প্রামাণ্য। জাভার বোরোবুদুরের ভাস্কর্যে (৮৫০ – ৯০০ খ্রিস্টাব্দ) *ললিতবিস্তর*-এর কাহিনি ফুটে উঠেছে। উত্তর ভারতের হেলেনীয় বৌদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভসমূহে বুদ্ধজীবনী সম্বলিত দৃশ্যাবলীর শিল্পীরা *ললিতবিস্তর*-এর কাহিনির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এমনও হতে পারে যে তাঁরা এই গ্রন্থ পাননি, প্রচলিত মৌখ বুদ্ধ-উপাখ্যানকেই তাঁরা অবলম্বন করেছেন। শিল্প-সাহিত্য এমন ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে যে কে কাকে প্রভাবিত করেছে তা নির্ণয় কষ্টসাধ্য। অশোকযুগের প্রতীকের ব্যবহার গান্ধার শিল্পে বুদ্ধের মূর্তিতে রূপ পায়। খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতক গান্ধার শিল্পের স্বর্ণযুগ, তা প্রাচীন মহাযান গ্রন্থাবলী রচনার সময়কাল। এই সময়কালের মধ্যে রচিত *ললিতবিস্তর*-এর প্রাচীন অংশের সঙ্গে পালি সাহিত্যের মিল রয়েছে, আর বাকিটুকু পরবর্তীকালের সংযোজন। উপাখ্যানের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধজীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী, তাঁর উপর দেবত্ব আরোপ, নানা আশ্চর্যজনক ঘটনা, নানাবিধ অলীক গল্প রয়েছে, তার থেকে সারোদ্ধার কষ্টসাধ্য। পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধচরিত না হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে সমস্ত উপকরণই রয়েছে যার ভিত্তিতে অশ্বঘোষ *বুদ্ধচরিত* রচনা করেন।[৮] যে সকল বৌদ্ধগ্রন্থে বুদ্ধচরিত বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে *ললিতবিস্তর*-এর প্রতি জীবনীকারদের ঝোঁক অধিক। সাহিত্যের ইতিহাস ও বুদ্ধজীবনী চর্চায় এই দুই গ্রন্থের শরণ ভিন্ন উপায়ন্তর থাকে না।

বুদ্ধচরিতের কয়েকটি বিশেষ অধ্যায়

বুদ্ধজীবনী বিষয়ক যা. কু. সি.-এর (পুরো নাম অজ্ঞাত) লেখা প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ‘শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত’ (*বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ*, ১২৬৪) প্রকাশিত হয়েছিল। বুদ্ধজীবনী নিয়ে অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ ‘বুদ্ধদেবের জীবন বৃত্তান্ত’ (*জ্ঞানাঙ্কুর*, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১), অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ ‘বুদ্ধদেব ও তদুদ্ভাবিত ধর্ম্ম-প্রণালী’ (*আর্য্যদর্শন*, আষাঢ়, ১২৮১) ও রামদাস সেনের ‘শাক্যসিংহের আবির্ভাব কাল’ (*আর্য্যদর্শন*, ভাদ্র – আশ্বিন, ১২৯২), জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীর প্রবন্ধ ‘গৌতমবুদ্ধ’ (*নারায়ণ*, চৈত্র, ১৩২৮) প্রকাশিত হয়েছিল। ‘গৌতমবুদ্ধ’ প্রবন্ধের শিরোটীকায় বলা হয়েছে –

> ভূপাল রাজ্যের অন্তঃপাতী সাঁচী শৈলবিহারের স্তূপ থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন লিপি ও মূর্তি প্রভৃতির আভাষ অবলম্বনে লিখিত।

রামদাস সেনের বুদ্ধবিষয়ক প্রবন্ধ ‘বৌদ্ধ ধর্ম্ম’ (*বঙ্গদর্শন*, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২), ‘শাক্যসিংহের জন্ম ও বাল্যজীবন’ (*নবজীবন*, চৈত্র, ১২৯২); ‘শাক্যসিংহের লিপিশিক্ষা’ (*নবজীবন*, শ্রাবণ ১২৯৩ – ৯৪); ‘*বুদ্ধচরিত*। ‘গোপার স্বপ্নদর্শন’ (*নবজীবন*, পৌষ, ১২৯৩); ‘শাক্যসিংহের শুদ্ধোদনের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া নিষ্ক্রমণ’ (*নবজীবন*, মাঘ, ১২৯৩); ‘বুদ্ধচরিত’ (*নবজীবন*, আষাঢ়, ১২৯৪) প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা এই প্রবন্ধনিচয়ের সাহায্যে বুদ্ধজীবন সম্পর্কে ঊনবিংশ-বিংশ শতকের সারস্বত সমাজের আগ্রহকে বুঝতে চেষ্টা করব।

ক) বোধিসত্ত্বের জন্মের স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা

‘শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত’-এ ঊনবিংশ শতকের প্রেক্ষিতে বুদ্ধজীবনীর আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে –

> প্রাচীন হিন্দুরা তাঁহার (বুদ্ধদেব) অসাধারণ ক্ষমতা দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; ফলতঃ তিনি যে সুপণ্ডিত ও মহাবুদ্ধিমান্ ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই; নচেৎ কোটি২ মনুষ্য তাঁহার মত গ্রহণ করিবে ইহা সম্ভবপর হয় না; সুতরাং উক্ত মহাজনের বিবরণ লিখনে অবকাশ প্রার্থনা করার আবশ্যক রাখে না; পাঠকবৃন্দ অবশ্যই ইহাতে তৃপ্ত হইবেন।

ললিতবিস্তর অনুযায়ী ‘শাক্যমুনির জীবন-চরিত’-এ লেখা হয়েছে – বোধিসত্ত্ব জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি বলে তুষিত স্বর্গলোকে বহুকাল বাস করেন। পরে কশ্যপ মুনি তাঁকে দেবতাদের শিক্ষকপদে নিযুক্ত করে স্বয়ং বুদ্ধ হওয়ার জন্য মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এইসময় পৃথিবীর ভক্তদের প্রার্থনায় বোধিসত্ত্ব ‘জম্বুদ্বীপ’-এ নির্বাণলাভের জন্য জন্মগ্রহণ করেন। তুষিতলোকে দেবতারা নানা আলোচনা করে ভাগীরথী তীরের প্রদেশকে বোধিসত্ত্বের জন্মস্থানরূপে মনোনীত করেন। উজ্জয়িনী, হস্তিনাপুর, মথুরা, প্রয়াগ, রাজগৃহ, কোশল, শ্রাবস্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজবংশীয়দের মধ্যে বোধিসত্ত্ব কপিলবস্তুর শুদ্ধোদনের রাজগৃহে ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা দেবতাদের জানান। তিনি তুষিত স্বর্গে মৈত্র (মৈত্রেয়) বোধিসত্ত্বকে দেবতাদের শিক্ষকপদে নিযুক্ত করে ষড়দন্ত গজের রূপ ধরে শুদ্ধোদনের রানি মায়াদেবীর গর্ভের দক্ষিণাংশে প্রবেশ করেন। বোধিসত্ত্বের করভরূপ স্বপ্নে জ্ঞাত হয়ে রানি রাজাকে জানান। স্বপ্নবিবরণের ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মণ ও গ্রহাচার্যরা জানান যে রানি একটি সম্রাট বা বুদ্ধ প্রসব করবেন।

‘গৌতমবুদ্ধ’ প্রবন্ধে বলা হয়েছে – নিদ্রিতাবস্থায় মায়াদেবী স্বপ্ন দেখলেন ভাবী বুদ্ধ এক শ্বেতহস্তীর কলেবর ধারণ করে স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হচ্ছেন। ‘বৌদ্ধ ধর্ম্ম’ প্রবন্ধ উল্লিখিত হয়েছে –

বোধিসত্ত্ব যে সময়ে তুষিত স্বর্গ পরিত্যাগ করে মায়াদেবীর দক্ষিণ কুক্ষিতে প্রবেশ করেন, সেই সময় মায়াদেবী নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন – তুষার বা রজতের ন্যায় শ্বেত বর্ণ, ছয়টি দন্তযুক্ত, মনোজ্ঞ, সুবক্ত শীর্ষদেশ, একটি গজ মনোহর গতিতে তাঁর উদরে প্রবেশ করেছে। এই অভূতপূর্ব সুখানুভূতির স্বপ্ন রাজা গণকদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা রাজচক্রবর্তী জন্মাবার কথা বলেন। দৈববাণীতে জানা যায়, বোধিসত্ত্ব তুষিত স্বর্গ ছেড়ে মায়াদেবীতে উপপন্ন হয়েছেন। মায়াদেবী পুত্র প্রসব করার পর আটপ্রকার নিমিত্ত ঘটেছিল। যেমন – তৃণ কাঁটার কাঠিন্য ছিল না, দংশ মশা প্রভৃতির দৌরাত্ম ছিল না, হিমালয় পর্বতের সমস্ত পাখিরা এসে শুদ্ধোদনের গৃহে রব করেছিল, তাঁর আগারে সব ফুল ফল একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর গৃহে আহার করলেও আহার্য দ্রব্য ক্ষয় পায় নি, তাঁর অন্তঃপুরের সকল বাদ্যযন্ত্র আপনা আপনিই বাদিত হয়েছিল ইত্যাদি। বোধিসত্ত্বের জন্মগ্রহণ বিষয়ে *ললিতবিস্তর* ও *মহাবস্তু অবদান*-এর 'দীপঙ্করের জন্ম' অধ্যায়ের মিল রয়েছে। *মহাবস্তু অবদান*-এ 'দীপঙ্করের জন্ম' অধ্যায়ে বুদ্ধ মহামৌগল্যায়নকে উদ্দেশ করে জন্মকালীন বোধিসত্ত্বের চারপ্রকার 'মহাবিলোকন'-এর (কাল, দেশ, দ্বীপ বা মহাদেশ ও কুলের বিলোকন) কথা বলেছেন।[৭]

ললিতবিস্তর-এর 'কুলশুদ্ধিপরিবর্ত্ত' অধ্যায় অনুযায়ী বোধিসত্ত্বের জন্মগ্রহণ প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করে কপিলবস্তু মহানগরীর শাক্যবংশকে স্থির করা হয়। বৈদিক পরম্পরায় পৃথিবী সপ্তদ্বীপা। কিন্তু এখানে চারটি দ্বীপের উল্লেখ রয়েছে – পূর্ববিদেহ, অপরগোদানীয়, উত্তরকুরু ও জম্বুদ্বীপ। যেহেতু এদের মধ্যে তিনটি সীমান্তস্থিত এবং সেখানকার লোকেরা মেষবৎ অযোগ্য, তাই মধ্যবর্তী জম্বুদ্বীপের ভারতবর্ষে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। তখন মতঙ্গ নামের প্রত্যেকবুদ্ধ[৮] এবং বারাণসীর ঋষিপত্তন থেকে পাঁচশ জন প্রত্যেকবুদ্ধ পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হলেন, কারণ বুদ্ধের জন্মের সময় অন্য কোনও বুদ্ধ বা প্রত্যেকবুদ্ধ সেই ভূমিতে থাকতে পারেন না। বৌদ্ধ আচারে ব্রাহ্মণ্য পরম্পরার মত বর্ণাশ্রম নেই। কিন্তু *ললিতবিস্তর*-এর 'কুলশুদ্ধি' অধ্যায়ে বিশেষ করে কুলশুদ্ধি বিচার করে বলা হয়েছে যে চণ্ডাল, বেণুকার, রথকার, পুক্কস প্রভৃতি হীনকুলে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন না। সময় বিশেষে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের প্রতিপত্তি অনুযায়ী তিনি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অনুমিত হয়, বর্ণাশ্রম প্রথা বুদ্ধের জন্মকালীন সময়ে প্রবলভাবে বর্তমান ছিল বলেই তার প্রভাবে এইরূপ কথিত হয়েছে।[৯]

'বৌদ্ধ ধর্ম্ম' প্রবন্ধে বলা হয়েছে – শাক্যসিংহ বুদ্ধ প্রকৃত ইক্ষাকু বংশীয়, তাঁর পূর্বপুরুষেরা গৌতমবংশীয় কপিলমুনির আশ্রমে গিয়ে লুকিয়ে শাকবৃক্ষে (শেগুন) বাস করেছিলেন, তার ফলে তিনি শাক্য ও গৌতম নামে প্রসিদ্ধ হন। সিদ্ধার্থের পিতা কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন, মাতা মায়াদেবী। আর্য অভিধান অনুযায়ী অতি ন্যায়বান রাজা শুদ্ধোদন পবিত্রান্ন ভোজন করতেন। *ললিত বিস্তর* অনুযায়ী সিদ্ধার্থ জম্বুদ্বীপের আঠারোটি স্থান ও কুল অন্বেষণের পর বসন্তকালে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে শাক্যকুলে মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় আটপ্রকার নিমিত্ত ঘটেছিল। মগধদেশের বৈদেহ, কোশল, বৎস, বৈশালী, উজ্জয়িনী, মথুরা, হস্তিনাপুর প্রভৃতি বংশ বোধিসত্ত্বের জন্মের অনুপযুক্ত। মিথিলার রাজবংশ উত্তম, কিন্তু রাজা সুমিত্র অতিবৃদ্ধ, সন্তান উৎপাদনে অসমর্থ ও অতিপ্রজ বলে পরিত্যক্ত। এইপ্রসঙ্গে জম্বুদ্বীপের ষোড়শ মহাজনপদের[১০] আলোচনা করা হয়েছে। শুদ্ধোদন বিশুদ্ধ গোত্রজাত সজ্জন ও ধার্মিক, শাক্যরাজবংশ শ্রেষ্ঠ, তাঁর প্রধানা মহিষী মহামায়া সর্বগুণসম্পন্না। তাঁরাই বোধিসত্ত্বের পিতামাতা হবার উপযুক্ত বলে স্থির হয়। কালবিলোকন অনুযায়ী বোধিসত্ত্ব সৃষ্টির প্রারম্ভে ও প্রাণিদের ধ্বংসের সময়ে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন না। যখন লোক সন্দেহরহিত ও সুস্থিত থাকে, তখন জন্মবিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান, জরাবিষয়ে স্পষ্ট বোধ, মরণবিষয়ে জ্ঞান হলে বোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন।[১১]

খ) সিদ্ধার্থের জন্মগ্রহণ

ললিতবিস্তর অনুসারে 'বৌদ্ধ ধর্ম্ম', 'বুদ্ধদেব ও তদুদ্ভাবিত ধর্ম্ম-প্রণালী' ও 'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত'-এ বোধিসত্ত্বের জন্মের পূর্ব বৃত্তান্ত স্থান পেয়েছে। 'গৌতমবুদ্ধ' প্রবন্ধটির সঙ্গে 'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত'-এর সাদৃশ্য রয়েছে। 'বুদ্ধদেবের জীবন বৃত্তান্ত' প্রবন্ধে সরাসরি সিদ্ধার্থের জন্ম থেকেই প্রবন্ধ সূচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে সিদ্ধার্থের পিতৃপরিচয় নেই। এই প্রবন্ধটি সুলিখিত হলেও তথ্যগত বিষয়ে কয়েকটি ক্ষেত্রে সমস্যাকর। উৎস গ্রন্থ সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু নির্দেশ না থাকায় তা আরও জটিলতার সৃষ্টি করেছে। যেমন – 'সিদ্ধার্থের মাতা মাধবী, শুপ্রবুদ্ধ নামা রাজার কন্যা'। সিদ্ধার্থের মা মহামায়া বা মায়া নামে প্রসিদ্ধ, মাধবী নাম প্রাবন্ধিক কোথা থেকে পেয়েছেন তা প্রবন্ধে উল্লিখিত হয় নি।

'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত' প্রবন্ধে কোনও সাল তারিখ না দিয়ে কেবল উল্লিখিত হয়েছে – 'অগ্রহায়ণ মাসে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়।' জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যান। মায়াদেবীর প্রসব বেদনা হলে তিনি

দাঁড়িয়ে এক বৃক্ষের শাখা অবলম্বন করে দক্ষিণ পাশ দিয়ে সিদ্ধার্থকে প্রসব করেন। রামদাস সেন *ললিতবিস্তর* ও *মহাবস্তু অবদান*-এর 'দীপঙ্কর বস্তু' অনুযায়ী 'শাক্যসিংহের জন্ম ও বাল্যজীবন' প্রবন্ধে সাল-তারিখের যথাযথ উল্লেখ না করে লেখেন –

শাক্যসিংহ পৌষ মাসের পুষ্যা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা তিথিতে লুম্বিনীবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কপিলবস্তু নগরের প্রান্তসীমায় লুম্বিনীবনে রানি মায়াদেবী গর্ভের দশম মাসের সূচনায় সিদ্ধার্থকে প্রসব করেন। জ্ঞান, স্মৃতি ও প্রজ্ঞাবান সিদ্ধার্থ গর্ভমলে লিপ্ত না হয়ে জননীর দক্ষিণ কুক্ষি থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। 'গৌতমবুদ্ধ' প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের স্বপ্ন ব্যাখ্যানুযায়ী রানি অন্তঃসত্ত্বা এবং গর্ভস্থ শিশু রাজচক্রবর্তী অর্থাৎ বুদ্ধ হবেন এই তথ্য পাওয়া যায়। গর্ভাবস্থায় চারজন দিকপাল বোধিসত্ত্ব মায়াদেবীকে সকল অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কপিলবস্তুর সমীপবর্তী লুম্বিনী উদ্যানে শালবৃক্ষের শাখা ধরে মায়াদেবী প্রসব করেন। চারজন দিকপাল জননী মায়াদেবীর দক্ষিণ দিক থেকে সন্তানকে ধরেছিলেন। 'শাক্যসিংহের আবির্ভাব কাল' প্রবন্ধে শাক্যসিংহের জন্মের সময়কাল নিয়ে সাম্ভাব্য সকল দিক থেকে বিচার করা হয়েছে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে বুদ্ধদেব খ্রিস্টজন্মের অন্যূন ৫০০ বছর পূর্বে জীবিত ছিলেন। কেউ কেউ ৫৪৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, কেউ কেউ ৫৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, কেউ কেউ ৬২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দকে সিদ্ধার্থের জন্মকাল বলে ধরেছেন। যদিও ইউরোপীয়দের এই নির্ণয়ের ভিত্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। বুদ্ধের জীবনবৃত্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে –

Its span of eighty years covers the greater part of the fifth century B.C., but the exact dates of his birth and death are uncertain.[১২]

টি. ডব্লু. রীস ডেভিডস্ বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতির কাল 'fifth century B.C.'-র কথা বলেছেন, সিদ্ধার্থের জীবনকালের ধারণা এখান থেকে পাওয়া যায়।[১৩] অঘোরনাথ গুপ্ত লিখেছেন, ৫৪৩ খ্রিস্টপূর্বে রাজগৃহে এক প্রকাণ্ড প্রথম বোধিসঙ্গম (Council) হয়।[১৪] বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সময়কাল ধরে পূর্বের আশিবছরের জীবন ধরলেই একটা হিসাব পাওয়া যায়। রামদাস সেন কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কল্‌হনের গ্রন্থের উল্লেখ করে লিখেছেন – কণিষ্কের সময় কাশ্মীর বৌদ্ধ পরিব্রাজক পূর্ণ ছিল। বুদ্ধপ্রয়াণের ১৫০ বছর পরে জনৈক নাগার্জুন নামে বৌদ্ধ ভূপতির জন্মকালে প্রথম বোধিসঙ্গমের ঘটনা ঘটেছিল। কল্‌হনের নির্ণয়ানুসারে কলির ২৪০২/৯ মাসের কিছু পূর্বে সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসী হন। রামদাস হিসাব করে দেখান যে বুদ্ধ ২৫৮৪ বছর

পূর্বে জন্মেছিলেন এবং তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৬৯৯ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। রামদাস *মহাবস্তু অবদান*-এর ‘ছত্রবস্তু’ অনুযায়ী লেখেন, সিদ্ধার্থ রাজা বিম্বিসারের সমসাময়িক। *বিষ্ণুপুরাণ*-এর সূত্রে তিনি অনুমান করেন সিদ্ধার্থ চন্দ্রগুপ্তের অন্যূন ৩০০ বছর পূর্বে উৎপন্ন হয়েছিলেন। নক্ষত্র বিচার অনুযায়ী কলির ২৩০০ বছর পরে, ২৪০০ বছরের মধ্যে ‘বুদ্ধবতার’ ঘটনা হয়েছিল। ভারতীয় পুরাণশাস্ত্র অনুসারে বুদ্ধদেবের আয়ু ২৬০০ বছরের কিছু বেশি হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে এঁর আয়ু ২৪০০-র বেশি নয়। *ভাগবত মহাপুরাণ* ও *বিষ্ণুপুরাণ*-এর তুলনামূলক আলোচনা অনুযায়ী বুদ্ধদেব প্রথম নন্দের কিছু পূর্বে মধ্য গয়াপ্রদেশে ‘আবির্ভূত’ অর্থাৎ ‘খ্যাতিমান’ হয়েছিলেন। এই কথার যাথার্থ ধরলে সিদ্ধার্থকে চন্দ্রগুপ্তের অনধিক ১৫০ বছর পূর্বের লোক বলা যেতে পারে এবং এতে ইংরেজ পণ্ডিতদের অনুমান আংশিক সত্য হয়। *ললিতবিস্তর* গ্রন্থে লিখিত রয়েছে, সিদ্ধার্থের আবির্ভাবের পূর্বে মগধে প্রদ্যোতন রাজবংশ বিদ্যমান ছিল। *বিষ্ণুপুরাণ*-ও এই সাক্ষ্য দেয়। রামদাস পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন –

> বুদ্ধদেবকে কোনও প্রকারে খৃঃ পূঃ ঠিক ৫৫০ বৎসরের পূর্ববর্ত্তী বলিতে পারা যায় না। উহার অধিক পূর্ব্বে তিনি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইহাই স্থির হয়।

আনন্দ কেন্টিস কুমারস্বামীর মতে বুদ্ধ ৫৬৩ খ্রিস্টপূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৮৩ খ্রিস্টপূর্বে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।[১৫] এডোয়ার্ড জে. থমাস এই জন্মকালকে সমর্থন করেছেন।[১৬] বুদ্ধের জীবনকাল আশি বছর এবং সিংহলী ঐতিহ্যানুসারে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সময়কাল ৫৪৪ খ্রিস্টপূর্ব। *মহাবংস* অনুযায়ী বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধ বোধিলাভ করেন –

> মগধেসু’রুবেলায়ং বোধিমূলে মহামুনি।
> বেসাখপুণ্ণমায়ং সো পত্তো সম্বোধিমুত্তমং।।[১৭]

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ৬২৩ থেকে ৫৪৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দকে বুদ্ধের সময়কাল রূপে গ্রহণ করেছেন। *শক-জিছু-রোকু* জাপানি গ্রন্থমতে ১০২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। *গ-ছের-রোল্-প* ইত্যাদি তিব্বতীয় গ্রন্থ মতে বুদ্ধের জন্মকাল ৫১৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। হিউয়েন সাঙ ও তাঁর সমসাময়িক চীনা গ্রন্থাকারদের মতে বুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ৮৫০ অব্দে প্রাদুর্ভূত হন। সতীশচন্দ্রের মতে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মগধরাজ্যে ঊরুবেলের বোধিদ্রুমতলে বৈশাখী পূর্ণিমায় সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেন। আশি বছরে খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমায় কুশীনগরের শালবৃক্ষমূলে তিনি পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হন।[১৮] সুকোমল চৌধুরীর মতে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে খ্রিস্টপূর্ব ৬২৪ অথবা ৪৬৩ অব্দে বোধিসত্ত্বের জন্ম। পঁয়ত্রিশ বছরে খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৯ বা ৫২৮

অব্দে বুদ্ধত্বলাভ এবং খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৪ অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর মহাপরিনির্বাণ লাভ ঘটে।[১৯] সুমঙ্গল বড়ুয়া খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দ বা খ্রিস্টপূর্ব ৬৭৩ অব্দকে সিদ্ধার্থের জন্মকাল ধরেছেন।[২০] প্রচলিত মতানুসারে বুদ্ধদেব আশি বছর বেঁচেছিলেন। 'শাক্যমুনির জীবন বৃত্তান্ত'-এ এই মতের সমর্থন রয়েছে। কিন্তু 'বুদ্ধদেবের জীবন বৃত্তান্ত' তাঁর জীবনকাল সত্তর বছরের তথ্য কিসের ভিত্তিতে দিলেন, তা স্পষ্ট নয়। 'বুদ্ধদেব ও তদুদ্ভাবিত ধর্ম্ম-প্রণালী'তে বুদ্ধদেবের সময়কাল নির্ধারণ করার উপায় নেই একথা জানানো হয়েছে। বৌদ্ধ গ্রন্থকারদের রচনা, বৌদ্ধধর্মের স্তূপমঠ ইত্যাদির দৃষ্টান্তে অনুমিত হয়েছে যে বুদ্ধদেব খ্রিস্টের অন্তত পাঁচ থেকে ছশো বছর আগে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন। 'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত' ও 'গৌতমবুদ্ধ' – এই প্রবন্ধদ্বয়ের তথ্য প্রায় এক। 'শাক্যমুনির জীবন বৃত্তান্ত' মতে শাক্যমুনি 'ঊনবিংশবর্ষ পর্য্যন্ত' পিত্রালয়ে সুখসম্ভোগ করেন অর্থাৎ এই অর্থে আমরা তাঁর 'মহাভিনিষ্ক্রমণ'কাল ত্রিশ বছর ধরতে পারা যায়। 'গৌতম বুদ্ধ' অনুযায়ী ঊনত্রিশ বছরে শাক্যমুনি সংসার থেকে বিনিষ্ক্রান্ত হন। দুটি প্রবন্ধেই ছয় বছর তপশ্চর্যার কাল বলে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু, বোধিলাভের সময় 'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত' অনুসারে ছত্রিশ, অন্যদিকে 'গৌতমবুদ্ধ' অনুযায়ী পঁয়ত্রিশ। 'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত' অনুযায়ী অগ্রহায়ণ ও 'শাক্যসিংহের জন্ম ও বাল্যজীবন' অনুযায়ী পৌষ বুদ্ধের জন্মমাসরূপে লিখিত হয়েছে। এই মাসের তত্ত্ব এখন পরিত্যক্ত হয়েছে। বুদ্ধের জন্ম, বোধিলাভ ও মহাপরিনির্বাণের সময় হিসাবে বৈশাখী পূর্ণিমাকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত' প্রবন্ধের মতে সিদ্ধার্থ ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র 'সপ্তপদপরিমিত ভূমি' পরিভ্রমণ করতে করতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। 'গৌতম বুদ্ধ' প্রবন্ধের মতে জন্মাবার পরেই সিদ্ধার্থ ঋজু হয়ে শতবার পদক্ষেপ করে তাঁর জগত শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করেন। 'শাক্যসিংহের জন্ম ও বাল্যজীবন' মতে, তাঁর জন্মের পরেই পূর্বদিকে সপ্তপদক্ষেপের অর্থ প্রাণিমাত্রের কুশল মূল ধর্মের পূর্বগামী অর্থাৎ পথপ্রদর্শক; দক্ষিণদিকে সপ্তপদক্ষেপের অর্থ দেব-মনুষ্যের প্রিয়; পশ্চিমদিকে সপ্তপদক্ষেপের অর্থ তিনি মানুষের পশ্চিম জাতির অর্থাৎ জরা-মরণ-দুঃখের অন্তর্কর্তা এবং উত্তরদিকে সপ্তপদক্ষেপের অর্থ জীব বা সত্তের শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ এই বার্তা জানানো। সিদ্ধার্থের জন্মের একই সময়ে বিভিন্ন জনের জন্মের উল্লেখ, সিদ্ধার্থের নামকরণের তাৎপর্য 'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত' ও 'গৌতম-বুদ্ধ' প্রবন্ধে একই ধরণের; সিদ্ধার্থের 'গৌতম' গোত্রের বিচার 'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত' ও 'বুদ্ধদেবের জীবন বৃত্তান্ত'-এর বক্তব্য এক।

‘শাক্যমুনির জীবন বৃত্তান্ত’ মতে, শাক্যসিংহের জন্মের সপ্তাহকাল পরে তাঁর মা মহামায়া মর্তদেহ পরিত্যাগ করে ত্রয়স্ত্রিংশ নামক বৌদ্ধস্বর্গে দেবতাদের মধ্যে পুনর্জন্মলাভ করেন। ‘বুদ্ধদেবের জীবন বৃত্তান্ত’, ‘গৌতম বুদ্ধ’ প্রবন্ধদ্বয়ে সপ্তাহকালান্তে মায়াদেবীর মৃত্যুর বর্ণনা থাকলেও মৃত্যুর তাৎপর্য বর্ণিত হয়নি। রামদাস সেন ‘শাক্যসিংহের জন্ম ও বাল্যজীবন’ প্রবন্ধে মায়াদেবীর পুদ্‌গল দেহ পরিত্যাগ করে দেবলোকে গমনের কারণ রূপে বলেছেন – মায়াদেবীর এই রূপ আয়ুপ্রমাণ অবধারিত ছিল। কেবল মায়াদেবী নয়, অতীত বুদ্ধদের জননীরাও প্রসবের সপ্তাহকালান্তে প্রাণত্যাগ করে স্বর্গগামিনী হয়েছিলেন। এই মৃত্যুর উপলক্ষ হল, বোধিসত্ত্বরা পূর্ণেন্দ্রিয়, পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণাবয়ব হয়ে নির্গত হন। তাঁদের জননীদের হৃদয় স্ফুটিত হওয়ার কারণে তাঁরা কালগতা হল। রামদাস *ললিতবিস্তর*-এর ‘জন্মপরিবর্ত্ত’ অনুসারেই এই বর্ণনা করেছেন।[২১]

গ) মহাপুরুষ লক্ষণ

মুখ্যত *ললিতবিস্তর* অবলম্বনে বুদ্ধজীবন লেখা হলেও সাময়িকপত্রের জীবনীকারগণ অলৌকিক আখ্যানের বিষয়ে আগ্রহ না দেখিয়ে বুদ্ধজীবনের বাস্তবানুগ জীবন উপস্থাপিত করেছেন। ‘শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত’-এ অলৌকিক আখ্যানের খুব সামান্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। ‘শাক্যসিংহের জন্ম ও বাল্যজীবন’-এ স্পষ্টতই বলা হয়েছে অনেক অলৌকিক বর্ণন ‘তৃপ্তিকর নহে’, তাই পরিত্যাজ্য। অসিতঋষির পরামর্শে দেবকুল থেকে আগত শিশু সিদ্ধার্থকে দেবদর্শনের জন্য মন্দিরে আনা হয়। *ললিতবিস্তর*-এর ‘দেবকুলোপনয়ন পরিবর্ত্ত’-এ এ সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।[২২] শিশু সিদ্ধার্থকে দেবস্থানে নিয়ে যাওয়া হলে মন্দিরের দেবপ্রতিমারা বালকরূপী বোধিসত্ত্বকে দেখামাত্র নিজ নিজ স্থান পরিত্যাগ করে বালকের চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হন। এই অদ্ভুত ব্যাপারে শাক্যগণ বিস্মিত ও আনন্দিত হন, অন্তরীক্ষে দিব্য পুষ্পবর্ষণ ও দিব্য বাদ্য হয়। রামদাস একটি মাত্র নিদর্শনরূপে এই ঘটনার উল্লেখ করলেও স্পষ্টত জানান –

> ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধগ্রন্থের অষ্টমাধ্যায়ে বুদ্ধের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে এমন সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহা পাঠ করিলে অনুবাদ করিতে আদৌ ইচ্ছা হয় না।

সিদ্ধার্থের মধ্যে বত্রিশপ্রকার মহাপুরুষ লক্ষণের কথা ‘শাক্যসিংহের জন্ম ও বাল্যজীবন’ প্রবন্ধে উল্লেখমাত্র রয়েছে। ‘গৌতমবুদ্ধ’ প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র রয়েছে। *দীর্ঘনিকায়*-এর ‘মহাপদন সূত্রান্ত’-এ বত্রিশপ্রকার মহাপুরুষ লক্ষণের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।[২৩] রামদাস সেন ‘শাক্যসিংহের মূর্ত্তি ও অঙ্গলক্ষণ’ প্রবন্ধে (*নব্যভারত*, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩) জানিয়েছেন যে *বোধিচর্য্যাবতার*, *ললিতবিস্তর*,

মহাবস্তু অবদান, ধর্মসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে বত্রিশপ্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ ও আশিপ্রকার অনুব্যঞ্জনার কথা বর্ণিত হয়েছে। সেই বর্ণনা অনুসারে বুদ্ধদেবের মূর্তি ও অঙ্গগঠন কেমন ছিল তা বোঝা যায়। সেই অনুযায়ী চিত্রের তৈরি করা সম্ভব। তিনি *ধর্মসংগ্রহ* ও *ললিতবিস্তর* অনুযায়ী বত্রিশপ্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ ও আশিপ্রকার অনুব্যঞ্জনার কথা আলোচনা করেছেন।[২৪] এই বর্ণনায় যে অতিশয়োক্তি রয়েছে আমরা মনে করি। প্রিয় বা পূজ্য মহামানবকে নান্দনিক দৃষ্টিতে বিভূষিত করার জন্যই এর আয়োজন করা হয়েছিল।

ঘ) শাক্যসিংহের লিপিশিক্ষা

'শাক্যসিংহের জীবনবৃত্তান্ত' অনুযায়ী সিদ্ধার্থ গুরুমহাশয়ের থেকে চৌষট্টি প্রকার স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অক্ষরের পরিচয় দিলে গুরু চমৎকৃত হয়ে তাঁর স্তব করেন। তারপর ক্রমশ হস্তীশিক্ষা, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি চৌষট্টি বিদ্যায় তিনি পারদর্শী হন। যুদ্ধ ও মল্লবিদ্যায় তিনি কৃতী ছিলেন। 'গৌতমবুদ্ধ' প্রবন্ধ অনুযায়ী সিদ্ধার্থ তৎকালীন অসাধারণ শৌর্যবীর্যসম্পন্ন যুবক – ধনুর্বিদ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, দৈহিক বিক্রমে অদ্বিতীয়, কলাবিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তিবান ছিলেন। 'শাক্যসিংহের লিপিশিক্ষা' প্রবন্ধে *ললিতবিস্তর* অনুসারে সিদ্ধার্থের লিপিশিক্ষার প্রসঙ্গ এসেছে। লিপিশালার প্রধান শিক্ষক বিশ্বামিত্রের শিষ্য হওয়ার জন্য নয়, তাঁকে প্রবুদ্ধ করার জন্য সিদ্ধার্থের আগমন ঘটেছিল। সিদ্ধার্থের তেজে বিশ্বামিত্র অভিভূত ও ভূপতিত হলে শুভাঙ্গ নামের দেবপুত্র সেখানে আবির্ভূত হয়ে বিশ্বামিত্রকে গাথা শোনান। গাথার তাৎপর্য এই যে ইহলোকে ও দেবলোকে যে সকল শাস্ত্র, সংখ্যা, লিপি গণনা প্রভৃতি প্রচলিত আছে, সে সমস্ত সিদ্ধার্থের পূর্বজ্ঞাত। লোকশিক্ষা, সত্ত্ব পরিপাক ও অন্যান্য সকল প্রাণিকে বিনীত ও মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তাঁর আগমন ঘটেছিল। লিপিশিক্ষা পর্বে অলৌকিক বর্ণনার আতিশয্যের পিছনে প্রাচীনকালে সকল লোকের অলৌকিকতা প্রীতির কথা প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন ভারতের চৌষট্টি প্রকার লিপির নামগুলি অধিকাংশই এখন অর্থবহ নয় তবে ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, পুষ্করসারী ভিন্ন অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মগধলিপি ইত্যাদি কয়েকটি লিপির নাম দেশ বা জাতির নামের সঙ্গে যুক্ত।[২৫] চৌষট্টি প্রকার লিপির অনেকগুলিরই লিপিবোধক শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে রামদাস সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, শকারি, দরদ, দ্রাবিড়, চীন, হুন, খাশ্য – এই বারোটি মাত্র শব্দের আভাষ বোঝা গেলেও বাকিগুলি সম্পর্কে তিনি সন্দেহবশত সংস্কৃত

থেকে অনুবাদ করেননি। এগুলি বুদ্ধমুখনিঃসৃত নয়, গ্রন্থকারের বর্ণনামাত্র – এই বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা সত্ত্বেও তা গ্রন্থের প্রাচীনতা নির্ধারণের পরিপন্থী নয়। কারণ সার্ধসহস্র বছর পূর্বের *মহাবস্তু অবদান* গ্রন্থে উক্ত সকল দেশের ও ভাষার উল্লেখ রয়েছে। প্রাবন্ধিক দাবি করেছেন, বুদ্ধদেবের অথবা তাঁরও পূর্বে অর্থাৎ তিন সহস্রাধিক বছর পূর্বে মুদ্রালিপি প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধযুগের এই প্রমাণ আমাদের দেশের প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী বলবান হবে। বিশ্বামিত্র ও সিদ্ধার্থের ধ্বনি উচ্চারণের অলৌকিক ঘটনা কাব্যিক ও 'অতি আশ্চর্য'-এর বিষয়। কথিত আছে, সিদ্ধার্থের উচ্চারিত বর্ণের এক-একটি বৈরাগ্যসূচক রহস্যের অর্থ আকাশ থেকে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। আমরা প্রবন্ধের আংশিক উদ্ধার করছি –

> গুরু উপদেশ করিলেন, অ।
>
> শাক্যসিংহ বলিলেন, অ।
>
> আকাশে ধ্বনিত হইল, "অনিত্যঃ সর্ব্বঃসংসার স্কন্ধঃ।"

প্রত্যেক ৫০টি ধ্বনির উচ্চারণকালে আকাশের প্রতিধ্বনির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের সার ব্যাখ্যাত হয়। সিদ্ধার্থ লিপিশালার থেকে ক্রমান্বয়ে বর্ণ, পদ, বাক্য-যোজন, শাস্ত্র সমুদায় শিক্ষা করেছিলেন। সিদ্ধার্থ যখন লিপিশালে থেকে লিপিশিক্ষা করেন, সেই সময়ে সেই পাঠশালায় নাকি দ্বাদশ সহস্র বালক লিপি শিক্ষার্থে উপস্থিত ছিল এবং সেই সকল বালকদেরকে তিনি গোপনে গোপনে সম্যক জ্ঞান উপদেশ দিতেন।

ঙ) শাক্যসিংহের উদ্বাহ

'বৌদ্ধ ধর্ম্ম' প্রবন্ধে সিদ্ধার্থের গুণজ বিবাহের কথা রয়েছে। বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থের কাছে সমস্যা ছিল যে তিনি কামের অনন্ত দোষ জ্ঞাত হয়েও ধ্যাননিমীলিত নেত্রে ধ্যেয় সুখে থাকবেন নাকি 'স্ত্রী-গৃহে' বাস করবেন? সত্ত্বগুণের পরিপাক কীভাবে হয় তা দেখানোর জন্য, লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি সংসার বন্ধন স্বীকার করেন। তাই পূর্ব পূর্ব বোধিসত্ত্বদের মতো তিনি স্ত্রী-পুত্র গ্রহণ করেছিলেন। *ললিতবিস্তর*-এর দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবাহের প্রস্তাবের সপ্তম দিনের পর সিদ্ধার্থ কন্যার কিছু গুণের প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রস্তাবিত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে কোন জাতির কন্যা বিবাহে সম্মত হয়েছিলেন। প্রবন্ধে গোপার সঙ্গে তাঁর কিছুকালের সুখী দাম্পত্যের চিত্রও উপস্থাপিত হয়েছে। 'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত' প্রবন্ধে পাই – শিল্পবিদ্যায় পারঙ্গম সিদ্ধার্থ স্বনির্বাচিত পাত্রী গোপাকে বিবাহ করার কথা লিখে

জানিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে গোপার বিবাহ হয়। 'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত' প্রবন্ধে এছাড়াও অতিরিক্ত তথ্য রয়েছে –

> সর্ব্বগুণান্বিতা গোপা নারীর আদর্শস্বরূপ ছিলেন; পরন্তু বুদ্ধদেব ঐ কন্যাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যশোধরা ও উৎপলবর্ণা নাম্নী অপর দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে যশোধরার গর্ভে রহিল নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে।

এই বাক্যবিন্যাসে সিদ্ধার্থ যে গোপার সঙ্গে অন্যায় করেছেন সেই ভাব অপ্রকাশিত থাকে নি। 'বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্তান্ত' অনুযায়ী সিদ্ধার্থের বিবাহ প্রসঙ্গে লেখকের বাড়তি শব্দযোজনা বা মন্তব্য তাঁর চরিত্রের অনুকূল হয় নি। শুদ্ধোদনের সপ্তমন্ত্রী সিদ্ধার্থের কাছে বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে তিনি কোন উত্তর না দিয়ে কয়দিন ঐ বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন। বিবাহ – তাঁর চিত্তের অস্থিরতা ও চিন্তা নিবৃত্তিতে সক্ষম হবে না জেনে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করেন। তাঁর মৌনতাকে সম্মতি লক্ষণ ধরে গোপার সঙ্গে বিবাহ স্থির হয়। প্রবন্ধের ভাষায় –

> সর্ব্বপ্রথমে দণ্ডপাণি সিদ্ধার্থকে মনুষ্যত্ববিহীন ও সহজ জ্ঞানশূন্য স্থির করিয়া তাঁহার সহিত আপনার বিবিধ গুণসম্পন্না কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হয়েন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহাকে অসাধারণ মানসিক বুদ্ধি ও শারীরিক বলবীর্য্যসম্পন্ন জানিতে পারিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক নিজ কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

বাক্যবন্ধের 'সহজজ্ঞানশূন্য' ভাবনাটি চললেও চলতে পারে, কিন্তু 'মনুষ্যত্ববিহীন' শব্দটি আপত্তিজনক। 'গৌতমবুদ্ধ'-এর প্রবন্ধকার সিদ্ধার্থের বিবাহের পিছনে হার্দিক নয়, রাজনৈতিক কৌশলের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বহুকাল ধরে কোলিয় রাজবংশের সঙ্গে শাক্যকুলের বিবাদ-বিসম্বাদ চলে আসছিল। এই বিবাদের নিঃশেষ ধ্বংসসাধনের জন্য কোলিয়-বংশসম্ভূতা সুপ্রবুদ্ধের কন্যা যশোধরার সঙ্গে ষোড়শবর্ষীয় সিদ্ধার্থের বিবাহ দেওয়া হয়।

ললিতবিস্তর-এর 'শিল্প সন্দর্শন পরিবর্ত্ত'-এ উল্লিখিত হয়েছে – শাক্য দণ্ডপাণি গোপাকে বোধিসত্ত্বের কাছে বিবাহে সম্প্রদান করলেন এবং রাজা শুদ্ধোদন নিয়মানুক্রম অনুসারে গোপা-বোধিসত্ত্বকে বরণ করেছিলেন। বোধিসত্ত্বের চুরাশি হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে গোপা পাটরানিরূপে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।[২৬] রামদাস সেন 'শাক্যসিংহের কৌমার জীবনের কথা' প্রবন্ধে (*ভারতী ও বালক*, ভাদ্র, ১২৯৩) *ললিতবিস্তর* অনুসারে মন্তব্য করেছেন –

> কুমার শাক্যসিংহের সহস্র স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে গোপাই শাক্যসিংহের প্রধানা মহিষী ছিলেন। শাক্যসিংহের অনেক ভার্য্যা ছিল, এ কথা সাধারণ লোকের অজ্ঞাত আছে।

মহাবংস-এ বুদ্ধের একজন পত্নী সুপ্রবুদ্ধ কন্যা সুভদ্রকাঞ্চনার উল্লেখ আছে। *জাতক* গ্রন্থে বুদ্ধপত্নী রাহুলমাতা নামে পরিচিত। ব্রহ্ম, সিংহল ও জাপানের গ্রন্থে বুদ্ধপত্নী সুপ্রবুদ্ধ কন্যা যশোধরা নামে পরিচিত। চীনাগ্রন্থে বুদ্ধের পত্নীত্রয় হলেন – যশোধরা, গোতমী ও মনোহরা। মনোহরা কখনো কোনো মানুষের দৃষ্টিগোচর হন নি, লোকে তাঁর নামমাত্র জানত। বৌদ্ধশাস্ত্রের টীকাকারগণ তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। গোতমী ও যশোধরা যথাক্রমে দণ্ডপাণি শাক্য ও মহানামের কন্যা বলে বর্ণিত হয়েছেন। কোন কোন তিব্বতীয় গ্রন্থমতে বুদ্ধের তিন পত্নীর নাম গোপা, যশোধরা ও উৎপলবর্ণা। কনিষ্কের সময়ে (১২৭ – ১৫০ খ্রিস্টপূর্ব) প্রস্তুত কোন প্রস্তরফলকে বুদ্ধের তিন পত্নীর প্রতিমূর্তি দৃষ্ট হয়। তাঁরা হলেন – গোপা, যশোধরা ও মৃগজা।[২৭] *জাতক নিদান* মতে চল্লিশ হাজার শাক্যকন্যা তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন।[২৮] *মহাবস্তু অবদান*-এ দণ্ডপাণি শাক্য মহানাম এবং গোপা যশোধরা নামেই পরিচিত।[২৯] *ললিতবিস্তর*-এর মতে দণ্ডপাণি সুপ্রবুদ্ধের ভ্রাতা। মতান্তরে তিনি আবার স্বয়ং সুপ্রবুদ্ধ বলে উল্লিখিত হয়েছেন।[৩০] পালিসাহিত্যে গোপা 'রাহুলমাতা' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধা। মললসেকেরার মতে সিদ্ধার্থের ভার্যার প্রকৃত নাম বিম্বা। ভদ্দকচ্চানা, যশোধরা ইত্যাদি তাঁর বিশেষণমাত্র। সিদ্ধার্থ এবং গোপার পরিণয় ৬০৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বা ৫৪৭ অব্দে সংঘটিত হয়েছিল।[৩১]

চ) শাক্যসিংহের মহাভিনিষ্ক্রমণের পটভূমি

জ্যোতির্বিদরা গণনা করে বলেছিলেন, সিদ্ধার্থ সম্রাট অথবা বুদ্ধ হবেন। তাঁর মহাভিনিষ্ক্রমণের কারণ বিষয়ে 'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত'-এ বলা হয়েছে –

> মধ্যে ২ উদ্যানে গমনসময়ে পথে তিনি আতুর বা বৃদ্ধ ও কখন বা শব ও যোগী সন্ন্যাসী প্রভৃতি পদার্থ দর্শন করিয়া পীড়া বার্দ্ধক্য মৃত্যু ও ধর্ম্মের বিষয়ে চিন্তায় মগ্ন হইতেন। ক্রমে ২ তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইতে লাগিল। একদা তিনি এক কৃষির কুটিরে ... তৎপরিবারের দুরবস্থা ও ক্লেশ দর্শনে অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া সামান্য সাংসারিক অনিত্য সুখভোগ ত্যাগ করত চিন্তাকুল হইয়া সামান্য সাংসারিক অনিত্য সুখভোগ ত্যাগ করত পরমতত্ত্ব জ্ঞানের উপলব্ধি হওনাভিলাষে জম্বুবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধের সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের এই প্রথম সূত্র।

রথে নগর পরিক্রমায় বেরিয়ে শাক্যসিংহ পূর্ব তোরণে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, দক্ষিণ তোরণে স্বজন পরিত্যক্ত বন্ধুহীন, বহুরোগগ্রস্ত, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর এক ব্যক্তি, পশ্চিম তোরণে বস্ত্রাবৃত মৃতদেহ এবং উত্তর তোরণে

এক শান্তমূর্তি, রোগশোকবিমুক্ত ভিক্ষুকে দেখেছিলেন। এই সম্পর্কে 'বৌদ্ধ ধর্ম্ম' প্রবন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। *বুদ্ধচরিত, ললিতবিস্তর, জাতক নিদানকথা* প্রভৃতিতে বর্ণিত জরাজীর্ণ, ব্যাধিগ্রস্ত, মৃত এবং প্রব্রজিত এই দৃশ্য চতুষ্টয় দেখে সিদ্ধার্থের মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়। 'বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্তান্ত', 'গৌতমবুদ্ধ' প্রবন্ধদ্বয়ের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি অন্যের অজ্ঞাতসারে সারথী ছন্দক ও ঘোড়া কন্থকের সাহায্যে গৃহত্যাগ করে অনামা বা ওনোমা নদীর তটে প্রব্রজিত হন। রামদাস সেন 'শাক্যসিংহের উদ্যানযাত্রা।' প্রবন্ধে (*ভারতী ও বালক*, ফাল্গুন, ১২৯৩) এই মত গ্রহণ করেছেন। এই প্রচলিত কাহিনি প্রায় সকল বুদ্ধজীবনীকার গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক ভাবে অনোমা নদীর অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। *মধ্যম-নিকায়*-এর 'আরিয়পরিয়েষণা সূত্র'-এ বুদ্ধ ধর্মের দুইপ্রকার অনুসন্ধানের কথা বলেছেন – অনার্যোচিত ও আর্যোচিত। জগতে সকল জীব জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, দুঃখের অধীন। তবু কিছু মানুষ এইসব অনুগত ধর্মের সন্ধানী। এটি অনার্যোচিত ধর্মের অনুসন্ধান। কিছু ব্যক্তি নিজে অধীন জেনে শোক-জরা-ব্যাধী-দুঃখহীন-অনুৎপন্ন নির্বাণের অনুসন্ধান করেন। এটি আর্যোচিত ধর্ম।[৩২] জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য কাব্যকল্পনায় মণ্ডিত হয়ে এটি চারটি বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছে। *দীর্ঘ-নিকায়*-এর 'মহাপদান সূত্রান্ত'-এ বুদ্ধদেব তাঁর জন্মের বহু পূর্বের একজন বিপশ্যী বুদ্ধের দৃষ্টান্ত দানের উল্লেখ করে সারথীকে জরা, বার্ধক্য, মৃত্যু ও সন্ন্যাসের কথা বলেছেন।[৩৩] বুদ্ধচরিতকারেরা বিপশ্যী বুদ্ধের কাহিনিকে সিদ্ধার্থের জীবনচরিতে আরোপ করেছেন।

'বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্তান্ত'-এ সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমণের কারণ ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধচিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অনেকক্ষেত্রেই বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়নি, প্রবন্ধের কোনো কোনো অংশ বেশ অস্বস্তিকর। যেমন – সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস জীবনের 'কঠোর ও বিষম অভিপ্রায়' পিতা ও সহধর্মিনীকে জানান। গোপা আর সিদ্ধার্থের এই অবস্থার বর্ণনা আংশিক উদ্ধারযোগ্য –

> তদীয় অনুপম রূপ লাবণ্য সম্পন্ন, দণ্ডপাণিনন্দিনী গোপ নাম ধর্ম্মোন্মত্তা সহধর্ম্মিনী নানা প্রেমসূচক সদুপদেশ ও বিচ্ছেদ নিমিত্ত নানা হৃদয়বিদারক খেদ ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব কিছুই বুঝিলেন না। ... সহধর্ম্মিনীর হৃদয়বিদারক খেদ বাক্য, পিতার প্রেম ও স্নেহপূর্ণ বাক্যাবলী তাচ্ছল্য করিয়া সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত হইয়া সুখের আলয় সুরম্য রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন ...।

এখানে বুদ্ধদেব নন, সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বের ঘটনা বলে ‘সিদ্ধার্থ’ নাম হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ‘ধর্ম্মোন্মত্তা সহধর্ম্মিনী’ শব্দবন্ধটি আপত্তিকর। পিতা ও ধর্মপত্নীর অনুভূতিমালা সিদ্ধার্থ ‘কিছুই বুঝিলেন না’ সত্য হলে, মানুষের দুঃখনিবৃত্তির কথা ভাবা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হত কি? সহধর্মিনীর হৃদয়বিদারক খেদবাক্য, পিতার প্রেম ও স্নেহপূর্ণ বাক্যাবলী ‘তাচ্ছল্য’ করে, সংসারের মায়া ত্যাগ করে ‘ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত’ হওয়া ভবিষ্যৎ বুদ্ধের চরিত্রের পক্ষে কি শোভনসুন্দর? এই ধরনের বয়ান তাঁর চরিত্রের পক্ষে হানিকারক বলেই মনে হয়।

ছ) গোপার স্বপ্নদর্শন

রামদাস সেন ‘বুদ্ধচরিত। গোপার স্বপ্নদর্শন’ প্রবন্ধে *ললিতবিস্তর* অনুসারে সিদ্ধার্থ ও গোপার দাম্পত্যের একটি খণ্ডচিত্র উপস্থাপিত করেছেন। গোপা রাতে ভীতিপ্রদ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন যা সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমণের প্রস্থানভূমি রচনায় সহায়তা করেছে। স্বপ্নভঙ্গের পর গোপার স্বপ্নের ব্যাখ্যায় সিদ্ধার্থ বলেন – পুণ্যফলেই এই স্বপ্ন দৃষ্ট হয়েছে। স্বপ্নে পৃথিবীকে কাঁপতে দেখার তাৎপর্য – গোপা দেব যক্ষ নাগ রাক্ষস এবং অন্যান্য সকল জীবের পূজনীয় হবেন এবং মুক্তহার বিকীর্ণ হয়ে নগ্ন হওয়ার অর্থ তিনি স্ত্রীকায়া পরিত্যাগ করে আত্মার স্বরূপ ‘পুরুষাকার’ লাভ করবেন। এই কথাগুলির মধ্যে দিয়ে সিদ্ধার্থ গোপার উদ্দেশে আত্ম-শরণের বার্তা দিয়েছেন। প্রাবন্ধিক সিদ্ধার্থ-গোপার অনোন্যোনির্ভরতার এক অনিন্দ্যসুন্দর চিত্র হাজির করেছেন –

> ভগবান্ শাক্যসিংহ এই রূপে ভয়-ভীতা গোপাকে পরিসান্ত্বনা করিলেন। বুদ্ধিমতী গোপা বিশ্বস্ত চিত্তে পতিবাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্বস্তা হইলেন এবং প্রমুদিত চিত্তে পুনর্নিদ্রাগতা হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বদল আনলেন। তিনি বহুদাম্পত্যের স্থলে একদাম্পত্যকে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা দিলেন। বঙ্কিম-ঘনিষ্ঠ রামদাস সেন কি সিদ্ধার্থ-গোপার মধ্যে এই দাম্পত্য জীবনের ভাবসম্মিলনকে অনুসন্ধান করেছেন?

জ) শাক্যসিংহের মহাভিনিষ্ক্রমণ

শাক্যসিংহের গৃহত্যাগ ‘মহাভিনিষ্ক্রমণ’ নামে খ্যাত। ‘শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত’ প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে রাজা শুদ্ধোদনের সকল প্রতিরোধকে ব্যর্থ করে সিদ্ধার্থ একদিন রাত্রে সাংসারিক মায়া পরিত্যাগ করে

অশ্বারূঢ় হয়ে ‘পলায়ন’ করলেন। ‘বৌদ্ধ ধর্ম্ম’ প্রবন্ধে ঊনত্রিশ বছর বয়সে সিদ্ধার্থ স্ত্রী গোপা ও পুত্র রাহুলকে পরিত্যাগ করে রাতে ঘোড়ায় চড়ে রাজভবন থেকে প্রস্থান করেন। ‘বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্তান্ত’ মতে পিতা ও পত্নীর আবেদনকে অস্বীকার করে তিনি রাতে অশ্বরক্ষকের সঙ্গে অশ্বারূঢ় হয়ে সংসার ত্যাগ করেন। ‘গৌতম বুদ্ধ’ প্রবন্ধ অনুসারে, একদিন রাজপ্রাসাদের নিদ্রাগতা পরিচারিকা নারীদের ন্যাক্কারজনক উচ্ছৃঙ্খল দৃশ্য দেখে তাঁর গৃহত্যাগ ইচ্ছা দৃঢ় হয়। তিনি রাত্রে নিদ্রারত পুত্র ও স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অশ্বারোহন করে দেবতাদের সহায়তায় নগর ত্যাগ করেন। ‘শাক্যসিংহের শুদ্ধোদনের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া নিষ্ক্রমণ’ প্রবন্ধে সিদ্ধার্থ শুদ্ধোদনের কাছে গৃহবাসের স্বপক্ষে জরার আক্রমণ ও অনন্তযৌবন; আরোগ্য প্রাপ্তি; মৃত্যুহীন অপরিমিত আয়ু এবং অতুল চিরস্থায়ী সম্পত্তির অধিকারের বর প্রার্থনা করেন। এই চারটি বরের প্রতিশ্রুতি শুদ্ধোদন দিতে না পারলে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানান। শুদ্ধোদনের সকল প্রতিরোধের চেষ্টা দেবতাদের আনুকূল্যে ব্যর্থ হয়। ইন্দ্র, বৈশ্রবণ, ললিতব্যূহ, ব্যূহমতি, বর্মচারী, বরুণ প্রভৃতি দেবতা নানা অলৌকিক কার্য ঘটান। দেবতা সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের পাদটীকা বৌদ্ধ-পুরাণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে –

> এই সকল দেবতা বৌদ্ধগণের মতে বৌদ্ধ। বৌদ্ধরা বলে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ পূর্ব্বকালের বোধিসত্ত্ব ও সিদ্ধ দেবতা।

দেবতাদের কৃত অন্তঃপুরের নারীদের ‘বিসংজ্ঞ, বীভৎস’ রূপে দেখে, শরীর মাত্রকেই অশুচি জ্ঞানে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের ইচ্ছা প্রবলতর হয়। শরীর সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা প্রবন্ধটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। *ললিতবিস্তর*-এর পঞ্চদশ অধ্যায় ‘অভিনিষ্ক্রমণ পরিবর্ত্ত’ অনুসারে দেবপুত্রদের সহায়তায় সিদ্ধার্থদৃষ্ট অন্তঃপুরের নৃত্যগীত পরায়ণ নারীদের নিদ্রাবস্থার বীভৎসরূপের বর্ণনা রয়েছে।[৩৪] *জাতক নিদানকথা*-য় একই দৃশ্যের অবতারণা রয়েছে। দেবরাজ শক্রভবনের মতো সিদ্ধার্থের সুরম্য রাজপুরী তাঁর কাছে ‘আমক শ্মশান’ এবং সমগ্র ত্রিলোক প্রজ্জ্বলিত গৃহের মত মনে হয়েছিল যা তাঁকে সংসার-বিবিক্ত করে তোলে।[৩৫] বুদ্ধদেব অন্তঃপুরিকাদের বীভৎসরূপ দেখে সংসার সম্পর্কে বীতরাগ হন – এমন কোন বর্ণনা *ত্রিপিটক*-এ নেই। *বিনয়পিটক*-এর *মহাবর্গ* গ্রন্থে শ্রেষ্ঠিপুত্র যশের প্রব্রজ্যাকালে এই রকম বর্ণনা রয়েছে। আমরা প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করছি –

> তিনি (যশ) একদিন পঞ্চকাম সমর্পিত সমঙ্গীভূত (তন্ময়) এবং নারী-পরিসেবিত হইয়া সকলের পূর্ব্বেই নিদ্রিত হইলেন। পরিজনগণও পরে নিদ্রিত হইল। সর্ব্বরাত্রি তৈল প্রদীপ জ্বলিতেছিল। অনন্তর কুলপুত্র

> যশ সকলের পূর্ব্বে জাগিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার পরিজনগণ নিদ্রা যাইতেছে; কাহারও কক্ষে বীণা, কাহারও কক্ষে মৃদঙ্গ, কাহারও কক্ষে 'আলম্বর', কাহারও বিকীর্ণ কেশ, কাহারও মুখে লালা নিঃসৃত, কেহ বা প্রলাপ বকিতেছে, মনে হইল যেন হাতের কাছে শ্মশান। তাহা দেখিয়া পাপে আদীনব প্রাদুর্ভূত হইল এবং নির্ব্বেদে চিত্ত সংস্থিত হইল।[৩৬]

নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর মতে, বুদ্ধচরিতকারগণ যশের যশ বুদ্ধে আরোপ করে কাব্যাংশকে সমৃদ্ধ করেছেন।[৩৭] মহাভিনিষ্ক্রমণ বিষয়ে *দীর্ঘ-নিকায়*-এর 'সোণদত্ত সূত্র' বলছেন, শ্রমণ গৌতম তরুণ, গভীর কৃষ্ণকেশ ও ভদ্রযৌবনসম্পন্ন প্রথম বয়সেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেছেন। মাতাপিতা অসম্মত, অশ্রুমুখ ও রোদনপরায়ণ হলেও তিনি মস্তকমুণ্ডন করে কাষায় বস্ত্র পরে গৃহ থেকে গৃহহীনের প্রব্রজ্যা নিয়েছিলেন।[৩৮] *মধ্যম-নিকায়*-এ 'ঔপম্যবর্গ'-এর অন্তর্গত 'আর্য্যপর্য্যেষণ-সূত্র'-এ বুদ্ধ বলেছেন – হে ভিক্ষুগণ! আমি যখন তরুণ, নবীন কৃষ্ণকেশ এবং ভদ্রযৌবনসম্পন্ন তখন স্নেহশীল ও অনিচ্ছুক মাতাপিতাকে কাঁদিয়ে, কেশ-শ্মশ্রু ছেদ করে, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করে আগার থেকে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই। 'মহাযমক বর্গ'-এর অন্তর্গত 'মহাসত্যক সূত্র'-এ একই বিষয়ের অবতারণা করে বুদ্ধ বলেছেন – আমি কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত ও কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করে আগার থেকে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হয়েছি, আমার মধ্যে উৎপন্ন সুখ-বেদনা অথবা উৎপন্ন দুঃখ-বেদনা সমগ্র চিত্ত অধিকার করে থাকবে, এই সম্ভাবনা নেই।[৩৯] *দীর্ঘ-নিকায়* এবং *মধ্যম-নিকায়*-এর ঘটনাকেই অভিনিষ্ক্রমণের প্রামাণিক কাহিনি বলে মনে হয়।

ঝ) বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি

সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলাভের ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত' প্রবন্ধানুসারে মহাভিনিষ্ক্রমণের পর সিদ্ধার্থ নিজের খড়্গ দিয়ে শিখা কাটার পর শুভ্রবস্ত্র ত্যাগ করে ব্যাধরূপ ইন্দ্রের দেওয়া গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করেন। তারপর সিদ্ধার্থের মগধ রাজ্যে গমন, বিম্বিসারের দেওয়া রাজ্য ও কামসুখ ভোগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, সিদ্ধিলাভের পর মগধ রাজ্যে আসার প্রতিশ্রুতি, গুরুদের সাধনাপদ্ধতিতে বিবিক্ত হয়ে আত্মসন্ধান, পঞ্চশিষ্যের প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। 'গৌতম বুদ্ধ' প্রবন্ধে সিদ্ধার্থের কেশ ও শিরস্ত্রাণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে – সিদ্ধার্থ তরবারি দিয়ে নিজের কেশগুচ্ছ কেটে শিরস্ত্রাণের সঙ্গে তা আকাশে ছুঁড়ে বলেন – যদি আমি ভাবী বুদ্ধ হই, তবে এই কেশদাম ঊর্ধ্বেই অবস্থান করুক নতুবা অচিরে ভূপতিত হোক। কেশরাশি নিমেষে উধাও হয়ে সুবর্ণপুটিকার মধ্যে স্বর্গের ত্রয়োত্রিংশ

দেবতার সামনে নীত হয়। এই ঘটনা বা বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির সময় ধরিত্রীর দোহাই ও ধরিত্রীর উত্তরপ্রদান ইত্যাদি কল্পনাসমৃদ্ধ অতিরঞ্জিত কাহিনি বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু সুখপাঠ্য।

'বুদ্ধচরিত' প্রবন্ধে শাক্যসিংহের বৈশালী গমন, মগধ প্রদেশ, রাজগৃহে বাস, বিম্বিসার রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ, পুনর্বার বৈঁশালী গমন এবং পুনরাগমন বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। সিদ্ধার্থের নয়নমুগ্ধকর 'অপরূপ রূপ ভিক্ষুক' মূর্তির কথা বারবার উঠে এসেছে। বিম্বিসারের সঙ্গে সিদ্ধার্থের কথায় বিষতুল্য কামের থেকে উত্তরণের প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে। এই প্রবন্ধের আকর্ষণীয় অংশটি হল *মহাবস্তু অবদান* থেকে চয়িত একটি গল্প যেখানে বুদ্ধ বৈশালী নগরীর ঘোরতর মারীভয় দূর করেছিলেন। হিমগিরির পর্বতে কুন্তলা যক্ষীর মৃত্যুর পর তার পুত্রেরা বৈশালীর অধিবাসীদের তেজোহরণ করে। তাতে লোক সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মরতে থাকে। কাশ্যপপূরণ, গোশালীর পুত্র, কাত্যায়ন গোত্রীয় কুমুদমুনি, কেশকম্বল, নির্গ্রন্থ মুনিঋষির সমাগম হলেও এই সমস্যার সমাধান হয় নি। দৈববাণী অনুসারে বিম্বিসার তখন রাজগৃহে অবস্থানরত বুদ্ধকে বৈশালীতে আনতে সচেষ্ট হন। বুদ্ধ অনুগামী হয়ে বিম্বিসারও বৈশালীতে আসেন। বুদ্ধের আগমনে বৈশালী সুভিক্ষ, নিরুপদ্রব হয়ে মরকভয় থেকে মুক্তি পায়। এই কাহিনির সঙ্গে *রামায়ণ*-এর লোমপাদ রাজ্যে অনাবৃষ্টি দূরীকরণে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আগমনের সাদৃশ্যটি লক্ষণীয়। বুদ্ধশ্রাবক সীবলী মহাস্থবিরের সম্পর্কে *ধম্মপদট্‌ঠকথা*-য় একই রকমের কাহিনি দৃষ্ট হয়।[৪০] *মহাবস্তু অবদান*-এর 'ছত্রবস্তু প্রকরণ'-এর এই কাহিনি সম্পর্কে প্রবন্ধকার লিখেছেন, বৈশালী গিয়ে মরক নিবারণ যদিও সিদ্ধার্থের বুদ্ধ হওয়ার পরে ঘটেছিল, তবুও কোন এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তা এই স্থলে প্রকটিত করা হয়েছে।[৪১] এই 'উদ্দেশ্য সাধনের' পিছনে কারণ স্পষ্ট নয়। এই কাহিনিকে সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির আগে তাঁর চরিত্রের মহনীয়তা প্রকাশক আখ্যান রূপে আখ্যায়িত করা যায়।

নির্বাণ মুক্তির সন্ধানী বোধিসত্ত্বের কঠোর সাধনা আত্মশক্তির পরাকাষ্ঠা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, বোধিসত্ত্বের ভূমিস্পর্শ মুদ্রার সিদ্ধালাভ বা বোধিলাভ অর্থাৎ বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির মূর্তি ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ও লোকপূজ্য। বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ নৈরঞ্জনা নদীতীরে ছয় বছর কৃচ্ছ্রসাধন করেন। প্রচলিত মতানুসারে 'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত'-এ লিখিত হয়েছে, ঐ সময়ে কামদেব বা মন্মথ বা কন্দর্প তাঁকে ঐহিক সুখাভিলাষী, ষড়রিপুর বশীভূত করবার মানসে সসৈন্যে বিবিধ প্রকার ছলনা করেন। সিদ্ধার্থকে

কামদেব সদুপদেশ ছলে উপবাসের অনর্থকতা ও দান, হোম, যজ্ঞাদির ফলপ্রাপ্তির কথা বললে তিনি প্রত্যুত্তরে জানান –

> হে মার! আমি অচিরাৎ তোমাকে পরাভূত করিব। তোমার প্রথম চর ইচ্ছা, দ্বিতীয় অলীক-আমোদ, তৃতীয় ক্ষুৎপিপাসা, চতুর্থ কাম, পঞ্চম তন্দ্রা ও অলস, ষষ্ঠ ভয়, সপ্তম সন্দেহ ও অষ্টম রাগ ও কাপট্য যাহারা কেবল স্বার্থপর – যাহারা কেবল বন্দিভাটদিগের নিকট যশঃপ্রার্থনা করে, – যাহারা কেবল সম্ভ্রমেচ্ছু, – যাহারা আত্মশ্লাঘী ও যাহারা পরনিন্দক – তাহারাই তোমার সেনার যোগ্য। কিন্তু যে মুনি বা ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয় সংযত করিয়াছেন, যিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, যিনি উত্তমরূপে বুদ্ধির চালনা ও বিবেকাধীনে সর্ব্ব কর্ম্ম নিষ্পন্ন করেন, রে মূঢ় তাহার তুমি কি করিতে পার?

কঠোর তপঃসাধনে শরীর অশক্ত ও অনাহারক্লিষ্ট হওয়ায় বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ এই পথ পরিত্যাগ করেন। স্নান করে দুই গোপকন্যার প্রদত্ত দুধ খেয়ে তিনি তৃণাসনে যোগাসনে বসে পরমতত্ত্ব লাভ করেন। ‘বুদ্ধদেবের জীবন বৃত্তান্ত’ প্রবন্ধে মারবিজয় ও বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির ঘটনা স্পষ্ট নয়। ‘গৌতমবুদ্ধ’ প্রবন্ধে গ্রামবাসী সুজাতার হাতে বোধিসত্ত্বের প্রাতঃরাশ খাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। বোধিসত্ত্ব যে সুবর্ণপাত্রে অন্নাদি খেয়েছিলেন তা নদীগর্ভে নিক্ষেপ করে বলেছিলেন, যদি আজই আমি বুদ্ধ হতে পারি তবে এই ভোজনপাত্র স্রোতোজলে উজান বেয়ে উঠুক, নয়তো এই দণ্ডেই জলমগ্ন হোক। আশ্চর্য যে সেই পাত্র কিছুক্ষণ স্রোতের বিপরীতে অগ্রসর ও জলমগ্ন হয়ে নাগরাজ কালের বাসভূমিতে চলে যায়। সেই দিন বোধিসত্ত্ব সন্ধ্যায় বোধিবৃক্ষের পাদদেশে দাঁড়িয়ে বৃক্ষের পূর্বদিকে ঘাসমুষ্টি ছড়িয়ে তার উপর বসে প্রতিজ্ঞা করেন, যদি আমার অস্থি, চর্ম, মাংস সমস্ত ক্ষীণ হয়ে যায়, যদি আমার শরীরের শোণিত জীবনীশক্তির বিলোপসাধন করে শুষ্ক হয়ে পড়ে, তথাপি আমি যতদিন না সত্যজ্ঞানের অধিকারী হয়ে বহুকল্পেও সুদুর্লভ সেই সম্বোধি লাভ করতে না পারি, ততদিন এই পরিগৃহীত আসন পরিত্যাগ করব না। এরপরে কামদেব আক্রমণ, প্রলোভন, নানা উপদ্রবের অবতারণা করেও বোধিসত্ত্বকে উদ্দেশ্যবিমুখ করতে পারেননি। তাঁর অসুর প্রাকৃতির দলবলের ভীষণ অত্যাচার ও নিদারুণ উৎপাতের ভয়ে বোধিসত্ত্বের পার্শ্বচর দিক্‌পাল দেবগণও পালিয়ে গেলেও ‘তথাগত’ একাকী নিজ আসনে স্থির ও নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। দুরাচার মার তাঁর উপরে ভীষণ বাত্যা প্রবাহিত করে, অবিশ্রান্ত উপলখণ্ড, তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র জ্বলন্ত অঙ্গার ও ভস্মরাশি অভিবর্ষণ করেও তাঁকে কোনভাবে বিচলিত করতে পারেন নি। সেইগুলি তাঁর শরীর স্পর্শ করার আগেই কোমল কুসুমে পরিণত হয়েছিল। বোধিসত্ত্ব তাঁর আসনে বসে কর্মের অধিকারী – এই স্বীকৃতির জন্য

ধরিত্রীর থেকে সাক্ষ্য চাইলে তিনি সেই আহ্বান অনুমোদন করেছিলেন। দুরাচার কামদেবের সৈন্যদল ধরিত্রীর শব্দে ভয়াকুল হয়ে লজ্জানত মুখে প্রস্থান করলে দেব-নাগ-সকল প্রাণিকুল বোধিসত্ত্বের জয়গান করেন। বোধিসত্ত্ব শত্রুদল পরাজয় করে সেই রজনীযোগে বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত হন। রজনীর প্রথম প্রহরে তিনি জাতিস্মর হয়ে পূর্ব-পূর্বজন্মের সকল জ্ঞানলাভ; দ্বিতীয় প্রহরে জীবজগতের যাবতীয় অবস্থা বিদিত; তৃতীয় প্রহরে কার্যকারণ পরম্পরা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের বিষয়ীভূত এবং রজনী প্রভাত হলে তিনি সর্বজ্ঞ 'বুদ্ধ' হয়েছিলেন।

ঞ) মার-বিজয়

মার-বিজয় বৌদ্ধসাহিত্যের বর্ণময় বিষয়। 'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত'-এর পাদটীকায় 'কামদেব' সম্পর্কে তুলনামূলক পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয়েছে –

> বৌদ্ধদিগের মতে কামদেব সৎব্যক্তিমাত্রের শত্রু; এবং যাহাতে তাহারা সৎপথভ্রষ্ট হয় এই তাঁহার কার্য্য। ফলতঃ মুসলমানদিগের সৈতান যে প্রকার বৌদ্ধদিগের মার বা কামদেব তদ্রূপ। হিন্দুশাস্ত্রে এতাদৃশ বর্ণন কুত্রাপি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

মহাবর্গ-এর 'মহাস্কন্ধ'-এর 'মার-কথা'য় বোধিসত্ত্বের সঙ্গে মারের কথোপকথন ও পরাজয়ের উল্লেখ আছে। বোধিসত্ত্ব মারের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হলে মার দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল।[৪২] *সুত্তনিপাত, মহাবর্গ*-এর 'প্রধান সূত্র'-এ মার এবং বোধিসত্ত্বের সংগ্রাম প্রসঙ্গ এসেছে। শ্রদ্ধা, বীর্য, প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও বদ্ধপ্রতিজ্ঞ বোধিসত্ত্ব সর্বোত্তম অনুভূতির অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত হয়ে জীবের শুদ্ধত্ব অবলোকন করেন। মারের প্রথম সেনা কাম, দ্বিতীয় অরতি, তৃতীয় ক্ষুৎপিপাসা, চতুর্থ তৃষ্ণা, পঞ্চম আলস্য ও তন্দ্রা, ষষ্ঠ ভীরুতা, সপ্তম বিচিকিৎসা, অষ্টম কুহনা ও জড়তার সঙ্গে মরণপণ সংগ্রাম করে বোধিসত্ত্বের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জয়যুক্ত হলে মার ভীত ও শোকাভিভূত হয়ে সৈন্যসহ অন্তর্ধান করে।[৪৩]

কখনো বিবদমান ভিক্ষুদের বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য বুদ্ধদেব উক্কট্ঠার সুভগবনে শালরাজমূলে অবস্থানকালীন বকব্রহ্মার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। পাপাত্মা মার জনৈক ব্রহ্মপার্ষদের দেহে আবিষ্ট হয়ে বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছেন। *মধ্যম-নিকায়,* 'ক্ষুদ্রযমক বর্গ'-এর 'ব্রহ্মনিমন্ত্রণ-সূত্র'-এ বকব্রহ্মা ব্রহ্মালোকের গুণাবলী বর্ণনা করে ভগবান বুদ্ধকে ব্রহ্মালোকে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন। এতে মারের আলাপ বন্ধ করবার এবং ব্রহ্মার অভিনিমন্ত্রণের বিষয় বিবৃত হয়েছে, তাই এই ধর্মব্যাখ্যানের নাম 'ব্রহ্মনিমন্ত্রণ'।

সম্যকসম্বুদ্ধের ধর্মপ্রচারে মার অতিক্রমণের প্রসঙ্গও এখানে বিবৃত হয়েছে। 'মহাযমক বর্গ'-এর 'ক্ষুদ্রগোপালক-সূত্র'-এ বুদ্ধদেব শিষ্যদের অসামান্য দৃষ্টান্তসহ মারস্রোত ভেদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন – যেইভাবে বড় বড় এঁড়ে ও বক্না বাছুরগুলি তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করে নিরাপদে অন্যপারে যায়, তেমনি যে সকল ভিক্ষু ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয়ে এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহের অল্পতায় সকৃদাগামী হয়ে মাত্র একবার মর্ত্যে জন্ম নিয়ে দুঃখের অন্ত করেন, তাঁরা তির্যকভাবে মারস্রোত ভেদ করে নিরাপদে অন্যপারে যান। 'সিংহনাদ-বর্গ'-এর 'দ্বিধাবিতর্ক সূত্র' মতে 'কাল-বিতর্ক' আত্মব্যাধি, পরব্যাধি, আত্মপর উভয়-ব্যাধি ঘটাবার দিকে সংবর্তন করে। এটি 'প্রজ্ঞানিরোধকারী, বিঘাতপক্ষ এবং নির্বাণ-প্রতিপক্ষ'। এই সূত্রে মারের এক চমৎকার রূপক উপস্থাপিত হয়েছে। 'ঔপম্যবর্গ'-এর 'নিবাপসূত্র'-এ মারকে ব্যাধ এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণদেরকে চারদল মৃগযূথের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তার তিনদল শ্রমণ ব্রাহ্মণ তিনদল মৃগযূথের মত মারব্যাধ প্রলোভনে ধরা পড়েন। আর যাঁরা চারপ্রকার ধ্যানাদি সহায়ে প্রজ্ঞালাভ করে ক্ষীণাসব হয়েছেন তাঁরাই মারবিজয় করেছেন। এঁরাই চতুর্থ মৃগযূথের মতো মারব্যাধ বা কামের প্রলোভন থেকে দূরে থাকেন।[৪৪]

থেরীগাথা-য় ৭ সংখ্যক শ্লোকে ধীরা, ১০ সংখ্যক শ্লোকে উপশমা, ৫০ সংখ্যক শ্লোকে দণ্ডিকা ও ৬৫ সংখ্যক শ্লোকে ভদ্রাকাপিলানীর মারবিজয়ের কথা রয়েছে।[৪৫] *ধম্মপদ*-এর 'চিত্তবগ্‌গো'র ৫ এবং ৮ শ্লোকে মারের প্রসঙ্গে এসেছে –

দূরংগমং একচরং অসরীরং গুহাসয়ং,

যে চিত্তং সঞ্ঞমেস্‌সন্তি মোক্‌খন্তি মারবন্ধনা।

দূরগামী, একচর, অশরীর ও হৃদয়গুহাশ্রিত চিত্তকে যাঁরা সংযত করেন, তাঁরা মারবন্ধন থেকে মুক্ত হন।[৪৬]

কুম্ভূপমং কায়সিমং বিদিত্বা নগরূপমং চিত্তমিদং ঠপেত্বা,

যোধেথ মারং পঞ্ঞায়ুধেন জিতঞ্চ রক্‌খে অনিবেসনো সিয়া।

এই দেহকে কলসীর মতো (ভঙ্গুর) মনে করে, এই চিত্তকে নগরের মত সুরক্ষিত করে প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা মারের সঙ্গে যুদ্ধ কর, এইরূপে বিজিত ধনকে সযত্নে রক্ষা কর; কিন্তু তার প্রতি আসক্তি রেখো না।[৪৭]

বৌদ্ধসাহিত্যে বর্ণিত মার হিন্দুসাহিত্য-পুরাণে বর্ণিত 'কাম' বা 'মদন' নয়। অবশ্য মূলতঃ মার 'কাম'ই – কাম থেকে মানুষের সর্বপ্রকার দুষ্প্রবৃত্তি ও দুষ্কর্মের অবতারণা হওয়ার জন্য 'কাম'কেই বৌদ্ধসাহিত্যে মারের প্রথম সেনা বলা হয়েছে। বৌদ্ধসাহিত্যে 'মার' একটি ব্যাপকার্থ লাভ করেছিল। 'মার'

হল 'পাপিমা' – কণ্হ (কৃষ্ণ) অর্থাৎ জীবনে যা কিছু 'কালো' তারই মূর্ত প্রতীক। মারের বহু সেনার মধ্যে প্রধান 'কাম'-এর দ্বারাই অন্যান্য দুষ্প্রবৃত্তিচয় প্রেরিত এবং পরিচালিত হয়। বৌদ্ধধর্মে বর্ণিত মারের ধারণা অনেকাংশে খ্রিস্টধর্মে বর্ণিত 'শয়তান'-এর অনুরূপ। জীবনের যা কিছু দুষ্প্রবৃত্তি, দুর্বুদ্ধি, দুষ্কর্ম, প্রলোভন প্রভৃতি সকলের মূলেই মার রয়েছে।[৪৮]

বুদ্ধের মারবিজয় অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গ, *ললিতবিস্তর* কাব্যের একবিংশ অধ্যায় 'মারধর্ষণ পরিবর্ত্ত' ও *জাতক নিদানকথা*-র 'অবিদূর নিদান'-এ অসামান্য কাব্যসুষমায় বর্ণিত হয়েছে। সম্যক সম্বোধির জন্য দৃঢ়মানস হয়ে বোধিবৃক্ষমূলে পর্যঙ্কবন্ধনে নিষণ্ণ বুদ্ধের প্রতি সসৈন্য মারের আক্রমণ, যুদ্ধ এবং বুদ্ধের মারবিজয়ের একটি বিশদ বিবরণ *জাতক নিদানকথা*-র 'অবিদূর নিদান' পাওয়া যায়।[৪৯] অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* অনুযায়ী কামদেব, চিত্রায়ুধ, পুষ্পশর, মোক্ষ-রিপু মার একই। মারের তিন পুত্র – বিভ্রম, হর্ষ ও দর্প এবং তিন কন্যা – রতি, প্রীতি ও তৃষ্ণা। মার পুষ্পময় ধনু ও বিশ্বজগতের মোহকর পঞ্চশর নিয়ে বোধিদ্রুমতলে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্বের ধ্যান ভাঙাতে পুত্র-কন্যাসহ উপস্থিত হয়। সসৈন্য মারের সঙ্গে তুমুল সংগ্রামের বিস্তৃত বিবরণ এখানে রয়েছে। বোধিসত্ত্ব মারবিজয় করে 'মহাপ্রীত্যাহাররূহ' সমাধিতে মগ্ন হন।[৫০] *ললিতবিস্তর* কাব্যে মারবিজয় সুন্দরভাবে বর্ণিত। কল্পনায় অভিনবত্বও রয়েছে। মার-পুত্রদের মধ্যে যারা বোধিসত্ত্বের প্রতি অভিপ্রসন্ন, তারা মারের দক্ষিণ পাশে দণ্ডায়মান, আর যারা বোধিসত্ত্বের প্রতি বিমুখ ও মারের পক্ষাবলম্বী, তারা মারের বাম পাশে দণ্ডায়মান ছিল। মারসৈন্যরা বোধিসত্ত্বের তপোভঙ্গের জন্য, অন্যদিকে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্বলাভের জন্য বদ্ধপরিকর হন। বোধিলাভের প্রত্যয়ে বোধিসত্ত্বের সংগ্রামের কাছে মারসৈন্য, মারপুত্র-কন্যা এবং স্বয়ং মার সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়েছে –

> এই উত্তম আসনে আজ বোধিকে এবং দশ অসাধারণ অনাসক্ত স্বতন্ত্র (=আবেণিক) বুদ্ধবলকে এবং সকল প্রতিসংবিদাকে পাইবে। হে বীর, মৈত্রী দ্বারা, প্রতারক মারের বিপুল দলকে পরাস্ত করিয়া পূর্ণ বুদ্ধ রাজ্য লাভ করিবে।[৫১]

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বৌদ্ধগ্রন্থের মারবিজয়ের সঙ্গে কালিদাসের *কুমারসম্ভব* আর *শিবপুরাণ*-এর কন্দর্পজয়ের অনেক সৌসাদৃশ্যের প্রতি দৃশটি আকর্ষণ করেছেন। *কুমারসম্ভব* আর *শিবপুরাণ* উভয়ই *ললিতবিস্তর* ও পালিগ্রন্থসমূহের পরবর্তী রচনা। বোধিসত্ত্ব মারের সঙ্গে তর্ক ও যুদ্ধ করতে অনেক সময় অতিবাহিত করেছিলেন। কিন্তু শিব কন্দর্পের সঙ্গে বৃথা তর্ক বা যুদ্ধে না গিয়ে ক্ষণকালের মধ্যেই ভস্মীভূত

করেছিলেন। শিব কন্দর্পের বিনাশ করলেও বোধিসত্ত্ব মারের প্রাণসংহার করেন নি। প্রথমে কন্দর্পের বাণে আহত হয়ে শিব কিছু পরিমাণে ধৈর্য হারিয়েছিলেন, কিন্তু পরে চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে নিগৃহীত ও বশীভূত করেন। পক্ষান্তরে বোধিসত্ত্ব কোন অবস্থাতেই ধৈর্যচ্যুত হননি। হিন্দুগ্রন্থ মতে, কন্দর্পের স্ত্রীর নাম রতি, অন্যদিকে বৌদ্ধগ্রন্থমতে রতি মারের কন্যা।[৫২]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকল্পের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বৌদ্ধ মার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তিনি বুর্ণুফের মত উল্লেখ করে বলেছেন, বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচারের পরবর্তীকালে কৃষ্ণোপাসনা প্রবর্তিত হয়। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ *সুত্তপিটক*-এ কৃষ্ণকে অসুর বলা হয়েছে। সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্র *ললিতবিস্তর*-এ কৃষ্ণের নাম আছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে (*প্রচার*, আশ্বিন, ১২৯১) মন্তব্য করেছেন – নাস্তিক ও হিন্দু ধর্মবিরোধী বৌদ্ধেরা কৃষ্ণকে অসুর বিবেচনা করেছেন। বেদাদিতে ইন্দ্রাদি দেবতাকে অসুর বলা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের প্রধান শত্রু প্রবৃত্তির নাম 'মার'। কৃষ্ণপ্রচারিত 'অপূর্ব্ব নিষ্কামধর্ম্ম', 'সনাতন ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সংস্কার' ও কৃষ্ণ-উপাসনা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের 'প্রধান বিঘ্ন' ছিল বলে কৃষ্ণকেই বৌদ্ধেরা অনেক সময় 'মার' বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন।

হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী, কামদেব বা মন্মথ প্রেমের ও সৌন্দর্যের দেবতা। কামবিজয়ই বোধিলাভের সোপান হওয়ায় বৌদ্ধমতে হিন্দু কামদেবের অপকর্ষ ঘটেছে। বৌদ্ধসাহিত্যে কামদেব পূর্ণ চরিত্রের সম্মান না পেয়ে মারের সেনামাত্রে পরিণত হয়েছেন।

ট) 'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত' – কয়েকটি বিচার

সাময়িকপত্রে বুদ্ধজীবন নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ 'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত'। বুদ্ধজীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অধিকাংশই এতে স্থান পেয়েছে। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্রগুলি পরবর্তীকালের প্রবন্ধগুলিতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। যেমন – 'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত'-এর বুদ্ধত্বলাভের পর গয়ায় 'সপ্ত-সপ্তাহ' বাসের উল্লেখমাত্র 'গৌতম বুদ্ধ' প্রবন্ধে বোধিদ্রুমতলে, অজপাল ন্যগ্রোধ (বটবৃক্ষ) মূলে, মুচলিন্দ বৃক্ষের ছায়ায়, রাজায়তন বৃক্ষের নিচে কাটানো; দুই বণিক-প্রসঙ্গ (ত্রপুষ ও ভল্লিক); ভিক্ষাপাত্র; বৌদ্ধসংঘের প্রথম উপাসকদ্বয়ের দীক্ষাদানের প্রসঙ্গ তথ্যসহ উপস্থাপিত হয়েছে।

‘শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত’ প্রবন্ধে বুদ্ধের উপলব্ধ ধর্ম জনসাধারণে বিতরণের দ্বিধা; পঞ্চশিষ্য প্রসঙ্গ; প্রধান দুই ধর্মসেনাপতি মৌদ্‌গল্যায়ণ, সারিপুত্র এবং প্রবীণ কাত্যায়নের শিষ্যত্বগ্রহণ; জেতবনে বুদ্ধের তেরো বছর বাস; কোশলরাজ প্রসেনজিৎ প্রমুখের বৌদ্ধধর্মগ্রহণ; শাক্যরাজবংশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের বৌদ্ধধর্মাবলম্বন; গঙ্গার উত্তর-দক্ষিণ তীরের দুই অঞ্চলের রাজাদের বুদ্ধের মধ্যস্থতায় বিবাদ ভঞ্জন; বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের বর্ণনা, মহাপরিনির্বাণের পর শিষ্যদের বুদ্ধের দেহ নিয়ে কর্তব্য, বুদ্ধের ভস্মরাশি ‘অষ্ট-দ্রোণ’ পরিমিত করে পূজার্চনার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বুদ্ধের ভস্মাবশেষ নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হলে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের মধ্যস্থতায় ভস্ম ভারতের অষ্টস্থানে বিতরিত হয়। প্রত্যেক স্থানেই ভস্মের উপর এক-একটি চৈত্য নির্মিত হয়েছিল। সিংহলে বুদ্ধের একটি দন্ত পূজিত হয় – এই তথ্য দেওয়ার পর প্রবন্ধে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য – সিংহলী এলুভাষায় বিরচিত *দলদাবংস* গ্রন্থটি বুদ্ধের একটি দাঁতের ঘটনাপঞ্জী। পরে এটি পালিতে *দাঠাবংস* নামে অনূদিত হয়। কলিঙ্গাধিপতিদের ইতিহাস রচনার উপাদান, অন্যদিকে কলিঙ্গ থেকে সিংহলে উপনীত হওয়ার সময় থেকে সিংহলের রাজা কিত্তিসিরি মেঘবন্ন ও তৎপরবর্তী সিংহলী রাজাদের একটি বংশচিত্রও এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। ক্যাণ্ডিতে রক্ষিত এই দন্তধাতু সিংহলের ধার্মিকদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র।[৫৩] এর অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডও জনমানসে উৎসাহ সঞ্চার করে। কাজেই সিংহলের বুদ্ধের দন্তপূজার তথ্যটি বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু দন্তটির আকৃতি কোন মানুষের হওয়া সম্ভব নয়।

‘বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্তান্ত’ প্রবন্ধের অনেক তথ্যই দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। যেমন – সিদ্ধার্থের পিতা, মাসি বা পালিতা মা, সারথী, ঘোড়া, ব্রাহ্মণ গুরুদ্বয়, পঞ্চশিষ্য, মগধরাজ, মগধ যুবরাজ প্রভৃতি কারও নামের উল্লেখমাত্র নেই, অনির্দিষ্টভাবে কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে মাত্র। অথচ এই প্রবন্ধেই নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে বুদ্ধদেব সৃষ্ট ‘এক নূতন ধর্ম্ম’ পঁয়তাল্লিশ কোটি পাঁচলক্ষ মানুষ বিশ্বাস করেন। একটি জনশ্রুতিকে প্রাবন্ধিক হাজির করে বলেছেন, বুদ্ধ গঙ্গানদীর তটে উপস্থিত হয়ে একটি শ্বেতকায় পাথরের উপর দাঁড়িয়ে মগধের রাজধানী রাজগৃহের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলেন, ‘এই সুরম্য এবং সাতিশয় আদরণীয় নগরের প্রতি আমার কোপদৃষ্টি’। করুণাঘন বুদ্ধ রাজগৃহের প্রতি ‘কোপদৃষ্টি’পাত করেছেন তা প্রাবন্ধিক কোথায় পেলেন তার কোন উল্লেখ নেই। অথচ এই ধরণের বাক্য ব্যবহার করে কি প্রাবন্ধিক বুদ্ধের চরিত্রমহিমাকে খর্ব করার চেষ্টা করেছেন? আরেকটি দৃষ্টান্ত আমাদের

সন্দেহের স্বপক্ষে বলা যায়। মহাপরিনির্বাণ বর্ণনানুযায়ী বুদ্ধদেব এক বিশাল শাল তরুতলে উপবিষ্ট হয়ে বিশ্রামকালে স্বয়ং আপনার জীবাত্মাকে ধূলিময় দেহ থেকে অপসারিত করে নিলেন। আমাদের প্রশ্ন, বৌদ্ধদর্শন যেখানে অনাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে 'জীবাত্মা'র মত পারিভাষিক শব্দ প্রাবন্ধিক কীভাবে স্বয়ং বুদ্ধ সম্পর্কেই প্রযুক্ত করলেন?

'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত' প্রবন্ধে চতুরার্যসত্যের উল্লেখ রয়েছে, ব্যাখ্যা নেই। এই জীবনচরিত সম্পর্কে প্রবন্ধকার জানিয়েছেন, পুরাণাদিতে রামকৃষ্ণাদি হিন্দুদেবতার জীবন বিবরণে যে সকল অলৌকিক ব্যাপার বর্ণিত আছে, বৌদ্ধেরা তার অনুকরণ করেছেন। পৌরাণিক বিবরণ শাক্যচরিত্রের আদর্শ হওয়ার ফলে প্রকৃতের সঙ্গে তার অত্যল্পমাত্র সম্বন্ধ রয়েছে। তিনি আবার এও স্বীকার করেছেন, গৌতমগোত্রে শাক্য নামে ব্যক্তির জন্ম, সন্ন্যাস, বিশেষ ধর্মপ্রচার অবশ্য স্বীকার্য, শাক্যের দেহাবশিষ্ট ভস্মের উপর যেসকল চৈত্য নির্মিত হয়েছিল সেগুলি ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপ। এছাড়াও হিন্দুশাস্ত্রে শাক্যের জন্মের কথা উল্লিখিত রয়েছে। প্রাবন্ধিক নিরীশ্বর সাঙ্খ্যদর্শনকে অবলম্বন করে বুদ্ধের মতের স্থূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। পশুঘাতনের নিষেধ তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য এবং এবিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছিলেন। যজ্ঞাদিতে জীব হিংসা নিবারণ করার জন্যেই বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধের অবতরণের কারণ দেখিয়ে কবি জয়দেব লিখেছেন –

> নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহরহঃ শ্রুতিজাতং, সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্।
>
> কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।।[৫৪]

বৌদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, প্রাবন্ধিক হিন্দুসাপেক্ষেই 'বুদ্ধচরিত'-এর বিচার করেছেন।

ঠ) 'শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়'

রামদাস সেনের (অস্বাক্ষরিত রূপে প্রকাশিত) 'শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়'[৫৫] কবিতায় (*জ্ঞানাঙ্কুর*, শ্রাবণ, ১২৮০) বুদ্ধদেবের চরিত্র চিত্রণ করা হয়েছে। কবিতা অনুযায়ী – যুদ্ধ, রক্তপাত ইত্যাদি ক্ষত্রোচিত নিষ্ঠুর কাজ করে লোকসমাজে পূজ্য হওয়ার বাসনা সিদ্ধার্থের মনে কখনো স্থান পায়নি। রাজপুত্র হয়েও রাজ্যভোগ ত্যাগ করে নবীন বয়সে যোগাভ্যাস ও কাম-ক্রোধস্বরূপ শত্রুবিজয় করে তিনি 'চিরযোগী' হয়েছেন। চরিতকাব্য লিখবার চিরাচরিত পন্থায় বুদ্ধের চারিত্রগুণ নিয়ে এই কবিতাটি লেখা হয়েছে।

প্রচলিত পয়ার বন্ধে লিখিত এই কবিতায় ভাবপরিবর্তনের জন্য বা নিছকই বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য ত্রিপদী ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা চৈতন্যচরিত কাব্যের ঢঙে চৈতন্যের গুণ বুদ্ধে আরোপিত হয়েছে।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ত্রিচীবর পড়েন। এই কাষায় বস্ত্রের তিনটি অংশ। *মহাবর্গ*-এর 'চীবর-স্কন্ধ' অধ্যায়ে বুদ্ধদেব ভিক্ষুদের ত্রিচীবর (দোহারা (দ্বিগুণ) সঙ্ঘাটি, একগুণ উত্তরাসঙ্গ এবং একগুণ অন্তর্বাস) ব্যবহার করতে বলেছেন।[৫৬] ভিক্ষুদের হাতের ভিক্ষাপাত্র 'অষ্টাপরিষ্কার' নামে পরিচিত। অথচ চৈতন্যের গুণ আরোপ করে কবি বুদ্ধকে বৈষ্ণব সাজিয়ে ছেড়েছেন –

পরনে কৌপীন কমণ্ডলু করে,

দেববৎ হাস্য আস্য শোভা করে,

প্রশান্ত বদনে সুবিমল কান্তি

হেরিলে মুনির মানস হরে।

জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*-এর দশাবতার স্তোত্রে অনুপ্রাণিত রামদাস বুদ্ধকে অবতার রূপে চিত্রিত করেছেন। ত্রিপদী বন্ধে লিখিত এই অংশটির মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর পদধ্বনি শোনা যায় –

বুদ্ধ অবতার,   মহিমা অপার

যোগীন্দ্র ঘোগেতে (যোগেতে) সদা মগন,

মায়া দেবীসূত   বহু গুণযুত,

সত্য নররূপে নৃপনন্দন।

বিশ্বনাথ কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণ*-এর প্রথম পরিচ্ছেদে ভাবের উদাহরণ স্বরূপ অনির্বচনীয়ের (নারায়ণ) বন্দনায় ধ্যানের প্রভাবে বুদ্ধের সমস্ত বিশ্ব অধিকারের কথা বলেছেন –

ধ্যানে বিশ্বমসাবধার্মিককুলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ।।[৫৭]

অমর কিন্নর, অপ্সরা, দেবপুরন্দর এবং দেবতাদের এই স্তুতিগানে অক্ষয় ধর্মের মহিমা প্রকাশিত –

অহিংসা পরমধর্ম্মের জয়।

সর্ব্বজীবে সম,   দয়া অনুপম,

হেন ধর্ম্ম কভু না হবে ক্ষয়।

স্বর্গ বিদ্যাধরীরা মৃদুমন্দ রবে মধুর স্বরে বীণা বাজিয়ে বুদ্ধের যশোগান করছেন। স্বর্গের অগণন দেবতা 'বুদ্ধ অবতার' 'মহিমা অপার' প্রতিধ্বনি করায় মানুষেরা অবাক হন। হিন্দু প্রকল্পেই পুরো কাব্যাংশটি লিখিত হয়েছে। সশিষ্য বুদ্ধ নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'আর্য্যশাস্ত্র'কে 'সামঞ্জস্য' করে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয়

দিয়েছেন। জ্ঞানমার্গ অনুযায়ী বন্ধনবিহীন ভবে ভোগ বিলাসহীন জীবনের উদ্দেশ্য নির্ব্বাণ কামনা। কবিতায় এই 'নবধর্ম্ম'-এর সম্পর্কে প্রত্যাশা ধ্বনিত হয়েছে –

রসাতলে যাক বেদ যাগ যজ্ঞ,

পশু বলিদানে নিত্য উল্লাস।

জয়দেবের দশাবতার বন্দনায় বুদ্ধপ্রসঙ্গ বাদ দিলে পশুঘাতকে রক্ষণশীল হিন্দুরা ভালো চোখে দেখেন নি, তাই তাকে কেন্দ্র করে নানা গল্প ফাঁদতে হয়েছে। *বিষ্ণুপুরাণ*-এর তৃতীয়াংশের সপ্তদশ অধ্যায়ে বিষ্ণুর নিজ দেহ থেকে মায়ামোহ উৎপাদনের প্রসঙ্গ রয়েছে। মায়ামোহ সমুদায় দৈত্যকে মোহিত ও বেদমার্গবিহীন করলে, দেবতারা অনায়াসে তাঁদের বিনাশ করবেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে মায়ামোহ (বুদ্ধ) দৈত্যদের বেদভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে পশুহিংসা নিবৃত্তির কথা বলেছেন। মায়ামোহ বিষ্ণু দেহজাত, অর্থাৎ বিষ্ণু অবতার। তাঁর কৌশলের স্তুতি করে এই শ্লোক লিখিত হয়েছে –

স্বর্গার্থং যদি বাঞ্ছা বো নির্বানার্থমথাসুরাঃ।

তদলং পশুঘাতাদিদুষ্টধর্ম্মৈর্নিবোধত।।

বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগচ্ছথ।

বুধ্যধ্বং মে বচঃ সম্যগ্ বুধৈরেবমুদীরিতম্।।

অর্থাৎ, হে অসুরগণ! যদি নির্বাণমুক্তি বা স্বর্গ তোমাদের কামনা থাকে, তাহলে পশু হিংসা প্রভৃতি দুষ্ট ধর্মে কোন ফল হবে না – এটি জানবে। জগৎ বিজ্ঞানময় বলে অবগত হও।

এই অধ্যায়ে অসুরদের মায়ামোহের উপদেশদান, বৌদ্ধধর্মোৎপত্তি, নগ্নদোষ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মায়ামোহ (বুদ্ধ) 'দিগম্বরো মুণ্ডো বর্হিপত্রধরো দ্বিজ' হয়ে দৈত্যদের পারলৌকিক ফললাভের জন্য তপস্যা থেকে নিবৃত করেন। নির্বাণমুক্তির স্বপক্ষে মায়ামোহ নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন ও পরিবর্ধিত বাক্যসমূহ দ্বারা দৈত্যদের বেদমার্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। ধর্ম-অধর্ম, সৎ-অসৎ, মুক্তির কারণ-বদ্ধতা, পরমার্থ-পরমার্থ নয়, বিষয়ের প্রকৃত ধর্ম, দিগম্বরের ধর্ম, বহুবস্ত্র মানুষের ধর্ম ইত্যাদি নানাপ্রকার সংশয়জনক বাক্য বলে মায়ামোহ দৈত্যদেরকে স্বধর্ম পরিত্যাগ করান। যে সকল মানুষ মায়ামোহ-প্রবর্তিত ধর্মে প্রবৃত্ত, বেদরূপ আবরণ ও চতুর্বিধ আশ্রম পরিত্যাগ করায় তারা নগ্ন রূপে পরিচিত হয়েছেন।[৫৮] *অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ* প্রভৃতিও এইক্ষেত্রে *বিষ্ণুপুরাণ* অনুসারী। *শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ*-এর প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ২৪ সংখ্যক পদে বিষ্ণুর একবিংশতি অবতারের প্রসঙ্গে বুদ্ধের নাম উল্লিখিত হয়েছে –

ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।

বুদ্ধো নাম্মাহজনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।।

শ্রীভগবান একবিংশ অবতারে কলিকালে অসুরপ্রকৃতি জনগণকে মোহন করবার জন্য গয়াপ্রদেশে অঞ্জনের পুত্র বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হবেন – এই কথা উক্ত হয়েছে।[৫৯]

বল্লভাচার্য *বেদান্তসূত্র*-এর দ্বিতীয় পাদের ষড়বিংশ সূত্রের ব্যাখ্যায় আখ্যায়িকা উপস্থাপন করেন। অভাব পদার্থ থেকে ভাব পদার্থের উৎপত্তি হয় এই মত খণ্ডন করে ভগবান ব্যাস বেদসমূহের প্রামাণ্য সংস্থাপন করেন। এরপর বুদ্ধ দৈত্যদের বিমূঢ় করবার জন্য প্রবৃত্ত হন। তিনি রুদ্ররূপী মহাদেবকে সম্বোধন করে বলেন –

ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়।

অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।।

সাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।।

বুদ্ধকে মোহশাস্ত্র বিরচন করতে, অতথ্য ও বিতথ্য ব্যাপারসমূহ প্রদর্শন করতে অনুরোধ করা হয়। যাতে কল্পিত শাস্ত্রের সাহায্যে সকলে বুদ্ধের প্রতি বিমুখ হন। বুদ্ধদেবের আদেশানুসারে রুদ্র প্রমুখও স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হয়ে বৈদিকধর্মে প্রবেশ করে লোকের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বেদসমূহের যথার্থ ব্যাখ্যা করেন। এরপর তাঁরা অস্তি ও নাস্তির অতীত অবিদ্যা নামক পদার্থকে জগৎপ্রবাহের কারণ বলে নির্দেশ করেন। সেই অবিদ্যার নিবৃত্তিতেই নির্বাণ লাভ হয়, এই কথা বলে কতগুলি জাতিভ্রষ্ট সন্ন্যাসী ও পাষণ্ডের সৃষ্টি করেন। এই সকল দেখে ব্যাস তাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। ব্যাস শঙ্করের সঙ্গে কলহ করে তাঁকে অভিশাপ দিয়ে মৌনাবলম্বন করেন। শঙ্কর এইভাবে জগৎকে বিমুগ্ধ করলেন। অগ্নিদেব সেখানে উপস্থিত হয়ে বেদসমূহকে উদ্ধার করে সমস্ত মোহ নিবারণ করেন।[৬০]

এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে স্বতই প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধজীবন এবং বৌদ্ধধর্ম হিন্দুদের প্রবল প্রতিযোগী হয়ে ওঠার কারণে বুদ্ধচরিত্রকে ছলে বলে কৌশলে গ্রাস করাটাই ব্রাহ্মণ্যবাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শত্রুরূপেই হোক বা মিত্ররূপে, বুদ্ধচরিত্র যে কোনভাবেই উপেক্ষণীয় নয় তা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বুদ্ধ সম্পর্কিত বহুবিধ অবস্থানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রূপকের অসামান্য ব্যবহারে বুদ্ধ 'জ্ঞানের শিখর' রূপে কল্পিত হয়েছেন। আর তাঁর জ্ঞান বারিধারায় কশ্যপ, উপালী, আনন্দ প্রমুখ পৃথিবীর সকলে তৃপ্ত। বৌদ্ধদর্শনের সারকথা কয়েকটি আঁচড়েই পরিস্ফুট হয়েছে –

মায়াময় এই সংসার আঁধার,

তাহে জীব পায় কষ্ট, অনিবার

স্বীয় কর্ম্ম গুণে, পাপ আচরণে

সবাই অধীন মরন জরা।

স্বভাবে উৎপত্তি স্বভাবেতে লয়,

স্বভাবেই হয় জীব সমুদায়,

নির্ব্বাণেই সুখ ...

আচার্যগণ বুদ্ধের শরণ নিয়ে মিথ্যা কদাচার দলন করে বৌদ্ধধর্মের জয়গান করেন। যদিও জ্ঞানযুদ্ধেই বুদ্ধের সিদ্ধি, 'ভব যাতনা' নাশ করবার জন্যই বুদ্ধের শরণ নেওয়া, তবুও দেব-নরের ভক্তিভাবের আধার রূপে তাঁকে 'বাঞ্ছা কল্পতরু' দেবতা বানিয়ে ফেলা হয়েছে। চৈতন্যের আদলে মহামানব বুদ্ধকে পরম তত্ত্বের রূপ দিয়েছেন কবি –

জয় গুণাকর শোক তাপ হর,

জগতে পবিত্র তোমার নাম।

এক মাত্র গুরু, বাঞ্ছা কল্পতরু

তুমিই কেবল আনন্দ ধাম।

নানা গুণ ধর ত্রিকালজ্ঞ বর

সংসারের কষ্ট জরা মরণ –

করহ বিনাশ, এই মাত্র আশ

তব শ্রীচরণে লই শরণ।

বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ – ত্রিরত্নের কাছে শরণগ্রহণ বৌদ্ধ পরম্পরা। রামদাস সেনের কবিতাটির আবেদনে বৈষ্ণব পদাবলীর সুর বেজেছে। চণ্ডীদাসের পদে কৃষ্ণের প্রতি রাধার সমর্পণের সুর আর রামদাসের কবিতাংশের নিবেদন কোথাও এক হয়ে গেছে। যদিও উৎকর্ষের বিচারে বৈষ্ণব পদটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চণ্ডীদাসের পদটি উদ্ধৃত হল –

বন্ধু কি আর বলিব আমি।

জীবনে মরণে জনমে জনমে

প্রাণনাথ হৈও তুমি।।

... ...

শীতল বলিয়া শরণ লইনু

ও দুটী কমল পায়।।[৬১]

রামদাস যদি বাংলার কবি রামচন্দ্র কবিভারতী, কাশ্মীরিয় ক্ষেমেন্দ্র বা অশ্বঘোষের অনুসারী হতেন, তবে বৌদ্ধ কাব্য সংবেদনায় তাঁর কাব্য আরো সমৃদ্ধ হতে পারত।

ঊনবিংশ শতকে বুদ্ধচরিত বনাম কৃষ্ণচরিত্র

বর্তমানের সংকটকালে অতীতাভিসারের ছক বারংবার পুনরাবৃত্ত হয়। আর যদি অতীত ইতিহাসেও ঈপ্সিত বা আকাঙ্ক্ষিত বিষয়বস্তুর সন্ধান ব্যর্থ হয়, তখন অতীতকল্পের শরণাপন্ন হতে হয়। অন্তঃসারশূন্য বা আশ্রয়হীন বর্তমানের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎকে সম্ভাবিত করার তাগিদ থেকে এই অতীতাভিসারের সৃষ্টি হয়। যেমন – তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলায় বহিরাগত বিধর্মী মুসলমানদের শাসনকালের প্রারম্ভে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালির নাজেহাল অবস্থা হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে ইসলামের সাংস্কৃতিক আধিপত্য থেকে বাঁচবার উপায় ছিল না। ইসলামের ধর্মীয় ঔদার্যের কারণে হোক বা রাজনৈতিক শক্তির কারণে হোক জাতি-বর্ণভেদের বিভাজনে বিভক্ত হিন্দুসমাজ থেকে অন্ত্যজশ্রেণি ধর্মান্তরিত হয়েছিল। সমকালীন তেমন কোন প্রতিরোধকামী হিন্দুবীর ছিলেন না যিনি বাঙালির এই সংকটকালে ত্রাতারূপে সামগ্রিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। এমতাবস্থায় অতীতের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। অতীতেও তেমন বাঙালি হিন্দু চরিত্র না থাকায় অতীতকল্প চরিত্রের অনুসন্ধানের পর *রামায়ণ* আর *মহাভারত*-এর মধ্যে আদর্শ নায়কের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল – রাম আর কৃষ্ণ। সেই চরিত্রগুলির বীরত্বের কাহিনি শুনিয়ে আত্মবিশ্বাসহীন বাঙালির মনে পরোক্ষে প্রতিরোধের বাসনা ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার জন্য সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজন হয়েছিল। সর্বভারতীয় নায়ক চরিত্র রামচন্দ্র বা কৃষ্ণ হয়ে উঠলেন একান্তভাবে বাঙালি বীর চরিত্র। বাস্তবে যা সম্ভবপর নয়, সেই শৌর্য, বীর্যময় প্রতিরোধ ও বিজয়ের ছবি কল্পনা বা বিশ্বাস অবলম্বন করে বাঙালি সান্ত্বনা ও ভরসা পেতে চেয়েছিল। কৃত্তিবাস ওঝার *শ্রীরাম পাঁচালি* (পঞ্চদশ শতক), মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* (১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ), কবীন্দ্র পরমেশ্বরের *পরাগলী মহাভারত* (আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ), শ্রীকর নন্দীর *মহাভারত* (১৫১২ – ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দ), 'সঞ্জয়' বা হরিনারায়ণদেবের *মহাভারত* (সপ্তদশ শতক), কাশীরাম দাসের *মহাভারত*-এর (১৬০৪ – ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ) নাম উল্লেখযোগ্য।[৬২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন রুখতে নবজাগ্রত স্বাজাত্যবাদী বাঙালি চিন্তকেরা সর্বভারতীয় নায়কের অনুসন্ধানে ব্রতী হন। কেবলমাত্র রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-ধর্মীয় আগ্রাসন থেকে নয়, সামগ্রিকভাবে আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক আধিপত্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় জাতীয় নায়কের অনুসন্ধান চলেছিল। উপনিবেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আধিপত্যের রূপ যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে তা ঊনবিংশ শতক প্রত্যক্ষ করেছিল। স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত ঊনবিংশ শতকে প্রগতিশীল 'ইয়ং বেঙ্গল' দেশীয় হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করার জন্য খ্রিস্টধর্মকেই সমর্থন করে বসেছিল, যদিও তাঁদের লক্ষ্য ছিল যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা। রামমোহন, ভূদেব, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রমুখ পাশ্চাত্যের ধর্মীয় আধিপত্য অর্থাৎ খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণের বিষয়টিকে ভালোভাবে নেননি। নেওয়ার কোন কারণও ছিল না।

স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র 'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধে (*বঙ্গদর্শন*, বৈশাখ, ১২৭৯) ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ অনুসন্ধান করে লিখেছেন –

> ক) স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা, কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের স্বভাব। ... কিন্তু ... স্বতন্ত্র লাভাকাঙ্ক্ষা যে সকলের মধ্যগত নহে। স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, এসকল নূতন কথা।
>
> খ) হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষার অভাব।

এই পরিস্থিতিতে বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীর কর্তব্য নির্দেশ করেছেন – 'জাতিপ্রতিষ্ঠা'। তাঁর মতে, ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে 'জাতিপ্রতিষ্ঠা' ছিল না এমন নয়। কিন্তু আর্যবংশীয়েরা বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকৃত করে স্থানে স্থানে এক একটি খণ্ড সমাজ স্থাপন করেছিল। সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতিভেদের পরিণতি স্বরূপ যে সংকট তৈরি হয়েছে সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন –

> পরিশেষে, কপিলবস্তুর রাজকুমার শাক্যসিংহের হস্তে এক অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি হইলে, অন্যান্য প্রভেদের উপর ধর্ম্মভেদ জন্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধর্ম্ম; আর একজাতীয়ত্ব কোথায় থাকে?

ভারতবর্ষ প্রাচীন হোক বা বর্তমান, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকে ধর্ম। 'ধম্মপদং' (*বঙ্গদর্শন নবপর্যায়*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – 'রাষ্ট্রচেষ্টা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্মের অঙ্গীভূত' করেছিল। এই অর্থে, 'ধর্মচেষ্টার ঐক্য'ই 'ভারতবর্ষের ঐক্য'। ধর্ম ও কর্মের অনোন্যোনির্ভরতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত অর্থে তিনি লিখেছেন –

> তত্ত্বজ্ঞান যতদূর পৌঁছিয়াছে ভারতবর্ষ কর্মকেও ততদূর পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গেছে। ভারতবর্ষ তত্ত্বের সহিত কর্মের ভেদসাধন করে নাই। এইজন্য আমাদের দেশে কর্মই ধর্ম। ... মানুষের কর্মমাত্রেরই চরম লক্ষ্য কর্ম হইতে মুক্তি – এবং মুক্তির উদ্দেশ্য কর্ম করাই ধর্ম।

ধর্ম ও কর্মের অনোন্যোনির্ভরতায় গড়ে ওঠা বীরচরিত্রের বা নায়কের সন্ধান ঊনবিংশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোকে সাংস্কৃতিক সংরক্ষণশীলতা হোক বা প্রগতিমুখিনতাই হোক প্রাচীন ভারতের প্রতি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টি পড়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতের মানুষের মহৎ মানস-সম্পদকর্মে প্রযুক্ত মহাভারতের যুগের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তিনি প্রচণ্ড কর্মসংঘাতময় যুগের *মহাভারত* থেকে কৃষ্ণচরিত্রকে উদ্ধার করলেন। মানবিকতার পূর্ণ বিকশিত রূপ কৃষ্ণচরিত্র ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক বলে কৃষ্ণ-কল্পনায় জাতীয় মানসেরও বিবর্তন ঘটেছে। *কৃষ্ণচরিত্র* গ্রন্থের বিস্ময়কর বিশ্লেষণের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র তা উপস্থাপিত করেছেন। *কৃষ্ণচরিত্র* গ্রন্থ রচনায় নিজের মনোগত আদর্শে চালিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি আলোচনায় তাঁর সমসাময়িক সমাজের নির্দেশ অনুসন্ধান করেছিলেন।[৬৩]

বঙ্কিমচন্দ্র যুগ প্রয়োজনের স্বার্থে *মহাভারত*-এর কৃষ্ণচরিত্রকে আদর্শ করা সত্ত্বেও সাম্যের উদ্‌গাতা বুদ্ধদেবের জীবন নিয়ে আগ্রহকে চেপে রাখতে পারেননি। ‘সাম্য’ প্রবন্ধ পর্যায়ক্রমে (*বঙ্গদর্শন*, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০; আষাঢ়, ১২৮০ এবং কার্তিক, ১২৮২) তিনটি প্রস্তাবাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম প্রস্তাবে বঙ্কিম সাধারণভাবে সমাজে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, বিজিত-বিজেতা, রাজপুরুষ-সাধারণ প্রজা, সুন্দর-অসুন্দর, বুদ্ধিমান-মূর্খ প্রভৃতি নানাবিধ বিপরীত যুগ্মকের কথা আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ভারতে উৎকট বর্ণবৈষম্যজনিত সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের তারতম্য লোপের জন্য বুদ্ধদেবের প্রচেষ্টার কথা আলোচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন –

> শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব, যখন বৈদিকধর্ম্মসঞ্জাত বৈষম্যে ভারতবর্ষ পীড়িত, তখন ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের উদ্ধার করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালিক বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। অন্য বর্ণ অবস্থানুসারে বধ্য – কিন্তু ব্রাহ্মণ শত অপরাধেও অবধ্য। ... এই গুরুতর বর্ণবৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাঁড়াইল। ... তখন বিশুদ্ধাত্মা শাক্যসিংহ অনন্তকালস্থায়ী মহিমা বিস্তার পূর্ব্বক, ভারতাকাশে উদিত হইয়া ... বলিলেন, তোমরা সবই সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান। মনুষ্যে মনুষ্যে সকলেই সমান। সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণবৈষম্য মিথ্যা। যাগ-যজ্ঞ মিথ্যা। বেদ মিথ্যা, সূত্র

> মিথ্যা, ঐহিক সুখ মিথ্যা, কে রাজা, কে প্রজা, সব মিথ্যা। ধর্ম্মই সত্য। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সকলেই সত্যধর্ম্ম পালন কর।

বৌদ্ধধর্ম প্রচলনের ফলে বর্ণবৈষম্য অনেকটা দূরীভূত হওয়ায় শিল্পবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞান সাহিত্যের অনুশীলনের পথ প্রস্তুত হয়েছিল। বুদ্ধসম্পাদিত 'ধর্ম্মবিপ্লবের' পরবর্তী বৌদ্ধধর্ম চালিত 'সহস্র বৎসরই ভারতবর্ষের প্রকৃত সৌষ্ঠবের সময়'। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর পঞ্চম সংখ্যা 'আমার মন' প্রবন্ধে (*বঙ্গদর্শন*, মাঘ, ১২৮০) কমলাকান্তের জবানীতে বঙ্কিমচন্দ্র লোকহিতের উপদেশক বুদ্ধদেবকে 'লোকশিক্ষক' রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে (*বঙ্গদর্শন*, অগ্রহায়ণ, ১২৮৫) বুদ্ধদেবকে স্মরণ করে তাঁর সঙ্গে লোকজীবনের ঘনিষ্ঠ যোগের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন –

> লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্ম্মের কূট তর্কসকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তক ঘর্ম্ম চরণকে আর্দ্র করে; মক্ষমূলর যে তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কলিকাতা রিভিউতে তার প্রমাণ আছে। সেই কূটতত্ত্বময়, নির্ব্বাণবাদী, অহিংসাত্মা, দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্ম, শাক্যসিংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে – গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলকে শিখাইয়াছিলেন।

সর্বজনগ্রাহ্য বুদ্ধচরিত্রের আশ্চর্য মহনীয়তা বঙ্কিমচন্দ্রের বাক্যে প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত *প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ*-এর আলোচনাকালে (*বঙ্গদর্শন*, চৈত্র, ১২৮১) 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে নিজের অনুসন্ধিৎসুতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি অনুশীলন ধর্ম বিষয়ক 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এর প্রবন্ধগুলিতে (*নবজীবন*, শ্রাবণ, ১২৯১ – চৈত্র, ১২৯২) কৃষ্ণচরিত্র প্রসঙ্গে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' (*প্রচার*, আশ্বিন, ১২৯১ – মাঘ, ১২৯১) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে *কৃষ্ণচরিত্র* প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। *প্রচার*-এ এই বিষয়ক কিছু অংশ বের হওয়ার পর ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে *কৃষ্ণচরিত্র* সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি *কৃষ্ণচরিত্র* প্রথম ভাগের 'বিজ্ঞাপন'-এ লেখেন, 'অনুশীলন ধর্ম্মে' যা তত্ত্ব মাত্র, 'কৃষ্ণচরিত্রে' তা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শের উপস্থিতি কাম্য, 'কৃষ্ণচরিত্র কর্ম্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ'। বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলন ধর্মকে 'Doctrine of Culture' বলেছেন। এই culture-ই 'হিন্দুধর্মের সারাংশ'। তাঁর মতে, আমাদের 'সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম' ও তার 'অভাবই অধর্ম'। কৃষ্ণের মধ্যেই তিনি ধর্মের পূর্ণতার অনুসন্ধান করেছেন।

‘কৃষ্ণচরিত্র’-এ কৃষ্ণচরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে বঙ্কিমচন্দ্র শাক্যসিংহ এবং খ্রিস্টের প্রসঙ্গ বারংবার এনেছেন। জগতে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যিশুখ্রিস্ট প্রমুখ ‘নরোত্তম’-দের জীবনচরিত্রের মূল সূত্র হল – এঁরা জন্মগ্রহণ করে ‘ধর্ম্মরক্ষা ও পাপনিবারণ ব্রত’ গ্রহণ করেন, যে ‘পাপনিবারণ ব্রতের নাম ধর্ম্মপ্রচার’। তাঁরা ধর্মসম্বন্ধীয় উপদেশ দ্বারা এবং নিজের কর্মকে ধর্মের আদর্শে পরিণত করার মাধ্যমে ধর্মপ্রচার অনুষ্ঠিত করেন। তবে বুদ্ধদেব ও খ্রিস্টকৃত ধর্মপ্রচার ‘উপদেশপ্রধান’ এবং কৃষ্ণকৃত ধর্মপ্রচার ‘কার্য্যপ্রধান’। বঙ্কিম এক্ষেত্রে কৃষ্ণের ‘প্রাধান্য’কে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পাপাত্মা বিনাশের প্রসঙ্গে কৃষ্ণের স্বপক্ষতা করে তিনি স্বীকার করেছেন যে যিশু বা বুদ্ধের জীবনীতে যতটা পতিতোদ্ধারের চেষ্টা দৃষ্ট হয়, তা কৃষ্ণের জীবনীতে নেই। তিনি যিশু বা বুদ্ধকে ‘ভক্তি’ করে তাঁদের ‘মনুষ্যশ্রেষ্ঠ’ চরিত্র আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করতে ইচ্ছুক। যিশু বা বুদ্ধ ‘ধর্ম্মপ্রচারকের ব্যবসায়’ যুক্ত, কিন্তু ‘আদর্শ মনুষ্য’ কৃষ্ণ কেবল ধর্মপ্রচার নয়, মানুষের সকলপ্রকার অনুষ্ঠেয় কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্ত করেছেন – ‘যিশু বা শাক্যসিংহ আদর্শ পুরুষ নহেন, কিন্তু মনুষ্যশ্রেষ্ঠ’। ‘মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যবসা’ ধর্মপ্রচার করে শাক্যসিংহ বুদ্ধ, যিশু বা চৈতন্য ‘লোকহিতসাধন’-এ ব্রতী হওয়ায় তাঁদের ‘আদর্শ পুরুষ’ বলেছেন। কিন্তু কৃষ্ণ ‘পতিতপাবন’ নাম ধরেও প্রধানত ‘পতিত-নিপাতী’ বলে ‘ইতিহাস’ প্রসিদ্ধ হওয়ায় তাঁকে ‘আদর্শ পুরুষ’ বলে হঠাৎ বুঝে ওঠা দায়। লক্ষনীয়, চৈতন্যদেবও বঙ্কিমের অভীষ্ট নন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের মতে গৌরাঙ্গ বা চৈতন্যদেব ‘অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ’। গয়া প্রত্যাবৃত গৌরাঙ্গের ভাবপ্রকাশের অত্যল্পকালের মধ্যেই তিনি পূর্ণতত্ত্ব ও কৃষ্ণস্বরূপ বলে নবদ্বীপ-লীলাপরিকরদের কাছে প্রতিভাত হয়েছিলেন। কৃষ্ণচৈতন্যের অভিনব লীলাকীর্তনে স্বরূপ দামোদর কৃষ্ণের দুই লীলা – বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপের কথার নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই দুই লীলাতত্ত্বের বিষয়জ্ঞাপক শ্লোকটি হল –

> রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
> চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।।[৬৪]

রাধা হলেন প্রেমঘন কৃষ্ণের প্রেম পরিণতি আনন্দময়ী(হ্লাদিনী)শক্তি। অতএব একসময় পৃথিবীতে তাঁরা এক আত্মা হয়েও ভিন্ন দেহ নিয়েছিলেন। সেই দুটি রূপ চৈতন্য নামে প্রকট হয়েছেন। রাধার ভাব ও অঙ্গকান্তিযুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্যকে নমস্কার।

এটি কৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রকটকালীন সময়ের ঘটনা। বর্তমানে কলিকালে আবার সেই দুইজনে একত্র হয়ে কৃষ্ণচৈতন্য মূর্তিতে প্রকট হয়েছেন। এই কৃষ্ণলীলা নিগূঢ় এবং আশ্চর্যজনক। তিনি বহিরঙ্গে

অর্থাৎ ভাবে এবং কান্তিতে রাধা হলেও অন্তরঙ্গে দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামই।[৬৭] বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার বৈষ্ণব ঐতিহ্যের সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এইসব বৈষ্ণব তত্ত্বকথা ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে তাঁর মনোগত কৃষ্ণচরিত্রের নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, হিন্দুধর্ম একমাত্র সম্পূর্ণ ধর্ম এবং কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ। 'কৃষ্ণচরিত্র' থেকে তাঁর চিন্তনের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধারযোগ্য –

> লোকভেদে, চরিত্রভেদে, অবস্থাভেদে, শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনের অধিকারী; আদর্শ মনুষ্য, সকল শ্রেণীরই আদর্শ হওয়া উচিত। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের, শাক্যসিংহ, যিশু বা চৈতন্যের ন্যায় সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার ব্যবসায়স্বরূপ অবলম্বন করা অসম্ভব। কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী, ধর্ম্মপ্রচারক; সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের, ধর্ম্মবেত্তাদিগের এবং একাধারে সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ। জরাসন্ধাদির বধ আদর্শ রাজপুরুষ ও দণ্ডপ্রণেতার অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ইহাই Hindu Ideal। অসম্পূর্ণ যে বৌদ্ধ বা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আদর্শ স্থানে বসাইয়া, সম্পূর্ণ যে হিন্দু ধর্ম্ম তাহার আদর্শ পুরুষকে আমরা বুঝিতে পারিব না।

বঙ্কিম মধুররসাত্মক নয়, বীররসাত্মক কৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। তাঁর কৃষ্ণ বংশীধারী নন, চক্রধারী। কৃষ্ণের গুণাবলীতে বর্ণনায় তিনি লিখেছেন, কৃষ্ণ বাহুবলে দুষ্টদমনকারী, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব নিষ্কাম ধর্মের প্রচারক, প্রেমময়, নিষ্কাম হয়ে সকল মানুষের দুষ্কর কর্মকারী, বাহুবলে সর্বজয়ী এবং ন্যায়ত দণ্ডদানকারী। বুদ্ধ যে তাঁর কৃষ্ণ প্রকল্পের পক্ষে সমস্যাকর – এসম্পর্কে তিনি সচেতন ও অভিনব কৌশলী ছিলেন। বুদ্ধকে বিষ্ণুর দশাবতারের অন্তর্ভুক্ত করে বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্ম বলে গ্রাস করার প্রচলিত পন্থায় না গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'আদর্শ মনুষ্য' হিসাবে কৃষ্ণেরই একটি গুণের আধার হিসাবে বুদ্ধের কথা বলেছেন –

> ... যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে, বলিয়াছিলেন, "বেদে ধর্ম্ম নহে – ধর্ম্ম লোকহিতে" – তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; যিনি সর্ব্ববলাধার, সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, সর্ব্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধভাবনা যুগবৈশিষ্ট্যের মতোই স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত, জটিল ও দ্বন্দ্বময়।

বিংশশতক: বুদ্ধচরিত ভাবনা

বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলন বা সংস্কৃতিচর্চার দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে এর দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ঐতিহ্যেই রয়েছে। তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকে অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য বিচার করতে গিয়ে যুগ-প্রয়োজনটাকেই বড়ো করে দেখেছেন। এটি তাঁর পক্ষে শুধু গবেষণার আনন্দ নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির মহৎ ঐশ্বর্যের সন্ধানের ক্ষেত্রে তিনি অধ্যাত্ম-সাধনার ধ্যানের দিককে বাদ দিয়ে কর্ম এবং কীর্তির উপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথও আত্মিক শক্তির বিকাশকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্যানের সত্যটিকেই বড়ো করে দেখেছেন এবং তাতেই নিহিত রয়েছে বিশ্বাত্মীয়তার তত্ত্ব। তপোবনের যুগ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে আরেকটি যুগকে গ্রহণ করেছিলেন – 'বৌদ্ধযুগ'। উপনিষদের মন্ত্রবাণী এবং বুদ্ধবাণীকে তিনি প্রায় একই আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন।[৬৬] অহিংসা, করুণা, ত্যাগ, বিশ্বমৈত্রী, ঐক্য, সংহতি এবং সর্বমানবের সমতা প্রধাণত এই কয়েকটি নীতি বৌদ্ধসংস্কৃতি ও রবীন্দ্রসংস্কৃতির মধ্যে গভীর যোগসূত্ররূপে ক্রিয়াশীল বলে প্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন। এইজন্যেই চারিত্রপূজারী রবীন্দ্রনাথ পুণ্যচরিত বুদ্ধদেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।[৬৭] 'করুণাময়' বুদ্ধের শরণাগত রবীন্দ্রনাথ *নটীর পূজা*-য় (পৌষ, ১৩৩৮) ভিক্ষুদের গানের মধ্যে দিয়ে প্রার্থনা করেছেন –

সকল কলুষ তামস হর,
জয় হোক তব জয়।
অমৃতবারি সিঞ্চণ করো
নিখিল ভুবনময়।
মহাশান্তি মহাক্ষেম
মহাপুণ্য মহাপ্রেম![৬৮]

বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মনীষা রবীন্দ্রনাথ 'বুদ্ধদেব' প্রবন্ধে (*প্রবাসী,* আষাঢ়, ১৩৪২) বুদ্ধদেবকে 'অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব' বলে প্রণতি জানিয়েছেন। অল্পপরিসর অস্বচ্ছ কালের মধ্যে মহামানবকে পরিপূর্ণ করে উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়, বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্রনাথ মহাপুরুষদের প্রতিভূরূপে গ্রহণ করেছেন, 'মানবমনের মহাসিংহাসনে মহাযোগের বেদীতে' তাঁর আসন। ত্রিকালচেতনায় মহাপুরুষের ভাবনা প্রসারিত। মহাপুরুষরা জন্মমুহূর্তেই মহাযুগে স্থান গ্রহণ

করেন, তাঁরা চলমান কালের অতীত কালে বর্তমান, দূর-বিস্তীর্ণ ভবিষ্যত কালে বিরাজিত। সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষকে বুদ্ধদেব নিজের মধ্যে অধিকার করেছেন, রাষ্ট্রগত জাতিগত দেশকালের কোনো অভ্যস্ত সীমানায় তাঁর চেতনা খণ্ডিত হয় নি, তাঁরই মধ্যে কেবল ‘পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ’। ‘মানুষের সত্যস্বরূপ’ তাঁর মধ্যে ‘দেদীপ্যমান’ হয়েছে, তিনি ‘সকল মানুষকে আপন বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ’ করে প্রকাশমান। ‘মানবের শ্রেষ্ঠতাকে উদ্ধার’ করবার জন্য ‘মানবশ্রেষ্ঠ’ বুদ্ধের আবির্ভাব। কোন অধিকারভেদ নয়, সকল মানুষের দুঃখ-মোচনের সংকল্প নিয়ে তাঁর তপস্যা। এর মধ্যে ছিল ‘নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা।’ তীব্র জীবনানুরক্ত কবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বুদ্ধের নির্বাণতত্ত্বকে গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। তিনি বুদ্ধের নির্বাণতত্ত্বকে নঞর্থক নয়, সদর্থক মুক্তির রূপে দেখেছেন, ‘সে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে’। রাগদ্বেষ বর্জনে নয়, ‘সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়’ সে মুক্তি। বুদ্ধের মধ্যে ‘বিশ্বমানবের সত্যরূপ’ কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

‘শান্তিনিকেতন’ বক্তৃতামালার ‘ব্রহ্মবিহার’-এ (১১ চৈত্র, ১৩১৫) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – বুদ্ধদেব প্রত্যহ শীলসাধনার দ্বারা আত্মাকে মোহমুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনার দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করার পথ দেখিয়েছেন। এই পদ্ধতি শূন্যতালাভের নয় মঙ্গললাভের, ‘নিখিললাভের পদ্ধতি’, ‘আত্মলাভের পদ্ধতি’, ‘পরমাত্মলাভের পদ্ধতি’।[৬৯] এটা বৌদ্ধদর্শনগত বিচার নয়, বুদ্ধদেবের মতামতকে রবীন্দ্রনাথ নিজের উপলব্ধি দিয়ে বিচার করেছেন। আত্মার ধারণা নয়, অনাত্মবাদই বৌদ্ধদর্শনের মূলগত তত্ত্ব। কিন্তু তিনি তাকে আত্মার উপলব্ধি, আত্মার প্রকাশে মুক্তিলাভের দৃষ্টান্তে ব্যক্ত করেছেন।

বুদ্ধদেবের ব্রহ্মবিহার, ভক্তিবাদের স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত উপলব্ধির সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। বুদ্ধচরিত্রের ঐশ্বর্য, আকর্ষণী শক্তি ও লোকশিক্ষক রূপে তাঁর ভূমিকার কথা রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন। ‘মৈত্রীসাধন’ প্রবন্ধে (*প্রবাসী*, মাঘ, ১৩৪৮) নির্বাণকে ‘অনির্বচনীয় আনন্দ’ রূপে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। ‘লোকলোকান্তরের জীবের প্রতি মৈত্রী’ ও ‘যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তর প্রতি অপরিমেয় প্রেম’-এর বুদ্ধবাণীর মধ্যে তিনি আনন্দের সন্ধান করেছেন। জগদ্‌ব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে গেলে লোকলোকান্তরের জীবের প্রতি মৈত্রী বিস্তার ও নিজের অহংকে নির্বাপিত করতে হয়, এই শিক্ষা দিতেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন। *জাতক* কাহিনির বুদ্ধের চরিত্রকে আশ্চর্য কুশলতায় রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন। যুগ যুগ ধরে সর্বসাধারণের মধ্য দিয়ে বুদ্ধের ক্রমপ্রকাশ সম্পর্কে তিনি ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭-

এ পত্রে লিখেছেন – প্রাণিজগতে নিত্যকাল ভালো-মন্দের যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধরেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্য রূপেই এই ভালোর শক্তি মন্দের ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছে, 'অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ'-এর মধ্যে তার চরম বিকাশ হয়েছে। জীবে জীবে লোকে লোকে সেই অসীম মৈত্রী অল্প অল্প করে নানা দিক থেকে আপন গ্রন্থি মোচন করে মোক্ষের দিকে ধাবমান। কেননা আপনার দিকেই তার টানের ফলেই জীব বদ্ধ, সমস্ত প্রাণিকে নিয়ে ধর্মের যে অভিব্যক্তি তার প্রণালী পরম্পরায় সেই আপনার দিকে টানের উপরে আঘাত লাগে। 'সেই আঘাত যে পরিমাণে যেখানেই দেখা যায় সেই পরিমাণে সেখানেই বুদ্ধের প্রকাশ'।[৭০]
'বুদ্ধজন্মোৎসব' কবিতায় (*নটীর পূজা,* পৌষ, ১৩৩৮) রবীন্দ্রনাথ ভিক্ষুদের গানে 'নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব', 'ঘোরকুটিল পঙ্ক', 'লোভজটিল বন্ধ' সমন্বিত 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'তে 'শান্ত', 'মুক্ত', 'অনন্তপুণ্য', 'করুণাঘন' বুদ্ধকে নবজন্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান করেছেন –

> নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
> করো ত্রাণ মহাপ্রাণ, আনো অমৃতবাণী,
> বিকশিত করো, প্রেমপদ্ম চির-মধুনিষ্যন্দ।[৭১]

'বুদ্ধদেবের প্রতি' (২৪ অক্টোবর, ১৯৩১) কবিতায় কবি ভারতবর্ষের মধ্যেই বুদ্ধের 'নব আগমণী', 'অমেয় প্রেমের বার্তা'-র প্রার্থনা করেছেন –

> বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
> আবার সার্থক হোক, মুক্তি হোক মোহ-আবরণ –
> বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমার স্মরণ
> নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।[৭২]

উপসংহার

ঊনবিংশ-বিংশ শতকে বুদ্ধজীবন নিয়ে বাঙালির আগ্রহ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এইক্ষেত্রে গবেষণামূলক অনুসন্ধিৎসা থেকেও ব্যক্তিগত রুচিবোধ, পছন্দ-অপছন্দ বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। কঠিন ধর্ম ও দর্শন সম্পৃক্ত বুদ্ধজীবনী নয়, সহজ-সাদামাঠা কতকগুলি মানবিক ধারণাকে সামনে রেখে গড়ে তোলা বুদ্ধজীবন সেইসময়ের সাময়িকপত্রে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে লেখক-কবির ভক্তি, কখনোবা বিশেষ অর্থে রাজনীতির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচিবোধ এই মাত্রায় গেছে যে বুদ্ধদেবকে 'ব্যক্তিগত দেবতা'

হিসাবেও গড়ে তুলবার চেষ্টা চলেছে। বেদদ্রোহী পুরুষ বুদ্ধদেবের কার্যকলাপকে হিন্দু পরম্পরার একটি কৌশলগত অবস্থান হিসাবে কেউ কেউ দেখাতে চেয়েছেন। বেদদ্রোহী বা করুণাঘন – যেভাবেই হোক না কেন বুদ্ধচরিত্র ঊনবিংশ শতকের সমাজ-ধর্ম-রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। বুদ্ধচরিত-কেন্দ্রিক লেখাপত্রগুলির ক্ষেত্রে মুখ্যত দুটি প্রবণতা লক্ষ করা যায় – অ) রাজেন্দ্রলালপন্থী লেখকরা ঐতিহাসিক বা মূলানুগ 'বৌদ্ধ' দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমকালীন প্রাপ্ত তথ্যনির্ভর সাম্ভাব্য যাথার্থ্য রক্ষা করে বুদ্ধজীবনকে রচনা করেছেন। এখানে সমাজ সচেতন ঐতিহাসিক যুগপুরুষ বা জাতীয় চরিত্ররূপে বুদ্ধদেব উপস্থাপিত হয়েছেন। এই জীবনকথায় শুধু বুদ্ধজীবন নয়, বৌদ্ধদর্শন ও সংস্কৃতিও গুরুত্ব পেয়েছে। আ) বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেবপন্থী লেখকরা হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষিতে বুদ্ধদেবকে হিন্দু প্রতিনিধিত্বকারী দেবতা বা অবতার বা মহামানব রূপে বিচার করতে চেয়েছেন। এর মধ্যে সুযোগ-সুবিধামত বুদ্ধচরিত্র, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কোমল-কঠিন সমালোচনাও স্থান পেয়েছে।

বুদ্ধদেবের চরিত্র লিখনে হিন্দু উপাদান অন্তর্ঘাত ঘটিয়েছে তা বিশেষভাবে বিচার্য বিষয়। বাংলার মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব চৈতন্যদেবের আদলে কখনো কখনো বুদ্ধচরিত্রকে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা হলেও সে চেষ্টা মূলত কার্যকর হয়নি। বুদ্ধচরিত্র লিখনে থেরবাদী ঐতিহ্যকে প্রায়শই অস্বীকার করে মহাযানী ঐতিহ্যের অনুবর্তন দেখা যায়। ঊনবিংশ শতকে ভারতবর্ষের জীবন্ত ধর্ম হিসাবে বর্ণময় মহাযানী ঐতিহ্য বা উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিতে বুদ্ধচরিত আলোচনা হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হিন্দুধর্মেরই একজন দেবতা হিসাবে বুদ্ধচরিত্রের উপস্থাপনার মধ্যে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার এবং পৃথক ধর্ম ও দার্শনিক প্রতিষ্ঠানরূপে বৌদ্ধধর্মকে অস্বীকার করবার ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসী রাজনীতিও এইক্ষেত্রে কার্যকর ছিল।

সাময়িকপত্রের লেখাগুলিতে সিদ্ধার্থের দাম্পত্য জীবনচিত্রণের একটা প্রবণতা লক্ষণীয়। সিদ্ধার্থ-যশোধরার প্রেম সম্পর্ককে উপস্থাপন করে বাংলার প্রেম ঐতিহ্য ধারার একটা সমর্থন খোঁজার চেষ্টা রয়েছে। এইক্ষেত্রে মহাযানী সাহিত্যের আদর্শ বিশেষ সহায়তা করেছে। ভগিনী নিবেদিতাও বুদ্ধ ও যশোধরার দাম্পত্যপ্রেম সম্পর্ক নিয়ে 'Buddha and Yashodhara' (*Modern Review*, 1919) প্রবন্ধে আলোকপাত করেছেন। এই প্রবণতা আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্নের জন্ম দেয় – ক) বুদ্ধ-যশোধরার প্রেমের মধ্যে লোকায়ত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার কৃষ্ণ-রাধার প্রেমের বা সহজিয়া বৈষ্ণব ধারার চৈতন্য-

শাটী বৈষ্ণবীর প্রেমের একটা ঐতিহ্য অনুসরণের বা ভাবকল্পনায় তাকে স্থান দেওয়ার প্রবণতা কি এর পিছনে কার্যকরী হতে পারে? খ) দাম্পত্যের প্রবল সমর্থক যুগনায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতাই এই প্রবণতাকে নির্ধারিত করেছে? গ) বৌদ্ধ সন্ন্যাসের ধারা সুপরিকল্পিত ভাবে অস্বীকার করে হিন্দু গার্হস্থ্যাশ্রমের সমর্থনই কি এর পিছনে ক্রিয়াশীল?

ঊনবিংশ শতকের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষাপটে বুদ্ধচরিত্র নির্মাণে সত্যাসত্য শুভাশুভের দ্বান্দ্বিক অবস্থানটিও জরুরি বিষয়। এই দ্বান্দ্বিক কাঠামোতে কি বুদ্ধদেবের আদর্শায়িত রূপের নির্মাণ ঘটেছে? ঊনবিংশ শতকে শাস্ত্র-পুথি বহির্ভূত ব্যবহারিক জগতে সত্যাসত্য শুভাশুভের সম্পর্কে এক নতুন চেতনার উদয় হয়েছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বাধীন বিচারবোধকে ইয়ং বেঙ্গল, বঙ্কিমচন্দ্র গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলেরা যুক্তি ও নৈতিক সত্যকে মানতেন। দেবেন্দ্রনাথের আরাধ্য ছিল ব্যক্তির উপলব্ধিগম্য ধ্যানের 'সত্য'। রবীন্দ্রনাথের কাছেও সৌন্দর্যলক্ষ্মী মঙ্গলস্বরূপিণী। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে 'সত্য' মঙ্গল, ধর্ম, শুভ এবং বাঞ্ছনীয়। তাঁর সত্যের ব্যাখ্যায় কোনও নির্বিশেষ রূপ নেই। লোকহিতৈষণার লক্ষ্যকে সামনে রেখে মিথ্যাও কখনো কখনো সত্য হয় – বঙ্কিমচন্দ্র অচল সত্যকে অনুগমন করার পরিবর্তে বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সত্যাসত্য শুভাশুভকে বারংবার নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন।[৭৩] কিন্তু প্রশ্ন হল, মিথ্যাকে যদি 'সত্য' করে তুলতে হয়, তবে কি তার মধ্যে অপব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে না? বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতার মধ্যে সেই আশঙ্কা রয়েছে। তাই বুদ্ধের নীতি, অনুশাসন, বিধি প্রাসঙ্গিক। যদিও অবস্থা বৈগুণ্যে এই বিধিও অর্থহীন হয়ে পড়ে। হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষাপটে সত্য ও শুভের প্রতীকরূপে প্রাচীন ভারতের গৌরব বুদ্ধচরিত্রকেই আদর্শ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শায়নে স্ববিরোধ রয়েছে এবং বুদ্ধের চরিত্র নির্মাণেও তা ধরা পড়েছে।

বুদ্ধদেবের নাস্তিক্যের বিপুল প্রভাব ছাড়িয়ে ব্রাহ্মণ্য, পৌরাণিক ধর্মের আস্তিক্যকে বুদ্ধচরিত্রে আরোপিত হয়েছে। এই পিছনে ভক্তিবাদী ধারায় চালিত কেশবচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথের মত বাঙালি চিন্তকও বুদ্ধদেবকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি ও শরণ প্রার্থনায় আশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু তা একরোখা নয়, তাঁরা নিজেরাও যেমন বুদ্ধচর্চায় রত থেকেছেন, তেমনি অন্যদেরও একাজে উৎসাহিত করেছেন। কেবল ভক্তির প্রাবল্যে এটি সম্ভব নয়। অন্যদিকে, বুদ্ধদেবের চরিত্রে নাস্তিক্যের উপর আস্তিক্য চাপানো একধরণের রাজনৈতিক পন্থা তো বটেই, সুকৌশলী এই পন্থাটাই প্রধান ধারা। আবার নাস্তিক্যবাদী বুদ্ধের

জীবনকে যে একেবারে নস্যাৎ করা গেছে এমনটিও সত্য নয়। এই ধারা স্বভাবতই ক্ষীণ। কিন্তু বিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে এই ধারার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। বামপন্থী তাত্ত্বিকেরা 'নাস্তিক' 'মানবতাবাদী' বুদ্ধের চরিত্রকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন।

উনবিংশ শতকে খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণ চলতে থাকে, তা দেশীয় লোকেদের দুর্বলতার সুযোগেই হোক বা উদার আদর্শের মুক্তির স্বপ্ন দিয়েই হোক। সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে হিন্দুধর্মের কুৎসা ও মানবতাবাদের ধারক-বাহক রূপে 'মহামানব' যিশুখ্রিস্টের ব্যাপক প্রচার। এই 'মহামানব'-এর বিকল্প চরিত্রের অনুসন্ধান সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতেই জরুরি হয়ে পড়েছিল। সামগ্রিক অর্থে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ও জাতীয়তাবাদী স্বার্থের প্রশ্নও হয়ে উঠেছিল জরুরি। এই প্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র 'ঐতিহাসিক' 'জাতীয় চরিত্র' রূপে কৃষ্ণচরিত্রের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু, এই প্রস্তাব রামদাস সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীদের মতো বঙ্কিম-অনুগামী, বন্ধুরাই গ্রহণ করেননি। সর্বভারতীয় জাতীয় চরিত্র বুদ্ধদেব, যাঁর ঐতিহাসিকতা নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠা সম্ভব নয়। বুদ্ধচরিত্র একইসঙ্গে ভারতের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি, বহির্জগতের কাছে ভারতীয় সভ্যতার মুখ ও ভারত-বহির্ভূত ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতিরোধক। বৌদ্ধধর্ম কেবল জাতীয় নয়, বিশ্বধর্মরূপে পরিচিত আন্তর্জাতিক ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি। তাই কৃষ্ণচরিত্র নন, বুদ্ধচরিত্রকেই রবীন্দ্রনাথ প্রমুখেরা ভারত তথা বিশ্বের মুখ হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন। প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যও এই ভাবনাকে সমর্থন করেছিল। এইভাবেই বিশ্বধর্মের ও সংস্কৃতির প্রতিনিধি বুদ্ধদেব 'এশিয়ার আলো'র তত্ত্ব খারিজ করে 'জগজ্জ্যোতি' 'অমিতাভ' – আলোর মত ছড়িয়ে পড়লেন। সৈয়দ মুজতবা আলী বুদ্ধের সর্বকালীন সর্বজনীন আত্মদীপ্ত 'মানব' মূর্তির সন্ধান দিয়েছেন –

> খুদা পরমেশ্বরকে বাদ দিয়ে, পাদরী-পুরুতের তোয়াক্কা না করেও ধর্মচর্চা করা যায়, একমাত্র নিজের উপর নির্ভর করে, ক্রিয়াকাণ্ড বর্জন করে, তথাগতের উপদেশের সঙ্গে সাধনাগত অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিয়ে, তথাগত যেখানে আগত হয়েছেন সেখানে পৌঁছান যায়, এ স্বপ্ন ইয়োরোপের কোন জ্ঞানী কোন গুণী দার্শনিকই দেখাবার সাহস করেননি। বুদ্ধের অশ্রুতপূর্ব বাণী এক মুহূর্তেই ইয়োরোপের সামনে এক নবীন ভুবন আলোক দিয়ে জাজ্জ্বল্যমান করে দিল। তাই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে আজ ওই এক মহাপুরুষ – বুদ্ধদেব – যাঁর পায়ের কাছে আজ সর্ব নাস্তিক সর্ব আস্তিক স্বধর্ম ভ্রষ্ট না হয়েও দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে, ত্রিশরণ জপ করতে পারে –
>
> বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
>
> ধর্মং শরণং গচ্ছামি

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।।[৭৪]

টীকা ও উৎসনির্দেশ

১। রায়চৌধুরী, নৃপেন্দ্রনাথ। (১৯৯৫)। রায়, অশোককুমার। (সম্পাদিত)। *নৃপেন্দ্রনাথ রচনাসম্ভার*। কলকাতা: এবং মুসায়েরা। পৃ. ৭৬

২। মহাস্থবির, ধর্মাধার। (অনূদিত)। (১৯৫৪)। *ধম্মপদ*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার। পৃ. ৬৮

৩। আরণ্য, স্বামী হরিহরানন্দ। মহাস্থবির, জ্যোতিপাল। (সম্পাদিত ও অনূদিত)। (২০০৫)। শান্তিদেবকৃত *বোধিচর্য্যাবতার*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ২৫০, ৭৬, ৫

৪। মহাস্থবির, ধর্মাধার। (অনূদিত)। (১৯৫৪)। *ধম্মপদ*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার। পৃ. ৭৩

৫। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উদ্ধৃতিটির উৎসের জন্য দ্রষ্টব্য: রায়, অলোক। (১৯৬৯)। *রাজেন্দ্রলাল মিত্র*। কলকাতা: বাগর্থ। পৃ. ২১৮

৬। শাস্ত্রী, জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায়। (অনূদিত)। (১৯৯৯)। *ললিতবিস্তর*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। পৃ. ৬, ৮

৭। Basak, Radhagovinda. (1963). *Mahvastu Avadana*. Vol. I. Calcutta: Sanskrit College. p. 73

৮। প্রত্যেক বুদ্ধরা বোধিলাভ করে নির্বাণপ্রাপ্ত হন। তাঁরা কেবল নিজেরা নিজেদের উদ্ধার করেন। তাঁরা প্রাপ্ত বোধিজ্ঞানের আলো জনমানসে প্রচার করার অধিকারী নন।

৯। শাস্ত্রী, জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায়। (অনূদিত)। (১৯৯৯)। *ললিতবিস্তর*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। পৃ. ১৭

১০। মগধের উত্থানের আগে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর, উত্তরপূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম মধ্যভারত ষোলোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই ষোলোটি মহাজনপদ হল কাশী, কোশল (অযোধ্যা), অঙ্গ (পূর্ব বিহার), মগধ (দক্ষিণ বিহার), বৃজি (উত্তর বিহার), মল্ল (গোরোক্ষপুর), চেদী (বুন্দেলখণ্ড), বৎস (প্রয়াগ), কুরু (দিল্লি-মিরাট), পাঞ্চাল (গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব), মৎস (জয়পুর), অবন্তি (মালব), শূরসেন (মথুরা), গন্ধার (পেশোয়া-আফগানিস্তান অঞ্চল), কম্বোজ (দক্ষিণ-পশ্চিম কাশ্মীর) এবং অশ্মক (গোদাবরী উপত্যকা)। অধিকাংশ মহাজনপদে রাজতন্ত্র কায়েম থাকলেও বৃজি, মল্ল প্রভৃতি কয়েকটি প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ছিল। বৃহৎ ও শক্তিশালী মহাজনপদগুলি ক্ষুদ্র ও দুর্বল মহাজনপদকে গ্রাস করার চেষ্টার ফলে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে কোশল, অবন্তি, বৎস ও মগধ এই চারটি মহাজনপদগুলি বাকিদেরকে গ্রাস করে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। দ্রষ্টব্য: ভট্টাচার্য, সুভাষ। (২০১৩)। *সংসদ ইতিহাস অভিধান*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ৩৩৬

১১। Basak, Radhagovinda. (1963). *Mahvastu Avadana*. Vol. I. Calcutta: Sanskrit College. p. 73 – 84

১২। Coomaraswamy, Ananda K. Horner, I. B. (1948). *The Living Thoughts of Gotama the Buddha*. Great Britain: Cassell and Company Limited. p. 1

১৩। Davids, T. W. Rhys. (2010). *Buddhism Being a Sketch of the Life and Teachings of Gautama, The Buddha*. Delhi: Low Price Publications. p. 8

১৪। গুপ্ত, অঘোরনাথ। (১৯৯২)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। *শাক্যমুনিচরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ৩

১৫। Coomaraswamy, Ananda K. (2003). *Buddha and the Gospel of Buddhism*, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited. p. 3

১৬। Thomas, Edward J. (2004). *The History of Buddhist Thought*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited. New Delhi. p. 29

১৭। বড়ুয়া, শুভ্রা। (অনূদিত)। (২০০৪)। *মহাবংস*। কলকাতা: গোবিন্দ প্রসাদ বড়ুয়ার ব্যক্তিগত উদ্যোগ। পৃ. ২

১৮। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। (২০০৬)। *বুদ্ধদেব অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সম্পূর্ণ জীবন চরিত ও উপদেশ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ৪৭ – ৪৮, ৫৩ – ৫৪

১৯। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদিত)। (২০০১)। *মহামানব গৌতম বুদ্ধ*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ. ১২, ৮২, ২০৫

২০। বড়ুয়া, সুমঙ্গল। (২০১৪)। *গৌতম বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ জীবন*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ. ২৬

২১। সেন, রামদাস। (১৯৯৭)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। *বুদ্ধদেব তাঁহার জীবনী ও ধর্ম্মনীতি*, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ১৫৫

২২। শাস্ত্রী, জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায়। (অনূদিত)। (১৯৯৯)। *ললিতবিস্তর*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। পৃ. ১৭৬ – ১৭৭

২৩। শীলভদ্র, ভিক্ষু। (অনূদিত)। (২০১১)। *দীঘ নিকায়*। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ – ৬। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ. ১৭৮ – ১৭৯

২৪। সেন, রামদাস সেন *ললিতবিস্তর* অনুযায়ী বুদ্ধদেবের বত্রিশটি মহাপুরুষ লক্ষণ ও আশিটি অনুব্যঞ্জনার বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। বত্রিশটি মহাপুরুষ লক্ষণ এইরকম – ১। পায়ের তলা রেখাময় চক্রচিহ্ন; ২। পায়ের তলা সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সমতল, পা শিরাজাল বিহীন; ৩। হাতের তলা সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সমতল, হাত শিরাজাল বিহীন; ৪। হাতের তলা ও পায়ের তলা কোমল ও রক্তবর্ণ; ৫। দুটি কাঁধ ও নাক প্রভৃতি সাতটি স্থান উঁচু; ৬। আঙুল দীর্ঘ ও বৃত্তাকার; ৭। পায়ের পিছনের দিক কিছুটা আয়ত বা বিস্তৃত; ৮। মধ্যকায় ঋজু; ৯। উপবেশনের সময় পা দুটি কোলে থাকে ; ১০। গায়ের রোম উপরের দিকে; ১১। জঙ্ঘাদুটি হরিণ-রাজ্যের জঙ্ঘার মতো; ১২। জানু পর্যন্ত লম্বা বাহু; ১৩। বস্তি ও গুহ্য কোষগত; ১৪। সোনার মতো বর্ণ; ১৫। লাবণ্য ও কান্তিময়; ১৬। প্রতি রোমকূপে একটি করে রোম দক্ষিণাবর্তে শোভিত; ১৭। ভ্রূর মধ্যে জড়ুল; ১৮। সিংহের মতো মধ্যদেশ; ১৯। মাংসল কাঁধ; ২০। কাঁধের উপর দিক পৃথু ও উঁচু; ২১। জিভ সরস ও রক্তবর্ণ; ২২। মাথা মণ্ডলাকার; ২৩। শীর্ষদেশ উষ্ণীষের মতো; ২৪। জিভ পাতলা ও লম্বা; ২৫। হনুদুটি সিংহের হনুর মতো; ২৬। হনুদুটি সাদা; ২৭। দাঁতগুলি সমান; ২৮। হংস অথবা সিংহের মতো গতি; ২৯। পরস্পর সংলগ্ন দাঁত; ৩০। চল্লিশটি দাঁত; ৩১। চোখের তারা মনোহর নীলবর্ণ; ৩২। ষাঁড়ের চোখের মতো মনোহর চোখ ।

আশিটি অনুব্যঞ্জন লক্ষণ এইরকম – ১। নখ তামার রঙ; ২। নখ স্নিগ্ধ; ৩। নখ উঁচু; ৪। আঙুল ছাতার চিহ্নের মতো; ৫। আঙুল চিত্র অর্থাৎ প্রাকৃত লোকের মতো নয়; ৬। আঙুল পূর্বাপরক্রমে সুবিভক্ত; ৭। শিরা দেখা যায় না; ৮। শিরাগ্রন্থি দেখা যায় না; ৯। গুল্ফ গূঢ়; ১০। দুই পা সমান; ১১। সিংহের মতো গতি; ১২। নাগের মতো গতি; ১৩। হংসের মতো পদবিন্যাস; ১৪। মত্ত ষাঁড়ের মতো স্বচ্ছন্দগতি; ১৫। ডান পা প্রথমে বিন্যাস; ১৬। মনোহর অর্থাৎ লীলাযুক্ত গতি; ১৭। সরলগতি; ১৮। গা (উরু প্রভৃতি স্থান) গোল ও মাংসল; ১৯। গা সদ্য পরিমার্জিত; ২০। অঙ্গসকল পূর্বাপর ক্রমে সুবিভক্ত; ২১। উজ্জ্বল গায়ের কান্তি; ২২। মৃদু অঙ্গ। ২৩। শুদ্ধ অঙ্গ; ২৪। সকল অঙ্গ ও লক্ষণ পূর্ণ; ২৫। শরীর স্থূল, মনোহর ও সুবৃত্ত; ২৬। পায়ের বিক্ষেপ সমান; ২৭। চোখ পবিত্রতাভাব-পরিপূর্ণ; ২৮। কোমল শরীর; ২৯। দেহে দৈন্য ও

খেদ দেখা যায় না; ৩০। উৎসাহযুক্ত শরীর; ৩১। 'গম্ভীর' উদর; ৩২। 'প্রসন্ন' উদর; ৩৩। সুবিভক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; ৩৪। আলোর মতো শরীরের কান্তি; ৩৫। বৃত্তাকার উদর; ৩৬। ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট উদর; ৩৭। উদর 'কোল-কুঁজো' নয়; ৩৮। কৃশ উদর; ৩৯। নাভি গভীর; ৪০। নাভির আবর্ত দক্ষিণ দিকে; ৪১। অঙ্গুলি দর্শকের আনন্দজনক; ৪২। ৭১। সুপ্রসন্ন কপাল; ৭৬। স্বাধীন নিদ্রা; ৭৭। ঈষৎ কুঞ্চিত কেশ; ৭৮। স্নিগ্ধ কেশ; ৭৯। সুগন্ধ কেশ; ৮০। হাত ও পায়ের তলায় শ্রীবৎস, স্বস্তিক ও নন্দ্যাবর্ত চিহ্ন রয়েছে।

দ্রষ্টব্য: সেন, রামদাস। (১৯৯৭)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। *বুদ্ধদেব তাঁহার জীবন ও ধর্ম্মনীতি*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ২৭ – ২৮

২৫। শাস্ত্রী, জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায়। (অনূদিত)। (১৯৯৯)। *ললিতবিস্তর*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। পৃ. ২০

২৪। প্রাগুক্ত। পৃ. ২১৫

২৬। বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। (২০০৬)। ভূমিকা। *বুদ্ধদেব অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সম্পূর্ণ জীবন চরিত ও উপদেশ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ঠ – ড

২৭। মহাথের, ধর্মপাল। (১৯৯৩)। *জাতক নিদান*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার। পৃ. ৮০

২৮। Basak, Radhagovinda. (1963). *Mahavastu Avadana*. Vol. II. Calcutta: Sanskrit College. p. 103

২৯। শাস্ত্রী, জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায়। (অনূদিত)। (১৯৯৯)। *ললিতবিস্তর*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। পৃ. ২৭

৩০। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদিত)। (২০০১)। পাদটীকা। *মহামানব গৌতম বুদ্ধ*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ. ২৮

৩১। সেন, রামদাস। (১৯৯৭)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। *বুদ্ধদেব তাঁহার জীবনী ও ধর্ম্মনীতি*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ৫৭ – ৬৪

৩২। চৌধুরী, সাধনকমল। (অনূদিত)। (২০০২)। *বিশুদ্ধ সুত্তনিপাত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ১২০

৩৩। শীলভদ্র, ভিক্ষু। (অনূদিত)। (২০১১)। *দীঘ নিকায়*। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ – ৬। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ. ১৮১ – ১৮৫

৩৪। শাস্ত্রী, জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায়। (অনূদিত)। (১৯৯৯)। *ললিতবিস্তর*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। পৃ. ২৬৭ – ২৭০

৩৫। মহাথের, ধর্ম্মপাল। (১৯৯৩)। জাতক নিদান। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভা। পৃ. ৮৫

৩৬। স্থবির, প্রজ্ঞানন্দ। (অনূদিত)। (১৯৩৭)। *মহাবর্গ*। দয়াধন-উমাবতী সিরিজ – ১। কলকাতা: যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড। পৃ. ১৬

৩৭। রায়চৌধুরী, নৃপেন্দ্রনাথ। (১৯৯৫)। রায়, অশোককুমার। (সম্পাদক)। *নৃপেন্দ্রনাথ রচনাসম্ভার*। কলকাতা: এবং মুসায়েরা। পৃ. ৮৭

৩৮। শীলভদ্র, ভিক্ষু। (অনূদিত)। (২০১১)। *দীঘ নিকায়*। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ – ৬। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ. ৮৪

৩৯। বড়ুয়া, বেণীমাধব। (অনূদিত)। (১৯৩৯)। *মধ্যম-নিকায়*। দয়াধন-উমাবতী সিরিজ – ৩। কলকাতা: যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড। পৃ. ১৭৮, ২৬১

৪০। তালুকদার, প্রসেনজিৎ। (সম্পাদিত)। (২০১৫)। বড়ুয়া, সুমিতকুমার। শ্রীমৎ বিশুদ্ধাচার মহাস্থবিরকৃত *সীবলী ব্রতকথা:* ধ্রুপদী লোকায়ত ভাবনার মেলবন্ধন। *জ্যোতি*। বাংলাদেশ: হীরক জয়ন্তী। শাসনতিলক ভদন্ত বিমলজ্যোতি স্মারক '১৬। পৃ. ৬৮ – ৬৯

৪১। Basak, Radhagovinda. (1963). *Mahavastu Avadana*. Vol. I. Calcutta: Sanskrit College. p. 332 – 344

৪২। এই বাদানুবাদ গাথায় মার এবং বোধিসত্ত্ব-ক্রমে যুক্তি-প্রতিযুক্তি উদ্ধৃত হল –

"দিব্য ও মানুষ, ভবে আছে যত পাশ,
সর্ব্বপাশে বদ্ধ তুমি বৃথা মুক্তি-আশ।
যে বন্ধনে বদ্ধ তুমি সে মহা বন্ধন,
আমা হ'তে মুক্তি তুমি হবে না শ্রমণ।"
"দিব্য ও মানুষ, ভবে আছে যত পাশ,
সর্ব্বপাশ-মুক্ত আমি, ছিন্ন সর্ব্ব পাশ।
সকল বন্ধন-মুক্ত, স্খলিত বন্ধন,
রে অন্তক! হত তুমি, নিহত এখন।"
"অন্তরীক্ষচর পাশ, করে মনে বিচরণ,
বাঁধিব তাহাতে, মুক্ত হবে না শ্রমণ।"
"রূপ শব্দ গন্ধ রস স্পর্শ যা' পঞ্চম,
পঞ্চকামগুণ যাহা অতি মনোরম।
নাহি ছন্দ তাহে মম, বীতছন্দ মন,
রে অন্তক! হত তুমি, নিহত এখন।"

দ্রষ্টব্য: স্থবির, প্রজ্ঞানন্দ। (অনূদিত)। (১৯৩৭)। *মহাবর্গ*। দয়াধন-উমাবতী সিরিজ – ১। কলকাতা: যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড। পৃ. ২২

৪৩। শীলভদ্র, ভিক্ষু। (অনূদিত)। (২০১৫)। ভিক্ষু, সুমনপাল। *সুত্ত-নিপাত*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ.৫০ – ৫১

৪৪। বড়ুয়া, বেণীমাধব। (অনূদিত)। (১৯৩৯)। *মধ্যম-নিকায়*। দয়াধন-উমাবতী সিরিজ – ৩। কলকাতা: যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড। পৃ. ৩৪৮ – ৩৫৩, ২৪৭, ১২৬, ১২৯ – ১৩০, ১৬৫ – ১৭৫

৪৫। শীলভদ্র, ভিক্ষু। (অনূদিত)। (১৯৫০)। *থেরীগাথা*। কলকাতা: মহাবোধি সোসাইটি। পৃ. ৭, ৩৩, ৪১

৪৬। মহাস্থবির, ধর্মাধার। (অনূদিত)। (১৯৫৪)। *ধম্মপদ*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার। পৃ. ১৫

৪৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৭

৪৮। দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। (২০০৪)। *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। পৃ. ৩৬, ৪৫

৪৯। মহাথের, ধর্মপাল। (১৯৯৩)। *জাতক নিদান*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার। পৃ. ১০০ – ১০৮

৫০। ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ। (অনূদিত)। (২০০০)। *অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ১৫৬ – ১৬৭

৫১। শাস্ত্রী, জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায়। (অনূদিত)। (১৯৯৯)। *ললিতবিস্তর*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। পৃ. ৩৫৮ – ৩৯৫

৫২। বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। (২০০৬)। *বুদ্ধদেব অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সম্পূর্ণ জীবন চরিত ও উপদেশ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ৯২ – ৯৩

৫৩। পাত্র, চিত্তরঞ্জন। (২০০৬)। ভূমিকা। *দাঠা বংস*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ. viii

৫৪। মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। (সম্পাদিত)। (২০১০)। জয়দেব। *গীতগোবিন্দ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ১৮২

৫৫। কবিতাটির শেষে 'বহরমপুর' শব্দটি রয়েছে। তাঁর *ঐতিহাসিক রহস্য* গ্রন্থে উক্ত কাব্যটি স্থান পেয়েছে। দ্রষ্টব্য: Chowdhury, Hemendu Bikash. (Edited). (2009). ঘোষ, বারিদবরণ। রামদাস সেন ও বুদ্ধচর্চা। *Jagajjyoti*. Bhikkhu Jagadish Kashyap Birth Centenary Volume. Kolkata: Bauddha Dharmankur Sabha. পৃ. ১৯২

৫৬। স্থবির, প্রজ্ঞানন্দ। (অনূদিত)। (১৯৩৭)। *মহাবর্গ*। দয়াধন-উমাবতী সিরিজ – ১। কলকাতা: যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড। পৃ. ৩৭৬

৫৭। মুখোপাধ্যায়, বিমলাকান্ত। (সম্পাদিত)। (২০০৮)। কবিরাজ, বিশ্বনাথ। *সাহিত্যদর্পণ:*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। পৃ. ১৮

৫৮। তর্করত্ন, পঞ্চানন। (সম্পাদিত)। (২০১০)। *বিষ্ণুপুরাণম্*। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স। পৃ. ২৩৪ – ২৩৬

৫৯। স্মৃতিতীর্থ, কৃষ্ণচন্দ্র। (২০০৬)। (সম্পাদিত)। গোস্বামী, রাধাবিনোদ। (সংকলিত)। মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন-প্রণীতম্ শ্রীমদ্ভাগবতম্। গিরিজা। পৃ. ৯২

৬০। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪ – ৫

৬১। মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। (সম্পাদিত)। (২০০০)। *বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ৬৮

৬২। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: সেন, সুকুমার। (২০০৪)। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১০৫, ১১০, ১২৩ ও মুখোপাধ্যায়, সুখময়। (২০১৪)। *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম*। কলকাতা: ভারতী বুক স্টল। পৃ. ১৫ – ১৭

৬৩। দত্ত, ভবতোষ। (২০০৮)। *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৭৭ – ৭৮

৬৪। সেন, সুকুমার। মুখোপাধ্যায়, তারাপদ। (সম্পাদিত)। (২০০৮)। আদিখণ্ড। প্রথম পরিচ্ছেদ। কৃষ্ণদাস বিরচিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১

৬৫। দাস, ক্ষুদিরাম। (২০০৯)। *বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ১৪১, ১৪৩ – ১৪৪

৬৬। দত্ত, ভবতোষ। (২০০৮)। *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৭৭

৬৭। সেন, প্রবোধচন্দ্র। (২০১১)। *ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৬৩ – ৬৪

৬৮। বৈশাখী-পূর্ণিমা, ১৩৩৮-য় কবি 'সকলকলুষতামসহর' কবিতাটি রচনা করেন। পরে তা *পরিশেষ* কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সংকলিত হয়। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০১৫)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। দ্বাদশ খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পৃ. ৭৩৪

৬৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০০৩)। ব্রহ্মবিহার। *শান্তিনিকেতন ১* । *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। সপ্তম খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৬৪৯

৭০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০০৩)। *জাভাযাত্রীর পত্র*: ১৯ সংখ্যক। যাত্রী। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। দশম খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ৫৪৫

৭১। 'বুদ্ধজন্মোৎসব' (২১ ফাল্গুন, ১৩৩৩) কবিতাটি পরে *নটীর পূজা*-য় অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্রষ্টব্য: ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০১৫)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। দ্বাদশ খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭২৯

৭২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০১২)। *পরিশেষ*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পৃ. ৯৯৯ – ১০০০

৭৩। দত্ত, ভবতোষ। (২০০৮)। *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৮০, ১৬৬

৭৪। আলী, সৈয়দ মুজতবা। (২০০৫)। *সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৭৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৌদ্ধশিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও নন্দনতত্ত্ব

ভূমিকা

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'ভারতশিল্প তত্ত্ব' প্রবন্ধে (*সাহিত্য*, শ্রাবণ, ১৩২৯) শিল্পের সংজ্ঞা অনুসন্ধান করে লিখেছেন – 'শিল্পং কৌশলং শীল্ সমাধৌ'। শিল্প 'একাগ্রতাসমুদ্ভাবিত কৌশলোৎপন্ন বস্তু' বা সৃষ্টি। লক্ষণীয় যে বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বের ত্রিসূত্র – শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার মধ্যে শীল ও সমাধির প্রসঙ্গ শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত। তিনি 'ভারতশিল্পের মূলসূত্র' প্রবন্ধে (*বঙ্গদর্শন*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯) বলেছেন যে ভারতের প্রধান আকাঙ্ক্ষা পরিদৃশ্যমান বস্তুতে নয়, অতীন্দ্রিয় মহাসত্তায়; অনির্বাচনীয়কে আকার দানের মধ্যেই তার পূর্ণতা। ভারতশিল্পের মূল প্রকৃতি সর্বত্র সকল যুগে একরকম হলেও, যুগে যুগে নানাস্থানে নানা রচনারীতি মূলসূত্রের ভাষ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। অক্ষয়কুমার 'ভারতীয় শিল্পাদর্শ' প্রবন্ধে (*সাহিত্য*, চৈত্র, ১৩১৮) ই. বি. হ্যাভেলের শিল্পভাবনার অনুসারী হয়েছেন। হ্যাভেল *The Ideals of Indian Art* (১৯১১) গ্রন্থে লিখেছেন –

> The spirituality of the Vedic age was gradually obscured, for a time at least, by the complicated ritualism of the Brahman priesthood, and it was the teaching of Buddha which gave the next great impulse to the development of Indian art, widening the intellectual outlook and correlating the abstract ideas and spiritual vision of the Vedic age with human conduct and the realities of life.
>
> But though Buddhism became the state religion and the dominant creed of the masses at this period, the term "early Buddhist art," which archæologists apply to it, does not convey a complete idea of all the influences which were then moulding Indian art. I would prefer to call it the Eclectic, or Transition period; for it was the time when India was collecting from every quarter of Asia the different materials out of which, in later times, the perfect synthesis of Indian art was formulated, and through which the visions of the Vedic age materialized in the technic arts of the great Buddhist-Hindu epoch.[১]

হ্যাভেলের মতে বৌদ্ধযুগ দ্বিতীয় যুগ – ভারত শিল্পের অভ্যুদয় যুগ, ভাবের আদান প্রদানের কল্যাণযুগ, নিখিল মিলন যুগ বলে অভিহিত হবার যোগ্য। এই যুগে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মানবিকতার সমন্বয় সাধিত হয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ – ১৯০২), ওকাকুরা কাকুজো (১৮৬২ – ১৯১৩), ঈ. বি. হ্যাভেল (১৮৬১ – ১৯৩৪), আনন্দ কেন্টিস কুমারস্বামী (১৮৯৯ – ১৯৮৭), ঋষি অরবিন্দের (১৮৭২ – ১৯৫৫)

শিল্প-বক্তব্য মূলত এক। তাঁদের মতে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক 'হিন্দুশিল্প' বা 'ভারতশিল্প' (বৌদ্ধশিল্প এর অন্তর্ভুক্ত) বস্তুরূপ অপেক্ষা ভাবরূপের উন্মোচনে অধিক যত্নশীল ছিল। ভারতবর্ষে রাজ-পৃষ্ঠপোষিত শিল্প নিদর্শন প্রভূত হলেও ভারতশিল্প প্রধানাংশে বুর্জোয়া নয়, গণশিল্প। ভারতীয় জীবনের সর্বস্তরে সঞ্চারিত এই শিল্পবোধে রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য প্রধান লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্যমাত্র। বাইরের রূপকে ভিতরে ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে এবং ভিতরের ভাবকে বাইরের রূপে ফুটিয়ে তোলাই এর বিশেষত্ব। আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় কলাবিদ্যার বিশিষ্টতা।[২]

গ্রন্থসাক্ষ্য অনুযায়ী বৌদ্ধশিল্প ও ভাস্কর্যের উৎস সন্ধান

বুদ্ধদেবের উপস্থিতি ও সান্নিধ্য বুদ্ধশিষ্যদের সঙ্গে অগণিত জনসাধারণকে দুঃখমুক্তি ও শান্তির পথ দেখাত। কিন্তু তাঁর মহাপরিনির্বাণের (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪৩৩) পরে ত্রিপিটকশাস্ত্রের বচন ও ব্যাখ্যা সেই অভাব পূরণে সমর্থ হয় নি। স্বভাবতই অগণিত জনসাধারণের সান্ত্বনা, ভরসা ও আশ্রয়ের জন্য বুদ্ধ বা বুদ্ধের প্রতীক অবলম্বন করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। জনমানস শিল্পের মধ্যে দিয়ে তাদের ভক্তি ও ভরসার আলম্বনস্বরূপ বুদ্ধের অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের উদার উৎস থেকে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধশিল্পের সূচনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন তা শিল্প ও ভাস্কর্য সৃষ্টির অনুকূল ছিল না। সর্বভূতের অনস্তিত্ব, দুঃখময় জগত ও ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞেয়ভাব (মতান্তরে নাস্তিকতা) মূর্তিসৃষ্টির পক্ষে প্রতিবন্ধক ছিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন এবং শিষ্যদেরও বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে নিরুৎসাহিত করেছিলেন। *দীর্ঘ-নিকায়* গ্রন্থের 'ব্রহ্মজাল সূত্র'-এর 'অমরা বিক্ষেপিত' অধ্যায়ে বলা হয়েছে – মহাপরিনির্বাণের পর বুদ্ধের কায়া চিরতরে ছিন্ন হওয়ায় ফলে তাঁর মূর্তিকল্পনা অসম্ভব।[৪] 'মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্ত'-এর পঞ্চম অধ্যায় অনুযায়ী ভিক্ষু আনন্দ বুদ্ধের কাছে মহাপরিনির্বাণের পর শরীর-পূজার বিধান চাইলে, তিনি বুদ্ধ-নির্দেশিত ধর্ম ও বিনয় রক্ষাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে জানিয়েছিলেন। আনন্দ দ্বিতীয়বার বুদ্ধের 'দেহ' সম্বন্ধে 'কর্তব্য' জানতে চাইলে বুদ্ধ তাঁকে বুদ্ধের শরীর পূজা না করে সৎ যাপন, অপ্রমত্ত ও দৃঢ়সংকল্প হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদের বুদ্ধের শরীরপূজার বিধান দিয়েছিলেন। স্তূপপূজার প্রসঙ্গে বুদ্ধ চারধরণের স্তূপার্হের কথা বলেছিলেন – (ক)

তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ, (খ) প্রত্যেক-বুদ্ধ, (গ) তথাগত-শ্রাবক এবং (ঘ) রাজচক্রবর্তী। তিনি এও বলেছিলেন যে মাল্য-গন্ধ-রঞ্জনোপকরণ দিয়ে বুদ্ধের উদ্দেশে উৎসর্গ, অভিবাদন করলে অথবা তাঁর উপর প্রসন্নচিত্ত হলে তা মানুষের দীর্ঘকাল হিত ও সুখবিধায়ক হবে।[৫] বুদ্ধের এই নির্দেশকেই বৌদ্ধস্থাপত্য ও শিল্প-ভাস্কর্যের উৎস বলে বিবেচনা করা হয়।

মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত 'সিংহলের চিত্র' প্রবন্ধে (*প্রবাসী*, বৈশাখ, ১৩৪১) লিখেছেন – *মহাবংস*-এর কিংবদন্তী অনুযায়ী বুদ্ধদেব শ্রীলঙ্কায় দেবতাদের কাছে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। বুদ্ধের বামচোখের ভ্রূর একটি কেশের উপরে দেবতারা স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন।

স্তূপ-স্থাপত্য বিকাশের আগে থেকেই রাজগৃহ, কাশী, বৈশালী নগরীর স্থাপত্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল যা স্তূপশিল্প বিকাশে সহায়তা করেছিল। সিন্ধু স্থাপত্যের পরেই মগধের রাজগৃহে (খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী) জরাসন্ধের বৈঠকস্থান, অজাতশত্রু নির্মিত রাজগৃহের প্রাচীরকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থাপত্য নিদর্শন বলা যায়। বুদ্ধমূর্তি প্রচলনের আগে থেকে বৌদ্ধস্থাপত্য ও শিল্পোপযোগী ধর্মীয় বাতাবরণ প্রস্তুত ছিল যা বুদ্ধমূর্তির প্রচলনে (১ খ্রিস্টাব্দ) অনন্য মাত্রা লাভ করেছিল।[৬]

বৌদ্ধস্তম্ভ, স্তূপ, স্থাপত্য

শিল্পকলা সাধারণ মানুষের সঙ্গে ধর্মীয় সংযোগের ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। বৌদ্ধধর্মের প্রথম পৃষ্ঠপোষক মগধরাজ বিম্বিসারের সময়েই বৌদ্ধস্তূপ পূজা প্রচলিত হয়েছিল। সম্রাট অশোকের (২৬৮/২৭২ – ২৩২ খ্রিস্টপূর্ব) রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল। তিনি পর্বতের গায়ে, গুহায় ও স্তম্ভে বৌদ্ধধর্মের অনুশীলনমালা লিপিবদ্ধ করান। *দিব্যাবদান*-এর 'অশোকাবদান' অনুযায়ী সম্রাট অশোক চুরাশি হাজার স্তূপ ও অসংখ্য বিহার নির্মাণ করেছিলেন।

স্তম্ভ স্থাপত্যই ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন যা অশোকের সময়েই নির্মিত হয়েছিল। তিনি বুদ্ধের জন্মস্থানে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করে সেখানে একটি গাধীমূর্তি সংযোজিত করেছিলেন। এলাহাবাদ, সারনাথ, সাঁচি প্রভৃতি স্থানে তাঁর ধর্মানুশাসনে খোদিত স্তম্ভগুলি বৌদ্ধস্থাপত্যের নির্দেশক। অশোকের স্তম্ভসমূহ নির্মাণের চমৎকার পরিকল্পনা রয়েছে – (ক) স্তম্ভ: গোলাকার ভিত্তিমূল থেকে ক্রমশ সরু হয়ে উপরে গোলাকারে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধবাণী খোদিত এই মসৃণ পালিশযুক্ত স্তম্ভগুলির স্থাপত্য

সৌকর্য অসাধারণ। (খ) স্তম্ভশীর্ষ বা ক্যাপিটল – এটি একটি তাম্রকীলকের সাহায্যে স্তম্ভের সঙ্গে যুক্ত প্রস্ফুটিত পদ্মের মত আকারবিশিষ্ট। স্তম্ভের উচ্চতা ও পরিধির সঙ্গে শীর্ষের আনুপাতিক পরিমাণ বিশেষ লক্ষণীয়। (গ) শীর্ষ বেষ্টনী বা অ্যাবাকাস্ – নানাবিধ কারুকার্যে সাজানো এই অংশটিতে ধর্মচক্র, সিংহ, ষাঁড়, ঘোড়া, হাতি থাকে। (ঘ) শীর্ষচূড়া – এই অংশে একাধিক সিংহমূর্তি (সারনাথ), সিংহ ও ষাঁড়মূর্তি (রামপুরওয়া স্তম্ভ) থাকে। পাদপীঠহীন এই 'মনোলিথিক' অশোকস্তম্ভগুলি মৌর্যস্তম্ভের বিশেষ স্থাপত্য রীতির পরিচায়ক।[৭]

বৌদ্ধস্থাপত্যের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন চৈত্য বা স্তূপ। বুদ্ধ বা তাঁর মতো ব্যক্তির ভস্ম, অস্থি, কেশ, দন্ত বা ব্যবহৃত বস্তুসমূহের উপর স্তূপ অর্থাৎ মাটি বা পাথরের ঢিবি করা হত। বৌদ্ধপূর্ব যুগে চৈত্যনির্মাণ প্রচলিত ছিল যা বৌদ্ধযুগে স্তূপে পরিণত হয়েছিল। বুদ্ধের শরীর-ধাতু স্তূপের ভিতরে নিহিত থাকায় শ্রীলঙ্কায় স্তূপের অন্য নাম 'দাগব' বা পালি ধাতু-গর্ভ।[৮] 'কালিঙ্গবোধি-জাতক'-এ আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ চৈত্য সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বলেছিলেন। চৈত্য তিন প্রকার – শারীরিক, পরিভোগিক ও ঔদ্দেশিক। (ক) শারীরিক চৈত্য – যেখানে বুদ্ধের 'ধাতু' সংরক্ষিত থাকে। বুদ্ধদের মহাপরিনির্বাণের পরই শারীরিক চৈত্য করা যায়। (খ) পারিভোগিক চৈত্য – বুদ্ধ ভোগ করেছেন এমন কোন বস্তু যেখানে থাকে। এই চৈত্য 'অবস্তুক' কারণ এর সঙ্গে কেবল মনের সম্বন্ধ থাকে। (গ) ঔদ্দেশিক চৈত্য – যেখানে বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত এমন স্থান বোঝায়।[৯] এছাড়াও বৌদ্ধতীর্থ ভ্রমণের সময়ে শ্রদ্ধার স্মারক অথবা পুণ্যার্জনের কারণে উৎসর্গীকৃত স্তূপ নির্মিত হয়। চৈত্যগৃহের অভ্যন্তরে নির্মিত স্তূপপূজাই বুদ্ধপূজা। প্রাথমিক পর্যায়ে যখন বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল তখন স্তূপ বুদ্ধের প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হত। মহাযান বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের সময় থেকে চৈত্যগৃহের স্তূপসমূহে বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বমূর্তি খোদিত হওয়ার ঐতিহ্য সূচিত হয়েছিল।

বৌদ্ধস্তূপ নির্মাণের বিশেষ রীতি রয়েছে। সাধারণত, চারকোণা বেদীর উপরে স্থাপিত স্তূপের বেদীকে 'মেধী', তার উপরের অর্ধগোলাকার 'প্রধান' অংশকে 'অণ্ড' ও তার উপরের চারকোণা অংশকে 'হর্মিকা' বলা হয়। হর্মিকার উপরের 'ছত্র'টিকে রাজছত্রের বিকল্প বা বুদ্ধের সার্বভৌম শক্তির পরিচায়ক বলে মনে করা হয়। স্তূপের চারিদিক বেষ্টনী থাকে, এটি প্রাথমিক পর্বে কাঠে তৈরি হলেও পরবর্তীকালে পাথরে তৈরি হতে থাকে। সাঁচী প্রভৃতি স্তূপে উঠবার জন্য সোপানশ্রেণি সংযোজিত হয়েছিল। এর

প্রবেশপথের চারদিকে চারটি তোরণ বা প্রবেশদ্বারের বেষ্টনীগুলি বৌদ্ধশিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন বলে বিবেচিত হয়।[১০]

আদিযুগের বৌদ্ধশিল্প প্রধানত আখ্যানমূলক হওয়ায় বুদ্ধের উপস্থিতি নির্দেশ করতে শিল্পীরা নানারকম ইঙ্গিতমূলক অলঙ্কার ব্যবহার করেছিলেন। যেমন – ভারহুত, সাঁচী (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪৩১) প্রভৃতি স্তূপে স্তম্ভের গায়ে খোদিত বোধিবৃক্ষের তলায় আসনের উপরে পদ্মচিহ্ন, ধর্মচক্র সংলগ্ন আসনে পদচিহ্ন বুদ্ধদেবের উপস্থিতি নির্দেশক। এখানে বুদ্ধজীবনের নানা ঘটনা, নিদান কাহিনি বা বুদ্ধত্বলাভের পূর্বতন জাতক কাহিনি স্থান পেয়েছিল। সমসাময়িক যুগে বুদ্ধজীবনের সঙ্গে যুক্ত নানা পরিচিত চরিত্র ও জনবহুল চিত্রগুলি জীবনের গতি-চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ ছিল। পূর্বতন জীবনের আলেখ্যগুলিতে বোধিসত্ত্ব কখনো প্রাণি আবার কখনো মানুষের আকৃতিতে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও স্তূপবেষ্টনী বা তোরণের গায়ে তৎকালীন জনসমাজে পরিচিত নানা দেবতা, যক্ষ, নাগ ইত্যাদির মূর্তির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।[১১] আনন্দ কুমারস্বামী বৌদ্ধ শিল্পস্থান ও চিহ্নগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন –

Place	**Event**	**Symbol**
Kapilavastu	Conception	Elephant
	Nativity	Lotus, bull
	Going Fourth	Gate, horse
Bodh Gaya	Great Enlightenment	Bodhi tree with rail
Saranath	First Preaching	Wheel, often with deer
Kusinagara	Final Nirvana (Death)	Stupa.[১২]

ভারহুত, সাঁচি, পিপ্‌-রওয়া, সারনাথ, ধামেক, নাগার্জুনকোণ্ডা, গোলি, জগ্‌গয্যপেটা, অমরাবতী, গান্ধার, তক্ষশীলার ধর্মরাজিকা স্তূপগুলি বৌদ্ধস্থাপত্যশিল্পের অসামান্য নিদর্শন। জেমস ফার্গুসন স্তূপপূজার সঙ্গে শিল্পভাবনা যুক্ত থাকার কথা লিখেছেন –

> The worship of stûpes probably arose from the popular idea that the sanctity of the relics was shared by their shrines; and gradually stûpas, simply in memory of the Buddha or of any of his notable followers, come to be multiplied and reverenced everywhere. Many were solid blocks without any receptacle for a relic; but in those inside chaitya halls, the casket was placed in the capital or Tree, whence it could be readily transferred, or taken out on the occasion of a festival.[১৩]

অশোক তাঁর সাম্রাজের বিভিন্ন স্থানে স্তূপ ও গুহা নির্মাণের সূচনা করলেও শুঙ্গ ও অন্ধ্রযুগেই (খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫ – ১৮০ খ্রিস্টাব্দ) তা পরিপূর্ণতা পেয়েছিল।

ঢাকা জেলার আসরাফপুর গ্রামে খড়্গারাজবংশের রাজা দেবখঙ্গের (৬৫৮ –৬৭৩) তাম্রশাসনের সঙ্গে একটি অষ্টধাতুর স্তূপ পাওয়া গেছে যা সম্ভবত বাংলার সর্বপ্রাচীন স্তূপের নিদর্শন। রাজশাহীর পাহাড়পুর ও চট্টগ্রামের ঝিউরিতে দুটি ব্রোঞ্জের স্তূপ পাওয়া গেছে।[১৪] ১০১৫ খ্রিস্টাব্দে লিখিত একটি বৌদ্ধপুথিতে বরেন্দ্রের মৃগস্থাপন স্তূপের একটি চিত্র রয়েছে। ময়নামতীতে খননকার্যের ফলে কোটিলামুড়ায় পাশাপাশি তিনটি স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে যা সম্ভবত বুদ্ধ (জ্ঞান) ধর্ম (ন্যায়) ও সংঘের (শৃঙ্খলা) প্রতীক। কেটিলামুড়ার কেন্দ্রীয় স্তূপের থেকে অসংখ্য মাটির উৎসর্গীকৃত স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। সত্যপীর ভিটা এবং তারা মন্দিরেও এরকম অসংখ্য স্তূপ রয়েছে। মহাস্থানগড়ে বসুবিহারের পাশে 'নরপতি ধাপ' নামে ৩০ ফুট উঁচু একটি প্রাচীন ধ্বংসস্তূপকে কানিংহাম অশোকস্তূপ বলে অনুমান করেছিলেন।[১৫]

প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মণের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা থেকে লেখা 'পাহাড়পুরের স্তূপ' প্রবন্ধটি (*বঙ্গবাণী*, শ্রাবণ, ১৩৩৩) প্রকাশের সময়েও স্তূপটির (স্থানীয় লোকেদের কাছে 'মইদল রাজার বাড়ি' নামে পরিচিত) ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কেউ অবহিত ছিলেন না। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে দিঘাপতিয়ায় কুমার শরৎকুমার রায়ের উৎসাহে বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি সর্বপ্রথম এই স্তূপের ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণে যত্নবান হয়েছিল। ১৯২৫ – ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নবিভাগের উদ্যোগে শরৎকুমার ও গবর্মেন্টের অর্থে মূলস্তূপটির বর্হিবেষ্টনীর দক্ষিণপূর্ব ধারের কতকটা অংশের খননকার্য সূচিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি খননকার্যকালীন সময়ে লিখিত হওয়ায় স্বভাবতই তথ্যে সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মি. বুকানন সর্বপ্রথম পাহাড়পুর পরিদর্শন করেছিলেন। তারপর দিনাজপুরের কালেক্টর ওয়েষ্টমেকট এটি পরিদর্শন করে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের ৪৪ সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। জেনারেল কানিংহাম এখানে তখনো পর্যন্ত বৌদ্ধনিদর্শন দেখতে না পেয়ে একে বেদপন্থী হিন্দুদের মন্দির বলে অনুমান করেছিলেন। তিনি এই স্তূপের উচ্চতা পাদদেশ থেকে ৭০ ফিট ও সমতলভূমি থেকে ৮০ ফিট বলে নির্ধারণ করেছিলেন।

মূল স্তূপটির সামনে খনন কার্যের ফলে সুবৃহৎ তিনতলা উত্তরমুখী টেরাকোটার মন্দির পাওয়া গেছে বলে প্রভাসচন্দ্র জানিয়েছেন। এখানে হাঁস, কচ্ছপ, মাছ, মুরগী, মানুষ, বানর, সিংহ, হাতি, কীর্তিমুখ প্রভৃতি টেরাকোটা পাওয়া গেছে। চারদিকে পরিখার চিহ্নবিশিষ্ট মন্দিরের পাদদেশের বেড় প্রায় ১২৫০

ফিট ও উচ্চতা প্রায় ৬৫ ফিট। মন্দিরের উত্তরদিকের বেষ্টনী খুঁজে টেরাকোটার তোরণের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল। বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি সংগৃহীত স্তম্ভলিপিতে লেখা রয়েছে –

রত্নত্রয় প্রমদেণ সত্ত্বানাং হিত কাম্যয়া।

শ্রীদশবলগর্ভেন স্তম্ভোহয়ং কারিতো ববঃ।

অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ–ত্রিরত্নের আনন্দের জন্য এবং প্রাণিদের মঙ্গল কামনা করে শ্রীদশবলগর্ভ এই শ্রেষ্ঠ স্তম্ভটি নির্মাণ করেছেন।

প্রকাশচন্দ্র পাহাড়পুরের মন্দিরটি 'বেদপন্থী হিন্দুগণের কি বৌদ্ধপন্থী হিন্দুগণের' সেই বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। তিনি বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির বার্ষিক বিবরণীতে (১৯২৫ – ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত পাহাড়পুর সম্পর্কে লেখা উদ্ধৃত করেছিলেন যেখান থেকে পাহাড়পুরের মন্দিরটি যে বৌদ্ধস্তূপ সেই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এখানে খননকার্যের ফলে একটি স্ফটিক, পিতলের ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি, পিতলের ক্ষুদ্র ঘণ্টা প্রভৃতি জিনিস পাওয়া গিয়েছিল। আমরা সমিতির বার্ষিক বিবরণীটির আংশিক উদ্ধার করছি –

> Paharpur (Rajshahi Dist.), 3 miles west of Jamalgunj E.B.R. Excavations which are in progress here have revealed a huge Buddhist Temple decorated with dados of terra-cotta plaques bearing various interesting figures. Inscribed stone pillars and other important relics also have been found… Two similar plaques and part of a stone pillar bearing an inscription of a Buddhist named Dasabalagarbha from Paharpur …

পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত বৌদ্ধস্তূপটি ও বিহারগুলির মধ্যে পাহাড়পুর সমগ্র বাংলার মধ্যে সবচেয়ে বড় বৌদ্ধবিহার। বাংলায় বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী দ্বিতীয় পালরাজ ধর্মপালের রাজত্বকালে (৭৭০ – ৮১০ খ্রিস্টাব্দ) বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের নওগাঁ অঞ্চলে নির্মিত সোমপুর বিহার পরবর্তীকালে পাহাড়পুর বিহাররূপে খ্যাত হয়েছিল। মন্দিরের গায়ে খোদিত টেরাকোটাগুলি পালরাজাদের সময়কালের (৭৫০ – ১১৭৪ খ্রিস্টাব্দ) মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। খ্রিস্টিয় নবম শতকের শেষার্ধে প্রতিহাররাজ মহেন্দ্রপাল এই অঞ্চলের কিছুটা দখল করলে এই বিহারের গৌরব সাময়িকভাবে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। পরে পালরাজ প্রথম মহীপালের (৯১৩ – ৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ) সময় পালবংশের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা হলে বিহারটির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। বৌদ্ধস্তূপের গায়ে পাথর ও টেরাকোটাগুলিতে প্রচলিত সহজিয়া বৌদ্ধসংস্কৃতি ও তৎকালীন বাংলায় প্রচলিত নৃত্য-গীত-বাদ্য পরিবেশনার কিছু চিত্রের পাশাপাশি জনমানসের কর্মময় জীবনযাপন ও কাল্পনিক চিত্র ধৃত রয়েছে।[১৬] রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলার এই নিজস্ব

ভাস্কর্যের মধ্যে চর্যাপদে উল্লিখিত ‘বুদ্ধনাটক’-এর আভাস পেয়েছিলেন।[১৭] ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের খননের ফলে পাহাড়পুরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই তিনটি বৌদ্ধস্তূপ, নানা ধরণের ভাঙা মাটির পাত্র, চিত্রসম্বলিত টেরাকোটা ও খিলানের নিদর্শন পাওয়ার তথ্য প্রকাশচন্দ্র জানিয়েছিলেন। পাহাড়পুরের বৌদ্ধস্তূপ[১৮] সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ে নানা তথ্য পরিবেশন করে আলোচ্য প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

বৌদ্ধগুহা ও চৈত্যশিল্প

গুহামন্দির ও চৈত্যশিল্পকে ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্য কর্ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই গুহামন্দিরগুলিতে তৎকালীন তিনটি প্রধান ধর্মাবলম্বী বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য) স্থাপত্যের অনুপম প্রকাশ ঘটেছিল। বৌদ্ধগুহাগুলিকে দু’ভাগে ভাগ করা যায় – থেরবাদী এবং মহাযানী। থেরবাদী গুহায় স্তূপ এবং মহাযানী গুহায় বুদ্ধমূর্তি অথবা বুদ্ধমূর্তি সম্মলিত স্তূপ-চৈত্যেই মূল অর্চনার বিষয়। বিখ্যাত গুহাগুলির মধ্যে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ‘ভাজা’ গুহা বৌদ্ধবিহার, পিঠালকোড়া বা পিঠালখোড়া গুহা চৈত্য, কোণ্ডনে গুহা, বেদ্‌সা গুহা, নাসিক গুহামন্দির, কান্‌হেরী গুহা, কার্লি গুহাচৈত্য, জুনাগর গুহাচৈত্য, বাঘ গুহা, কোলবি গুহা, বিন্নায়গ গুহাচৈত্য, ধামনার গুহা উল্লেখযোগ্য।

‘ভারত ভ্রমণ’ শীর্ষক একটি অস্বাক্ষরিত ভ্রমণকাহিনির (*নবজীবন*, আশ্বিন, ১২৯১) মধ্যে ‘পাণ্ডব গুহা’র বিবরণ রয়েছে। নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ‘বৌদ্ধ কলা-শিল্পের অনুপ্রেরণা ও বাঘগুহার পরিচয়’ প্রবন্ধে (*পঞ্চপুষ্প*, বৈশাখ, ১৩৩৮) তথ্যপূর্ণ বিস্তৃত বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। বাগ বা বাঘ গুহাই স্থানীয় লোকেদের কাছে ‘পাণ্ডব গুহা’ নামে পরিচিত। ‘ভারত ভ্রমণ’-এ বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণদের পরে বৌদ্ধরা এই গুহা ব্যবহার করেছিলেন। গুহায় ‘বৌদ্ধদেব’ মূর্তি বেশি, কেবল একটি দেবীর মূর্তি (পাণ্ডাদের মতে সর্বমঙ্গলা মূর্তি) রয়েছে। গুহার মূর্তিগুলির মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুদের মূর্তি কোনটা যে কার তা বুঝে ওঠা দায়। প্রাবন্ধিক তেত্রিশটি গুহার উল্লেখ করে তার মধ্যে কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এর মধ্যে পর্বত কেটে তৈরি করা ‘অতি সুন্দর’ ৩ সংখ্যক গুহাটি বর্গাকার, আয়তন প্রায় ২৬০০ বর্গফুট, মেঝেযুক্ত দীর্ঘদালানের তিনদিকে উনিশটি ঘর রয়েছে। নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর মতে নয়টি গুহায় ‘ভিক্ষুদের কুঠি’র সংখ্যা কুড়িটি। সাধনচন্দ্র সরকারের মতে খ্রিস্টিয় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতকে নির্মিত বাগগুহার সংখ্যা আট বা নয়টি এবং ঘরের সংখ্যা আঠারোটি।[১৯]

নৃপেন্দ্রনাথ বিস্তৃতভাবে বাগগুহার অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। সাধনচন্দ্র সরকারের বর্ণনা অনুযায়ী মধ্যপ্রদেশে বিন্ধ্যপর্বতের ঢালে পর্বতগুহার পাশ থেকে নর্মদার শাখানদী বাগ থেকে প্রায় দেড়শ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এইগুলির মধ্যে বিশালাকার গুহা থাকলেও চৈত্যগৃহ নেই। এটি অজন্তার ১৬ সংখ্যক গুহার আদলে তৈরি শ্রমণবিহার, স্তম্ভ বারান্দা সমেত সামনের অংশে একটি সুবিশাল পাথরকে পর্বতের গা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি বাঘের আকৃতি দেওয়া হয়েছে বলে একে 'বাঘগুহা' বলে। গুহার ভিতর বর্গাকার এবং কুড়িটি স্তম্ভসারি দ্বারা সাজানো এবং এতে বিভিন্ন অলঙ্করণ, বন্ধনী ও শীর্ষদেশ রয়েছে। বাইরের স্তম্ভগুলি অপেক্ষাকৃত কম অলঙ্কৃত। ভিক্ষুদের কুঠি কারুকার্যবিহীন প্রায় ছয় হাত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সমন্বিত হলেও পিছনের স্তূপের প্রবেশদ্বারে দুটি স্তম্ভ রয়েছে এবং প্রবেশপথের উভয়প্রাচীর সুন্দর শিল্পকার্যে ভূষিত। একসঙ্গে তিনটি মূর্তি রয়েছে, মধ্যস্থলে বুদ্ধদেব এবং উভয়পাশে অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধমূর্তি একশো চারটি পদ্মের উপর দাঁড়ানো, ডান হাত বরদমুদ্রার ভঙ্গিতে বিন্যস্ত, দেহের রেখাপাত গুহাযুগের, মাথায় কেশ ও উষ্ণীষ প্রচলিত নিয়মেই সাজানো রয়েছে। এখানেও অজন্তার মূর্তি শরীরের মতো আস্তর ও রঙের চিহ্ন রয়েছে। প্রায় পাঁচ বা সাড়ে পাঁচ হাত মূর্তিগুলি তোরণযুক্ত বড় বড় কুলুঙ্গিতে স্থান পেয়েছে। পরবর্তীকালে এই বোধিসত্ত্বমূর্তি দুটিকে হিন্দুরা যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণ এবং প্রবেশপথের ডান ও বাম দিকের তিনটি করে মূর্তিকে যথাক্রমে কুন্তী, ভীম, অর্জুন এবং দৌপদী, নকুল, সহদেব বানিয়েছেন। ২ সংখ্যক গুহার বারান্দায় উত্তরপ্রান্তে যক্ষ ও নাগের মূর্তি রয়েছে।[২০]

'ভারত ভ্রমণ'-এর প্রাবন্ধিক ২২ সংখ্যক গুহায় 'ইন্দ্রসভা'র মূর্তিগুলি হিন্দু না বৌদ্ধমূর্তি এই বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হতে পারেননি। কিন্তু তাঁর বর্ণনাটি বিশেষভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে বৌদ্ধমূর্তিগুলি স্থানীয় লোকেদের পূজার্চনার কারণে হিন্দুমূর্তিতে পরিণত হয়েছিল। প্রাবন্ধিকের গুহা সংখ্যা নির্ণয়ের মতো মূর্তি সম্পর্কিত বক্তব্যেও অসঙ্গতি রয়েছে। বৌদ্ধশিল্পকলার সঙ্গে তাঁর পরিচয়হীনতা এর অন্যতম কারণ বলে মনে হয়। যেমন – 'বিংশতিতম গহ্বরটি তৃতীয় গহ্বরের ন্যায়; ভিতরে একটি মূর্তি আছে, মূর্তিটি বৃহৎ, রং করা এবং অঙ্গের কোন স্থানই ভগ্ন হয় নাই' – এই বর্ণনা অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট, স্থাপত্য ও মূর্তিতত্ত্বের নিরিখে মূল্যহীন। তিনি ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ সংখ্যক গুহাগুলিকে 'সামান্য' বৈশিষ্ট্যযুক্ত বলেছেন যা ৪ ও ৫ সংখ্যক গুহাগুলির ক্ষেত্রে একেবারেই সত্য নয়। নৃপেন্দ্রনাথ রঙিন ম্যুরাল

চিত্রে সমৃদ্ধ ৪ সংখ্যক প্রাচীন গুহাটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই প্রাচীরে বাগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রাবলীর পরিচয় রয়েছে। এই গুহার ভিতরে আঠাশটি স্তম্ভ ও চারটি অর্ধস্তম্ভ, তিনটি বারান্দা, তিনদিকে সাতাশটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। কেন্দ্রস্থিত বারান্দার দ্বারের ফ্রেমটি বিচিত্র মূর্তি, পুষ্পলতার কারুকার্য এবং স্ক্রোল বা গুটানো অলঙ্কারমণ্ডিত, কোথাও কোথাও বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। গুহার সামনের দিক চৈত্য খিলানাকৃতিবিশিষ্ট, সবচেয়ে বড় গুহার পিছনের কেন্দ্রে মেধি ও সশীর্ষ 'ডাগোবা' রয়েছে।[২১]

অসিতকুমার হালদার 'বাঘগুহা' প্রবন্ধে (*প্রবাসী*, ভাদ্র, ১৩২৪) একটি চিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন –

> এই বৌদ্ধ গুহায় সিদ্ধার্থের বুদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে রাজোদ্যানে সখীদের সঙ্গে নৃত্যগীত আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে বাসের একটি চিত্র হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। তার পাশেই আবার একজন অশ্বারোহী রাজপুত্রের লোক-লস্কর নিয়ে শোভাযাত্রার ছবি। এটিও সিদ্ধার্থের প্রথম উদ্যান-প্রাঙ্গণ ত্যাগের পর সহর প্রদক্ষিণের ছবিও হতে পারে। ... এই ছবিগুলি অজন্তার ধরণের হলেও এই মূর্ত্তিগুলির ভাবে ও ধরণে স্বতন্ত্র একটা বিশেষত্ব আছে বলে মনে হয়। অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির সঙ্গে এগুলির তুলনা হতে পারে। বর্ণবিন্যাসে রেখাঙ্গনে ও মূর্তিগুলিকে যথাযথ স্থানে আরোপ করতে এই বাগ-শিল্পীরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন। রঙের মধ্যে নীল আর সাদা রঙটা এখনও পর্য্যন্ত বেশ আছে – নষ্ট হয়নি। বাঘের ও অজন্তার চিত্রকরেরা যে কি বর্ণ ব্যবহার করতেন বলা যায় না।

খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতক থেকে নবম শতক পর্যন্ত ইলোরার বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের শিল্পকলা চালুক্য-রাষ্ট্রকূট স্থাপতিদের কালে গড়ে উঠেছিল। ইলোরার উত্তর প্রান্তভাগের মন্দিরের নাম পার্শ্বনাথ এবং সর্বশেষ মন্দিরের নাম দেহর বারা। আবিষ্কৃত চৌত্রিশটি গুহামন্দিরের স্থাপত্য বিস্ময়কর।[২২] অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ 'ইলোরার গুহা' (*বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ*, ফাল্গুন, ১২৫৯) ও 'দেবগিরি' (*নবজীবন*, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬) প্রবন্ধ দুটিতে বোম্বাই দ্বীপের পূর্বাংশে দৌলতাবাদ বা দেবগিরি নগরের কাছে ইলোরা গুহার বিবরণ রয়েছে। অলোক রায় 'ইলোরার গুহা'কে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচনা বলে দাবি করেছেন।[২৩]

'দেবগিরি' প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে বৌদ্ধভিক্ষুরা যাতে নিভৃতে ধ্যান করতে পারেন, সেইজন্য ধনী বৌদ্ধরা দিলয়াড়া, দেবগিরি প্রভৃতি স্থানে গুহা তৈরি করিয়ে দিতেন। ধর্মীয় সংস্কারের ফলশ্রুতিতে তৈরি ইলোরায় গুহায় 'অতি চমৎকার নৈপুণ্য' ও 'অদ্ভুত কীর্তি' দেখা গেছে। 'ইলোরার গুহা' প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে ইলোরা পূর্ব-পশ্চিমে ব্যাপ্ত অনুচ্চ অর্ধচন্দ্রাকার অবয়বযুক্ত, দুইপাশে উঁচু ও মাঝখানে নিচু পর্বতমালা। ইলোরার গুহায় পার্শ্বনাথের দক্ষিণদিকের মন্দির 'ইন্দ্রসভা' অতি বিস্তৃত ও রম্য। এর তিনটি গুহাস্তম্ভ এবং

প্রাচীরের সর্বত্র বহুসংখ্যক খোদিত বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। এর উত্তর দিকের গর্ভগৃহে বুদ্ধদেবের প্রকাণ্ড মূর্তি পার্শ্বনাথের মতো হলেও 'কিয়দংশে বিশেষ', তা হিন্দুদের দেবমূর্তির মত অলঙ্কারে সাজানো নয়। হিন্দুরা এই মূর্তিকে 'জগন্নাথ বুদ্ধ' বলেন। এই মূর্তির বামে 'ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী' মূর্তি রয়েছে। ৩ সংখ্যক গুহার ('রঞ্জোড়জির গুহা') গর্ভস্থান ও প্রাচীরের সর্বত্র বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। এর সামনের বারান্দায় হাতির উপর পুরুষমূর্তি এবং বাঘের উপর স্ত্রীমূর্তি (ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী) থাকায় ব্রাহ্মণেরা এই সভাকে 'ইন্দ্রসভা' বলে দাবি করেছেন। আবার, এই ইন্দ্রাণী মূর্তিই অন্য গুহাদুটিতে 'ভবানী' নামে খ্যাত। প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এই তিনটি গুহা 'বৌদ্ধগুহা'। এগুলি ইন্দ্রদেবের পূজার জন্য নির্মিত হয় নি, কারণ যদি তা হত তাহলে মন্দিরের গর্ভগৃহে বুদ্ধদেবের মূর্তি রেখে বাইরে প্রধান উপাস্যমূর্তিকে রাখা হত না। একটি পাথরে খোদিত এই গুহাগুলি আগে দোতলা ছিল। ইন্দ্রসভার কিছুদূর আগে একটি ক্ষুদ্র বৌদ্ধমন্দিরের অস্তিত্বের কথাও প্রাবন্ধিক জানিয়েছিলেন যা এখনো রয়েছে।

'ইলোরার গুহা' এবং 'দেবগিরি' প্রবন্ধদুটিতে তিনতলা গুহা বর্ণনায় সাদৃশ্য রয়েছে। তিন থাল 'বৌদ্ধ মঠ'; তলাগুলির নাম যথাক্রমে 'পাতাল', 'মর্ত্যলোক' ও 'স্বর্গ'। এর গর্ভগুহায় বুদ্ধদেবের একটি দিগম্বর মূর্তি এবং প্রাচীরের সর্বত্র পদ্মাসনোপবিষ্ট এক একটি স্ত্রীমূর্তির মাথায় এক একটি বুদ্ধদেবের মূর্তি খোদিত রয়েছে। দুটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে এখানকার ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধদেবের মূর্তিকে রামচন্দ্রের মূর্তি বলে সিঁদুরচর্চিত করে পূজা করেন। প্রবেশদ্বারে দুই প্রকাণ্ড দ্বারপাল (মৈত্রেয় ও মঞ্জুশ্রী) রয়েছে। এই গুহার বাইরের স্তম্ভগুলির সবল ভাস্কর্য মূর্তিশূন্য হওয়ার ফলে আকর্ষণীয় নয়, কিন্তু ভিতরের স্তম্ভগুলিতে ভাস্কর্য-কলার অপূর্ব নিদর্শন দেখা যায়।

'তিন থাল' গুহার দক্ষিণে 'দুখিয়া ঘর' এবং তার পাশে 'বিশ্বকর্মার গুহা'[২৪] বৌদ্ধমন্দির হলেও ব্রাহ্মণেরা এগুলিকে হিন্দু মন্দির বলে দাবি করেন। 'ইলোরায় গুহা' প্রবন্ধে উভয় গর্ভগৃহে বুদ্ধদেবের মূর্তি থাকায় এটিকে বৌদ্ধমন্দির বলা হয়েছে। বিশ্বকর্মা গুহা সম্পর্কে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে *History of Indian and Eastern Architecture*. Vol – I গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে জেমস্ ফার্গুসনের মন্তব্য করেছিলেন –

> The dimensions of this cave are considerable, 85ft. 10 in. by 43 ft, and 34 ft. high; the inner end is entirely blocked up by the dâgaba which, instead of being circular as in all the older examples, has a frontispiece attached to it larger than that in cave No. 19 at Ajantâ, which, … makes it square in front. On this addition is a figure of Buddha seated with his feet down and surrounded by attendants and flying figures is the later style of Mahâyâna Buddhist art. In the root, all the ribs and ornaments are cut in the rock, though

still copied from wooden prototypes, and the triforium is sculptured with groups, as in nos.19 and 26 of Ajantâ.[২৫]

'দেবগিরি' প্রবন্ধে ইলোরা স্থাপত্যেরও প্রশংসা করে একে 'বিস্ময়জনক স্থাপত্য' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইলোরার ভাস্কর্যের স্বাতন্ত্র নির্ধারণ করে সাধনচন্দ্র সরকার লিখেছেন যে এটি অজন্তার থেকেও উজ্জ্বল অলঙ্কৃতিবিশিষ্ট, এর ভাস্কর্যকর্মের অতিরিক্ত স্থান চিত্রাঙ্কিত; অন্যদিকে অজন্তা এর বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।[২৬]

প্রাচীন ভারতের অন্যতম পুরাকীর্তি অজন্তা গুহাগুলি ঔরঙ্গাবাদ নগর থেকে খান্দেশ-ভূভাগবর্তী ঘাট পর্বতশ্রেণির সংলগ্ন ফার্দাপুরের প্রায় দেড় ক্রোশ স্থান জুড়ে অবস্থিত। সম্ভবত এই গুহাশ্রেণির নাম 'অচিন্ত্য' মহাবিহার থেকে 'অজন্তা' নাম এসেছিল।[২৭] প্রায় ২৫০ ফিট উঁচু বিন্ধ্যপর্বতের পাশ কেটে করা অজন্তার খাড়া গুহাগুলি প্রায় ৩৫ ফিট থেকে ১১০ ফিট পর্যন্ত উঁচু এবং ৫৪৯ মিটার পরিধিতে অর্ধবৃত্তাকারে অবস্থিত। সকল গুহা এককালে নির্মিত না হওয়ায় পরিকল্পনার অভাবে এর তলগুলি অননুভূমিক। প্রায় প্রতিটি গুহার নিচে প্রবাহিত ওয়াগ্রা নদী পর্যন্ত সোপানশ্রেণি প্রসারিত ছিল বলে অনুমিত হয়।[২৮] ওয়াগ্রা নদীর স্রোতধারা ঘিরে খাড়াই ব্যাসল্ট আগ্নেয়শিলা কেটে গুহানির্মাণ কৌশলের ক্ষেত্রে শিল্পী-শ্রমণদের নিখুঁত পরিকল্পনা ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রের এক অনন্য সুসামঞ্জস্য অজন্তাকে অদ্বিতীয় করে তুলেছে। বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র অজন্তায় নানা সময়ে আসা পরিব্রাজকদের মধ্যে হিউয়েন সাঙের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধসাধকেরা এই আরণ্যক পার্বত্য প্রদেশে তাঁদের নিভৃত সাধনক্ষেত্র প্রায় ন'শো বছরের অকল্পনীয় পরিশ্রম, নিষ্ঠা, অসাধারণ শিল্পবোধ দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন।[২৯] ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ রেজিমেন্টের জনৈক ক্যাপ্টেন মর্গান অজন্তা 'আবিষ্কার' করেছিলেন। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে লেফটেন্যান্ট জেমস অ্যালেকজাণ্ডার অজন্তা পরিদর্শন করেছিলেন।

অজন্তায় আবিষ্কৃত ত্রিশটি গুহার মধ্যে কয়েকটি বিহার বা সংঘারাম এবং বাকিগুলি বৌদ্ধ চৈত্য। বিহারগুলির স্থাপত্যে প্রাচীন তক্ষণশিল্পকলার প্রভাব লক্ষণীয় যার মধ্যে প্রায় চার শতকের স্থাপত্যকলার নিদর্শন রয়েছে। চৈত্যগৃহে প্রবেশদ্বারের উপরে অশ্বক্ষুরাকৃতি স্থাপত্যকলার নিদর্শনে তৈরি জানলাগুলি পশ্চিম ভারতের কার্লি, ভাজা, বেদসা প্রভৃতি চৈত্যশিল্পের সঙ্গে তুলনীয়। চৈত্যগুহাগুলির ভিতরের স্তূপে বুদ্ধমূর্তির অনুপস্থিতি তার প্রাচীনতার পরিচয়বাহী। এখানকার শ্রমণ সমাবেশের জন্য প্রশস্ত দালান এবং

তিনদিকে অবস্থিত কুঠুরিগুলি ভিক্ষুদের বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হত। প্রাচীন গুহাগুলিতে সাতবাহন যুগের শিল্প ও ভাস্কর্যরীতির ছাঁদ লক্ষণীয়।[৩০]

১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে অজন্তা ভ্রমণ করে নিবেদিতা ছাব্বিশটি গুহার কথা উল্লেখ করেছিলেন। নিবেদিতা তাঁর 'The Ancient Abbey of Ajanta' প্রবন্ধে (*The Modern Review*, 1910) প্রাপ্ত গুহাগুলিকে চারটি যুগে ভাগ করেছিলেন – (ক) প্রথম যুগ – ১৩, ১২, ১১, ১০, ৯, ৮; (খ) দ্বিতীয় যুগ – ১৯, ১৮, ১৭, ১৬, ১৫, ১৪; (গ) তৃতীয় যুগ – ৭, ৬, ৫, ৪, ৩, ২, ১ ও (ঘ) চতুর্থ যুগ – ২৬, ২৫, ২৪, ২৩, ২২, ২১, ২০ নং গুহা। *বাঘ ও অজন্তা* গ্রন্থে দেবব্রত মুখোপাধ্যায় গুহাগুলির মধ্যে থেরবাদী থেকে মহাযানী ভাস্কর্য ও চিত্রধারার বিবর্তনের কথা বলেছেন, তাঁর প্রস্তাবিত যুগবিভাগ হল – (১) হীনযান যুগ: (খ্রিস্টপূর্ব ২০০ – খ্রিস্টাব্দ ২০০) – (ক) চৈত্য সংখ্যা – ৯, ১০ নং গুহা ও (খ) বিহার সংখ্যা – ৮, ১২, ১৩, ৩০ নং গুহা; (২) মহাযান যুগ: (৪৫০ খ্রিস্টাব্দ – ৬৪২ খ্রিস্টাব্দ) – (ক) চৈত্য সংখ্যা – ১৯, ২৬, ২৭, ২৯ নং গুহা ও (খ) বিহার সংখ্যা – ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১১, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৮ নং গুহা।[৩১]

অজন্তার গুহাগুলির মধ্যে কালপরম্পরায় ১৩ সংখ্যক গুহাটি প্রাচীনতম। ৬, ৮, ১২ ও ৩০ সংখ্যক গুহাগুলিও এর দাবিদার। ১৩ সংখ্যক গুহা মৌর্যযুগের প্রাচীরের মত অতীব মসৃণ, কিন্তু বিচিত্রিত নয়। ৯ ও ১০ সংখ্যক গুহার ভাস্কর্যে ভারহুত ও সাঁচীস্তূপের মূর্তিগুলির মাথার মতো উষ্ণীষ পরা বলে এই গুহা ও মূর্তিগুলি অন্ধ্র-সমকালীন বলে অনুমিত হয়। চালুক্য রাজাদের আমলে অজন্তার অধিকাংশ গুহা চিত্রিত হয়। ১ থেকে ৫ সংখ্যক ও ২১ থেকে ২৫ সংখ্যক গুহা এর নিদর্শন। চালুক্য রাজারা বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন বলে তাঁদের শাসনকালে শিল্প-স্থাপত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল।[৩২] ১৯ ও ২৬ সংখ্যক গুহায় একধরণের চৈত্যকক্ষ ও 'চংক্রমন' পথের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ২৬ সংখ্যক গুহাটি সবচেয়ে বড়, চিত্র ও সুদৃশ্য ভাস্কর্যে সমৃদ্ধ। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের বিশাল ভাস্কর্য এর অন্যতম সম্পদ।[৩৩] জেমস্ ফার্গুসন ১৯ সংখ্যক চৈত্যের ভিতর ও বাইরের সজ্জা, সৌধজাতীয় কাজে ভাস্কর্যের পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধের আচরণগত পরিবর্তনকে এই সময় সর্বত্র উপস্থিত করা হয়েছিল যা তার ভাষায় 'The greatest change of all is that Buddha'. ফার্গুসনের মন্তব্যটি এক্ষেত্রে উদ্ধারযোগ্য –

> ... what is even more significant than these is that from a pure atheism we have passed to an overwhelming idolatry. At kârâtê the eight figures that originally adorned the porch

are chiefs or donors with their wives, in pairs. All the figures of Buddha that appear there now are long subsequent additions. None but mortals were sculptured in the earlier caves, and among these Sâkyamuni nowhere appears. Here, on the contrary, he is Bhagavat – the Holy One – the object of worship, and occupies a position in the front of the dâbaga or altar itself, surmounted by the triple umbrella and as the Numen of the place.[৩৪]

'অজন্তা নগরের গুহা' (*বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ*, কার্তিক, ১২৬৫) প্রবন্ধটি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখা বলে অলোক রায় দাবি করেছেন।[৩৫] অজন্তার 'শোভায়মান' প্রকৃতির উল্লেখ করে সাধকদের আত্মমগ্ন শিল্পচর্চাকেন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে – 'ঐ নিভৃত স্থানের পৃথিবী অন্যত্রের সহিত কোন সংস্পর্শ রাখে না'। প্রবন্ধে পশ্চিম দিকে এগারোটি, পূর্বদিকে আটটি এবং মধ্যগুহাকে সামনে রেখে অন্যান্য গুহা মোট কুড়িটি গুহার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মধ্যগুহা দক্ষিণমুখী, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় ছেষট্টি ও ছাব্বিশ হাত, ছাদের তল গোলাকার ও উপরিভাগ গম্বুজাকৃতির মত। গুহার মধ্যে আট ফুট উঁচু আটত্রিশটি স্তম্ভ আছে যার অনেকগুলি ভাঙা, চার হাত প্রশস্ত বারান্দা আগে চিত্রিত ছিল। গুহার প্রবেশদ্বারের সামনে একটি চৈত্যের মধ্যে ধ্যানমগ্ন ও দাঁড়ানো অনেক বৌদ্ধমূর্তি রয়েছে। মধ্যগুহার ঠিক পশ্চিমে গুহার মধ্যে সিংহাসনে বসা দিগম্বর বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। এর পশ্চিমের গুহা মূর্তিশূন্য ও তারপরের গুহাদ্বারে একটি বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। পরবর্তী গুহার সামনের দুইপাশে গরুড়মূর্তি স্থাপিত হয়েছে যেন তার উপর প্রাঙ্গনের ভার রয়েছে।

প্রবন্ধে পরবর্তী একটি গুহায় 'পালি-অক্ষরে খোদিত লিপি এবং কতগুলি স্ত্রী পুরুষের চিত্র'-এর কথা বলা হয়েছে। পালিভাষা কথ্যভাষা, এর কোন নিজস্ব লিপি বা অক্ষরমালা নেই। তবে প্রবন্ধে 'পালি-অক্ষরে খোদিত লিপি' বলা হল কেন? বিধুশেখর ভট্টাচার্য্যের *পালিপ্রকাশ* গ্রন্থে এর সমাধান পাওয়া যেতে পারে। তিনি *মহাবংস* থেকে পংক্তি উদ্ধার করেছেন – 'থেরিয়াচরিয়া সব্বে পালিং বিয় তমগ্গহুং' অর্থাৎ স্থবির ও আচার্যরা সকলেই তা (বুদ্ধঘোষকৃত *অর্থকথা*) পালি-র (অর্থাৎ শাস্ত্রের পঙক্তি বা মূল) মতো গ্রহণ করলেন। এখানে শাস্ত্রপংক্তি বা মূলশাস্ত্র বোঝাতে পালি শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে।[৩৬] আমাদের মতে প্রবন্ধে শাস্ত্রপংক্তি বা মূলশাস্ত্র বোঝাতে পালি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এই গুহাতে অনেকগুলি কালো ও সোনালি বুদ্ধমূর্তি খোদিত রয়েছে। পরবর্তী ক্ষুদ্র গুহা খিলান করা, উঁচু ও বৃত্তাকার উপরিভাগে সুদৃশ্য চিত্র-বিচিত্র পাত্রে ঊনবিংশ জৈনের লক্ষণস্বরূপ চিত্র এবং চৈত্যের নিচে এক বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত, অন্যটিতেও কতগুলি বুদ্ধমূর্তি খোদিত রয়েছে। একটি গুহায় কৃষ্ণসারের পীঠে শতদলপদ্মের উপর সিংহাসনে আসীন বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। প্রাবন্ধিকের মতে সিংহাসনে

খোদিত কৃষ্ণসার ‘ষোড়শ জৈন-শান্তির চিহ্ন’। প্রবন্ধে গুহাগুলির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, স্তম্ভ, মূর্তি ইত্যাদির বিবরণ রয়েছে। ‘চতুর্থ গুহা’র নিচে ও উপরে দিগম্বর ও বস্ত্রপরিহিত বুদ্ধমূর্তি থাকায় প্রাবন্ধিক সিদ্ধান্ত করেছেন যে এইগুলি ‘শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর’ জৈনমতাবলম্বীদের কীর্তি। প্রবন্ধে ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ সংখ্যক গুহা বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। এই গুহাগুলি খুব বড়ো না হলেও সেগুলি পর্বত খোদিত ‘অত্যন্ত বিস্ময়কর’ বস্তু।

বর্তমানের প্রেক্ষাপটে এই প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতার বিচার করলে চলবে না, বরং এখানে সমকাল থেকে অগ্রবর্তী দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধটি বাংলায় অজন্তা বিষয়ক প্রথম তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধরূপে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী।

বৌদ্ধবিহার বা মন্দির

বৌদ্ধ স্থাপত্যকলার নিদর্শনরূপে মুক্তস্থানের মন্দিরগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। বুদ্ধগয়া বা বোধগয়া মন্দিরটি বিহারের গয়া থেকে দক্ষিণ দিকে ছয় মাইল দূরে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অবস্থিত বৌদ্ধদের পবিত্রতম তীর্থস্থান। বুদ্ধদেবের সম্বোধিলাভের এই স্থানের মন্দিরটি মহাবোধি মহাবিহার নামে পরিচিত হয়েছিল। মহাবোধি মন্দিরের চারপাশে ‘অনিমেষ’, ‘চঙ্ক্রমন’, ‘রত্নগৃহ’, ‘অজপাল নিগ্রোধ’, ‘রাজায়তন’, ‘মুচলিন্দ’ চৈত্য প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিল্প নিদর্শন। সরসীকুমার সরস্বতী এবং ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার মহাবোধি মন্দিরের বিবরণ দান করে লিখেছিলেন –

> The temple is 180 feet high and 50 feet square at the base, rising from a platform, on the four corners of which are smaller towers of the same shape as the temple. It is made of bricks and plastered over. The outside walls are relieved by niches with statues in them. The temple faces the east and has an antechamber and a *torana* in front. At its back is the Bodhi tree with the Vajrasana below it. The railing round the temple was made of stone in the ‘Asokan’ style and decorated with fine carvings. It once enclosed a quadrangle 145 feet by 108 feet, much of which has disappeared. Some sculptures are housed in a shed to the north.[৩৭]

বর্তমানেও এই মহাবিহারের সংস্কার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের ‘গয়া’ (*বঙ্গবাণী*, কার্তিক, ১৩৩৪) প্রবন্ধে মহাবোধি মন্দির সম্পর্কে কোন বিশদ বিবরণ না থাকলেও কয়েকটি বক্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। বর্তমান বোধিবৃক্ষকে ‘বৃক্ষ পরম্পরায়’ প্রাচীন ‘বোধিদ্রুমেরই উত্তরাধিকারী’ (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪২১) আখ্যায়িত করে তিনি মন্তব্য

করেছেন – ‘পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ প্রাচীন পুণ্য নিদর্শন বুঝি আর নাই’। তিনি মন্দিরের চারপাশে প্রস্তরবেষ্টনীর কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষে সুন্দর খোদিত চিত্রে শিল্পীর কলানৈপুণ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এই বেষ্টনীর অনেকস্থানে ‘আর্য্যা কুরঙ্গীর দান’ লেখা রয়েছে। মন্দিরের চারিত্র্য নির্ধারণে প্রাবন্ধিক লিখেছেন –

> ইহার বিশালতা ও গাম্ভীর্য্যে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়। বৌদ্ধগয়ার মন্দিরের গঠন পরিপাট্য সম্পূর্ণ নূতন ধরণের – ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত এই শ্রেণির মন্দির আবিষ্কৃত হয় নাই।

প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের অনুকরণে এই শ্রেণির মন্দির পরিকল্পিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরশিল্পের মূল অনুসন্ধান করতে হলে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের গঠন প্রণালীর বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন বলে প্রাবন্ধিক মতপ্রকাশ করেছিলেন। মন্দিরের ভিতরের সুন্দর বুদ্ধমূর্তিটি জাপান সম্রাটের দান – এই শোনা কথায় তিনি বিশ্বাস করেছিলেন।

হিউয়েন সাঙের *সি-ইউ-কি*-তে (৬২৯ খ্রিস্টাব্দ) তাম্রপর্ণীর বোধিরক্ষিত (খ্রিস্টিয় প্রথম শতক), শ্রমণ প্রখ্যাতকীর্তি (খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতক), স্থবির দ্বিতীয় মহানামের (খ্রিস্টিয় ৫৮৭ – ৫৮৮) মূর্তির গায়ে খোদিত লিপিতে বুদ্ধমূর্তি (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪২০) প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও দত্তগল্লানিবাসী বোধিসেনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতকের ইতিলেখ অনুযায়ী ভক্ত উদয়শ্রী বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহাবোধি মন্দিরের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার নাম এখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। বর্তমান মন্দিরটি সম্রাট অশোক ও পরবর্তীকালে মিত্র বা কুষাণবংশীয় রাজাদের সময় নির্মিত একটি ছোট প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কানিংহামের মতে রানি কুরঙ্গীর বদান্যতায় ‘বজ্রাসন-মূলগন্ধকুটী বিহার’ বুদ্ধগয়ার প্রথম বৌদ্ধমন্দির।[৩৮] ফা-হিয়েন বোধিবৃক্ষের কাছে তিনটি সংঘারাম বিহারের অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন।[৩৯] আমরা স্যামুয়েল বিল অনূদিত *সি-ইউ-কি* থেকে উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি –

> Outside the northern gate of the wall of the *Bôdhi* tree is the Mahâbadhi *saṅghârâma*. It was built by a former king of Siṁhala (*Ceylon*). This edifice has six halls, with towers of observation (temple towers) of three storeys; it is surrounded by a wall of defence thirty or forty feet high. The utmost skill of the artist has been employed; the ornamentation is in the richest colours (*red and blue*). The statue of Buddha is cast of gold and silver, decorated with gems and precious stones. The *stûpas* are high and large in proportion, and beautifully ornamented; they contain relics of Buddha.[৪০]

কিংবদন্তী অনুযায়ী ৫৮৮ - ৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীলঙ্কার মহানামন্ নামের জনৈক স্থবির বুদ্ধের জন্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সিংহলের শ্রমণ প্রখ্যাতকীর্তি (খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতক), রাজা ধাতুসেন (খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতক), অমরসিংহ (খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতক), মগধের মৌর্যবংশীয় রাজা পূর্ণবর্মার নাম মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত ছিল। পরবর্তী যুগে পালবংশীয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দিরের সংস্কার ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। মহাবোধি মন্দিরের গায়ে বা চারপাশে উৎসর্গীকৃত অধিকাংশ বুদ্ধমূর্তি বা বোধিসত্ত্বমূর্তি পালযুগের সৃষ্টি। এয়োদশ শতকের শেষভাগে বর্মীরা মন্দির সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। *পগ্-যম-জোন-জঙ্গ* গ্রন্থানুযায়ী মহাবোধি মন্দির বা মূল-গন্ধকুটি মন্দির আনুমানিক ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার ছগল রাজ্যের মহিষী সংস্কার করেছিলেন। এর পরেই এই মন্দির অজ্ঞাত কারণে বৌদ্ধ উপাসকদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে শৈব গিরি সম্প্রদায়ের অধিগত হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান, বুদ্ধগয়ার বেষ্টনীর খোদাইগুলি ভারহুত ও সাঁচির তোরণগাত্রে খোদিত শিল্পের তুলনায় পরবর্তীকালের। এই মহাবোধি মন্দিরের মত বিশাল ও সুউচ্চ মন্দির উত্তরভারতে দেখা যায় না। মন্দির-সংলগ্ন পশ্চিমদিকে বোধিবৃক্ষের নিচে অবস্থিত বুদ্ধদেবের বোধিলাভের স্থান বজ্রাসন বা বোধিমণ্ডপের বারোটি তল আলেকজাণ্ডার কানিংহাম আবিষ্কার করেছিলেন। তিব্বতীয় ভিক্ষু ধর্মস্বামী (১২৩৮ খ্রিস্টাব্দ) বজ্রাসন, বোধিবৃক্ষ, মহাবোধি মন্দিরের বুদ্ধমূর্তি, মূলগন্ধকুটি বা মহাবোধি মন্দির, তথাগতের দন্ত, বুদ্ধপদাঙ্কিত প্রস্তর-সিংহাসন, প্রস্তরবেষ্টনী ও তারাবিহারের অস্তিত্বের কথা তাঁর বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। অশোকের স্থাপত্য রীতিতে পাঁচটি বিন্যাস দৃষ্ট হয় – ১। স্তম্ভ ২। স্তূপ ৩। প্রকার বা বেষ্টনী ৪। চৈত্য বা পূজাবন্দনার স্থান ও বিষয় এবং ৫। বিহার বা শ্রমণভিক্ষুদের আবাসস্থল। এই পঞ্চরীতির সমন্বয় বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দির প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় বলে এটি অশোক পরবর্তীকালে নির্মিত বলে ধরা হয়।[৪১]

অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'ডাক্তার স্পুনারের নূতন আবিষ্কার' প্রবন্ধে (*নারায়ণ*, মাঘ, ১৩২২) বৌদ্ধ পুরাতাত্ত্বিক স্থান আবিষ্কারের তথ্য রয়েছে। রতন টাটা পাটলিপুত্র খননের ব্যয়ভার নিলে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্বপ্রধান কর্মচারী জন মার্শাল পাটলিপুত্রে এসে ডি. বি. স্পুনারের সঙ্গে আলোচনা করে কুমরাহার ও বুলন্দিবাগ খনন করেছিলেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি স্পুনারের তত্ত্বাবধানে প্রথম খননকার্য শুরু হওয়ার ফলে পাটলিপুত্র, অশোক ও বৌদ্ধ ইতিহাসের অনেক নূতন উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে স্পুনার কুমরাহারে (Site no. III) মাটির তৈরি একটি প্লাক

(41/8’’ by 35/8’’) (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪৩১) আবিষ্কার করে মহাবোধি মন্দিরের প্রচলিত ইতিহাসকে আলোড়িত করেছিলেন। এই প্লাক মন্দিরের আকার ও অবয়ব সম্পর্কে অনাবিষ্কৃত তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিল। সংস্কারের পর বর্তমান মন্দিরের সঙ্গে প্লাকের বৈষম্য থাকাটাই স্বাভাবিক। স্পুনারের মতে, কানিংহাম ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে মহাবোধি মন্দিরের সংস্কারের সময় প্লাকটি পেলে বোধহয় মন্দিরের মৌলিক গঠন সম্পর্কে ঠিক ঠিক বুঝতে পারতেন। কেবল কানিংহামের সময়েই নয়, অতীতেও এই মন্দিরের সংস্কারকাজের সঙ্গে সঙ্গে এর স্থাপত্যেরও পরিবর্তন ঘটেছিল। তাই, হিউয়েন সাঙের দৃষ্ট মহাবোধি মন্দির গঠন প্রণালীর বিবরণের সঙ্গে এখনকার মন্দিরের বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। ত্রয়োদশ শতকের ব্রহ্মদেশীদের দ্বারা এই মন্দির সংস্কারের সময় তাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের কিছু প্রভাব পড়েছিল। এর থেকে প্রাবন্ধিক সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে বিভিন্ন যুগের সংস্কারের সময় এর স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মৌলিকতা অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়ে মহাবোধি এক ‘নূতন মন্দিরে’ পরিণত হয়েছিল।

প্লাকটি একটি সমাধিস্তূপে কুষাণযুগের বহু তাম্রমুদ্রার সঙ্গে পাওয়ার ফলে স্পুনার অনুমান করেছেন যে প্লাকটি সম্ভবত কুষাণযুগের (দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দী)। প্লাকের সামনের দিকে মহাবোধি মন্দিরের ‘অতি উৎকৃষ্ট প্রাচীনতম চিত্র’ – ‘Unquestionably the oldest drawing of this building in existence’। মন্দিরের বাহ্যদৃশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন –

> … a tall tower-like structure with four stories or tiers with niches above the main cella, the whole being surmounted by a complete stupa with fivefold *hti*.

তাঁর মতে, প্লাক দেখে বোঝা যায় মন্দিরের চূড়ার গঠনপ্রণালী ঐতিহাসিকভাবে ভুল ছিল। প্রধান অংশটি আংশিকভাবে অনাবৃত, সুবিশাল খিলানের মধ্যপথে সোজাসুজি মন্দিরের দিকে তাকালে বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখা যায়। এই মূল মন্দিরের বাইরে প্রধান মন্দিরের দক্ষিণে ও বামদিকে দুটি দাঁড়ানো মূর্তি রয়েছে, সম্ভবত এই মূর্তিগুলি চৈনিক পরিব্রাজকের বর্ণিত বোধিসত্ত্বের রূপামূর্তি, যার এখন কোন চিহ্ন নেই। মন্দিরের চারদিকে বোধিসত্ত্বমূর্তিগুলির ঘরের বেষ্টনীগুলি ‘অশোক রেলিং’ (মৌর্য-পরবর্তী শুঙ্গরাজাদের বা তার পরবর্তীকালের সৃষ্টি) নামে পরিচিত। এই বেষ্টনী কেবল মন্দিরের পবিত্র অংশটুকু আর আঙিনা ঘিরে আছে। চওড়া প্রাচীর ও উঁচু প্রবেশদ্বার থেকে এর বাইরের সীমা বোঝা যায়। এই প্রাচীর ও প্রবেশদ্বার প্লাকের নিচে অতি সংক্ষেপে অল্প-স্থানের মধ্যে চিত্রিত হয়েছে। প্লাকের আরেকটি বিশেষত্ব হল মধ্য বেষ্টনীর প্রবেশপথের দক্ষিণদিকে একটি স্তম্ভের শীর্ষে একটি হাতিমূর্তি রয়েছে, যাকে অশোকের অন্যান্য

স্তম্ভের সাদৃশ্যে অশোক-নির্মিত বলা যায়। ফা-হিয়েন (খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতক) এই মৌর্যস্তম্ভের কোন চিহ্ন দেখতে না পাওয়ায় উল্লেখ করেননি। সম্ভবত, তাঁর আসার আগেই স্তম্ভটি পড়ে গিয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে বর্তমান প্লাকটি চতুর্থ শতকের পূর্বের। এতে অতি অস্পষ্টভাবে খোদিত খরোষ্ঠী লিপি থেকে 'most suggestive' বিষয় উঠে এসেছে –

> It is the first epigraph in this Indian form of Perso-Aramaic to be found in Eastern India.

এতে খোদিত মন্দিরপ্রাঙ্গন নিবিড় জঙ্গলে আবৃত, মাঝে মাঝে মন্দির, স্তূপ ও দেবমূর্তি দেখা যায়। দুই একটি পূজারত ব্যক্তি এবং দুয়েকটি জীবজন্তুর (হাতি) চিত্র আছে। মূল মন্দিরের উপরের আকাশে উড়ন্ত চারটে দেবমূর্তি এই পূণ্যভূমিকে পূজা করছেন। পাটলিপুত্রে বুদ্ধগয়ার প্লাক কীভাবে আবিষ্কৃত হল সে সম্পর্কে স্পুনার জানিয়েছেন যে অসংখ্য বৌদ্ধযাত্রী বুদ্ধগয়ার এসে মন্দিরের প্লাক কিনে দেশে নিয়ে যেতেন। সম্ভবত খ্রিস্টিয় শতকের আগে এই খননভূমির কাছে কোন বৌদ্ধ-বিহার ছিল এবং কোন ভিক্ষু বুদ্ধগয়া থেকে এই প্লাকটি এনেছিলেন।

এই প্লাকটি[৪২] বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরের বিবর্তনের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে বিবেচিত হবে বলে আমাদের মনে হয়।

অস্বাক্ষরিত 'বৌদ্ধদিগের মঠ' প্রবন্ধটি (*বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ*, ভাদ্র, ১২৫৯) রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখা বলে অলোক রায় মনে করেন।[৪৩] বৌদ্ধ ধর্মানুগামীরা দুইভাগে বিভক্ত – গৃহস্থ ও উদাসীন (ভিক্ষু)। মঠ প্রতিষ্ঠার কারণ সম্পর্কে জানানো হয়েছে যে বুদ্ধদেবের উপদেশ অনুসারে উদাসীনরা জ্ঞানসঞ্চয়ন, ধর্মঘোষণা ও তীর্থভ্রমণে আটমাস এবং বর্ষার চারমাস গৃহস্থের ঘরে বা পর্বতগুহায় বাস করতেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে তাঁদের গৃহস্থের ঘরে স্থান দেওয়া অসম্ভব হয়ে পরেছিল। তাই বর্ষাবাসের জন্য মগধরাজ অজাতশত্রু মঠের স্থাপন করেছিলেন। মঠে স্বয়ং বুদ্ধদেব বিহার করাতে তা 'বেহার' নামে খ্যাত হয় এবং বিদ্যাচর্চার জন্য খ্যাত বুদ্ধমঠ মাত্রেরই নাম 'বেহার' (বিহার), আরো সম্প্রসারিত অর্থে মগধের নামও 'বেহার'। বৌদ্ধশাস্ত্র মতে বিহার প্রতিষ্ঠা অতি পুণ্যকর্ম হওয়ায় বৌদ্ধ দেশগুলিতে ধনী লোকেরা নিজেদের সাধ্য অনুসারে বিহার নির্মাণ করেন। বার্মায় অট্টালিকাগুলির মধ্যে 'বিহার'ই সর্বোৎকৃষ্ট এবং তা নানাভাবে সোনা দিয়ে সাজানো হয়।

বর্মার ‘কিউম্ দোগি’ অর্থাৎ রাজপ্রতিষ্ঠিত মঠ অন্যান্য মঠের থেকে উঁচু, চওড়া ও নানারকম সোনার অলঙ্কারে সুশোভিত। বার্মায় কাঠে তৈরি পাঁচতলা উঁচু মঠও দেখা যায়। প্রবন্ধে ক্যাপ্টেন সাইম্ সাহেবের মঠের বিবরণ দেওয়া হয়েছে –

> এই মঠের পোতা ৮ হস্ত উচ্চ; অতি বিশাল কাষ্ঠখণ্ড-সকল অগ্রে ভূমিতে পুঁতিয়া তদুপরি তাহা প্রস্তুত হইয়াছে। এই প্রশস্ত সোপানদ্বারা এই পোতার উপর উঠিয়া এবং অট্টালিকার সৌন্দর্য্য-দর্শনে আমরা বিশেষ আনন্দিত ও আশ্চার্যান্বিত হইলাম। ইহার চতুর্দ্দিগ নানাবিধ আশ্চর্য্যগঠনেরচিত ও স্বর্ণমণ্ডিত (গিল্টি করা) গরাদিয়াদ্বারা বেষ্টিত; এবং তন্মধ্যে ’প্রশস্ত ও সুচারু বারাণ্ডায় বেষ্টিত এক বিস্তার গৃহ আছে। ঐ গৃহের ছাদ ৫০ ফুট উচ্চ বহু সংখ্যক স্তম্ভপরি স্থাপিত; এবং তাহার চতুর্দ্দিগে সুবর্ণ মণ্ডিত মনোহর গরাদিয়া আছে। স্তম্ভের নিম্নভাগে ৩ হস্ত পরিমাণ স্থান রক্তবর্ণাক্ত, অপর সর্ব্বাংশ সুবর্ণে মণ্ডিত। আমরা এতৎ গৃহের মধ্যস্থলে স্বর্ণমণ্ডিত এক সিংহাসনোপরি গৌতম (বুদ্ধ) দেবের সুবর্ণমণ্ডিত প্রস্তরময় এক প্রতিমূর্তি দেখিলাম।

অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ ‘শিব ডেগণ পাগোডা’-য় (*রহস্য-সন্দর্ভ*, ১২৭৯) বলা হয়েছে যে রেঙ্গুনের বাড়ির ছাদগুলির চূড়া অসমতল ও অলঙ্কৃত হওয়ায় অতি মনোহর ও চিত্তাকর্ষক হয়। শিবডেগণ প্যাগোডা একটি পুরণো ও উৎকৃষ্টতর সোনার চূড়াবিশিষ্ট বৌদ্ধমন্দির।

মায়ানমারের প্যাগোডা সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ বিহার’ প্রবন্ধে (*আনন্দবাজার প্রত্রিকা*, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৪) আলোকপাত করেছিলেন। এখানকার ভারতীয় স্থাপত্যের ক্রমবিবর্ধমান স্বাধীন গতি, বিভিন্ন যুগের মন্দিরের গঠনপ্রণালী আলোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে বৌদ্ধধর্মের সূত্রে ভারতবর্ষ থেকে আসা স্থাপত্য-শিল্পরীতির সঙ্গে বার্মার ধ্যানধারণা যুক্ত হয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিল। এখানকার সোনার পাতমোড়া ঘণ্টাকার চৈত্য সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন –

> বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে লতাচিত্রাদি-অলংকরণ বিহীন, নিরাভরণ অথচ স্বর্ণমণ্ডিত বৌদ্ধ চৈত্যের চূড়াভাগ, ব্রহ্মদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গভীর ও অন্তর্মুখী দিকের প্রতীক-রূপ হইয়া উঠিয়াছে।

অস্বাক্ষরিত ‘সিংহল দ্বীপের দেবালয়’ প্রবন্ধে (*রহস্য সন্দর্ভ*, ১২৭৯) সিংহলী পুরাবৃত্ত অনুসারে বৌদ্ধধর্মের আগে হিন্দুধর্ম প্রচলিত থাকার কথা উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ প্রাবন্ধিক সিংহলের দক্ষিণতম ভাগের দেবীনুর মন্দিরের ছবি দিয়েছিলেন। দেবমূর্তি ও প্রবেশপথহীন ঘণ্টাকৃতিবিশিষ্ট এই মন্দিরের নিচের পরিধি ১৬০ এবং উচ্চতা ৩০ পা পরিমাণ। প্রবাদ অনুসারে এর ভিতরে ঐরাবতের একটি দাঁত রয়েছে।

বিবরণানুযায়ী স্পষ্ট যে এটি বৌদ্ধ উৎসর্গীকৃত বা ভোটিব স্তূপ। সিংহলী ঐতিহ্যানুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মহেন্দ্রের কাছে বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে রাজা দেবনামপিয়তিস্স অনুরাধপুরের দক্ষিণে মহামেঘবনে বিহার নির্মাণ করে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য দান করেছিলেন। *দীপবংস*-এর বর্ণনানুযায়ী মহামেঘবন মহাবিহার সিংহলের প্রথম বৌদ্ধবিহার। সিংহলরাজ দুট্‌ঠগামনীর (১০১ - ৭৭ খ্রিস্টপূর্ব) কনিষ্ঠ ভাই সদ্ধাতিস্সের (৭৭ - ৫৯ খ্রিস্টপূর্ব) রাজত্বকালের অষ্টমবর্ষে বহু বৌদ্ধবিহার নির্মিত হয়েছিল যার মধ্যে অনুরাধপুরের দক্ষিণগিরি বিহার সিংহলের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বিশিষ্টস্থানের অধিকারী। রাজা বট্টগামনী অভয় (১ খ্রিস্টপূর্ব) অভয়গিরি নামে একটি বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন। সিংহলে ছয় হাজারেরও বেশি বৌদ্ধবিহার রয়েছে।[৪৪] বৌদ্ধবিহারগুলি প্রাচীনকাল থেকে সাম্প্রতিক বৌদ্ধশিল্প-সংস্কৃতির ধারাকে বহন করে চলেছে।

বৌদ্ধচিত্রকলা

আমাদের আলোচ্য সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে বৌদ্ধচিত্রকলা বিষয়ক সরাসরি প্রবন্ধ না থাকলেও অন্যান্য সাময়িকপত্রে সেই বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রয়েছে। প্রফুল্লকুমার সরকারের 'ভারতীয় চিত্র-পরিচয়' (*বঙ্গবাণী*, ভাদ্র, ১৩৩০) প্রবন্ধে চিত্রকে নৃত্যের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে যে ত্রৈলোক্যের যাবতীয় বস্তুর অনুকরণ ও সুন্দরকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা থেকেই চিত্রের উদ্ভব হয়েছিল। মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ *তাঞ্জুর* গ্রন্থমালার *চিত্রলক্ষণ* পুস্তিকায় চিত্র সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। ভারতীয় চিত্রকলায় বস্তুতান্ত্রিকতা বা স্বভাবানুকরণ না থাকায় সচারচর দৃষ্ট নয়, কেবল সেগুলি আঁকার শাস্ত্রীয় রীতি রয়েছে। সাধারণত যা দেখা যায় না, যেমন – কল্পলতা সিংহ, বাঘ বা ঋষিদের ধ্যানলব্ধ দেবমূর্তি ইত্যাদি শাস্ত্রীয় নির্দেশ মেনে আঁকা হত। যশোধরের কারিকা অনুযায়ী বাৎস্যায়ন ব্যাখ্যা করেছিলেন –

রূপভেদপ্রমান্নাত্মক ভাবলাবণ্যযোজনং সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গমিতিচিত্রাং ষড়ঙ্গকম্।

ষড়ঙ্গের মধ্যে ভারতীয় চিত্রের প্রধান অঙ্গ সাদৃশ্যকরণ। শাস্ত্রীয় নিয়মতন্ত্র ও বস্তুতন্ত্র – উভয়শ্রেণির শিল্পের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যবিধান তুল্যমূল্যভাবে প্রযোজ্য। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শিল্পকলার পার্থক্য সম্পর্কে বলা যায় – কিছুটা সাদৃশ্যের অভাবে পাশ্চাত্য শিল্পে বস্তুতন্ত্রের প্রাধান্য, আর এর প্রভাবের কারণে ভারতীয় চিত্রশিল্পে ভাবময়তার প্রাধান্য, নিয়মতন্ত্রের সুদৃর ভিত্তিতে সংযমের গাঢ় পরিণতিতেই তার মুক্তি দেখা যায়।

সুধীরচন্দ্র রায়ের 'বাংলার চিত্রকলা' (*নারায়ণ*, শ্রাবণ, ১৩২৪) প্রবন্ধে বাংলার চিত্রকলার আলোচনা প্রসঙ্গে বৌদ্ধচিত্রকলার প্রসঙ্গ এসেছে। বাংলার চিত্রকলার বিশেষত্ব ইউরোপীয় চিত্রকলার আদর্শ থেকে ভিন্ন, জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত ও স্বাতন্ত্রমণ্ডিত। এর প্রকৃতি দৈবী-সত্ত্বপ্রধান, করুণ, প্রেমরসে পূর্ণবিকশিত, পূর্ণ রসস্ফূর্ত।

অজন্তার শিল্পকলার মূল আদর্শের সঙ্গে পারস্য, জাপান, ফরাসি চিত্রকলার সংযোগে ই. বি. হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে আধুনিক বাংলার চিত্রকলার আদর্শ তৈরি হয়েছিল। বাংলার আধুনিক চিত্রকলা কেবলমাত্র ভারতের পৌরাণিক আদর্শের অনুকরণ করে বাংলার মহান আদর্শের আংশিক উদ্ধার করেছে বলে প্রাবন্ধিক মতপ্রকাশ করেছেন। দৃষ্টান্তরূপে তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুদ্ধ ও সুজাতা' (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪৩৫) আর 'তিষ্যরক্ষিতা'র (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪৩৫) চিত্র-সমালোচনা করেছেন। প্রাবন্ধিক 'বুদ্ধ ও সুজাতা'র দোষের উল্লেখ করে লিখেছেন যে পূর্ণরসস্ফূর্তি না থাকায় তা 'খানিকটা অন্তঃসার শূন্য', এখানে 'বুদ্ধের বৌদ্ধত্বের স্ফূর্ত্তি' হয়নি। তাঁর মতে, অনেকসময় একই পুরানো চিত্রকলার আদর্শে নিজস্বতায় অন্তর্ভাব ফুটিয়ে তোলার ফলে চিত্রগুলি উচ্চতম আদর্শে পৌঁছেছিল। হিংসা-দ্বেষ-জর্জরিত অহঙ্কার-স্ফীত ও সৌন্দর্যবোধে গর্বিত, রুদ্র ও শান্তভাবের আশ্চর্য সামঞ্জস্যে অশোকমহিষী 'তিষ্যরক্ষিতা'র চিত্রে অন্তরাত্মার পূর্ণ বিকাশ ও আত্মস্ফূর্তি ফুটে উঠেছে।

আধুনিক বাংলার চিত্রকলা ভারতের পৌরাণিক ও চারুকলার চিত্রকলার আদর্শে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল বলে প্রাবন্ধিক মতপ্রকাশ করেছেন –

> ভারতীয় চারুকলায় সাধারণতঃ যোগ এবং জ্ঞানভাবের বিকাশ বিশেষ লক্ষিত হয়। এই ভাব বাংলাতেও বিকশিত। কিন্তু এই যোগ এবং জ্ঞানভাবের প্রথম বাংলাতেই প্রেমভাবের সঙ্গে সমভাবে অভিব্যক্ত হয়। বুদ্ধদেব এবং শঙ্কর এই যোগ ও জ্ঞানভাব ভারতে চিরপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু বাংলার মাটি-আকাশ-বাতাসের প্রভাবে বাঙালির ভাব লালিত্য এবং মহাপ্রভু চৈতন্যের লীলামাধুর্যের এই ভাব বাংলায় প্রেমভাবে পরিণত হয়েছে। বাংলার ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে বাংলার জীবনে, বাংলার ইতিহাসে এবং চারুকলায় এই প্রেমভাবের বিশেষ বিকাশ দেখা যায়।

ভারতীয় চিত্রের আদর্শ প্রাথমিকভাবে বৌদ্ধগুহা থেকে এসেছে বলে অসিতকুমার হালদার মনে করতেন। তাঁর মতে, বৌদ্ধশিল্প 'ভাব পরিকল্পনায় সর্বপ্রধান'। ভারতীয় চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অজন্তার সকল বৌদ্ধচিত্র (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪৩২) 'একটা আধ্যাত্মিক আবেশ ও শান্তির ভাবে মণ্ডিত।'[৪৫] সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বলেছেন যে পরম্পরাগত ভারতীয় চিত্র পদ্ধতির ক্রমোন্নতির ধারায় অজন্তা গুহাগুলিতে বহুশতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিত্রীদের চিত্রভাবনা একত্র পুঞ্জীভূত হয়েছিল।[৪৬]

শিল্পশাস্ত্রের ষড়ঙ্গ-ভাবনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েও অজন্তা নিজ বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। অজন্তাচিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গতিশীলতা। দেব-দেবী, মানব-মানবী, পশু-পাখি সমেত প্রাণময় ও জঙ্গমশীল এই চিত্ররীতিকে ন্যারেটিভ স্টাইল বলা যায়। মুখ্যত বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বকে আশ্রয় করে *জাতক* ও *অবদান*-এর বুদ্ধজীবনের বিবিধ কাহিনি, ফুল ও তরুলতা, বাস্তব ধর্মাশ্রয়ী বিষয় চিত্রিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম ও বুদ্ধজীবনী প্রচার ও জনসাধারণকে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে শিক্ষাদানের অভিপ্রায়েই অজন্তাগুহা চিত্রিত হয়েছিল।[৪৭]

প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা পারিপার্শ্বিকতা অনুসরণকারী পরিপ্রেক্ষিত নির্ভরশীল নয়, তা ভাবানুসরণকারী শিল্পশাস্ত্রের প্রমাণানুগত। প্রমা অর্থে ভ্রমহীন জ্ঞান, দূর বা কাছের পরিমাণ, পার্থক্য বা দৃষ্টজ্ঞানের সঙ্গে অনুভবগত আন্তরিক দিক যুক্ত। তাই ‘অজন্তার পরিপ্রেক্ষিত-চিত্রণ সাধারণগ্রাহ্য নয়’ বলে দেবব্রত মুখোপাধ্যায় মতপ্রকাশ করেছেন।[৪৮] পরিপ্রেক্ষিতের খুঁটিনাটির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না দিলেও অজন্তার চিত্রগুলিতে শিল্পীদের অভিজ্ঞতা, আলোছায়ার সমাবেশ, অস্থিসংস্থান বা অ্যানাটমির জ্ঞান, নিসর্গ চিত্রণে দক্ষতা, বর্ণসমাবেশ বিশেষভাবে লক্ষনীয়। অসিতকুমার হালদার আলঙ্কারিক শিল্পে বৌদ্ধশিল্পীকে মোগলশিল্পীর ‘প্রায় সমকক্ষ’ আখ্যায়িত করে লিখেছেন –

> অজন্তা গুহার শীর্ষদেশের সজ্জা (ceiling decoration) এক বিচিত্র কাণ্ড! হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন মাথার উপর একখানি বহুমূল্য শালের চাঁদোয়া টাঙানো রয়েছে। প্রত্যেক চাঁদোয়ার মধ্যে একটা করে প্রকাণ্ড শ্বেতপদ্ম বিকশিত; আর তার চারিধারে গোলভাবে সজ্জিত সারি সারি হাঁস কিম্বা ময়ূর অথবা মৃণালদলমন্থনতৎপর হাতীর পাল; চার কোণে নানারকম লতা-পাতার কাজ। সেগুলির মধ্যে যে একটা বিশেষ অর্থ আছে তা দেখলেই বোঝা যায়। মোগল আলঙ্কারিক চিত্র সূক্ষ্মতা হিসাবে সর্বোৎকৃষ্ট বটে; কিন্তু অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্রের মত অর্থপূর্ণ বলে মনে হয় না।[৪৯]

অশোক মিত্র অজন্তার গুহাচিত্রে চীন ও পারসিক চিত্ররীতির প্রভাবের কথা বলেছিলেন। এর খুঁটিনাটি নৈপুণ্য, কৌশল, এমনকি মুদ্রাদোষও সমগ্রভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। অজন্তার কাজে যে সব শিল্পী নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা বংশপরম্পরায় ভারত ও বিদেশে নানাস্থানে ছড়িয়ে গিয়ে স্থান ও কাল উভয়ক্ষেত্রেই অজন্তা পদ্ধতির বিস্তার ঘটিয়েছিলেন।[৫০] আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর মতে, বৌদ্ধ

সন্ন্যাসীদের কাছে মানুষ্যদেহের শিল্পস্থাপন নিষিদ্ধ ও পুষ্পস্তবক এবং লতাগুচ্ছ অনুমোদিত থাকলেও সাহিত্য এবং অজন্তার ৯ এবং ১০ সংখ্যক গুহাচিত্রে (১০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ২০০ খ্রিস্টপূর্ব) এই নিয়ম ভাঙা হয়েছিল। সেখানে জাতকের দৃশ্য ও বুদ্ধের নানা ছবি চিত্রিত হয়েছিল। অজন্তা চিত্রের এই প্রতিবাদী সাহসী দিক দেখিয়ে কুমারস্বামী অজন্তাচিত্র সম্পর্কে বলেন, 'the painting is static and enormously dignified, rather than elegant or facile'।[৫১] কুমারস্বামী অজন্তার চিত্র, বাণভট্টের *কাদম্বরী* প্রভৃতি শিল্প-সাহিত্যের ভাব সম্মিলনে ভারত ইতিহাসের এক অতুলনীয় একৈক সময়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছিলেন যা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ –

> … the painting of Ajanta reflect the abundant, exquisite, sophisticated and brilliant life that forms the theme of Bana's *Kādambarī*. This was an age which could afford to permit to itself the fullest possible enjoyment of life, by right of innate virtue. In this connection it is worthwhile to remark that now for the first and only time in Indian history we meet with a practice of the arts as a personal achievement, side by side with the vocational and hieratic production.[৫২]

হ্যাভেলকে লেখা চিঠিতে (৩ মার্চ, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ) নিবেদিতার অজন্তার মূল্যায়ন যথার্থ বলে মনে হয় – 'ও বস্তু ভারতীয় ইতিহাসে কল্পনাতীত বৃহৎ ব্যাপার'।[৫৩]

বৌদ্ধ ভাস্কর্যশিল্প

বৌদ্ধগ্রন্থ *মহাবংস* অনুযায়ী বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের ২৭০ বৎসর পর সম্রাট অশোকের সময় তৃতীয় মহাসংগীতি আহূত হয়েছিল। সংগীতি শেষে স্থবির মোগ্গলিপুত্ত প্রত্যন্ত দেশে বুদ্ধশাসন স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রধান প্রধান অর্হতদের নানা স্থানে পাঠিয়েছিলেন।[৫৪] ধর্ম-শিল্প-সংস্কৃতি বিস্তার ও সংযোগসাধনে ধর্ম প্রচারকদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ দেবাদর্শ কল্পিত ও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে ললিতকলা ও সাহিত্যসৃষ্টির এটাই সর্বপ্রধান যুগ।

ভারতের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্পর্কীয় ভাস্কর্য শুধু উত্তরাপথ নয় – সিংহল, যবদ্বীপ, চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশেও উন্নতির শেষ সীমায় উপনীত হয়েছিল। ভারতের ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শনরূপে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কার্লে, নাসিক গুহা, কান্হেরী, দক্ষিণপূর্ব অমরাবতী, নাগার্জুনকোণ্ডা, গোলি, জগ্গয্যপেটা, উত্তর পশ্চিম ভারতের গান্ধার ও তক্ষশীলার ভাস্কর্যও (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪২১)

বিখ্যাত। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধদুটি হল - অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ 'বামিয়ান নগরের বুদ্ধমূর্ত্তি' (*রহস্য-সন্দর্ভ*, শ্রাবণ, ১২৭০) (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪৩২) যেটি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখা বলে অলোক রায় দাবি করেছেন[৫৫] এবং গুরুদাস সরকারের 'ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্য ও উড়িষ্যার শিল্পকলা' (*নারায়ণ*, চৈত্র, ১৩২৬)।

'বামিয়ান নগরের বুদ্ধমূর্ত্তি' প্রবন্ধে লেখা হয়েছে, মাধ্যন্তিক স্থবির কাশ্মীর এবং গান্ধার প্রদেশে প্রেরিত হয়ে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার করেছিলেন। এই অঞ্চলের মধ্যে পারস্যের বামিয়ান নগর প্রধান। পর্বতবেষ্টিত বামিয়ানে বৌদ্ধভিক্ষুদের বাসস্থানের জন্য অসংখ্য গুহা ও এইগুলির স্থানে স্থানে অনেক বুদ্ধমূর্তি খোদিত হয়েছিল। উপাসনার জন্য খোদিত সবচেয়ে বড় মূর্তিটির পারস্য ভাষায় নাম 'সিল্‌সাল'। ঐ মূর্তি একশ বিশ পা দীর্ঘ। মুসলমানদের দৌরাত্ম্যে মূর্তির মুখ ও পা ভেঙে গেলেও অবশিষ্ট দীর্ঘ কর্ণ, স্থূল ওষ্ঠাধর, কুঞ্চিত কেশ, সুদীর্ঘ চীবর ও অন্যান্য অংশে বৌদ্ধলক্ষণ স্পষ্ট বোঝা যায়। পর্বতের গায়ে থাকা চারকোণা সুড়ঙ্গ দিয়ে অনায়াসে বুদ্ধমূর্তির মুখের কাছ পর্যন্ত যাওয়া যেত। এই মূর্তির চারশ হাত দূরে একই অবয়বের আরেকটি বুদ্ধমূর্তি (উচ্চতা আনুমানিক চল্লিশ হাত) রয়েছে। তৎকালীন বামিয়ান বৌদ্ধরা সমৃদ্ধশালী ছিলেন বলে বহু ব্যয় করে এই কীর্তিস্থাপন করতে পেরেছিলেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিশ্বের উচ্চতম এই দুটি বুদ্ধমূর্তি আফগানিস্থানের ইসলামী মৌলবাদী তালিবানরা ১ মার্চ ২০০১ থেকে ভাঙা শুরু করেন। বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে এই অপূর্বভাস্কর্য নিদর্শন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। শঙ্খ ঘোষ এই বর্বরতার নিন্দা করে বলেছেন –

> এ উন্মত্ততা নিছক ধর্মেরই ওপর আঘাত নয়, শুধু বুদ্ধেরই ওপর আঘাত নয়, এ আঘাত শিল্পের ওপর, মানুষের শিল্প-সংবেদনার ওপর। এ আঘাত আজ মানব সভ্যতার আত্মমর্যাদার ওপর।[৫৬]

প্রাচীনকালে বাণিজ্যের সুবর্ণযুগে আফগানিস্থানের মধ্যে দিয়ে বণিকরা যাতায়াত করার ফলে এখানে তিনটি সভ্যতার মিলনস্থল দেখা যায় – পাশ্চাত্যে রোম, প্রাচ্যে চীন এবং দক্ষিণ প্রাচ্যে ভারতবর্ষ। মধ্য এশিয়ায় বালখ্‌, পশ্চিম এশিয়ায় হীরাট এবং দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় কাবুল দ্বারপ্রান্ত হয়েছিল। এই পথেই এদেশে পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নব নব ভাবের আদান প্রদান ঘটেছিল, বালখ্‌ এবং কপিশার মধ্যবর্তী স্থান বামিয়ানে বৌদ্ধসংস্কৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক দেশকে সমৃদ্ধ করেছিল। হিন্দুকুশ পর্বতের বামিয়ান উপত্যকায় পর্বত খোদাই করে স্মিতহাস্যময় দুই বিশালকার বুদ্ধমূর্তি তৈরি হয়েছিল। পৃথিবীর উচ্চতম মূর্তিটি ১৭৫ ফিট উঁচু, অন্যটি ১২০ ফিট। কুষাণ যুগে বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি দুটি এবং পারিপার্শ্বিক গুহামন্দিরগুলি সম্ভবত খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে কুষাণ শাসনকালে সৃষ্ট হয়েছিল।[৫৭]

কুষাণ পর্বের শিল্প[৫৮] প্রধানত দুটি ভিন্ন প্রকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল – ক) গান্ধার এবং খ) মথুরা শিল্প। প্রকৃতি বা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে এই দুই রীতি পৃথক, উভয়ের ক্ষেত্রে গভীর মানবিকতাবোধই শিল্পকর্মের প্রেরণা ছিল।[৫৯]

'ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্য ও উড়িষ্যার শিল্পকলা' প্রবন্ধে মধ্যযুগের হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্যে গ্রিক প্রভাব নিরপেক্ষ স্বাধীন ভারতীয় ধারার শিল্পের বিকাশের কথা বলা হয়েছে। লেখক গুরুদাস সরকার এই প্রবন্ধে ভুবনেশ্বরের শিল্পকলায় বিদেশী প্রভাব আছে কি না এবং থাকলে কতদূর আছে তার বিচার করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধ শিল্পকলার প্রসঙ্গ এসেছে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, মধ্যযুগে ভারতীয় শিল্পের উপর গ্রিক প্রভাবের থেকে গ্রিক শিল্পীদের উপর ভারতীয় প্রভাবই অধিকতর পরিস্ফুট। পর্সিপলিসের অনুকরণে স্তম্ভশ্রেণি ও বিদেশী শিল্পরীতি অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে নির্মিত সম্রাট অশোকের স্থাপত্য বেষ্টনীর মধ্যেও শক্তিমান খাঁটি ভারতীয় শিল্পপ্রথার অস্তিত্ব। ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য ভাবপ্রবণতা যা আধ্যাত্মবাদ, ধীশক্তি ও দর্শন বিষয়ক ভাবনার সঙ্গে যুক্ত।

ভারতের ভাস্কর্য বস্তুশিল্পেরই আনুষঙ্গিক। ভারতীয় শিল্প মূর্তিশিল্প ও শুক্রাচার্যের নীতি অনুযায়ী সপ্ততালের। ভাস্কর্যে গল্প বলার রীতি লক্ষণীয়। কম্বোজের আঙ্কোরভাটে এবং যবদ্বীপের বরবুদুরে দক্ষিণী শিল্পরীতির চিহ্ন রয়েছে। পৌরাণিক বা জাতক কাহিনির চিত্রগুলি ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত। হেলেনীয় নয়, কোর্ণাকের মন্দিরের তরু-সন্নিহিতা রমণীর সঙ্গে ভারতীয় বৌদ্ধমূর্তির সাদৃশ্যের কথাই প্রাবন্ধিক বলেছেন। হ্যাভেল *Ideal of Indian Art* গ্রন্থে ভিক্টোরিয়া আলবার্ট চিত্রশালায় রাখা একটি মূর্তির উল্লেখ করেছেন। সিদ্ধার্থের জন্মগ্রহণকালে মায়া একটি বৃক্ষের কাণ্ডে হেলান দিয়ে, একটি পা তুলে বঙ্কিম-ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর শিশু সিদ্ধার্থ তাঁর কুক্ষি ভেদ করে বেরোচ্ছেন। ভারহুত স্তূপে বৃক্ষকাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত চন্দ্রা যক্ষিণীর মূর্তি রয়েছে। সাঁচীর পূর্বতোরণে একটি যুবতিমূর্তি দুই হাতে একটি অশোকশাখা ধরে রয়েছে আর বহু অলঙ্কারে সাজানো বামপায়ে বৃক্ষকাণ্ডের তলা স্পর্শ করছে। মথুরার ভাস্কর্যে পাথরের একদিকে কতগুলি পদ্মাকৃতি ফুলের মতো ও অন্যদিকে একটি অল্পবয়স্কা তরুণী অশোকগাছে (দীর্ঘ অপ্রশস্ত পাতা) হেলে, বামহাতে একটি ফুলে ভরা শাখা ধরে দাঁড়িয়ে, আর বামপদে ফোটা অশোকগাছের কাণ্ডদেশ স্পর্শ করে রয়েছে। সুন্দরীর পদাঘাতে অশোক-ফুল ফুটে ওঠার সংস্কার ভারতীয় কবিদের কাছে সুপরিচিত। কালিদাসের *মালবিকাগ্নিমত্রম্* নাটকে মালবিকা যখন রাজ্ঞীর আদেশে অশোকবৃক্ষে বামপাদ স্পর্শ করে

অশোকবৃক্ষের দোহদ ক্রিয়া করছিলেন, সেই সময়ে সঙ্গী বিদূষকসহ অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাজা অগ্নিমিত্রের তাঁকে এই অবস্থায় দেখার সুযোগ ঘটেছিল। *মেঘদূতম্*-এর যক্ষও অশোকতরুর মত প্রিয়ার বামপদ স্পর্শলাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কেবল বামপদ স্পর্শে পুস্পোৎপাদন নয়, বাঙালি বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস শ্রীরাধার পদবিক্ষেপেই স্থলপদ্ম ফুটে ওঠার কল্পনা করেছেন –

যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাহাঁ তাহাঁ থলকমলদল খলই।।[৬০]

জে. স্ট্রজিগউস্কি বলেছেন, ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের এই নমুনা ও মিশর দেশের সেকেন্দ্রিয়ার কপ্টিক শিল্পের বাঁধাছাঁচের এই অনুকৃতি একই আদিস্থান (সম্ভবত সিরিয়া বা এশিয়া-মাইনর) থেকে উদ্ভূত। আবার, সিংহলের 'নারীলতা' ও মকরমুখ থেকে বিনির্গত বল্লরীসমূহে সমাবেষ্টিতা আধুনিক দক্ষিণী নারীমূর্তি এই একই ভাবধারার অন্তর্গত। ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত তরু ও তরুণীর পরিকল্পনাটি ভারতীয় বলে প্রাবন্ধিক ধরতে চেয়েছিলেন। সাদৃশ্য থাকলেও ভারতীয় শিল্পধারার বৈশিষ্ট্য এইক্ষেত্রে অক্ষুন্ন রয়েছে। উড়িষ্যার মন্দিরে মনোবিমোহন ভঙ্গীতে দাঁড়ানো একক রমণীমূর্তি মথুরা ভাস্কর্যে দেখা যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্যে, নারীদেহের নিতম্ব ও বক্ষদেশের পৃথুলত্ব ভারতীয় শিল্পেরই বিশেষত্ব বলে পরিগণিত।

অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় *Modern Review* প্রত্রিকায় 'সিংহ ও হস্তীর উপাখ্যান' প্রবন্ধে (বাংলা অনুবাদক সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; *প্রবাসী*, কার্তিক, ১৩২৬) লিখেছেন –

> ১৮'শ শতাব্দীর একটি সিংহলী নস্যাধারের উপর তিরিঙ্গি তলই'র (বাঁকাপাতা'র) নক্সা সারনাথে ধামেক স্তূপের (৫ম শতাব্দী) একটি নক্সার ধারাবাহিকতা ও উদ্‌বর্তনের নমুনা। এইরূপে উড়িষ্যার আদর্শ ২য় ও ৩য় শতাব্দীর জৈন ও বুদ্ধ প্রকারের নক্সা হইতে গৃহীত – তাহারা যে সমজাতীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আধশোয়া হাতির উপর উদগ্র সিংহের নক্সাটি উড়িষ্যার বাইরে পুরাণো শিল্পীদের উদ্ভাবিত হলেও তা উড়িষ্যার শিল্পীদের অতিপ্রিয় নক্সা। মধ্যযুগের মাগধী ভাস্কর্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই নক্সাগুলি উড়িষ্যার হিন্দুশিল্পের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, তা নবম ও দশম শতাব্দীর বৌদ্ধমূর্তিকারদের প্রচলিত নক্সা ছিল। প্রচলিত ছাঁচের মধ্যে বুদ্ধের সিংহাসনের পীঠের অলঙ্কার হিসাবে খোদিত এই নক্সাটির দৃষ্টান্তস্বরূপ গয়াজেলার কুর্খিয়া থেকে সংগৃহীত বুদ্ধমূর্তির কথা বলা যায়। এই নক্সার পূর্বতন ইতিহাস অনুযায়ী ষষ্ঠ শতাব্দীতে খোদিত অজন্তার ৯ সংখ্যক গুহায় প্রচারক বুদ্ধের উপবিষ্ট

মূর্তির সঙ্গে সিংহাসন ও হাতির উপরে উদগ্রসিংহের নক্সাটি দেখা যায়। অজন্তার ১৯ সংখ্যক গুহাপ্রাচীরে অঙ্কিত বুদ্ধ-শ্রেণিতে বুদ্ধের সিংহাসনের পৃষ্ঠাসনের দুইপাশে সিংহ আর পঞ্চম শতাব্দীতে খোদিত সারনাথের বুদ্ধমূর্তিতে ও সিংহাসনে সিংহ থাকলেও হাতির অভাব দেখা যায়। পঞ্চম শতাব্দীতে দেখতে পাওয়া যায়, এই সিংহের নক্সার পূর্বতন রূপটি নির্দিষ্ট বাঁধাছাঁচে পরিণত হয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে হাতির নক্সা সংযোজিত হয়েছিল।

গুরুদাস সরকার অর্ধেন্দুকুমারের বক্তব্যটিকে স্বীকার করেও প্রকৃত স্বরূপটুকু বুঝতে ভুবনেশ্বর ও মথুরার ভাস্কর্যের পার্থক্য করেছেন। মথুরার শ্রীমূর্তি প্রয়াস গণমূর্তির উপর দণ্ডায়মান, তাঁকে অনেকে জড়বস্তুর উপর শক্তির ক্রিয়াশীলতার নিদর্শন রূপে, আবার কেউ কেউ তাঁকে বৌদ্ধ শয়তান মারের সঙ্গিনীদের প্রতিমূর্তি বলে বিবেচনা করেন। অন্যদিকে উড়িষ্যার নর্তকী মূর্তিগুলি কোন গণমূর্তির উপর দাঁড়িয়ে নেই। বটনমার স্তম্ভগায়ের নর্তকীমূর্তি, উপবিষ্ট গণমূর্তির বিস্তৃত করতলের উপর নৃত্যভঙ্গীতে দাঁড়ানো; যক্ষিণী সুদর্শনা নৃত্যপরা রমণীর মতো একটি গণদেহের উপর দাঁড়ানো; স্ত্রীদেবতা চুল্লকোক গজের উপর ললিতভঙ্গীতে দাঁড়ানো। এই ভাস্কর্যগুলির সঙ্গে মথুরার পিল্লাগায়ের ভাস্কর্যের সম্পর্ক রয়েছে। যে স্থাপত্য কীর্তির চারদিকে এইগুলি সন্নিবিষ্ট হত, লোকের বিশ্বাস ছিল তা এদের দ্বারাই সুরক্ষিত হবে। ভয় দেখিয়েই হোক বা কামজনিত মোহ উৎপাদন করেই হোক, যেকোনো প্রকারে বিরুদ্ধবাদী অনিষ্টকারিকে স্তম্ভিত করতে পারলেই যক্ষিণীদের কার্যসিদ্ধি হবে। ভারহুত স্তূপ প্রতিষ্ঠার কাল থেকে যে কলাপদ্ধতি অনুসৃত হয়ে মথুরায় প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, বহুশতাব্দী পরে ভুবনেশ্বর বা কোর্ণাকের মন্দিরের গায়ে কালের নিয়মে পরিবর্তিত হয়ে সেই সকল যক্ষিণী 'অলস নায়িকা' প্রভৃতি রূপে আগের মতো একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাবন্ধিক বৌদ্ধশিল্পের প্রভাব ভারতবর্ষীয় প্রেক্ষাপটে স্বীকার করেও উড়িষ্যার শিল্পকলার স্বাতন্ত্র্যের পক্ষেই সওয়াল করেছেন।

বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্ব

মূর্তি একটি প্রতীক বা নির্দশন যা বিশেষ ধর্ম, সভ্যতা, দর্শন এবং তত্ত্বের নির্ধারক। মূর্তিশাস্ত্রের উপাদান ১) পাথর বা ধাতু নির্মিত মূর্তি থেকে এবং মন্দিরে বা পুথিতে অঙ্কিত চিত্র ও ২) বৌদ্ধ সাহিত্য ও তত্ত্বগ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ মূর্তিশাস্ত্রের ভিত্তি মুখ্যত *সাধনমালা* (সংগ্রহ কাল ১১৬৫ খ্রিস্টাব্দ) তন্ত্রপুথির

উপর প্রতিষ্ঠিত। এর একশো বত্রিশটি সাধনায় অগণিত দেবদেবীর বর্ণনা, মূর্তির ধ্যান, পূজাপদ্ধতি, তন্ত্র ও মন্ত্র প্রয়োগাদি রয়েছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পুথি *নিষ্পন্নযোগাবলী*-র (আনুমানিক ১১৩০ খ্রিস্টাব্দ) প্রণেতা বিক্রমশীল মহাবিহারের পণ্ডিত অভয়াকরগুপ্ত। এতে প্রায় ছয়শো দেবদেবীর বিবরণ ও মূর্তিকল্পনা রয়েছে।

বৌদ্ধতন্ত্র মতে সৃষ্টির আদি ও অকৃত্রিম উৎপত্তিস্থল একমাত্র শূন্য, তার অর্থ সৎ বিজ্ঞান ও মহাসুখ অর্থাৎ শূন্যের মতো ও আনন্দস্বরূপ। এই শূন্য ঘনীভূত হয়ে প্রথমে শব্দ এবং পরে শব্দ থেকে আবার ঘনীভূত হয়ে দেবতারূপ গ্রহণ করে। শূন্যকে বজ্রযানে 'বজ্র' আখ্যায়িত করা হয়। শূন্য বজ্রের মতো দৃঢ়, সারবান, ছিদ্ররহিত, অচ্ছেদ্য, আদাহী ও অবিনাশী হওয়ায় শূন্যযানই বজ্রযান। দেবদেবীর মূর্তিদর্শন ও দেবদেবীর পূজাকে বজ্রযানের একটি বিশেষত্ব বলে মানা হয়।[৬১]

বৌদ্ধমত অনুযায়ী জীবাত্মা বোধিচিত্ত বা করুণা ও পরমাত্মা শূন্যবজ্র বা আদিবুদ্ধ। বাসানাযুক্ত এবং নানাপ্রকারের বোধিসত্ত্ব থেকে নানাপ্রকার দেবদেবীর উৎপত্তি হয়। বাসনার মতো অনন্ত দেবতা নিয়ে দেবসংঘ (Pantheon) গঠিত। দেবতারা শূন্যাত্মা। বৌদ্ধতন্ত্র অনুযায়ী সাধনা করলে প্রথমে শূন্যতার বোধ, দ্বিতীয়ে বীজমন্ত্রের দর্শন এবং তৃতীয়ে বীজমন্ত্র থেকে বিম্ব অথবা দেবতার অস্পষ্ট আকার, অবশেষে সুস্পষ্ট মূর্তি দেখা যায়। গুপ্ত-পরবর্তী পালরাজত্বকালে বাংলা এবং বিহারে নানারকমের মূর্তি (অধিকাংশ বজ্রযান) প্রস্তুত হয়েছিল। সারনাথ, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, কুরকিহার, বুদ্ধগয়া, পূর্ববঙ্গ, আসাম ও উড়িষ্যায় নানা অদ্ভুত অদ্ভুত মূর্তি তৈরি হয়েছিল। এই সকল দেবমূর্তিগুলির মধ্যে ষড়ক্ষরী, লোকেশ্বর, উচ্ছুষ্মজম্ভল, মঞ্জুশ্রী, তারা, অবলোকিতেশ্বর, বসুধারা, মারীচী, পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ, বজ্রসত্ত্ব, হেরুক, পর্ণশবরী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৬২] বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধদেবতা কুলের উৎপত্তি সম্পর্কে লিখেছেন –

> In Hinayana or primitive Buddhism there was no pantheon to which workshop was offered by any Buddhist. But in Mahayana a large number of deities were included and laker, in its more advanced form of Vajrayāna this pantheon became surprisingly large with deities of every philosophical dogma, ritualistic literature, abstract ideas, human qualities even desires such as sleeping, yawning, and sneezing were deified or given a deity form.[৬৩]

গুরুদাস সরকারের সচিত্র 'হে বজ্র' প্রবন্ধের (*বঙ্গবাণী*, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০) বক্তব্যানুসারে বঙ্গদেশে বৌদ্ধতান্ত্রিক প্রথা বহুদিন থেকে প্রচলিত ছিল। তিব্বতের যি-দাম (Yi-dam) বা দেবসংরক্ষক শ্রেণির সুপরিচিত মূর্তির অনুরূপ মূর্তি 'বাংলার হেবজ্র' (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪৩৪)। চীন, নেপাল, তিব্বতের ধর্ম-

বিষয়ক চিত্রগুলিতে ‘অশ্লীলতা’ দেখা যায়। কেবল যি-দাম নয়, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বমূর্তিগুলিও প্রায়শই স্ব স্ব শক্তিকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ রেখেছেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন যে এই সকল চিত্র ও মূর্তিগুলি ভারতীয় মূল থেকে উদ্ভূত ও তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সমগ্র ভারতের হিন্দু তান্ত্রিক প্রভাবের সঙ্গে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার সম্পর্ক অভিনিবেশের যোগ্য বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। ব্রহ্মদেশে প্রাপ্ত আটটি মাথা (সামনে পিছনে তিনটি করে ছয়টি ও উপরে একটি মুখ), ষোলটি হাতের পুরুষমূর্তি স্ত্রীমূর্তিকে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দুর্গামূর্তি রূপে পূজিত হন। মূর্তিটি পিতল বা অষ্টধাতু নির্মিত প্রায় ছয় ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট ‘সম্পূর্ণ বাঙ্গালা ছাঁচের’ মূর্তি। প্রাবন্ধিক একে বৌদ্ধমূর্তিতত্ত্বের দৃষ্টিতে মিলিয়ে হেবজ্রমূর্তি রূপে চিহ্নিত করেছেন। যদিও বিশদে হেবজ্র মূর্তি লক্ষ্মণ সম্পর্কে কিছুই বলেন নি, কিন্তু দুর্গারূপে পূজিত মূর্তিকে হেবজ্র মূর্তি রূপে দাবি করা কম সাহসিকতার কাজ নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *বেনের মেয়ে* উপন্যাসে হেবজ্র মূর্তির উল্লেখ রয়েছে।

বৌদ্ধ দেবমণ্ডলের আদি দেবতা আদিবুদ্ধ বা বজ্রধর। ইনি সর্বব্যাপী, সর্বকারণ, সর্বশক্তিমান আধার এবং সর্বজ্ঞ। এঁর দুরকম মূর্তি কল্পিত হয়েছে – ক) একক মূর্তি বা শূন্যমূর্তি বা শূন্যতা বা পরমাত্মা, খ) যুগনদ্ধ মূর্তি বা বোধিচিত্ত মূর্তি বা করুণা বা জীবাত্মা। আদিবুদ্ধ শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে যুগবন্ধ অবস্থায় থাকেন। আদিবুদ্ধ থেকে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪৩৩) উদ্ভব। পঞ্চধ্যানবুদ্ধ পাঁচটি স্কন্ধের অধিষ্ঠাতা। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের শক্তি, বোধিসত্ত্ব ও মানুষী বুদ্ধ কল্পিত হয়েছে। প্রস্তর মূর্তিতে না পাওয়া গেলেও পুথিচিত্রে কখনো কখনো তাঁদের দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ত্রিকোণাকৃতি যন্ত্র প্রস্তরমূর্তিতে ধ্যানীবুদ্ধের বামপাশে দেখতে পাওয়া যায়। ধ্যানীবুদ্ধের একটি করে বোধিসত্ত্ব থাকেন। বোধিসত্ত্বরা মাথার উপর ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি ধারণ করে স্ব স্ব কুলচিহ্ন প্রকাশ করেন। এঁরা রাজোচিত বেশভূষায় থাকেন। শাক্যসিংহ বুদ্ধের আগেও চব্বিশজন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল, অন্যমতে বত্রিশজন। তাঁদের শেষ সাতজনকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষী বুদ্ধ আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৬৪] পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের দৃশ্য বৈশিষ্ট্যসমূহের তালিকা দেওয়া হল[৬৫] –

নাম	**কেন্দ্র** (স্তূপে অবস্থান)	**বর্ণ**	**প্রতীক**	**মুদ্রা**	**বাহন**	**শক্তি**	**বোধিসত্ত্ব**	**মানুষী বুদ্ধ**
বৈরোচন	কেন্দ্র	শ্বেত	চক্র	ধর্মচক্র	ড্রাগন	লোচনা	সমন্তভদ্র	ক্রকুচ্ছন্দ
অক্ষোভ্য	পূর্ব	নীল	বজ্র	ভূমিস্পর্শ	হস্তী	মামকী	বজ্রপাণি	কণকমুনি

রত্নসম্ভব	দক্ষিণ	পীত	রত্ন	বরদ	সিংহ	বজ্রধাতেশ্বরী	রত্নপাণি	কাশ্যপ
অমিতাভ	পশ্চিম	রক্ত	পদ্ম	সমাধি	ময়ূর	পাণ্ডরা	পদ্মপাণি/ অবলোকিতেশ্বর	গৌতম
অমোঘসিদ্ধি	উত্তর	শ্যাম	বিশ্ববজ্র	অভয়	গরুড়	আর্যতারা/ তারা	বিশ্বপাণি	মৈত্রেয়

অক্ষোভ্যকুলের দেবসংঘের মধ্যে হেরুক অতি জনপ্রিয় ও শক্তিশালী দেবতা। এরই রূপভেদ হেবজ্র। অক্ষোভ্যকুলের অন্যান্য দেবতারা হলেন – চণ্ডরোষণ, বুদ্ধকপাল, সপ্তাক্ষর, মহামায়া, হয়গ্রীব, যমারি, জম্ভল, বিঘ্নান্তক, বজ্রহুংকার, ভূতডামর, পরমাশ্ব, বজ্রজ্বালানলার্ক, ত্রৈলোক্যবিজয়, যোগাম্বর ও কালচক্র। হেরুকের জন্য পৃথক তন্ত্র রচিত হয়েছিল। এঁর নানাপ্রকার মূর্তি কল্পিত হয়েছে – দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ, ষোড়শভুজ। হেরুকের মূলমূর্তি দ্বিভুজ। তিনি নীলবর্ণ বিশিষ্ট। একক বিরাজিত, সঙ্গে শক্তি থাকে না। তাঁর মুখমণ্ডল ক্রোধাবেশে উদ্ভাসিত এবং দ্রংষ্ট্রাকরাল, চোখ বহিরাগত ও আরক্ত। কেশরাজি অগ্নিশিখার ন্যায় উর্দ্ধোস্থিত। তিনি শবের উপর বামপদ বিন্যাস করে, দক্ষিণপদ বামপদের উরুতে ন্যস্ত করে নৃত্যরত (অর্ধপর্যঙ্ক নাট্যাসন)। দক্ষিণ হাতে উদ্যত বজ্র এবং বামহাতে হৃৎপ্রদেশে রক্তপরিপূর্ণ কপাল থাকে। বামস্কন্ধ থেকে একটি খট্টঙ্গের উপর পতাকা। নেপাত, তিব্বত ও মাঞ্চুরিয়ায় এই মূর্তি পাওয়া যায়।[৬৬] *নিস্পন্নযোগাবলী* মতে, হেরুক তাঁর শক্তি প্রজ্ঞার সঙ্গে যুগনন্ধ অবস্থায় থাকলে তাঁর নাম হয় হেবজ্র। তাঁর হাতের সংখ্যানুযায়ী নামেরও পার্থক্য হয়।[৬৭]

গুরুদাস সরকারের প্রবন্ধে ষোড়শভুজ হেবজ্রের (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪৩৩) উল্লেখ থাকায় আমরা সে সম্পর্কে উল্লেখ করছি। ষোড়শভুজ হেবজ্রের মুকুটে কুলজ্ঞাপক অক্ষোভ্য ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তি দেখে যায়। তিনি শক্তি নৈরাত্মার (প্রজ্ঞা) সঙ্গে যুগবদ্ধ অবস্থায় থাকেন। তাঁর চার পদতলে চারজন মার থাকেন। প্রথম – স্কন্ধমার ব্রহ্মা, পীতবর্ণ; দ্বিতীয় – স্কন্ধমার ক্লেশ, বিষ্ণু, নীলবর্ণ; তৃতীয় – মৃত্যুমার মহেশ্বর, শ্বেতবর্ণ এবং চতুর্থ – দেবপুত্রমার, শ্বেতবর্ণ। এই মারেদের উপর চতুর্পদ দেবতার দ্বিপদ অর্ধপর্যঙ্কভাবে আর অবশিষ্ট দ্বিপদ আলীঢ়ভাবে বিন্যস্ত থাকে। তাঁর বর্ণ নীল। অষ্টমুণ্ডবিশিষ্ট। মূল মুখ নীল, দক্ষিণের স্মিতমুখ শ্বেত, বামে রক্তবর্ণ, চতুর্থ মুখটি মস্তকপরি বিকৃত দন্তবিশিষ্ট। অন্যান্য সকল মুখ নীলবর্ণের। তাঁর দক্ষিণ হাতে – বজ্র, তরোয়াল, তীর, চক্র, মদ্যপাত্র, দণ্ড, ত্রিশূল এবং হল; বাম হাতে – ঘণ্টা, পদ্ম,

ধনুক, উদ্ধত খট্বাঙ্গ, কপালপাত্র, রত্ন, উদ্যত তর্জনী এবং রজ্জু।[৬৮] হে বজ্র তিব্বত এবং চীনে অত্যন্ত জনপ্রিয় তান্ত্রিক বৌদ্ধদেবতা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১ – ১৯৫১) বৌদ্ধ শিল্পতত্ত্ব বিচার

ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের সূচনা পর্বে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। স্বদেশী যুগে শিল্পান্দোলনের একটা দার্শনিক ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং এই আদর্শের রূপকার হয়ে উঠেছিলেন। অজন্তা চিত্রকলা তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। ই. বি. হ্যাভেল 'Some Notes on Indian Pictorial Art' (*The Studio*, October, 1902) প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের সেরা ছবি 'বুদ্ধ ও সুজাতা'র বিশেষ উল্লেখ করেছিলেন। এডুইন আর্নল্ডের *The Light of Asia* গ্রন্থ থেকে এই চিত্রবিষয় গৃহীত হয়েছে যেখানে বুদ্ধকে বনদেবতা ভেবে গ্রাম-রমণী সুজাতার পায়েসান্ন নিবেদনের প্রসঙ্গ রয়েছে। হ্যাভেল লিখেছেন যে অবনীন্দ্রনাথ বুদ্ধের প্রশান্ত আধ্যাত্মিক মহিমাকে সহজ ছন্দে, অনুভূতির গভীরতায় প্রকাশের সঙ্গে একই সহজতায় সুজাতার নিবেদনের মধ্যে এনেছেন লাবণ্য ও মধুরিমা এনেছিলেন।[৬৯] ভগিনী নিবেদিতার (১৮৬৭ – ১৯১১) অসমাপ্ত গ্রন্থ *Myths of the Hindus and Buddhists* (১৯১৩), যা তাঁর মৃত্যুর পর আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী সম্পূর্ণ করেন, তার চিত্রগুলি আচার্য অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে তাঁর ছাত্ররা এঁকেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের জন্য 'বোধিসত্ত্বের হস্তীদন্ত', 'রাজকুমার সিদ্ধার্থের বিদায়', 'বুদ্ধের বোধিলাভ'(দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪৩২), 'মহাভিক্ষুক বুদ্ধ', 'মহাপরিনির্বাণ' ও 'তিষ্যরক্ষিতা' চিত্র অঙ্কন করেন।[৭০]

অবনীন্দ্রনাথের 'রানী বাগীশ্বরী' বক্তৃতামালার[৭১] 'শিল্পে অধিকার' (*প্রবর্তক*, ফাল্গুন – চৈত্র, ১৩২৩), 'সাদৃশ্য' (*প্রবাসী*, চৈত্র, ১৩৩৪) ও 'বর্ণিকা ভঙ্গম' (*বিচিত্রা*, পৌষ, ১৩৬৫) ছাড়া বাকি প্রবন্ধগুলি *বঙ্গবাণী*-তে প্রকাশিত হয়েছিল। বাকি প্রবন্ধগুলির প্রকাশকাল হল – 'শিল্পে অনাধিকার' (ফাল্গুন, ১৩২৮), 'শিল্পে অধিকার' (চৈত্র, ১৩২৮), 'দৃষ্টি ও সৃষ্টি' (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯), 'শিল্প ও ভাষা' (আষাঢ়, ১৩২৯), 'শিল্পের সচলতা ও অচলতা' (শ্রাবণ, ১৩২৯), 'সৌন্দর্যের সন্ধান' (কার্তিক, ১৩২৯), 'শিল্প ও দেহতত্ত্ব' (অগ্রহায়ণ, ১৩২৯), 'অন্তর বাহির' (ফাল্গুন, ১৩২৯), 'মত ও মন্ত্র' (চৈত্র, ১৩২৯), 'শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড' (আশ্বিন, ১৩৩০), 'শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), 'শিল্পের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভালোমন্দ' (মাঘ, ১৩৩০),

‘শিল্পবৃত্তি’ (অগ্রহায়ণ, ১৩৩১), ‘সুন্দর’ (ফাল্গুন, ১৩৩১), ‘অসুন্দর’ (চৈত্র, ১৩৩১), ‘জাতি ও শিল্প’ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২), ‘অরূপ না রূপ’ (কার্তিক, ১৩৩২); ‘রূপবিদ্যা’ (পৌষ, ১৩৩২, পত্রিকায় ‘রূপরেখা’ নামে প্রকাশিত); ‘স্মৃতি ও শক্তি’ (ফাল্গুন, ১৩৩২), ‘আর্য ও অনার্য শিল্প’ (চৈত্র, ১৩৩২), ‘আর্যশিল্পের ক্রম’ (বৈশাখ, ১৩৩৩), ‘রূপ’ (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩), ‘রূপের মান ও পরিমাণ’ (চৈত্র, ১৩৩৩), ‘ভাব’ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩), ‘লাবণ্য’ (কার্তিক, ১৩৩৪), ‘সন্ধ্যার উৎসব’ (বৈশাখ, ১৩৩০), ‘খেলার পুতুল’ (পৌষ, ১৩৩৩)। এগুলির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের গভীর জ্ঞানের, শিল্পীর রসিক চিত্তের ও শিল্পাদর্শের অপূর্ব ব্যাখ্যার পরিচয় বিধৃত রয়েছে, যার মধ্যে কেবল বৌদ্ধ-প্রসঙ্গগুলি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রবন্ধাবলীতে রূপতত্ত্ব ও শিল্পের নানা দিক নিয়ে আলোচনায় একান্ত নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীতে তিনি চিত্রশিল্প ও কথাশিল্পের ভেদ দূর করেছেন। তাঁর এই প্রবন্ধগুলির প্রবেশক হিসাবে আমরা *Hindustan Standard* পত্রিকার কিছু অংশ উদ্ধার করছি –

> Abanindranath Tagore was a unique personality who painted and wrote alternately producing superb things with two dissimilar instruments of creation. Perhaps the statement needs to be corrected, for he never wrote; he talked. Even when he wrote he was in fact talking, and talk followed from his tongue as well as from his pen in a perfumed iridescent stream. Some of it is caught in his books (Bageswari Lectures) … The thing that makes it a timeless work is its sheer readability and the fascinating way in which even abstruse points of aesthetics have been discussed.[৭২]

‘অতীতের শিল্পসম্পদ’ হারানোর অর্থ শিল্পের পক্ষে দুর্ঘটনা হওয়ায় অতীতের সঙ্গে বর্তমান শিল্পের যোগসূত্র তাৎপর্যপূর্ণ। অবনীন্দ্রনাথ ‘জাতি ও শিল্প’ প্রবন্ধে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র (cultural trajectory) নির্মাণে ক্রিয়াশীল বৌদ্ধযুগের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন –

> বৌদ্ধযুগে আমাদের শিল্প বোধিবৃক্ষের কলমের চারা ও ধর্মশাস্ত্র শিল্পশাস্ত্রাদির সঙ্গে সোনার গামলায় নীত হয়েছিল এ-দেশ থেকে সে-দেশ কিন্তু সেখানে গিয়ে প্রাচীন ভারত-শিল্প নবীন আবহাওয়ায় দেখতে দেখতে নতুন তেজে বেড়ে উঠল, ঔপ্যনিবেশিক এক একটা নতুন ধাঁচ পেলে দেবমূর্তির প্রসাদ ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্তই। কিন্তু নিজ ভারতে শিল্পশাস্ত্রের মতের বাঁধনে বাঁধা শিল্প বাঁধানো বোধিদ্রুমের সঙ্গে দীনাবস্থা প্রাপ্ত হতেই চলল।

অতীত শিল্পীদের আদর্শে বর্তমানকে সঙ্গী করে তিনি শিল্পবিস্তারের আশা করেছেন। রসের প্রাধান্যে জগতের সকল শিল্প একৈক ভাবপ্রকাশক। ভাবের মিলনের ক্ষেত্রে প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্যের যোগসূত্র হিসেবে বৌদ্ধভাব কীভাবে ক্রিয়াশীল ছিল তা ‘শিল্পবৃত্তি’ প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন –

> বৌদ্ধদের আমলে যেভাবে একটি মাত্র বুদ্ধমূর্তি অথবা মূর্তিও নেই শুধু একখানা হাতে লেখা পুঁথি – ধর্মে ধর্মে, চিন্তায়-চিন্তায়, শিল্পে-শিল্পে মিলিয়ে দিয়েছিল চীন ও ভারতের দুই সভ্যতাকে অটুটভাবে, সে ভাবের মিলন হতে কত দেরি লাগছে আজকের প্রাচ্যে ও আজকের প্রাশ্চাত্যে!

তাত্ত্বিক দৃষ্টান্তের প্রয়োগেও অবনীন্দ্রনাথ সমান সাবলীল। আর্টের ভাষাকে তিনি 'শিল্প ও ভাষা' প্রবন্ধে চারটি ভাগ করেছেন – 'শাস্ত্রীয় শিল্প' (অ্যাকাডেমিক আর্ট), লোকশিল্প (ফোক আর্ট), পরশিল্প (ফরেন আর্ট), মিশ্রশিল্প (অ্যাডাপটেড আর্ট)। পরশিল্পের উদাহরণ রূপে গান্ধার শিল্প; মিশ্রশিল্পের রূপে চীনের বৌদ্ধশিল্প, জাপানের নারা মন্দিরের শিল্প, গ্রীসের ছাঁচে ঢালা স্থানবিশেষের বৌদ্ধশিল্প পদ্ধতির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি একান্ত ভারতীয় চিন্তন পদ্ধতির অনুসারী হয়ে 'শিল্পের সচলতা ও অচলতা' প্রবন্ধে তিনি ইন্‌আর্টিস্টিক রিয়্যালিটির (কুশ্রী নয়) দৃষ্টান্তরূপে গান্ধারের কঙ্কালসার বুদ্ধকে চয়ন করলেন। যিনি শিল্পী বা কবি নন, জীবনের কুশ্রী আর দীনতাকে অবলম্বন করে তার চিন্তন যে কী বিকট আর বীভৎসরূপ পেতে পারে তা এই দৃষ্টান্ত দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দেন। রেখা-রস-রূপের আলোচনায় তিনি 'রূপরেখা' প্রবন্ধে বলেন যে রূপের সঙ্গে রেখা ঠিক ভাবে মেলালে রেখা 'সুন্দরী', আবার ঠিক রেখাকে পেলে রূপ 'সুন্দর'। রেখা কেবল মানুষকে কেমন দেখতে তা প্রমাণ করে না, তার ভঙ্গি দর্শকের মধ্যে ভাবের তরঙ্গ তোলে। রেখা রূপ রসের একৈক রূপের রূপরেখা মূর্ত হয়েছে বুদ্ধমূর্তিতে –

> রেখা রূপ রস মিলল সেখানে এবং একেই বলতে হল রূপরেখা – বাইরে এর স্থান অন্তরে এর স্থান। ... বুদ্ধমূর্তিতে এই রেখা।

রসশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র – এইসব মত ও মন্ত্রগুলি নানা যুক্তিতর্ক শিল্পজ্ঞান, রসবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা দিক থেকেই শিল্পচর্চার সহায়ক। বৌদ্ধযুগে গ্রিক, পারসিক এবং ভারতীয় মতের মিশ্রণে বৌদ্ধশিল্প চৈত্য বিহার ইত্যাদির ভিত্তিচিত্রণ ও ভাস্কর্যে তিন ধরণের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'রূপ' প্রবন্ধে মৌলিক চিন্তন ও বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে রূপবিদ্যাকে অনুসন্ধান করেছেন। খেলনা গড়ার নিয়েমের দৃষ্টিতে তিনি স্তূপ নির্মানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন –

> বালির স্তূপ গড়লে ছেলেতে আর পাথরের স্তূপ গড়লে বৌদ্ধরাজা – সাজের বাহুল্য এবং রূপের সমাবেশ ইত্যাদি নিয়ে আরও অনেকখানি পরিপূর্ণ হল বৌদ্ধস্তূপ কিন্তু রূপটা রইল সেই ছেলের-গড়া বালির স্তূপেরই।

বৌদ্ধশিল্প অনার্য স্তর থেকে আর্য স্তরে উত্তরণের প্রসঙ্গ অবনীন্দ্রনাথ 'আর্য ও অনার্য শিল্প' প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। চিন্তায় ধর্মে কর্মে বৌদ্ধযুগ 'প্রকাণ্ড এক ওলট-পালট' আনলেও 'অক্ষয়বটের স্মৃতি' তার

শৈল ভাস্কর্যে মূর্ত হয়েছে। অসিতকুমার হালদারের *অজন্তা* (১৯১৩) গ্রন্থের বীজকথনে রূপদক্ষ অবনীন্দ্রনাথ অজন্তা সম্পর্কে যা লিখেছেন তা তিনটি বাক্যমাত্র, কিন্তু তার মধ্যেই রূপরেণু ফুটে উঠেছে –

> ভারতশিল্পের শেষ দীপাবলি যেখানে আজও বিচিত্রচ্ছটা বিস্তার করিয়াছে – বৌদ্ধযুগের সেই অজন্তা গিরিগুহায় আর বৈদ্যুতিক আলোকপ্রখর এই বাঙ্গালায় ব্যবধান বিস্তর – পথের ব্যবধান, কালের ব্যবধান, সভ্যতা ভব্যতা উভয়েরই ব্যবধান; সুতরাং অজন্তার চিত্রশিল্পের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ পরিচয় ঘটাইতে হইলে শুধু শুনিয়া নয় সেটা দেখিয়ে বোঝাও প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যেই শ্রীমান নন্দলাল ও অসিতকুমার প্রমুখ বাঙ্গালার তরুণ শিল্পীগণ অজন্তার তীর্থমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা সেই তীর্থযাত্রারই ইতিহাস। এই ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে হয়ত প্রাচীন ভারতের নির্বাপিত-প্রায় সেই প্রদীপের শিখা স্নিগ্ধ উজ্জ্বল প্রশান্ত এবং যাহার আলোক বিদ্যুতের মত তীব্রও নয় – নয়নের পীড়াও দেয় না।[৭৩]

অবনীন্দ্রনাথ 'শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড' প্রবন্ধে অজন্তার চিত্রের দৃষ্টান্তে শাস্ত্র পড়ার থেকেও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের প্রত্যক্ষতার উপর গুরুত্বদান করেছেন। 'অন্তর বাহির' প্রবন্ধে তিনি বিশ্বের শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অথচ স্বতন্ত্র ভারতশিল্পের কথা বলেছেন।

অক্ষয়কুমার মৈত্র 'ভারত-চিত্রচর্চা' (*ভারতবর্ষ*, আশ্বিন, ১৩২৯-এ প্রকাশিত ও *প্রবাসী*, কার্তিক ১৩২৯-এ 'কষ্টিপাথর' অংশে সংকলিত) প্রবন্ধে অজন্তার বিরূপ সমালোচনা করে লিখেছেন, অজন্তা গুহাচিত্রাবলী 'চিত্র' নয়, 'চিত্রাভাস'; পুরানো ভারতচিত্রের অসম্যক্ নিদর্শন, চিত্র-সাহিত্যদর্পনের 'দোষ-পরিচ্ছেদ-এর অনায়াসলভ্য উদাহরণ', 'বিলাসব্যসনমুক্ত যোগযুক্ত অনাসক্ত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নিভৃত-নিবাসের ভিত্তি-বিলেপন'। 'ভারতচিত্রোচিত প্রশংসা লাভের অনুপযুক্ত' এই চিত্রকে তিনি 'আকস্মিক, অলৌকিক' একশ্রেণির 'পুস্ত-কর্ম্ম' বলেছেন। স্থান-প্রমাণ-ভুলন্ত-মধুরত্ব-বিভক্ততা-সাদৃশ্য-ক্ষয়-বৃদ্ধি – এই আটটি পারিভাষিক সংজ্ঞায় চিত্রের আটটি গুণ উল্লিখিত। স্থান, রস ও চিত্রদোষদুষ্ট চিত্র অপ্রশস্ত বলে নিন্দিত। যথার্থ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে অজন্তা গুহাচিত্রাবলী 'ভারত-চিত্রের অনিন্দ্যসুন্দর নিদর্শন' হতে পারে না এবং চিত্রশিল্পীরা পুরনো ভারতে 'চিত্রবিৎ' বলে গণ্য হতেন না। 'চিত্রে নয়, চরিত্রে' তাঁরা নমস্য; তাঁদের ভিত্তিচিত্র কলা-লালিত্যে নয়, 'বিষয়-মাহাত্ম্যে' প্রশংসার্হ বলে অক্ষয়কুমার মৈত্র মতপ্রকাশ করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ 'মত ও মন্ত্র' প্রবন্ধে এই মত খণ্ডন করে অজন্তার স্বপক্ষে শিল্পের নিজস্ব যুক্তি খাড়া করেছেন –

> সৃষ্টির প্রকাশ হল স্রষ্টার অভিমতে, শিল্পের প্রকাশ হল শিল্পীর অভিমতটি ধরে, ব্যক্তিবিশেষের বা শাস্ত্রমতবিশেষের সঙ্গে না মেলাই তার ধর্ম, কাজেই কলঙ্ক ও অপরিণতি যেমন হয় চাঁদের পক্ষে শোভার কারণ, শিল্পের পক্ষেও ঠিক ঐ কথাটিই খাটে। চিত্রষড়ঙ্গের কতখানি পরিপূর্ণতা পেলে চিত্র চিত্র হবে চিত্রাভাস হবে না, মডেল ড্রয়িং কতখানি সঠিক হলে তবে অজন্তার ছবিকে বলব চিত্র আর কতখানি কাঁচা থাকলে অজন্তার চিত্রাবলী হবে 'চিত্র-সাহিত্য-দর্পণের দোষ-পরিচ্ছেদের অনায়াসলভ্য উদাহরণ' তা বলা কঠিন ...।

তাঁর মতে – 'রূপের যথার্থ পরিমাপ একমাত্র রূপবিদ্যা দ্বারা হওয়া সম্ভব'। অজন্তার চিত্রগুলিকে অনেকে 'চমৎকার' বললেও চমৎকার কেন তা কেবল রূপবিদই বলতে পারেন। 'রূপবিদ্যা' প্রবন্ধে এই বিষয়ে তিনি আলোচনা করে বলেন যে পুরাতত্ত্ববিদ চিত্রের প্রাচীনতা ও ইতিহাস বিশ্লেষণ করে সাধারণ মানুষের মত রস পাবেন, কিন্তু রূপবিদ এগুলির সঙ্গে 'চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষ' দেখবেন –

> অজন্তার চিত্র যেন তাঁর সামনে আজ আঁকা হচ্ছে, – কারু হাত নির্ভয়ে রেখা টানছে, কারু হাত ভয়ে কাঁপছে। ... এইসব চিত্রের পেছনে মানুষের চিত্রবিদ্যার ধারা কত যুগ যুগ ধরে বইতে-বইতে কী রেখা গেল রঙের কূলে কী চিন্তার ছাপ – তাই দেখবে রূপবিদ।

'আর্য ও অনার্য শিল্প' প্রবন্ধে চিত্রেকলায় আলোছায়ার দৃষ্টান্তরূপে অজন্তাচিত্র সম্পর্কে বলেছেন –

> অজন্তা গুহার ছাদের চন্দ্রাতপ তার মাঝখানে যে মস্ত পদ্ম আঁকা হল তারই কোণে-কোণে এই শাদা আর কালো দুই ঊষাদেবতার রূপ লিখে গেল শিল্পীরা।

অজন্তার অপ্সরার চিত্র বিশ্লেষণে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবি ও সমালোচকের ত্রিবেনীসঙ্গম ঘটেছে। তিনি চিত্রশিল্পের ব্যাকরণ আলোচনায় 'পরিচয়' (*ভারতী,* বৈশাখ, ১৩২১) ও 'মূর্তি' (*প্রবাসী,* মাঘ, ১৩২০) প্রবন্ধে বলেছেন যে রূপে রূপে মিল অপেক্ষা সাদৃশ্যের পক্ষে ভাবে ভাবে সম্বন্ধ বেশি প্রয়োজনীয়। একের ভাব অন্যে উদ্রেক করলে সাদৃশ্য, অর্থাৎ কোনো এক রূপের ভাব অন্য কোনো রূপের সাহায্যে আমদের মনে উদ্রেক করে দেওয়া। দুইয়ের আকৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও, এক বস্তু অন্য বস্তুর যথার্থ ভাব উদ্রেক করে। ভাবরাজত্বে রূপ পৌঁছলে সাদৃশ্য উপমা ধরে রূপ ও ভাব পাল্টাপাল্টি হয়। অলংকার-শিল্পের মূলে 'সদৃশকরণের নানা কৌশল' সম্পর্কে তিনি তুলনারহিত উদাহরণ দিয়েছেন –

> অজন্তা গুহায় যারা অপ্সরার চিত্র লিখেছিল অপ্সরার কাঁধে দুখানা করে ডানা বেঁধে দেবার দরকারই তারা বোধ করেনি, মেঘকেই তারা ডানা সদৃশ করে লিখে গেল! কী চমৎকার উপমা দিয়ে বললে তারা – মেঘপাখনা অপ্সরা! কবিতায় এ উপমা হয়ত এখনও চলেনি, কিন্তু চলবার বাধাও দেখিনে।

বাগীশ্বরী প্রবন্ধমালার অনেক প্রবন্ধে মূর্তিশিল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে বুদ্ধমূর্তির প্রসঙ্গ নানা বিষয়ীবৈচিত্রকে অঙ্গীকার করে প্রকাশ পেয়েছে। 'রস ও রচনার ধারা' প্রবন্ধ মতে, শিল্পক্রিয়ার দুটি প্রক্রিয়া – ক) বিরল-বৈচিত্র্য যেখানে ভাব গভীর এবং খ) ইঙ্গিতে আভাসে রচনা প্রক্রিয়ার স্বল্পতা ও সরলতায়, অন্যদিকে বহুবৈচিত্র যেখানে অনেকখানি বিনিয়ে বিচিত্র ঘটনা ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে বলা। এই দুইয়ের মধ্যে সমস্ত শিল্পের গতাগতি ধরা রয়েছে। মূলগতভাবে বিরল বিচিত্রতার প্রসার ভারতের শিল্পপ্রক্রিয়ার বিশেষ স্থান না পেলেও ব্যতিক্রম রূপে তিনি 'নিঃসঙ্গতা ও নিশ্চলতা এবং অনেকখানি স্তব্ধতা'ময় বুদ্ধমূর্তির কথা বলেছেন। 'শিল্প বৃত্তি'-তে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পের আন্তর্জাতিকতা ও মানবিক আবেদন ভাষারূপ পেয়েছে। ছাঁচের মধ্যে ভালোমন্দ, ভিন্ন ভিন্ন উপযুক্ত অনুপযুক্ত প্রকাশ পায়। ভারতে বৌদ্ধ হিন্দু মোগল ইত্যাদি – বিদেশে গ্রীক রোম খ্রিস্ট-তুর্ক ইত্যাদি নানা ধর্মের ছাঁচ পেয়ে শিল্পের একটা জাতিবিভাগ স্পষ্ট হয়ে উঠলেও শিল্প হিসেবে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অবনীন্দ্রনাথের এই সমন্বয়পন্থায় আর্য-অনার্য, বৈদিক-বৌদ্ধ একাকার হয়ে যায়। এখানেও সমন্বয়কেন্দ্রে রয়েছে বৌদ্ধশিল্প। চিন্তন আর শিল্পকলার অসম অগ্রগতি সত্ত্বেও মিলনে বাধা হয়নি।

'আর্যশিল্পের ক্রম' প্রবন্ধে মূর্তিপূজা এবং প্রতিমা শিল্পের সূত্রে বৌদ্ধশিল্পের বিবর্তনকে[৭৪] অনুসন্ধান করেছেন –

> বৈদিক কাল থেকে আরম্ভ করে অনেক যুগ ধরে 'অদ্বিতীয় ঈশ্বরের' ধারণাতে পৌঁছেছে যখন মানুষের মন গভীর জ্ঞানের ধারা ধরে সেই সময় থেকে রসের ধারা ধরে চলতে শুরু করল শিল্পীদের মানস সারা বৌদ্ধযুগ অতিক্রম করে অদ্বিতীয় বুদ্ধমূর্তির ধারণাতে পৌঁছতে। জ্ঞানীর পথে যেমন নানা জটিল ও বিচিত্র তর্ক-বিতর্ক, শিল্পীর পথেও তেমনি নানা কর্মের নানা রীতিপদ্ধতির বিচিত্রতা গিয়ে মিলল একটি কেন্দ্রে; জ্ঞানী বললেন 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক:', শিল্পী দেখালে – স্তব্ধমূর্তি!

'রূপ' প্রবন্ধে রূপের তারতম্য বিশ্লেষণে তিনি বুদ্ধমূর্তি আর চৈত্যের তুলনা করেছেন –

> বৌদ্ধশিল্প তাঁর মধ্যে একা বুদ্ধমূর্তিটিই কেবল নির্ভূষন সুন্দর রূপ, আর চৈত্য বিহার স্তূপ সবই ভূষাভারাক্রান্ত রূপ।

অবনীন্দ্রনাথ 'রূপের মান ও পরিমাণ' প্রবন্ধে বুদ্ধমূর্তির ক্ষেত্রে শাস্ত্র ভাঙা-গড়া খেলাকে লক্ষ করেছেন। শাস্ত্র মেনে বুদ্ধ প্রতিমা হয় নি। তাই শাস্ত্রবিহীন প্রতিমা ও মান পরিমাণ এক একজন শিল্পী করার ফলে সেই মূর্তির আদর্শে শাস্ত্রীয় মাপ এসেছিল। 'ভাব' প্রবন্ধে ডৌল ও সাজের সঙ্গে ভাবের হেরফেরে বুদ্ধমূর্তি গঠনের কথা বলেছেন, যেমন – 'সমভঙ্গ বুদ্ধমূর্তি'। এতে দেহের বাম ও দক্ষিণ উভয় পাশের ভঙ্গি বা ভঙ্গ

সমান থাকলেও হস্তমুদ্রা পৃথক হয়। আবার, ‘আভঙ্গ’ বোধিসত্ত্বমূর্তিতে মূর্তির কটিদেশ মানসূত্র থেকে এক অংশ বামে বা দক্ষিণে সরে যায়।[৭৫] বুদ্ধমূর্তি সৃষ্টির পেছনে শিল্প ব্যাকরণ অনুযায়ী অবনীন্দ্রনাথ ভারত-ষড়ঙ্গের সাদৃশের কথা বলেছেন। ‘সাদৃশ্য’ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে সাদৃশ্য পুরোপুরি নকল করে, নয়তো মানুষের ভাবভঙ্গীতে মেলানোর প্রসঙ্গে আসে। বুদ্ধের মূর্তি শিল্পীর নিজের চোখে দেখা না থাকলেও ‘দ্বিতীয় উপায়ে নানা লক্ষণাক্রান্ত নাক মুখ চোখের টানটোন দিয়ে পাথরের মূর্তিতে বুদ্ধত্বটুকু’ ধরার চেষ্টা লক্ষ করা যায়।

এই ভাবেই নিজের সমগ্র শিল্পীসত্তা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ কখনো অখণ্ড রসদৃষ্টিতে, কখনো তত্ত্বদৃষ্টিতে বৌদ্ধশিল্পকে চিনে নেবার চেষ্টায় অনন্যপরতন্ত্র হয়ে রয়েছেন।

উপসংহার

বুদ্ধদেবের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও তাঁর ধর্মের ঔদার্য ভারতীয় শিল্পে – স্থাপত্য, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায় ও মূর্তিতত্ত্বে এক নূতন দিগন্ত রচনা করেছিল। আমাদের আলোচ্য কালপর্বের শিল্প-রসিকদের আলোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৌদ্ধশিল্পকে বিচ্ছিন্ন ভাবে না দেখে তাকে হিন্দুধর্মের সঙ্গে অখণ্ডভাবে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। একটা জাতীয়তাবাদী ধারণা ফল্গুধারার মতো এই ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ছিল। ঊনবিংশ শতকে অনুসন্ধানের সুবিধার্থে তাত্ত্বিকরা যুগ নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। সময়কাল অনুযায়ী ভাগ হয়েছে হিন্দুশিল্প, বৌদ্ধশিল্পের। বৌদ্ধশিল্পের মধ্যে দিয়ে ভারতের প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পের সূচনা হওয়ায়, বৌদ্ধশিল্পের সূত্রে হিন্দুশিল্পের যুগনির্মাণের চেষ্টা চলতে থাকে। সময় বিশেষে সমগ্রটাই হিন্দুশিল্প বলার প্রবণতার সঙ্গে সামগ্রিক অর্থে তা ভারতীয় শিল্পের গৌরব বলে স্বীকৃত হয়েছে।

বৌদ্ধশিল্পকে স্বতন্ত্রভাবে যে দেখা হয়নি তা নয়, কিন্তু তার মধ্যেও মূল ঝোঁক পড়েছে অখণ্ড ভারতসত্তার অনুসন্ধানের উপর। আবার, কোন কোন বিদেশী তাত্ত্বিক যখন বৌদ্ধ বা হিন্দুশিল্পকে হেয় করে বিদেশী শিল্পকে মহত্ত্বদান করেছেন তখন ভারতীয়দের পক্ষ থেকে, কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে বিদেশীদের পক্ষ থেকেও প্রতিবাদ হয়েছে। তবুও, ভারতীয় শিল্পের প্রতি পক্ষপাত কোথাও কোথাও একদেশদর্শীতায় আক্রান্ত বলে মনে হয়। যেমন – গান্ধার শিল্পের যা কিছু ভালো তা সবটাই ভারতীয়, মন্দের সব দায় হেলেনিক ধারণাজাত, এই ধরণের সংকীর্ণ বিশ্লেষণী প্রবণতাও দেখা গেছে। তবে,

ভারতীয় শিল্পের অখণ্ড দৃষ্টিতে আলোচনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধশিল্পের বিবর্তনের দিকটিও চমৎকার ফুটে উঠেছে। শান্তি ও সৌকুমার্য হিন্দু-বৌদ্ধযুগের শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় শিল্পের বিভিন্ন ধারার উদাহরণগুলি ও ব্যাকরণের ক্ষেত্রে বৌদ্ধশিল্পের অবদান অনস্বীকার্য।

একথাও মনে রাখতে হবে যে বৌদ্ধশিল্প বলতে কেবলমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্প বোঝায় না। ভারতীয় বৌদ্ধশিল্পের আলোচনায় সিকিম, দার্জিলিং, কালিম্পং, লাদাখ প্রভৃতি অঞ্চলের শিল্পকেও বোঝায়। এই শিল্পের আলোচনা ছাড়া বৌদ্ধশিল্প সমগ্রতা পাবে না। এই সম্পর্কিত আলোচনা এখনো তেমন হয়ে ওঠে নি। তাই এদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। মৌর্যযুগে বৌদ্ধ শিল্পকলার যথার্থ সূত্রপাত হলেও এই যুগের শিল্প ভাস্কর্যের ধারণা বৈদিক ও প্রাক-বৈদিক যুগের শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য চিন্তনের জায়মানতা ও ক্রম-পরিণতির এক সুসংহত রূপময় প্রকাশ। অতীত ভারত শিল্পের ক্ষেত্রে তার নিজস্বতার পরিচয় বৌদ্ধশিল্পের মধ্যে দিয়েই খুঁজে পেয়েছিল। এটি ভারতবাসীর মনে একৈক শিল্পবোধের জন্ম দিয়েছিল যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। যেহেতু বৌদ্ধশিল্প মানব হিতৈষণার দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই মানবেতিহাসের সামগ্রিকতায় এটি দিগ্‌দর্শনকারী। তাই বৌদ্ধশিল্পের কদর বিশ্বের অনান্য দেশেও অতীতকাল থেকে বর্তমান।

বৌদ্ধধর্ম নয়, বৌদ্ধশিল্প সামগ্রীর আদান প্রদানের মাধ্যমেই ভারতবর্ষের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটেছিল। সিল্ক রুটের পথ ধরেই বৌদ্ধশিল্প সামগ্রী চীনদেশে প্রবেশ করেছিল। শিল্পের আকর্ষণেই বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল। বৌদ্ধশিল্পের সূত্র ধরেই এর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সমগ্র দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে এক যুগান্তকারী শিল্প ভাবধারার জন্ম দিয়েছিল।[৭৬]

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও ইতিহাস অনুসন্ধিৎসায় যে জোয়ার এসেছিল তাতে বর্তমানে ভাঁটা পড়েছে। আবার, চন্দ্রকেতুগড়, গোবর্ধনপুর, কর্ণসুবর্ণ, মোগলমারি প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত বিহার ও প্রত্নবস্তুকে ঘিরে সাধারণ মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা, উৎসব আয়োজন, গ্রন্থ প্রণয়ন তার মূল্যও সামান্য নয়। ২০০২-০৩ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক অশোক দত্তের তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গের সর্ববহৎ বৌদ্ধ মহাবিহার মোগলমারি (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতক) পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। মোগলমারি খননের ফলে পশ্চিম সীমান্তে বৌদ্ধবিহারের সীমানা প্রাচীর, গর্ভগৃহ, প্রদক্ষিণ (চংক্রমণ) পথ, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাস-কুঠুরি, সিঁড়ির ধাপ, ধ্বজস্তম্ভ, জলনিকাশী নালা, মৃৎপাত্র,

স্টাকোর মূর্তি, পোড়ামাটির উৎসর্গ ফলক, মিশ্রধাতুর মুদ্রা, সোনার লকেট ইত্যাদি পাওয়া গেছে। খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকের ব্রাহ্মী লিপি সম্বলিত পোড়ামাটির একটি গোলাকার উৎসর্গ ফলকের মধ্যে মিশ্র সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষায় বৌদ্ধধর্মের অতি প্রাচীন বাণী 'এ ধর্ম হেতুপ্রভব ...' পাওয়া গেছে। ২৪ জানুয়ারি, ২০১৬ অষ্টম পর্যায়ের প্রত্নখননের দিন ৯১টি প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে, তার মধ্যে ২১টি ছোটবড় বুদ্ধমূর্তি। মোগলমারির উৎখননের ফলে ইতিহাস ও প্রত্নচর্চার ক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলার গৌরবময় দিনের অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। এছাড়াও ১৯৬২-৬৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুধীরঞ্জন দাশ মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে হিউয়েন সাং বর্ণিত 'লো-তো-মো-চি' অর্থাৎ রক্তমৃত্তিকা বিহার (চতুর্থ শতক) আবিষ্কার করেন। ১৯৫৬-৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে উত্তর চব্বিশ পরগণায় বেড়াচাঁপা ও হাড়োয়ার কাছে বিদ্যাধরী নদীর তীরে চন্দ্রকেতুগড়ে (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক), দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় সুন্দরবনের পাথর প্রতিমা ব্লকের গোবর্ধনপুরে (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক) বৌদ্ধ পুরাতাত্ত্বিক স্থান আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলার ইতিহাস রচনায় এইগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি বাংলাদেশে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ পুরাতাত্ত্বিক স্থানগুলির কথা উল্লেখ করা যায়।

প্রাচীন ভারতের জনমানসে এক পরিশীলিত শিল্পীত বোধ তৈরি করতে যেমন বৌদ্ধশিল্প সক্রিয় ছিল, তেমনিই ঊনবিংশ শতকের সমাপ্তি আর বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে শিল্পের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা গঠনে বৌদ্ধশিল্পের পরোক্ষ প্রভাব ছিল অপরিসীম। বর্তমানকে সম্ভাবনাময় করে তোলার স্বার্থে সমকালের ভারতীয় শিল্প প্রবক্তাদের অতীতমুখী হয়ে বৌদ্ধশিল্পের কাছ থেকে আত্মবোধের দীক্ষা নিতে হয়েছিল। ঔপনিবেশিক আগ্রাসী শিল্পের বিরুদ্ধে ভারতীয় নিজস্ব নন্দনতাত্ত্বিক প্রস্থান তৈরির ক্ষেত্রে অন্যতম বিষয়ালম্বন বৌদ্ধশিল্প। জাতীয়তাবাদী ভারতীয় শিল্প আন্দোলনে তাই ভবিষ্যতকে সম্ভাবিত করার জন্য বৌদ্ধশিল্পের শরণ নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাই বর্তমান শিল্পচিন্তার ক্ষেত্রে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহমান বৌদ্ধশিল্পের প্রাসঙ্গিতা আজও অম্লান। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বহির্বিশ্বের কাছে এখনও ভারতীয় শিল্পের 'মুখ' বৌদ্ধশিল্প।

টীকা ও উৎস নির্দেশ

১। Havell, E. B. (1920). *Ideals of Indian Art*. New York: E. P. Dutton and Company. P. 13

২। বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। (২০১০)। *নিবেদিতা লোকমাতা*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ২৫

৩। রায়, শরৎকুমার। (২০০০)। *বৌদ্ধ ভারত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ৯৭

৪। শীলভদ্র, ভিক্ষু। (অনূদিত)। (২০১১)। *দীঘ নিকায়*। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ – ৬। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ. ২১

৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬, ২৫৮

৬। সরকার, সাধনচন্দ্র। (১৯৯৭)। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ৭

৭। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০

৮। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১, ১৯

৯। ঘোষ, ঈশানচন্দ্র। (অনূদিত)। (২০০৪)। পাদটীকা। *জাতক*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ১৫১

১০। সরকার, সাধনচন্দ্র। (১৯৯৭)। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ১৯ – ২১

১১। চৌধুরী, হেমেন্দুবিকাশ। (সম্পাদিত)। (১৯৯৫)। গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার। বৌদ্ধ শিল্পের বিবর্তন। *জগজ্জ্যোতি*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা। পৃ. ৬৭ – ৬৮

১২। Coomaraswamy, Ananda K. (1999). Coomaraswamy, Ananda K. (Edited). Early Buddhist Art – Maurya, Sunga and Early Andhra. *Introduction to Indian Art*. New Delhi. Munsiram Monoharlal Publishers Pvt. Ltd. p. 28

১৩। Fergussion, James. (1998). *History of Indian and Eastern Architecture*. Vol – I. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited. p. 66

১৪। Bagchi, Jhunu. (1993). *The History and Culture of the Palas of Bengal and Bihar (Cir. 750 A. D. Cir. 1200 A. D).* New Delhi: Abhinav Publications. p. 117

১৫। বড়ুয়া, প্রণবকুমার। (২০০৭)। *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। ঢাকা। বাংলাদেশ: বাংলা একাডমী। পৃ. ১৭৬

১৬। জাকারিয়া, সাইমন। (২০০৭)। *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধনাটক*। ঢাকা। বাংলাদেশ: বাংলা একাডেমী। পৃ. ৩ – ৪, ১৬ ও সরকার, সাধনচন্দ্র। (২০০৭)। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ১৩৬ – ১৩৭

১৭। মজুমদার, রমেশচন্দ্র। (১৯৮৮)। *বাংলা দেশের ইতিহাস*। কলকাতা: জেনারেল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ২৪৫ – ২৪৬

১৮। পাহাড়পুর স্তূপ সম্পর্কে পরবর্তীকালে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। আমরা এই প্রসঙ্গে দুইজন গবেষকের লেখা থেকে দৃষ্টান্ত উদ্ধার করছি।

ক)। পাহাড়পুর স্তূপের দুটি প্রেক্ষাগৃহের উল্লেখ করে সৈয়দ জামিল আহমেদ জানিয়েছেন –

> Inside the cruciform shaped main temple of the Somapur Monastery there is a centrally placed sealed square chamber, form the four outer walls of which project four cellas. Each of these cellas faces a nearly square hall… A narrow ambulatory path surrounded the internal cruciform created by the sealed chamber, the cellas and the (nearly) square halls.

দ্রষ্টব্য: Ahmed, Syed Jamil. (1995). ‘Buddhist Theatre in Ancient Bengal’. The Asiatic Society of Bangladesh: *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*. p. 36

খ)। পাহাড়পুর বিহার এক বিরাট চারকোণা স্থান জুড়ে ৯০০ ফুটেরও বেশি দীর্ঘ ও চারদিকে উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। বিহারের প্রবেশপথ উত্তরমুখী, সিঁড়ি দিয়ে স্তম্ভযুক্ত একটি বিরাট প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এর দক্ষিণে প্রাচীরনির্মিত একটি ছোট প্রবেশপথ দিয়ে ভিতরে অপেক্ষাকৃত ছোট প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করা যেত। ছোট প্রেক্ষাগৃহটির দক্ষিন দিক খোলা এবং ছাদবহনকারী স্তম্ভযুক্ত ছিল। এখান থেকে বারান্দা পেরিয়ে প্রধান মন্দিরের সামনে যাওয়া যেত। সিঁড়ির দুইদিকে সারিবদ্ধ ১৭৭টি কক্ষ প্রাথমিক পর্যায়ে ভিক্ষুদের আবাসগৃহ রূপে ব্যবহৃত হত। বড় প্রেক্ষাগৃহের মাপ ৫৩ × ৪৭ ফুট এবং ছোটটির মাপ ৩৭ × ২৪ ফুট। এছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্দিরের উত্তরাংশে আরেকটি প্রেক্ষাগৃহের সন্ধান মিলেছে।

দ্রষ্টব্য: জাকারিয়া, সাইমন। (২০০৭)। *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধনাটক*। ঢাকা। বাংলাদেশ: বাংলা একাডেমী। পৃ. ১৭ – ১৮

১৯। সরকার, সাধনচন্দ্র। (১৯৯৭)। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ৯৮

২০। প্রাগুক্ত। পৃ. ৯৮ – ১০০

২১। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০০

২২। ইলোরায় বারোটি বৌদ্ধ, সতেরটি ব্রাহ্মণ্য এবং পাঁচটি জৈনধর্মের গুহা রয়েছে। সম্ভবত, বজ্রযানী বৌদ্ধদের নির্দেশে প্রাচীনগুহাগুলি খ্রিস্টিয় পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। বৌদ্ধমন্দিরগুলির মধ্যে দুটি চৈত্যগুহা এবং অপর দশটি বিহার বা সংঘারাম ছিল। প্রাচীন গুহাগুলিতে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব সহচর ও বিদ্যাধরের সঙ্গে রয়েছেন, কিন্তু পরবর্তি গুহাসমূহের অধিকাংশ বোধিসত্ত্বমূর্তি এবং বুদ্ধমূর্তিগুলি ক্ষুদ্রতর হয়েছে। ২ সংখ্যক থেকে ৬ সংখ্যক এবং ৮ থেকে ১০ সংখ্যক গুহায় যথাক্রমে ধর্মচক্র প্রবর্তন, ভূমিস্পর্শ ও ধ্যানমুদ্রার বিশালাকার বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। ইলোরা চৈত্য, ১১ ও ১২ সংখ্যক গুহা ছাড়া সকল বৌদ্ধগুহা একতল বিশিষ্ট, এদের সামনের দিকের বারান্দা এবং ভিতরের বিশাল কেন্দ্রীয় সভাগুহাগুলি স্তূপসমন্বিত ছিল। পর্বতের দক্ষিণদিক থেকে প্রথম বারোটি গুহাই বৌদ্ধগুহারূপে চিহ্নিত।

দ্রষ্টব্য: সরকার, সাধনচন্দ্র। (১৯৯৭)। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ১০৫ – ১০৭

২৩। রায়, অলোক। (১৯৬৯)। পরিশিষ্ট – ৪। *রাজেন্দ্রলাল মিত্র*। কলকাতা: বাগর্থ। পৃ. ১৩

২৪। ইলোরার সব গুহার ছাদ চ্যাপ্টা হলেও, কেবল বিশ্বকর্মা গুহার ছাদ গোলাকার। এই মন্দিরের দরজার উপরে চৈত্যের জানালা প্রায় সম্পূর্ণ বৃত্তাকার, অভিনব আকৃতির স্তূপে ছোট খাঁজ কেটে বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত হয়েছে। এখানের সবধরণের শিল্পকাজেই এক উন্নতশৈলী দেখা যায়। ছোট ছোট মূর্তি ও অলঙ্করণে শোভিত বস্তুস্তম্ভ গুহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। সবদিকে সম্পসারিত ত্রিশটি স্তম্ভ দ্বারা প্রধান কক্ষটিকে ধনুকাকৃতিরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। স্তম্ভগুলির পাদদেশ ঘটাকৃতি, কেবলমাত্র সামনের সারির কেন্দ্রের দিকে দুটি স্তম্ভের পাদমূল চতুষ্কোনিক। স্তম্ভকাণ্ডগুলি অষ্টকৌণিক এবং পত্র পুষ্পালঙ্কারে খচিত। শীর্ষ মুকুটটি পত্রিতা অর্থাৎ পুষ্পলতাদির অলঙ্কারণে উৎকীর্ণ। স্তম্ভগুলির শীর্ষদেশে ব্রাকেট রয়েছে। দ্রষ্টব্য: সরকার, সাধনচন্দ্র। (১৯৯৭)। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ১১৩

২৫। Fergussion, James. (1998), *History of Indian and Eastern Architecture*, Vol – I. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited. p. 160

২৬। রায়, অলোক। (১৯৬৯), পরিশিষ্ট – ৪, *রাজেন্দ্রলাল মিত্র*, বাগর্থ: কলকাতা, পৃ. ১৮

২৭। মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত। (১৯৭০)। *বাঘ ও অজন্তা*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী। পৃ. ৬২

২৮। সরকার, সাধনচন্দ্র। (১৯৯৭)। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ. ১১৪ – ১১৫

২৯। হালদার, অসিতকুমার। (২০১০)। দাশগুপ্ত, প্রসেনজিৎ। পাল, সৌম্যেন। (সম্পাদিত)। হালদার, গৌতম। প্রাক্কথন। ‘অজন্তাপ্রেমী শিল্পী ক্রিশ্চিয়ানা জেন হেরিংহাম’। *অজন্তা*। কলকাতা: লালমাটি।

৩০। সরকার, সাধনচন্দ্র। (১৯৯৭)। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদক)। *বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ১১৫, ১১৮

৩১। মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত। (১৯৭০)। *বাঘ ও অজন্তা*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী। পৃ. ৭৭ – ৭৮

৩২। সরকার, সাধনচন্দ্র। (১৯৯৭)। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদক)। *বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ১১৫ – ১১৬

৩৩। ঘোষ, নির্ম্মলকুমার। (১৯৯৫)। *ভারত শিল্প*। কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১৩২ – ১৩৩

৩৪। Fergussion, James. (1998). *History of Indian and Eastern Architecture*. Vol – I. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited. p. 151

৩৫। রায়, অলোক। (১৯৬৯), পরিশিষ্ট – ৪, *রাজেন্দ্রলাল মিত্র*, বাগর্থ: কলকাতা, পৃ. ১৮

৩৬। ভট্টাচার্য্য, বিধুশেখর। (২০১৪)। মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র। ভিক্ষু, সুমনপাল। (সম্পাদিত)। প্রবেশক। *পালিপ্রকাশ*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ২৭

৩৭। Saraswati, Sarasi Kumar. Sarkar, Khitish Chandra. (1936). *Kurkihar, Gaya and Bodhgaya*. Rajshahi. p. 54

৩৮। সরকার, সাধনচন্দ্র। (১৯৯৭)। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদক)। *বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ. ১২৯। মহাবোধি মন্দিরের বিস্তারিত ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য: বড়ুয়া, মনোরঞ্জন। (২০১৬)। *বৌদ্ধতীর্থ পর্যটন*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। পৃ. ১৮ – ২৩ ও দত্ত, বিমলচন্দ্র। (২০১৫)। *বৌদ্ধ ভারত*। মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র। ভিক্ষু, সুমনপাল। (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ ভারত*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ৬৩, ৬৭

৩৯। Beal, Samuel. (Edited). (2008). *Si-Yu-Ki/ Buddhist Records of the Western World*. Translated from the Chinese of Hiuen Tsang (A. D. 629). Book VIII. Delhi: Low Price Publications. p. 123

৪০। Ibid. p. 133

৪১। সরকার, সাধনচন্দ্র। (১৯৯৭)। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ১০২, ১৩১ – ১৩৭; দত্ত, বিমলচন্দ্র। (২০১৫)। মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র। ভিক্ষু, সুমনপাল। (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ ভারত*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ৬৮ ও বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূলচন্দ্র। (১৯৬৬)। *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়। পৃ. ১৩৬

৪২। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের প্রসঙ্গে একই প্রবন্ধকারের 'বোধগয়া প্লাকের নূতন কথা (অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ন মিঃ ভিনসেন্ট এ, স্মিথের অভিমত)' (*তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, আষাঢ়, ১৩২৪) প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

৪৩। রায়, অলোক। (১৯৬৯)। পরিশিষ্ট – ৪। *রাজেন্দ্রলাল মিত্র*। কলকাতা: বাগর্থ। পৃ. ১২

৪৪। হালদার (দে), মণিকুন্তলা। (২০১০)। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদক)। *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ৩১৭ ৩১৯, ৩২৩

৪৫। হালদার, অসিতকুমার। (২০১০)। দাশগুপ্ত, প্রসেনজিৎ। পাল, সৌম্যেন। (সম্পাদিত)। সটীক সংস্করণ। হালদার, গৌতম। *অজন্তা*। কলকাতা: লালমাটি। পৃ. ৩১ – ৩২

৪৬। দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ। (২০০৫)। *ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৪৩

৪৭। সরকার, সাধনচন্দ্র। (১৯৯৭)। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদক)। *বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ১১৮ – ১১৯

৪৮। মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত। (১৯৭০)। *বাঘ ও অজন্তা*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী। পৃ. ১১৪

৪৯। হালদার, অসিতকুমার। (২০১০)। দাশগুপ্ত, প্রসেনজিৎ। পাল, সৌম্যেন। (সম্পাদিত)। সটীক সংস্করণ। হালদার, গৌতম। *অজন্তা*। কলকাতা: লালমাটি। পৃ. ৩২ – ৩৩

৫০। মিত্র, অশোক। (২০০৭)। *ভারতের চিত্রকলা*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৪৭

৫১। Coomaraswamy, Ananda K. (1999). Coomaraswamy, Ananda K. (Edited). 'Kusana and Later Andhra Period'. *Introduction to Indian Art*. New Delhi: Munsiram Monoharlal Publishers Pvt. Ltd. p. 41 – 42

৫২। Ibid. The Gupta Period. p. 45

৫৩। নিবেদিতার চিঠিটির জন্য দ্রষ্টব্য: বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। (২০১০)। *নিবেদিতা লোকমাতা*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ২২১

৫৪। বড়ুয়া, শুভ্রা। (২০০৪)। *মহাবংস*। কলকাতা: গোবিন্দপ্রসাদ বড়ুয়া (ব্যক্তিগত উদ্যোগ)। পৃ. ৮০

৫৫। রায়, অলোক। (১৯৬৯), পরিশিষ্ট – ৪, কলকাতা: *রাজেন্দ্রলাল মিত্র*, বাগর্থ, পৃ. ১৮

৫৬। চৌধুরী, হেমেন্দুবিকাশ। (সম্পাদিত)। (২০০১)। ঘোষ, শঙ্খ। 'অতন্দ্র প্রহরার প্রয়োজন'। *প্রসঙ্গ: আফগানিস্থানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা। পৃ. ৪৯

৫৭। পূর্বোক্ত। বড়ুয়া, দীপককুমার। 'অসহায় মানবজাতি এবং আফগানিস্তানে বুদ্ধ'। পৃ. ৪১ – ৪২

৫৮। খ্রিস্টিয় ৫০ থেকে ৩০০ অব্দ পর্যন্ত গান্ধার শিল্পের বিস্তৃতির কাল। এই শিল্প সমকালীন মথুরা শিল্পকে প্রভাবিত করেছিল, এমনকী অল্প হলেও দক্ষিণে সম্প্রসারিত হয়েছিল। কুমারস্বামী গান্ধার শিল্পের মূল্যায়নে বলেছেন –

> The genius of Hellenistic art is foreign to Indian psychology. Western art at all times tends to representation, Indian to symbolism: the influence of Gandhāra, hardly recognizable after A. D. 300, constitutes an episode, and not a stage in a continuous development.

cf. Coomaraswamy, Ananda K. (1999). Coomaraswamy, Ananda K. (Edited). 'Kusana and Later Andhra Period'. *Introduction to Indian Art*. New Delhi: Munsiram Monoharlal Publishers Pvt. Ltd. p. 36 – 37

গ্রিক শিল্পের অ্যাপোলো মূর্তি থেকে গান্ধার শিল্পী বুদ্ধমূর্তির প্রেরণা পেয়েছিলেন – প্রচলিত এই মতের বিরোধিতা করে কুমারস্বামী বিতর্ক উস্‌কে দিয়েছেন। তাঁর মতে গ্রিকশিল্প ভারতেও কোন অস্তিত্ব রাখতে পারে নি। বুদ্ধমূর্তি খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের আগে থেকেই ভারতবাসীর কাছে পরিচিত ছিল। একই সময়ে হেলেনিস্টিক ধরণের মূর্তি গান্ধারে, অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় ধারার মূর্তি মথুরায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই প্রসঙ্গে কুমারস্বামী একটি সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন –

> It is agreed that the earliest gendhara figures are already stereotyped' and that Buddha figures must have been made as early as the first century B. C. Were then these prototypes of Hellenistic or of Indian origin?

cf. Ibid, p. 37

গ্রিক ও ভারতীয় উৎস সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত ঐতিহাসিক সাম্ভাব্যতার প্রেক্ষিতে তাঁর বক্তব্যটি প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে –

> ... Buddha image wherever found is based on Indian prototypes: just as the images of Bodhisattvas and those of Hindu deities are derived in direct descent from Indian sources.

cf. Ibid, p. 38

গান্ধার শিল্পের নির্দেশন মূলত জালালাবাদ, হাড্ডা, বামিয়ান, সোয়াত উপত্যকা, তক্ষশীলাও পেশোয়ারে পাওয়া গেছে। গান্ধার শিল্পীরা বৌদ্ধ গ্রন্থাদি ও জনশ্রুতি থেকে আহৃত বুদ্ধদেবের জন্ম থেকে মহাপরিনির্বাণকে অজস্র ভাস্কর্যে রূপায়িত করেছিলেন। *জাতক*-এর থেকেও বুদ্ধদেবের জীবনী তাঁদেরকে বেশি আকর্ষণ করেছিল। তাঁদের ভাস্কর্যে নানারকম বোধিসত্ত্ব মূর্তি দেখা যায়। স্তূপগাত্রে স্টাকো অর্থাৎ চূনবালি নির্মিত নানা মনোগ্রাহী মুদ্রা ও ভঙ্গীর বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তি তক্ষশিলা মহাবিহার প্রভৃতিতে সারিসারি স্থাপিত হয়েছিল। গ্রিক ভাস্কর্য শিল্পের চরমোৎকর্ষ মূর্তিগুলিকে অসামান্যতা দান করেছিল। মূর্তিগুলিতে ড্রেপারি বা পরিহিত বস্ত্রভঙ্গগুলির সুনিপুন কাজ ফুটে উঠেছিল। দ্রষ্টব্য: সরকার,

সাধনচন্দ্র। (১৯৯৭)। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ৫৮ – ৫৯

গান্ধার শিল্পকলায় বুদ্ধমূর্তি ভারতীয় যোগীমূর্তির ভাবেই অনুপ্রাণিত। এই বুদ্ধমূর্তি গ্রিক অ্যাপোলোর নতুন পোশাকমাত্র পড়ে সূচিত হয় নি, তা গ্রিক প্রভাবজাত অস্থিচর্মসার বুদ্ধ ছিলেন না। তাই গ্রিক প্রভাবিত মূর্তিতে বুদ্ধের সুবিখ্যাত বত্রিশপ্রকার প্রধান লক্ষণ ও আশিপ্রকার গৌণ-লক্ষণ প্রকাশিত হয় নি। বাহ্য-মাংসল সৌন্দর্যের অনুপাত দৃষ্ট হয়েছে হেলেনিক বুদ্ধমূর্তিতে, অন্যদিকে পরবর্তী গান্ধার শিল্পে ভারতীয় ভাবে জারিত হয়ে দেহের আশ্রয়ে দেহাতীতকে প্রকাশে সক্ষম হয়েছে। লোরিয়েন-টঙ্গাইয়ের ভাস্কর্য (গান্ধার যুগের শেষ পর্যায়ে খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকে) বুদ্ধমূর্তিতে এই অপূর্ব সৌন্দর্য দৃষ্ট হয়েছে; এটি গান্ধার শিল্পকলার স্বর্ণযুগ। মথুরা শিল্পিকে গান্ধার শিল্পের অনেকটা শাখা হিসাবে বিবেচনার প্রবণতা বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে। মথুরায় ভারহুত-সাঁচীর ভারতীয় শিল্পকলার ধারাই বহমান এবং তা একান্তই ভারতীয়। মথুরা শিল্প প্রাথমিকভাবে গ্রিক গঠন রীতির প্রভাব কাটাতে না পারলেও পরবর্তীকালে এটি গান্ধার শিল্পকলার প্রভাবমুক্ত হয়। স্বাতন্ত্রের ভাবনা মজ্জাগত ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে। সারা এশিয়ার শিল্পকলায় যোগীর (বুদ্ধ) রূপকল্পনা ভারতীয় শিল্পকলার এক অতুলনীয় দান। পৃথিবীর কোন শিল্পকলার এই একটি রূপের এত অসীম প্রভাবের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এই মহাযোগী বুদ্ধের রূপাকৃতির আদর্শ মথুরা। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকেই এখনে স্বতন্ত্র ধারায় বিশিষ্ট বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয় যা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধ শিল্পকলায় মথুরাশিল্পের প্রভাব লক্ষনীয়। দ্রষ্টব্য: রায়চৌধুরী, নৃপেন্দ্রনাথ। (১৯৯৫)। রায়, অশোককুমার। (সম্পাদিত)। 'গান্ধার শিল্পকলা ১ ও ২' *নৃপেন্দ্রনাথ রচনাসম্ভার*। কলকাতা: এবং মুসায়েরা। পৃ. ১৪, ১৮ – ২১

৫৯। ঘোষ, নির্ম্মলকুমার। (১৯৯৫)। *ভারত শিল্প*। কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৭৪

৬০। মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। (সম্পাদিত)। (২০১০)। *বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ৫৯৫

৬১। ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ। (২০০৪)। চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি। (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধদের দেবদেবী*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১৪ – ১৫, ১৮

৬২। পূর্বোক্ত। পৃ. ২১, ২৩ – ২৪

৬৩। Bhattacharyya, Binoytosh. (2013). *The Indian Buddhist Iconography*. New Delhi: Cosmo Publications. p. 35

৬৪। ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ। (২০০৪)। চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি। (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধদের দেবদেবী*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৩১, ৩৪ – ৩৫

৬৫। Halder (De), Manikuntala. (Edited). (2007 – 2009). Biswas, Aiswarya. 'On Evolution of Buddha-Concept'. *Centenary Volume of the Department of Pali*. Kolkata: University of Calcutta. p. 200

৬৬। ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ। (২০০৪)। চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি। (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধদের দেবদেবী*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৬৬ – ৬৭

৬৭। Bhattacharyya, Binoytosh. (2013). *The Indian Buddhist Iconography*. New Delhi: Cosmo Publications. p. 190

৬৮। Ibid. p. 192 – 193

৬৯। বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। (২০১০)। *নিবেদিতা লোকমাতা*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৬২

৭০। Coomaraswamy, Ananda K. & Nivedita, Sister. (1967). *Myths of the Hindus & Buddhists*. New York: Dover Publications. INC

৭১। অবনীন্দ্রনাথ গিলার্ডি ও পামার সাহেবের কাছে শিক্ষানবিসী করেন। এই প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর চিত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব দেখা যায়। পরে তিনি নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে ব্রতী হন। তাঁর গুণগ্রাহী ও অনুরাগীদের মধ্যে ছিলেন ঈ. বি. হ্যাভেল, রদেনস্টাইন, আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী, ভগিনি নিবেদিতা, স্টেলা ক্রামারিশ প্রমুখ। 'শিল্পগুরু' অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শেই লুপ্তপ্রায় ভারতীয় শিল্পকলা নবজীবন লাভ করেছিল। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক তাঁকে ডক্টর অব্ লিটারেচার উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় শিল্পকলার অধ্যাপনার পদ 'রানী বাগীশ্বরী অধ্যাপক' পদে তিনি বৃত হন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাগীশ্বরী পদে থেকে তিনি ঊনত্রিশটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলি *প্রবর্তক, বঙ্গবাণী, প্রবাসী* ও *বিচিত্রা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি ১৯৪১ সালে গ্রন্থাকারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। (১৯৯৭)। *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*। *অবনীন্দ্র রচনাবলী*। অষ্টম খণ্ড। কলকাতা: প্রকাশ ভবন। পৃ. ৩৮৭, ৩৯০

৭২। *Hindustan Standard* থেকে উদ্ধৃত এই অংশটির জন্য দ্রষ্টব্য: ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। (১৯৯৭)। *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*। *অবনীন্দ্র রচনাবলী*। অষ্টম খণ্ড। কলকাতা: প্রকাশ ভবন। পৃ. ৩৮৪

৭৩। হালদার, অসিতকুমার। (২০১০)। দাশগুপ্ত, প্রসেনজিৎ। পাল, সৌম্যেন। (সম্পাদিত)। সটীক সংস্করণ। ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। ভূমিকা। *অজন্তা*। কলকাতা: লালমাটি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও বেঙ্কটাপ্পা প্রথমবার (১৯০৯ – ১৯১০) এবং অসিতকুমার হালদার ও সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মিসেস হেরিংহামের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার (১৯১০ – ১৯১১) অজন্তার ছবি নকল করতে গিয়েছিলেন। অসিতকুমার প্রমুখরা 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর পক্ষ থেকে গিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জগদীশচন্দ্র বসু তাঁদের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন।

৭৪। অবনীন্দ্রনাথের মতে, 'মূর্তিপূজা এবং প্রতিমা শিল্পের সূত্রপাতেই বুদ্ধের আবির্ভাব' হয়েছিল। তত্ত্বচিন্তার দিকে ভারতবাসী উপনিষদ একেশ্বরবাদ থেকে শূন্যবাদে তখন পৌঁছলেও শিল্পকলার প্রেক্ষিতে নবীন। পুরনো যুগের বনস্পতি, কল্পতরু, ইন্দ্রবীজ, অশ্বমেধের ঘোড়া, সূর্যরথের একটি চাকা – এরকম নানা প্রাচীনতম কল্পনা নতুনতর প্রতীক পাথরের স্তূপের গায়ে ফুটেছে। বৌদ্ধযুগে পুরাতন যুগের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। অশোকতলায় মায়াদেবীর মূর্তিতে রাবণ রাজার অশোক বনের স্মৃতি দেখা গেছে, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা বুদ্ধের ঘোড়া কণ্ঠককে অনুসরণ করেছেন, ধর্মচক্র একচক্র সূর্যের আকারে

স্তম্ভের ওপরে দীপ্তি পাচ্ছে। প্রাচীনকালের বনস্পতি পূজা বা শ্রীরামের পাদুকা সাঁচিস্তূপের কল্পতরুর ছায়ায় বুদ্ধের চরণচিহ্নকে মনে করায়। নতুন ভাবের নতুন উন্মেষ, নতুন শিল্পের নতুন উন্মেষের লক্ষণ বৌদ্ধশিল্পের প্রথমাবস্থায় সুস্পষ্ট ধরা পড়েছিল। যূপকাষ্ঠের বদলে আর্যেতর অবস্থার দেবতা ও পরে বাহন হওয়া পশুপাখি পাথরের স্তম্ভে শোভা পেয়েছে। পাথরের চৈত্যবিহার গিরিগুহায় কাঠের কারুকার্য দেখা যায়। ইন্দ্রের বজ্র সুগঠিত রূপে বৌদ্ধযুগের অলঙ্কারশিল্পে স্থান পেয়েছে। 'দ্বা-সুপর্ণ' হংসমিথুন হয়ে দরজার উপরে কারুকাজ হয়েছে। অতিপ্রাচীন ঋভুগণের নির্মিত রথচক্র ধর্মচক্র এবং চক্রাকার পদ্মফুলরূপে চৈত্যবিহারে মঠে প্রাসাদে শোভমান হয়েছে। মানুষের আর্য অবস্থা ও তার পূর্বেকার স্মৃতি ও কল্পনা বৌদ্ধশিল্পে ব্যক্ত হয়েছে। ধ্যানী বুদ্ধপ্রতিমাতে আর্যেতর জাতির শিল্পচেষ্টা এবং আর্যজাতির উৎকৃষ্ট চিন্তা এক পরিণয়সূত্রে ধরা পড়েছে। গান্ধার দেশের শিল্পমূর্তি 'কাপড়-পরা কুঞ্চিত কেশ নকল বুদ্ধ' হয়েছে। বহির্ভারতের শিল্পীর গড়া 'আসল বুদ্ধমূর্তি' শ্রীলঙ্কার অনুরাধপুরের অরণ্যে পাওয়া গেছে। কোন সাজসজ্জা, চোখ-ভোলানো চাকচিক্য বা সৌন্দর্য নয় এই মূর্তিতে ঋষিপ্রতিম মহাপুরুষই রূপ পেয়েছেন। 'রূপবান পাথর ধ্যাননিমগ্ন' রূপ পাওয়ায় যুগযুগান্তের আরণ্যক অবস্থার কথা স্পষ্ট হয়েছে।

৭৫। ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। (২০০৭)। *শিল্পায়ন*। *অবনীন্দ্র রচনাবলী*। অষ্টম খণ্ড। কলকাতা: প্রকাশ ভবন। পৃ. ৩৫৪, ৩৫৯

৭৬। আহম্মদ, নাজিমুদ্দীন। (২০০৫)। *সিল্করোডের গৌরবময় প্রত্নসম্পদ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

সপ্তম অধ্যায়

প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত ও 'বৌদ্ধযুগ'-এর নির্মাণ: পুনর্বিবেচনা

ভূমিকা

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি থেকে ভারতীয়দের, বিশেষভাবে বাঙালিদের স্বাতন্ত্র্যের কথা পণ্ডিতদের বক্তব্যে অনেকসময়েই ফুটে উঠেছে। সেই বক্তব্যের মধ্যে অনুযোগ ও অভিযোগের সুরটি প্রধান। এই প্রবণতার দুটি দিক রয়েছে – ক) সাধারণ মানবপ্রকৃতি থেকে ভারতবর্ষীয় মানসপ্রকৃতি ভিন্ন, ইহমুখীনতাকে স্বযত্নে পরিহার করার দিকেই তার ঝোঁক। খ) ইতিহাসবোধের অভাব তাকে জাতীয় ইতিহাস রচনার গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছে। জাতীয় ইতিহাস এমনকি যথার্থ ইতিবৃত্ত না থাকার ফলে তা অন্যান্য দেশের থেকে ইহলৌকিক দৃষ্টিকোণ থেকে পিছিয়ে পড়েছে। তবে এই অভিযোগ সাম্প্রতিক সময়ের প্রেক্ষিতে করা সম্ভব নয়। কারণ, ভারতীয় তথা বাঙালিদের মানসিকতা সাধারণ মানবপ্রকৃতিকে অনুসরণ করে স্বাতন্ত্র্য বর্জনের পথেই চলেছে। আর ইতিহাস চর্চারও একটা ধারার সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু, ঊনবিংশ শতকের প্রেক্ষিতে অনুযোগ ও অভিযোগগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। আমরা সেই সময়ের প্রেক্ষিতে ভারতীয় তথা বাঙালির মানসপ্রকৃতির স্বরূপ ও সংকট বুঝবার জন্য কয়েকটি বক্তব্য উপস্থাপন করছি –

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কাদম্বরী চিত্র' (*প্রদীপ*, মাঘ, ১৩০৬) প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতবর্ষের 'অসামান্যতার' লক্ষণকে চিহ্নিত করে বলেছিলেন যে সকল সভ্যদেশই নিজের সাহিত্যে ইতিহাস ও জীবনী আগ্রহ করে সংগ্রহ করে থাকে, ভারতীয় সাহিত্যে তার চিহ্ন দেখা যায় না; যদিওবা 'ভারতসাহিত্যে ইতিহাস-উপন্যাস' থাকে, তার মধ্যে 'আগ্রহ' নেই।

প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে, ইহজীবনের প্রতি ভারতীয় মনের বিমুখতার কারণেই ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাস নেই। ফলে, ভারতীয় মন ইহজীবনের কোনো বিশেষ অভিপ্রায়কে সার্থক করে তুলবার উদ্দেশ্যে কখনোও একাগ্র বা ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। কালে কালে ভারতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি এর অভাবে নিজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে বা 'জাতীয় অভিপ্রায়গত যোগসূত্রের অভাবে' বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি মানুষের মনে বা স্মৃতিতে একৈক ইতিহাসরূপে গ্রথিত হওয়ার সুযোগ পায় নি।[১]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (*বঙ্গদর্শন*, মাঘ, ১২৮১) প্রবন্ধে ভারতীয়দের ইতিহাস হীনতার জন্য খেদ প্রকাশ করেছেন। ভারতীয়রা 'ঘোরতর' দেবভক্ত, 'কীর্তি'সচেতন 'গর্বিত' জাতি নয় বলে তাদের ইতিহাস নেই। তিনি লিখেছেন –

> জাতীয় গর্ব্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। ... সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙালি।

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন যে রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আর্থিক বিন্যাস প্রভৃতি সমস্ত কিছুই মানুষ গড়ে তোলে – এই মানুষের ইতিহাসই যথার্থ ইতিহাস। মানুষের কর্মগুলি অন্যোন্যনির্ভর; একটি কর্মের সঙ্গে অপরাপর কর্মকে যুক্ত করে দেখলে তবেই তার সম্পূর্ণ রূপ ও প্রকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। ইতিহাস চেতনার মূলে রয়েছে সামাজিক স্থিতি ও গতির চেতনা। এই চেতনা প্রধানত পরম্পরা ও পরিবর্তনের। এই চেতনা একান্তই কালচেতনা নির্ভর, বস্তুত কালের চেতনা ব্যতীত পরম্পরা-পরিবর্তন চেতনার কোন অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। ভারতীয় কালচেতনার ধারাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় – ক) প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, খ) প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃতি এবং গ) ইহুদি-খ্রিস্টিয় সংস্কৃতি। পরম্পরাগত ভারতীয় বা ব্রাহ্মণ্য চেতনায় কাল শাশ্বত, অবিভাজ্য, অপরিমেয়, অক্ষয়, অব্যয়, সূচনা-সমাপ্তিহীন ইন্দ্রিয়বোধাতীত ধারণা। এই কালচেতনা একান্তই বৌদ্ধিক, বিশুদ্ধ জ্ঞানগত, অপার্থিব; যার সঙ্গে পরম্পরা-পরিবর্তন চেতনার তথা ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নয়। অন্য কালচেতনা একান্ত পার্থিব, পরিমেয়, বিভাজ্য। পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদিতে এই কালচেতনার পাওয়া যায়। মহাকাল চেতনায় মহাযুগ ছোট্ট বৃত্ত এবং এর শেষে মহাপ্রলয়। তারপর নূতন মহাযুগের সূচনা। এর নিরবিচ্ছিন্ন গতির প্রকৃতি যথাযথ বৃত্তায়িত নয়, গতিশীল বৃত্তের মত। ভারতীয় বৌদ্ধচেতনায় কালের গতির ধারণা প্রায় এক, বৃত্তায়িত না হয়ে অবিরাম সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো খেলানো। ব্রাহ্মণ্য ধারণার মতো এখানেও অতীত স্বর্ণযুগের কল্পনা রয়েছে, যে স্বর্ণযুগ ধীরে ধীরে অধর্ম ও দুর্নীতি দ্বারা আচ্ছন্ন হতে হতে বর্তমানের কৃষ্ণযুগে পরিণত হয়, তারপর আবার ক্রমান্বয়ে নূতন স্বর্ণযুগের দিকে তরঙ্গের উত্থান ঘটে। পরম্পরগত ভারতীয় মানসে কালের বৃত্তায়িত গতি হওয়ায় পশ্চিমীসুলভ প্রগতির ধ্যানধারণা নেই। কিন্তু একথা স্মরণে রাখতে হবে যে আধুনিক ভারতীয় মানস পাশ্চাত্য কালভাবনা, প্রগতি ভাবনা দ্বারা প্রায় আচ্ছন্ন।[২]

বাংলার ইতিহাস রচনার সূচনা-পর্ব

বাংলার যথার্থ ইতিহাস রচনার সূচনা-পর্ব রূপে ১৮১৪ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দকে চিহ্নিত করা যায়। রামমোহন রায়ের স্থায়ীভাবে কলকাতায় বাসের সময়কালকে (১৮১৪) বাঙালির মনে ঐতিহাসিক চেতনার সূচনাকালরূপে গণ্য করা যায়। জাতীয় চিত্তে ইতিহাসের প্রেরণা দুইভাবে আসে – ক) যখন কোন জাতি ঐক্যবদ্ধ জীবনে শক্তিকে উপলব্ধি করে তাকে নানা সাধনার মধ্যে কর্মের রূপ দেয়, তখন সে ওই উপলব্ধিকে তথা সাধনলব্ধ ফলকে ইতিহাসে প্রকাশ করে। তখনকার ঐতিহাসিক চেতনাসঞ্জাত লিখিত ইতিহাসই যথার্থ ইতিহাস অর্থাৎ 'জাতীয় জীবনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ'। খ) কোন জাতি দীর্ঘকালের সুপ্তির অবসানে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে কর্মসাধনায় তৈরি হলে তার অতীত ইতিহাস রচনার জন্য ব্যকুলতা প্রকাশিত হয়। কারণ, অতীতের ইতিহাস অনাগত কালের ইতিহাস রচনার প্রেরণা ও শক্তির প্রধান উৎস। বাঙালির ইতিহাস রচনার প্রয়াস এই দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্গত। সূচনা পর্বের শেষের দিকে বাঙালি কর্মজীবনে উপনীত হয়ে শক্তিসংগ্রহের ব্যাকুল আগ্রহে অতীতমুখী হয়।[৩]

ক) পাশ্চাত্য গবেষকদেরদের ইতিহাস চর্চা

ওয়ারেন হেস্টিংসের অনুপ্রেরণায় উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে The Asiatic Society নামক প্রাচ্য বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন। সেইদিন থেকে বাংলা তথা ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তচর্চার সূচনাকাল বলে ধরা যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যায়ে ফরাসি-বিপ্লবের ফলে যে সময়ে ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন যুগ সূচিত হয়েছিল, ঠিক সে সময়েই এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে চার্লস উইলকিন্স, উইলিয়ম জোন্স, এইচ. টি. কোলব্রুক প্রমুখ মনীষীদের প্রবর্তনায় ভারতীয় সংস্কৃতির আবিষ্কারের ফলে বাংলায় এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। অতীত অনুসন্ধিৎসা এর গুরুত্বপূর্ণ দিক। চার্লস স্টুয়ার্টের *History of Bengal from the first Mohammedan invasion until the virtual conquest of that country by the English, A.D. 1757* গ্রন্থটি আধুনিক কালপর্বে রচিত বংলার প্রথম ইতিবৃত্ত। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স দিনাজপুরের অন্তর্গত বাদালের গড়ুরস্তম্ভে খোদিত লিপির অর্থ উদ্ধার করেছিলেন। এইচ. টি. কোলব্রুক *Asiatic Researches* (Vol. I)-এ (১৭৮৮) লিপিটির ইংরেজি মর্মানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। *Asiatic Researches*-এ প্রকাশিত 'Enumeration of Indian Classes' (১৭৯৮) প্রবন্ধে তিনি বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করেছিলেন। তিনি বাংলা মুদ্রণের

পথপ্রদর্শক, বাংলার পুরাতত্ত্বসাধনার সূত্রধর, ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা রূপে স্বীকৃত। তিনি *Asiatic Researches*-এ (১৮০৭) রণবঙ্গমল্লদেবের ময়নামতী লিপি (দিনাজপুর জেলা) এবং তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের আমগাছি-লিপি (দিনাজপুর জেলা) মূল সংস্কৃত পাঠ ও ইংরাজি অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। বাদাল গরুড় স্তম্ভলিপি এবং আমগাছি-লিপি থেকেই বাংলার পালরাজবংশের ইতিহাসের মূল কাঠামোটি জানতে পারি। শুধু রাজকীয় ইতিহাস নয়, প্রাচীন বাংলার জনপদ পরিচয় তথা সামাজিক ইতিহাসের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। আশ্চর্যের বিষয় সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে তারপরও একখানি পূর্ণাঙ্গ বাংলার ইতিবৃত্ত রচিত হয়নি।[৪]

খ) বাঙালির ইতিহাস চর্চা

ঊনবিংশ শতকের মুখ্যত দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় শতবর্ষব্যাপী ইতিহাস, ইতিবৃত্ত, সাহিত্যের ইতিহাস, সাহিত্যেতিহাস চর্চায় বাঙালি চিন্তকদের মুখ্য ভূমিকাকেই আমরা আলোচনার আওতায় রেখেছি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমগ্র বিষয়টির ব্যাপক রূপান্তর ঘটছে যা স্বতন্ত্র অভিনিবেশের বিষয় যা আমাদের মূল গবেষণা প্রকল্পের বহির্ভূত, তাই সেই অংশটি আমাদের আলোচনায় রাখা হল না।

ঐতিহাসিক চেতনার মধ্যে জাগ্রত জাতির ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। সুপ্ত জাতির যেমন ভবিষ্যতের ইতিহাস সৌধ গড়বার ঈপ্সা থাকে না, তেমনি অতীতের ইতিবৃত্তের প্রেরণা সন্ধানের চেষ্টাও দেখা যায় না। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের চেষ্টায় বাংলা ও ভারতবর্ষের যে ইতিহাস রচনার প্রয়াস দেখা যায় তার প্রেরণা হিসাবে জাতীয় গৌরববোধের থেকেও বিশুদ্ধ জ্ঞানকাণ্ডচর্চা বেশি ক্রিয়াশীল ছিল। ইংরেজিতে লিখিত হওয়ায় সাধারণ বাঙালি বা দেশবাসীর পক্ষে নিজেদের ইতিহাসই জানবার উপায় ছিল না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দেশী মনীষী দেশীয় ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত লিখবার অধিকারী হলেও তাঁরা সেইদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেননি; হয় তাদের কাজ খণ্ডিত বা সংক্ষিপ্ত হয়েছে, নতুবা হয়েছে ইংরেজি ভাষায় যা দেশীয় মানুষদের বোধ বা চর্চার ক্ষেত্রে সাধ্যের বাইরে ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধে (*বঙ্গদর্শন,* বৈশাখ, ১২৭৯) ভারতের কলঙ্কের অন্যতম কারণ রূপে 'হিন্দু ইতিবৃত্ত' না থাকার কথা বলেছেন। তিনি 'ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার' থেকে 'স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা' ধারণা নিয়ে হিন্দুর দুটি কর্তব্য নিরূপণ করেছেন – সকল হিন্দুকে একমত হয়ে একসঙ্গে কাজ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অন্যজাতির অমঙ্গল করেও আত্মমঙ্গল করতে হবে। তিনি 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধে (*প্রচার,* শ্রাবণ, ১২৯১) বলেছেন, ভারতের কলঙ্ক আর বাংলার কলঙ্ক একই। উক্ত দুটি প্রবন্ধে বাঙালির বাহুবলের দীনাবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অতীতের বলবীর্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। 'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধে (*বঙ্গদর্শন,* শ্রাবণ, ১২৮১) তিনি প্রশ্ন তুলেছেন – 'বঙ্গদেশের পূর্ব্বগৌরব কোথায়?' যদিও স্বপ্নলব্ধ, তবুও তিনি বাঙালির বাহুবল লাভের ক্রমনির্ধারণ করেছেন – যদি কখনো (ক) বাঙালির কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (খ) বাঙালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (গ) সেই কারণে লোকে প্রাণপণ করতে প্রস্তুত হয়, (ঘ) সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙালির অবশ্যই 'বাহুবল' হবে। বাঙালির এরকম মানসিক অবস্থা যে কোন সময় ঘটতে পারে। তিনি 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে (*বঙ্গদর্শন,* অগ্রহায়ণ, ১২৮৭) বাঙালিকে 'মানুষ' ও 'ভরসা' করার স্বার্থে বাংলার ইতিহাসের দাবি জানিয়েছিলেন। তিনি বাংলার ইতিহাস লিখবার জন্য দীক্ষিত-অদীক্ষিত সকলকেই আহ্বান জানিয়েছেন –

> তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। ... আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যত দূর সাধ্য, সে এত দূর করুক; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্ম্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস সন্ধানে সকলকে আহ্বান জানিয়েই নিজে নিরস্ত থাকেননি। তাঁর 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' (*বঙ্গদর্শন,* ভাদ্র, ১২৮০; অগ্রহায়ণ ১২৮০) প্রবন্ধে যে পুরাবৃত্ত অনুসন্ধিৎসা সূচিত হয় তার ধারা পরবর্তীকালের অনেক প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর 'বাঙ্গালির বাহুবল' (*বঙ্গদর্শন,* মাঘ ১২৮১), 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (*বঙ্গদর্শন,* অগ্রহায়ণ, ১২৮৭), 'বাঙ্গালির উৎপত্তি' (*বঙ্গদর্শন,* পৌষ ১২৮৭ – জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮), 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' (*বঙ্গদর্শন,* জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯), 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' (*প্রচার,* শ্রাবণ, ১২৯১) প্রবন্ধগুলিতে পুরাবৃত্ত সম্পর্কে স্বাজাত্যবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালি তথা ভারতবাসীর কলঙ্ক সম্পর্কে সচেতন করে তা মোচনের উপায় নির্ধারণ এবং অনাগতকালে বাঙালির গৌরব অর্জনে প্রেরণাদান করা তাঁর পুরাবৃত্ত সন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল।

গ) সাময়িকপত্র ও গ্রন্থে ইতিহাস চর্চা

বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস, ইতিবৃত্ত, সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্যেতিহাসচর্চায় সাময়িকপত্র অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কালীপ্রসাদ ঘোষের ‘On Bengali Works and Writers’ (*Literary Gazette*; 2, January, 1830) প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর রচনাটির সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ‘বাঙ্গালা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারক’ *সমাচার দর্পণ*-এ প্রকাশিত হয়েছিল। মার্সম্যানের *History of Bengal* (১৮৩৯) অবলম্বনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর *বাঙ্গালার ইতিহাস,* দ্বিতীয় ভাগ (১৮৪৮) রচনা করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত সর্বপ্রথম তাঁর *সংবাদ প্রভাকর*-এ (আশ্বিন, ১২৬০ – মাঘ, ১২৬১) অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য – কবিওয়ালা, পাঁচালীকার, আখড়াই গান, টপ্পা গান, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সম্বন্ধে ধারাবাহিক নিবন্ধ ও উক্ত কবি-গায়কদের গানের নমুনা মুদ্রিত করেন। তিনি ‘কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত’ (১৮৫৫) রচনা করেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বাঙ্গালা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ’ (১৮৫২) ও বিদ্যাসাগর ‘সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব’ (১৮৫৩) প্রকাশ করেন। মার্সম্যানের *History of Bengal* (১৮৩৯) অবলম্বনে রামগতি ন্যায়রত্ন সেনবংশের সময়ে থেকে আলিবর্দির শাসনকাল পর্যন্ত *বাঙ্গালার ইতিহাস,* প্রথম ভাগ (১৮৫৯) রচনা করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বেণ্টিঙ্কের পরবর্তীকাল থেকে বাংলার ছোটলাট লর্ড বীডনের (১৮৬২ – ১৮৬৭) শাসনকাল পর্যন্ত বাংলার ইতিবৃত্ত সংকলন করেন যা তাঁর স্বাধীন চেষ্টা ও চিন্তার পরিচায়ক, তৃতীয় ভাগের প্রথমাংশ *শিক্ষাদর্পণ*-এ এবং শেষাংশ *এডুকেশন গেজেট*-এ (১৮৬৫ – ১৮৬৯) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্র মিত্র *কবিকলাপ* (১৮৬৬), হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের *কবিচরিত* (প্রথম খণ্ড, ১৮৬৯), মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের *বঙ্গভাষার ইতিহাস* (প্রথম ভাগ, ১৮৭১) ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘Bengali Literature’ (*Calcutta Review*, 1871) এই সময়ের উল্লেখযোগ্য রচনা। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত রামগতি ন্যায়রত্নের *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৭৩) গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনি চারটি পরিচ্ছেদ ও তিনটি কালে বিষয়টি ভাগ করেছেন – ১) আদ্যকাল, ২) মধ্যকাল ও ৩) ইদানিন্তন কাল।[৫]

বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির যথাযথ আলোচনা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ* এবং *রহস্য সন্দর্ভ*-এ প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শন* এক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। রাজনারায়ণ বসুর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরে দেওয়া বক্তৃতাটি 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য' (১৮৭৮) প্রকাশিত হয়েছিল। রমেশচন্দ্র দত্তের *The Literature of Bengal* (১৮৭৭)-এ বাংলা সাহিত্যের তিনটি যুগবিভাগ করে গ্রন্থ-পরিকল্পনা সম্পর্কে লেখা হয়েছিল –

> … on the national literature … First, the period of lyrical poetry, extending from the twelfth to the end of the fifteenth century of the Christian era … Second, the period of classical influence, extending from the beginning of the 16th Century to the end of the eighteenth century … Third, the period of European influence, being the period in which we are living, and commending with the nineteenth century.[৬]

সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ব্যাপক পটভূমিকায় পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত এই গ্রন্থে গ্রন্থকার তৎকালীন সমাজ ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ দেখিয়েছেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে রমেশচন্দ্রের *The Literature of Bengal*–এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। জাতীয়তাবাদী আদর্শের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে তিনি *বাংলার ইতিহাস* (১৮৯২) গ্রন্থে শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, উপরন্তু 'বাংলার জাতীয় জীবনেরই ইতিহাস' চিত্রিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।[৭]

জাতীয়তাবাদী আদর্শের ধারায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স্কুলপাঠ্য *প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস* (১৮৭৪), গঙ্গাচরণ সরকারের 'বঙ্গ সাহিত্য ও বঙ্গভাষা' (১৮৭৯) প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আধুনিক কালের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা সম্বলিত 'বাঙ্গালার সাহিত্য' (*বঙ্গদর্শন*, ফাল্গুন, ১২৮৭) প্রবন্ধটি সাবিত্রী লাইব্রেরির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত ও *বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য* (১৮৮১) নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর *Verncular Literature of Bengal* (১৮৯১) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শোভাবাজারের বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুরের জমিদারবাড়িতে লিওটার্ড ও ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর উদ্যোগে স্থাপিত 'Bengal Akademy of Literature' (২৩ জুলাই, ১৮৯৩) সাহিত্যসভার নাম বদলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ (১৭ বৈশাখ, ১৩০১) এবং এর মুখপত্র *The Bengal of Literature*-এর নাম বদলে *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* রাখা হয়েছিল। দীনেশচন্দ্র সেন *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*-এ (১৮৯৬) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে 'হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ', 'চৈতন্য যুগ', 'সংস্কার যুগ', 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ' এবং 'ইংরেজ যুগ' – এই কয়টি যুগে বিভক্ত করেছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের *সিরাজদ্দৌলা* (১৮৯৭) এবং সম্পাদিত *ঐতিহাসিক চিত্র* (১৮৯৯) ত্রৈমাসিক

পত্রিকাটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। রজনীকান্ত গুপ্তের বিদ্যালয়পাঠ্য ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থ *বাংলার ইতিহাস* (১৮৯৯) হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ যুগবিভাগ অনুযায়ী লিখিত হয়েছিল।[৮]

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল* (১৯০১), দীনেশচন্দ্র সেনের *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,* প্রথম সংস্করণ (১৯০১) এবং যদুনাথ সরকারের *India of Aurangzib* (১৯০১) একই বছরে প্রকশিত হয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (১৯০৪) বাঙালির জাতীয় জীবনের প্রায় এক শতাব্দীকালের 'আধুনিক বাংলার প্রথম ও শেষ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস'। এই গ্রন্থটির পরিপূরক গ্রন্থ রূপে শিবনাথের *আত্মচরিত* (১৯১৮) এবং *History of the Brahmo Samaj* (১৯১১ – ১৯১২) গুরুত্বপূর্ণ। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত *ঐতিহাসিক চিত্র* সাময়িকপত্র উঠে যাওয়ার পাঁচ বছর পর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে নিখিলনাথ রায়ের সম্পাদনায় দ্বিতীয় পর্যায় সূচিত হয়েছিল। চার্লস স্টুয়ার্টের *History of Bengal* (১৯০৪), আবদুস্ সালাম-কৃত ইংরেজি অনুবাদে মধ্যযুগের বাংলার ইতিবৃত্ত *Riyaz-us-Salatin* (১৯০৪), নীলমণি মুখোপাধ্যায়ের *সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালার ইতিহাস* (১৯০৪), রামপ্রাণ গুপ্তকৃত সটীক বঙ্গানুবাদ *রিয়াস-উস-সালাতিন* (১৯০৫), অক্ষয়কুমার মৈত্রের রচিত *মীরকাশিম* (১৯০৫) প্রভৃতি ইতিহাসচর্চাকে পরিপুষ্টি দিয়েছিল। নিখিলনাথ রায় সম্পাদিত *ঐতিহাসিক চিত্র*-র তৃতীয় পর্যায় (১৯০৭) সূচিত হয়েছিল। বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস রূপে পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত* (প্রথম ভাগ) (১৯০৭), রজনীকান্ত চক্রবর্তীর *গৌড়ের ইতিহাস* (১৯১০) প্রকাশিত হয়েছিল। বাঙালির ইতিহাসের উপাদান সংকলন ও ধারাবাহিক তথ্যানুসন্ধানের অভিপ্রায়ে শরৎকুমার রায়ের আনুকূল্যে রাজশাহিতে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি (১৯১০) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার মুখপত্রটি বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিতম্*-কে (১৯১০) আশ্রয় করে পাল রাজত্বের ইতিবৃত্ত সংগঠনের প্রথম প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ *History of the Bengali Language and Literature* (১৯১১) প্রকাশিত হয়েছিল। রমাপ্রসাদ চন্দের *গৌড়রাজমালা* (১৯১২) নিরপেক্ষ উদার দৃষ্টিতে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত বাংলার ইতিহাস। অক্ষয়কুমার মৈত্রের *গৌড়লেখমালা*-কে (১৯১২) প্রাচীন বাংলার পাল রাজত্বকালের তাম্রশাসনাদি লেখ-সংগ্রহ বা ইতিহাসের মূল উপাদান সংকলনের প্রথম সার্থক প্রয়াসের ফল রূপে গণ্য করা যায়।[৯]

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের *The Palas of Bengal* (১৯১৫) এবং *বাঙ্গালার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (১৯১৫) এবং দ্বিতীয় খণ্ড (১৯১৭) পুরাবৃত্ত চর্চায় একটি নতুন পর্যায়ের সূচনাকারী গ্রন্থ। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal* (১৯২২), কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মধ্যযুগে বাঙ্গালা* (১৯২৩), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ *বাঙ্গালার ইতিহাস* প্রথম সংস্করণ (১৯২৩), রমেশচন্দ্র মজুমদারের *Early History of Bengal* (১৯২৪) ইতিহাসচর্চার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এফ. জে. মোশহানের *Early History of Bengal* (১৯২৫)-এ মৌর্য-রাজত্বকালের বাংলার বিবরণ এবং ননীগোপাল মজুমদারের *Inscriptions of Bengal* (১৯২৯)-এ চন্দ্র, বর্মণ ও সেন রাজত্বকালের লেখসমূহের মূলপাঠ, অনুবাদ ও ভাষ্য রচিত হয়েছিল। হেমচন্দ্র রায়ের *Dynastic History of Northern India* প্রথম খণ্ডের (১৯৩১) ষষ্ঠ অধ্যায়ে গুপ্তোত্তর কাল থেকে তুর্কিবিজয় পর্যন্ত বাংলার রাজবংশগুলির ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক অনুসরণ করা হয়েছিল। পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের *কামরূপশাসনাবলী* (১৯৩১) ও কনকলাল বড়ুয়ার *Early History of Kamrupa* (১৯৩১) গ্রন্থ দুটিতে বাংলা ও আসামের পারস্পরিক ঐতিহাসিক সম্পর্কের বিষয় আলোচিত হয়েছে। রাধাগোবিন্দ বসাকের *History of North Eastern India* (১৯৩৪) গ্রন্থে গুপ্ত রাজত্বকালের সূচনা থেকে পালবংশের অভ্যুদয় পর্যন্ত (৩২০ – ৭৬০) ইতিহাস রয়েছে। বাংলার পাশাপাশি কামরূপ, নেপাল, মগধ, উড্র প্রভৃতি প্রতিবেশী জনপদগুলির ইতিবৃত্ত অনুসরণে বাংলার পুরাবৃত্তকে বৃহত্তর পটভূমিকায় দেখার চেষ্টা রয়েছে।[১০]

দীনেশচন্দ্র সেনের *বৃহৎ-বঙ্গ* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৩৫) আদিকাল থেকে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলার সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। ১৯১৬ সালে বাংলার লাট লর্ড রেনাল্ডসের প্রাইভেট সেক্রেটারি ডব্লিউ. আর. গুরলে বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংকলনের উদ্দেশ্যে লেখক-সঙ্ঘের পরিকল্পনা করলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এই পরিকল্পনার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ' অংশটি দীনেশচন্দ্র সেন *বৃহৎ-বঙ্গ* নামে প্রকাশ করেন।[১১] দীনেশচন্দ্র রচিত *The Vaishnava Literature of Medieval Bengal* (১৯১৭), *Chaitanya and His Companions* (১৯১৭), *The Folk Literature of Bengal* (১৯২০) ইত্যাদি বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতিচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ। রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাঙ্গালার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৩০) পুরাবৃত্তচর্চায় নতুন গ্রন্থের মর্যাদার অধিকারী। প্রমোদলাল পালের *Early History of Bengal*, প্রথম খণ্ড (১৯৩৯) ও দ্বিতীয় খণ্ডে

(১৯৪০) স্বকীয়তা ধরা পড়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাগোবিন্দ বসাক, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্তৃক সম্পাদিত সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিতম্* (১৯৩৯) দৃষ্টান্তমূলক গবেষণাগ্রন্থ। আশুতোষ ভট্টাচার্যের *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* (১৯৩৯) মঙ্গলকাব্য অবলম্বনে বাংলার সমাজ ও লৌকিক ধর্মের ইতিবৃত্ত, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস এবং সাহিত্যের সমবায়ে বর্ণিত হয়েছিল। কালক্রমের পৌর্বাপর্ব বজায় রেখে সাহিত্যের ইতিহাসকে জাতীয় ইতিহাসের ভূমিকার উপরে স্থাপন করার অসামান্য প্রয়াস ধরা পড়েছিল সুকুমার সেনের *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ডে (১৯৪০)। তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৪৩), *প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী* (১৯৪৩) এবং *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী* (১৯৪৫), *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড (১৯৪৬) গ্রন্থগুলি সারস্বত চর্চায় অপরিহার্য। অন্নদাশঙ্কর রায় এবং লীলা রায় লিখিত প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতি অল্প পরিসরে *Bengali Literature*-এ (১৯৪২) ধরা পড়েছে । বাংলার ইতিহাস সংগঠনের পর্যায়ের উপাদানগ্রন্থ রূপে বিনয়চন্দ্র সেনের *Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal* (১৯৪২) উল্লেখযোগ্য। বাংলার তুর্কি-পূর্ব যুগের প্রথম সর্বাঙ্গীণ ও সম্পূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ রমেশচন্দ্র মজুমদারের *History of Bengal*, প্রথম খণ্ডের (১৯৪৩) উল্লেখ করা যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (প্রথম খণ্ড, ১৯৩২; দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৩৩; তৃতীয় খণ্ড, ১৯৩৫) বাংলা দেশের ঊনবিংশ শতকের ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চার অমূল্য উপকরণ গ্রন্থ রূপে সর্বজন স্বীকৃত। রমেশচন্দ্র মজুমদারের *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৯৪৬) তুর্কি-পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। জে. সি. ঘোষ প্রণীত *Bengali Literature* (১৯৪৮) গ্রন্থে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে সাহিত্যকে জাতীয়জীবন সম্পৃক্ত করে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছিল। যদুনাথ সরকার সম্পাদিত *History of Bengal*, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৪৮) গ্রন্থে কেবল রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্ত রয়েছে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত নেই। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ লাহার সম্পাদনায় *Indian Historical Quarterly* (১৯২৫), *Indian Research Institute*-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র *Indian Culture* (১৯৩৪) প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলার ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ (১৯৫০) ও তার ত্রৈমাসিক মুখপত্র *ইতিহাস*-এর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।[১২] বাংলার প্রাচীন ইতিবৃত্ত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে চরম পরিণতি হিসাবে নীহাররঞ্জন রায়ের *বাঙ্গালার ইতিহাস*, আদিপর্ব (১৯৫০) অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী।

ঊনবিংশ শতকে বাঙালির ইতিহাস চর্চার বৈশিষ্ট্য

ঊনবিংশ শতকের বাঙালি ইতিবৃত্তকার, ঐতিহাসিক, সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের রচনার উৎস ছিল স্বাজাত্যবোধ। ভারতের বা বাংলার অতীত গৌরবময় ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণই এগুলির মুখ্য অভিপ্রায় হওয়ার ফলে ঐতিহাসিকের নৈর্ব্যক্তিক সত্য অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা অনেকটাই আবেগলগ্ন হয়ে পড়েছিল। লেখকদের ব্যক্তিগত রুচিবোধ ও প্রবণতাই সাময়িকপত্র ও গ্রন্থগুলির ক্ষেত্রে নির্ণায়কের কাজ করেছিল। বিংশ শতকের সূচনাপর্ব থেকেই একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল যা প্রথম দশকের পর থেকে আরো সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল, আর আবেগের স্থলে যুক্তিগ্রাহ্যতা এসে গোটা ইতিহাসচর্চা ধারার অভিমুখকে বদলে ফেলেছিল। ইতিবৃত্তের মধ্যে থাকা ইতিহাসকে যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ইতিহাসের সঙ্গে নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা, নানা বিচার-বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ হয়ে তা সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতি বিদ্যাচর্চার রূপ ধারণ করেছিল।

বাংলা ভাষায় ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, সাহিত্যেতিহাসচর্চায় একটা বিবর্তন লক্ষ করা গেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণে যুগবিভাগ করার প্রবণতা ছিল। সেই প্রবণতা ধীরে ধীরে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষ বা সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধানের দিকে মোড় নিয়েছে। যদিও যুগ বিভাগ করে আলোচনা যে একেবারেই থেমে যায়নি, কিন্তু সামাজিক জীবনের উপর গুরুত্বের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলার জনসমষ্টির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বর্তমান রূপ কী বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সংঘটিত হয়েছে তা এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে। রাষ্ট্র, দৈনন্দিন জীবন, শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-কর্মের সঙ্গে প্রবহমান জীবনধারা, বৃহত্তম সমাজের সঙ্গে কার কী সম্বন্ধে তার বিচারও এখানে করা হয়েছিল।

প্রাচীন বাংলার প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের সূত্র স্বভাবতই চলে এসেছিল। ইতিহাসকার, ইতিবৃত্তকার, সাহিত্যের ইতিহাসকার বা সাহিত্যেতিহাসকার যিনিই প্রাচীন বাংলা বা ভারতের অতীতকে উপস্থাপিত করেন, তিনি কার্যত অতীতের ইতিহাসের নবরূপায়ণ বা পুনর্নির্মাণ ঘটান। ঊনবিংশ শতকের ‘বৌদ্ধ ভারত’ বা ‘বৌদ্ধ বাংলা’-র চর্চাও তাই সামগ্রিক অর্থে পুনর্নির্মিত ও চিন্তকদের ভাবনাজাত ফসল। এই ভাবনাকে বুঝে নিতে ঊনবিংশ শতকের সাময়িকপত্র ও পুস্তকগুলি সহায়ক হবে।

নীহাররঞ্জন রায় 'উনিশশতকী বাঙালির পুনরুজ্জীবন: পুনর্বিবেচনা' প্রবন্ধে (*জিজ্ঞাসা,* বৈশাখ, ১৩৮৭) বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস ভাবনার ধরণ-ধারণের অনুসন্ধান প্রসঙ্গে আমাদের পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী হওয়ার কথা বলেছেন। ইউরোপে বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতকের তিনশতকব্যাপী জীবনান্দোলন রেনেসাঁস। পাশ্চাত্যের অনুকরণে প্রায় তিন শতক পরে বাংলা দেশেও সমান্তরাল তথাকথিত 'পুনরুজ্জীবন' সূচিত হয়েছিল যাদের ভাবনাগত মিলন কখনোই সম্ভব ছিল না। পরানুকরণের সূত্রেই পাশ্চাত্যের রেনেসাঁস আমাদের ঊনবিংশ শতকের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে তুলিত হয়েছিল, কিন্তু এই তুলনা শুধু 'নবজন্ম'-এর সামান্যার্থ ছাড়া অসার্থক, অনৈতিহাসিক বলে নীহাররঞ্জন রায় মনে করেছেন। পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের সূচনায় প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিল্পাদর্শ ও সৌন্দর্যবোধ, ভাষা ও সাহিত্য, জীবনচর্যা ও জীবনমূল্যবোধ – প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয়ের ও পুনঃপ্রবর্তনার কোন উদ্দেশ্যই লক্ষিত হয় না; তা অনেক পরে, হিন্দুমেলা (১৮৬৭) প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু স্বাজাত্যবোধের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছিল। রামমোহন বেদান্ত-ধর্মানুমোদিত একেশ্বরবাদের পুনঃপ্রবর্তন চেয়েছিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা ছিল ঔপনিবেশিক ব্রহ্মবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। প্রাচীন ভারতবর্ষের অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধাবনত থাকলেও প্রাচীন ভারতের জীবন ও সাংস্কৃতিক আদর্শের পুনঃপ্রবর্তনায় তাঁর আগ্রহ ছিল না। বিদ্যাসাগর সাংখ্য, বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন মনে করতেন এবং ওইসব পুথিপত্র গঙ্গায় বিসর্জন দিলে কারো কোনো ক্ষতি হবে বলে মনে করতেন না। যুক্তিসর্বস্ব বিজ্ঞানমনস্ক 'প্রায় নাস্তিক' ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে রিভাইভ্যাল প্রীতি কার্যকর ছিল। এঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথই ছিলেন একমাত্র জন যাঁর প্রাচীন ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচর্চা ও সেই চর্যাশ্রিত জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধানুরাগ ছিল। তিনি তা প্রিয়জনদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে সচেষ্টও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর জীবনের বিশেষ পর্বে আনুমানিক ১৮৮৭ – ১৮৮৮ থেকে ১৯০১ – ১৯১০ কালপর্বে বিষয়টিকে কামনার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন। প্রাচীন ভারতের তপোবনাদর্শ, ক্ল্যাসিক্যাল ভারত অর্থাৎ সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত সাহিত্য, কালিদাস, বৌদ্ধসংস্কৃতির আদর্শ ও আবহকে সঞ্চারিত করতে রবীন্দ্রনাথ সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৭০-এর পর থেকে বাঙালি হিন্দু স্বাজাত্যবোধের সঙ্গে এসেছিল আধুনিকীকরণ – স্তিমিত মোহাবিষ্ট জীবনের পুনরুজ্জীবন।

এই আন্দোলন ছিল কলকাতা-কেন্দ্রিক। প্রধানত ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ, শিক্ষিত হিন্দু বঙ্গসন্তানদের উৎসাহ ও আগ্রহেই কলকাতায় নগরনির্ভর, ভূমিসত্ত্বভোগী ও বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত মহলে ইংরেজি ভাষা ও শিক্ষা প্রবর্তিত হলে তা ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণিরও প্রসার হয়েছিল। পুনরুজ্জীবনের স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থব্যবস্থার বিরোধ তলে তলে ছিলই এবং সে বিরোধ বারে বারেই পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনকারীদের নানা সংস্কার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করেছিল। এছাড়াও, সম্প্রসারমাণ মধ্যবিত্তেরা সকলেই নূতন জীবনবাদের সমর্থক ছিলেন না। পরম্পরাসক্ত নব্য-মধ্যবিত্তদের থেকেই পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের সবচেয়ে বড় বাধা ও বিরোধ এসেছিল। ঊনবিশ শতক তো বটেই, বিংশ শতকের প্রথম পর্বেও পরম্পরাগত বাঙালি-হিন্দু সমাজ কাঠামোর বিশেষ অদলবদল ঘটেনি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ পুনরুজ্জীবন এবং আধুনিকীকরণের নায়কেরা প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম ও সামাজিক আচার-আচরণের যেসকল সংস্কার ও পরিবর্তন সাধন করতে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞাননির্ভরতায় সমাজ জীবনকে খাড়া করতে চেয়েছিলেন; রাধাকান্ত দেব, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ পরম্পরাসক্ত, রক্ষণশীলরা প্রায় সকলেই এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ১৮৬০ – ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে পরম্পরাশক্তি ও রক্ষণশীলতা কেবলমাত্র বাংলায় নয়, ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য হিন্দু সমাজে ক্রমশ আরও যেন প্রসার ও গভীরতা পেয়েছিল।[১৪]

অতীতের গৌরবের অনুসন্ধিৎসা এই পুনরুজ্জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ভবিষ্যতকে সম্ভাবিত করবার তাগিদে, বর্তমানে আশ্বস্ত হওয়ার ঈপ্সায় অতীতের দিকে মুখ ফেরানো অবশ্যম্ভাবী ছিল। রাজেন্দ্রলাল-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের ইতিহাস অনুসন্ধানের তাগিদানুভব এই পুনরুজ্জীবনের উল্লেখযোগ্য দান। 'ধম্মপদং' প্রবন্ধে (*নবপর্যায় বঙ্গদর্শন*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২) রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনুসন্ধান প্রসঙ্গে লিখেছেন যে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় ছাঁদের ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ, ভারতের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নয়, সকল বৈচিত্র ও বৈষম্যের ভিতরে ভিতরে একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্রের যোগই তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা সত্য। এত বৈচিত্র ও বৈষম্যের আপাত অসেতুসাধ্য রূপ থাকলেও ধর্মের উদারতা এদের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে সংযোগসাধন করেছে। তাই, ভারতের যথার্থ ইতিহাস হল ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্ম 'আলোর মতো', তার পাওয়া এবং দেওয়া একসঙ্গে ঘটে। এই ধর্ম রিলিজন, পলিটিক্স প্রভৃতি সমেত 'সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র'।

ভারতের ইতিহাস বলতে বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দু ইতিবৃত্ত'কে বুঝিয়েছেন, স্বদেশীপর্বে রবীন্দ্রনাথেরও সেই ঝোঁক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধে (*বঙ্গদর্শন*, বৈশাখ, ১২৭৯) 'সমুদায় ভারত'কে 'একজাতীয় বন্ধনে' আবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব রেখেছিলেন। তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুদ্ধচরিত্র ও বৌদ্ধসংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন নি। ভারত তথা বিশ্ব-ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি 'সাম্য' প্রবন্ধে (*বঙ্গদর্শন*, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০) লিখেছিলেন –

> বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল – বর্ণবৈষম্য কতক দূর বিলুপ্ত হইল। প্রায় সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত রহিল। ... সেই সহস্র বৎসরই ভারতবর্ষের প্রকৃত সৌষ্ঠবের সময়। যে সকল সম্রাট হিমালয় হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত যথার্থই একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছেন – অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, শিলাদিত্য প্রভৃতি এই কালমধ্যেই তাঁহাদিগের অভ্যুদয়। এই সময়েই তক্ষশিলা হইতে তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত, বহুজন-সমাকীর্ণ মহাসমৃদ্ধশালিনী সহস্র সহস্র নগরীতে ভারতবর্ষ পরিপূরিত হইয়াছিল। এই সময়েই ভারতবর্ষের গৌরব পশ্চিমে রোমকে, পূর্ব্বে চীনে গীত হইয়াছিল – তদ্দেশীয় রাজারা ভারতবর্ষীয় সম্রাটদিগের সহিত রাজনৈতিক সখ্যে বদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা ধর্ম্মপ্রচারে যাত্রা করিয়া অর্দ্ধেক আশিয়া ভারতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্যায় যে এই সময়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন বৌদ্ধদয়ের আনুষঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞান সাহিত্যের বিশেষ অনুশীলনের কাল নিরূপণ করা কঠিন, কিন্তু শাক্যসিংহের সম্পাদিত ধর্ম্মবিপ্লবের সহিত যে, সে সকলের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রেক্ষাপটে ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে প্রদেশের ধারণা ভারতের ধারণায় ব্যাপ্ত বা ভারতের ধারণা প্রদেশের ধারণায় সংকুচিত হয়েছিল। 'কোন একটি অভিপ্রায়কে' নিয়ে 'ভারতবর্ষের কোনো একটি প্রদেশ আপনাকে একচিত্ত' বলে 'উপলব্ধি' করেছে, এরকম অবস্থা ভারতবর্ষের ভাগ্যে বেশি ঘটে নি একথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে দেশের লোকের সমগ্র চিত্তে যখন কোনো একটি অভিপ্রায় জেগে ওঠে এবং সর্বসাধারণ সচেষ্ট হয়ে সেই অভিপ্রায়কে সার্থক করতে চায় ও সেই অভিপ্রায়কে প্রতিকূল আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে, তখনই সে দেশ যথার্থভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে এসে দাঁড়ায়।[১৭]

আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের মূর্তিকল্পনা অশোকের সময় থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। পুরাণ, কালিদাস, গুপ্ত ও বাকটক রাজবংশের কালে এই কল্পনা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মনকে অধিকার করলেও মোটামুটি সপ্তম শতক থেকে তা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। অষ্টম-নবম শতক থেকে দেশের

সর্বত্র আঞ্চলিক সত্তার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই আঞ্চলিক সত্তা প্রভাব বিস্তার করেছিল। আকবর বাদশাহ থেকে শুরু করে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত যে সুবিস্তীর্ণ মুঘল সাম্রাজ্য তার পক্ষেও এই সর্বভারতীয় স্বপ্ন-কল্পনার প্রত্যাবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়নি। দেশের মানুষের চিত্ত ও চেতনায় দেশের ছোট-বড় বিভিন্ন অঞ্চলগুলিই দেশ বলে উপলব্ধ হত। পাশাপাশি ভারতবর্ষ বলে একটা দেশের অস্তিত্বের অস্পষ্ট ধারণাও ছিল। মুসলমান রাজশক্তিও যে দেশকে স্বীকার করতেন তা হিন্দু, হিন্দুস্থান, প্রধানত সিন্ধু-গাঙ্গেয় উত্তর ভারত; সমগ্র ভারতবর্ষ নয়। ঊনবিংশ শতকের পুনরুজ্জীবনই বহু শতাব্দীর পর এদেশের বিচ্ছিন্ন মানুষকে অখণ্ড সমগ্র ভারতবর্ষের ভাবনার সঙ্গে নবপরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিল।[১৮]

ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা অখণ্ড ভারতবর্ষের সন্ধানে প্রাচীন ভারতবর্ষানুগ হতে থাকে। বিশ্বমনা রবীন্দ্রনাথ এইসময় দেশ ও জাতির আবেগ-আবর্তে প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল চেতনাকে অনুভব করে আত্মস্থ ও আশ্বস্ত হতে চেয়েছিলেন। ‘স্বদেশ’ কবিতায় (*নবপর্যায় বঙ্গদর্শন*, পৌষ, ১৩০৯) তাঁর এই ভাবনা ধরা রয়েছে –

> হে বিশ্বদেব, মোর কছে তুমি দেখা দিলে আজ কী বেশে।
> দেখিনু তোমারে পূর্বগগনে, দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
> … … …
> শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র অতীতের তপোবনেতে।
> অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।
> … … …
> হৃদয় খুলিয়া দাঁড়ানু বাহিরে শুনিনু আজিকে নিমেষে,
> অতীত হইতে উঠিছে হে দেব, তব গান মোর স্বদেশে।

অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্নকল্প রচনার সাহিত্যিক রূপ রবীন্দ্রনাথের ‘শিবাজী উৎসব’ কবিতায় (*বঙ্গদর্শন*, আশ্বিন, ১৩১১ ও *ভারতী*, আশ্বিন, ১৩১১) প্রকাশিত হয়েছিল। ‘এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত’কে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা এই কবিতায় দেখা যায়।[১৯]

ঊনবিংশ শতকের বঙ্গসন্ধান প্রকারান্তরে ভারতানুসন্ধানের ক্ষেত্রে যোগসূত্র স্বয়ং বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি। হিন্দু জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষার তাগিদে অতীত ভারতের ‘বৌদ্ধযুগ’-এর বিনির্মাণ ঘটেছিল। নিজেদের অতীত গৌরবকে অনুসন্ধান করে হীনত্বকে অপসারণ করার ঐকান্তিক ইচ্ছাই বৌদ্ধযুগের বৃহত্তর বাংলা দেশ ও ভারতানুসন্ধানের প্রেরণা।

সাময়িকপত্রে ‘বৌদ্ধযুগ’-এর সুলুক-সন্ধান

ঊনবিংশ শতকের বাংলা ও ভারতের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানের স্বার্থেই ‘বৌদ্ধযুগ’-এর নির্মাণ আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল। আমাদের আলোচ্য সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে এই সন্ধান গুরুত্ব সহকারেই প্রকাশিত হয়েছিল। অস্বাক্ষরিত ‘পুরাবৃত্ত পাঠের ফল’ (*রহস্য সন্দর্ভ*, ১২৭৯) প্রবন্ধে বলা হয়েছে – ‘পুরাবৃত্ত’ একপ্রকার দর্শন, তা জাতীয় একতার ধারক, আনন্দদানকারী ও সামাজিক মঙ্গলবিধায়ক।

শ্রীর (চিত্তরঞ্জন দাশ?) ‘বাঙ্গালীর আদর্শ’ প্রবন্ধে (*নারায়ণ*, ফাল্গুন, ১৩২৬) বাঙালির ‘সঙ্ঘবদ্ধ’ ও ‘আত্মরক্ষা’র স্বার্থে বৌদ্ধযুগ বা বৌদ্ধবিপ্লবের ঐতিহ্যের দিকে মুখ ফেরানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, অতীতে বাংলায় সংঘটিত ‘বৌদ্ধ বিপ্লব’-এ মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলার ইতর ভদ্র সেদিন ধর্ম ও বুদ্ধের নামে সংঘবদ্ধ হয়েছিল –

> বাঙ্গালার জন-সাধারণ বৌদ্ধবিপ্লবে একসঙ্গে দলবদ্ধ হইয়াছিল। তাহার ফলে, কে জানে, বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সাহিত্যের জন্ম হয় কি, না? কে জানে, স্ত্রীশূদ্রের আত্যন্তিক ভেদজনিত সমাজ-বিন্যাসে এক অভিনব সাম্যবাদের প্রথম প্রচার হয় কি, না? কে জানে, ব্রাহ্মণের অপেক্ষা না করিয়া, কেবলমাত্র এক প্রজাসাধারণের নির্বাচনের উপর রাজধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল কি, না। কে জানে, বাঙ্গালার ইতিহাসে সমবেত প্রজাশক্তির যে বিদ্রোহের মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে দিব্বোক, রূদোক ও ভীমের আকস্মিক অভ্যুদয়ে – বৌদ্ধবাঙ্গালার সামাজিক সাম্যবাদ এক আশ্চর্য্য প্রেরণা যোগাইয়াছিল কি, না? ধীমান্ ও বীতপালের শিল্প ও ভাস্কর্য্য ... কে জানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রেরণাতেই বাঙ্গালার শুধু সাহিত্যের জন্ম নয়, শিল্পেরও এক অনিন্দ্যসুন্দর আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল কি, না – ? ভাটার মুখে বৌদ্ধবিপ্লব স্থানে স্থানে যে সকল আবর্জ্জনার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, তাহা বাঙ্গালায় বৌদ্ধপ্লাবনের চিহ্ন, সন্দেহ নাই ...।

প্রাবন্ধিক বিংশ শতকের বাঙালির আদর্শহীনতার বিপ্রতীপে বৌদ্ধযুগের বাঙালির আদর্শকে খুঁজেছেন। বাঙালির অধিকার সম্প্রসারণের স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রাবন্ধিকের বাক্যবিন্যাসে ভাষারূপ পেয়েছে –

> বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালার জনসাধারণের প্রথম জাগরণ; সাম্যবাদের প্রথম প্রচার; বর্ণাশ্রমী সমাজের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ; ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রথম পরাজয়, যাহারা বাঙ্গালায় এ বিপ্লব ঘটাইয়াছিল, তাহারাও কি বাঙ্গালী ছিল?

প্রাবন্ধিক বাঙালির সেই ধারার অনুসন্ধানের কথা বলেছেন। বাঙালির বৌদ্ধ আদর্শ কালের নিয়মকে মেনেই পরিবর্তিত হয়েছিল। বৌদ্ধ বিপ্লবে ভাঁটা পড়লে ‘লুক্কায়িত ব্রাহ্মণ্যশক্তি’ সমাজকে নতুনভাবে বিন্যস্ত

করতে শুরু করে। প্রাবন্ধিক তাই মন্তব্য করেছেন – বৌদ্ধযুগের আগের আর পরের বাঙালি ‘এক নয়’। পুনরুত্থান যুগের ব্রাহ্মণের আরেকটা আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করা। বৌদ্ধযুগের পর সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ার ভাব সমাজে দেখা দিয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেন-রাজবংশের অধঃপতনের পর থেকে মুসলমান শাসনকালেও বাংলার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বহুস্থানে এবং বহুপরিমাণে স্বীকার করেছিল। মুসলমান অধিকারের পর হিন্দু ও বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার চলেছিল; বৌদ্ধদের উপর ‘অধিকতর’। মুসলমান আগমনে বাঙালি বৌদ্ধকে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ভাগ করে নেওয়ায় বাংলায় বৌদ্ধ লুপ্ত হয়েছিল।

প্রবন্ধকার সমকালীন বাংলার প্রেক্ষাপটে ব্রাহ্মণকেই বাংলা দেশ তথা বাঙালির নেতৃত্বপদে বরণ করেছিলেন, একথা ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রাবন্ধিকের মতে, বাংলার ব্রাহ্মণ বৌদ্ধযুগের পরে, সমগ্র মুসলমান যুগ ধরে একটা আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়াস করেছিল। সমগ্র মুসলমান যুগে ব্রাহ্মণ বেঁচে ছিল বলেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণের এই নেতৃত্বগ্রহণের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘মাতৃ-অভিষেক’ (*প্রবাসী*, শ্রাবণ, ১৩১৭) কবিতাটিতে ‘ভারতের মহামানবের সাগরতীরে’ ব্রাহ্মণকেই নেতৃত্বভার দিয়েছিলেন – ‘এসো ব্রাহ্মণ, শুচি কর মন ধরো হাত সবাকার।’ আলোচ্য প্রবন্ধেও সেই সুর ধরা পড়েছে –

> বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ! তুমি কি ... আদর্শকে আবার তুলিয়া ধরিতে পারিবে? সে শক্তি কি তোমার আছে? না, বৌদ্ধবিপ্লবের মত আর একটা সমাজবিপ্লবে সকলে সমভূম হইয়া যাইবে।

বৌদ্ধ ভারতের ইতিবৃত্ত

বৌদ্ধভারতের ইতিবৃত্ত ও ইতিহাসচর্চা বিষয়ে ঊনবিংশ-বিংশ শতকে সাময়িকপত্রগুলিতে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের আলোচ্য কালপর্বের মধ্যে রামদাস সেনের ‘ভারতীয় পুরাবৃত্ত’ (*বঙ্গদর্শন*, ভাদ্র, ১২৭৯); যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের ‘প্রাচীন রাজগৃহ’ (*নারায়ণ*, আশ্বিন – কার্তিক, ১৩২৪) এবং ‘মগধ’ (*বঙ্গবাণী*, ভাদ্র, ১৩৩০); বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের ‘গিরিবজ্রপুর’ (*বঙ্গবাণী*, পৌষ, ১৩৩২) এবং ‘পৌণ্ড্রবর্ধন’ (*বঙ্গবাণী*, চৈত্র, ১৩৩২) প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

‘ভারতীয় পুরাবৃত্ত’ প্রবন্ধে চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের প্রসিদ্ধ স্থান ভ্রমণ ও হিন্দু আর বৌদ্ধ রাজাদের সম্পর্কে তাঁদের বিবরণ ফারসি আর ইংরাজি অনুবাদের মধ্যে দিয়ে প্রাপ্তির সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।

‘মগধ’ প্রবন্ধটি সুলিখিত, যুক্তিগ্রাহ্য যথাযথ ইতিবৃত্ত যেখানে বৌদ্ধপ্রসঙ্গের সঙ্গে জৈন ও হিন্দু প্রসঙ্গ রয়েছে। আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে মহাবীর ও বুদ্ধের লীলাভূমি, প্রথম দুটি বৌদ্ধসংগীতির স্থান, মোগলিপুত্ত তিস্‌স এবং উপগুপ্তের মত প্রধান দুইজন বৌদ্ধাচার্যের কীর্তিভূমি, বৌদ্ধ ও জৈন উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্রের বিধিবদ্ধ স্থান, অশোকের বিজয় কীর্তিস্থান, নানাস্থানে বৌদ্ধধর্মপ্রচারক প্রেরণ, মানুষ এবং জন্তুর চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকদের নানাস্থানে গমন, প্রথম শল্যচিকিৎসার স্থান, নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নানা দেশে দর্শনাদি প্রচার, তক্ষণশিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের স্থানের সৌজন্যে শিল্পীদের বিভিন্ন স্থানে সমাদর প্রভৃতি কারণে মগধ ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন ভারতে মগধ রাজ্য সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। আর্যদের কেউ কেউ মহাবীর বা বুদ্ধদেবের মত গৃহত্যাগ করে লোকশিক্ষার জন্য অগ্রগামী হওয়ায় ব্রাত্যের উদ্ভব এবং অন্যান্য জনপদে আর্যসভ্যতার বিস্তৃতি ঘটেছিল। বুদ্ধদেবের সময়ে মগধে আশিটা গ্রাম ছিল। ‘মগধ’ প্রবন্ধটি পাদটীকা কণ্টকিত। উৎস উল্লেখ করে তথ্যপূর্ণ এই প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় – টীকায় *বিনয়পিটক* (১/১৭৯)-এর উৎস উল্লেখ করে প্রবন্ধে জানানো হয়েছে বিম্বিসারের সময়ই মগধ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পিতৃহন্তা অজাতশত্রু নিকটবর্তী কোশল ও বৈশালী রাজ্য জয় করে মগধের বিস্তৃতি সাধন করেন। *সুমঙ্গল বিলাসিনী*-তে অজাতশত্রুর সঙ্গে লিচ্ছবিদের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যুদ্ধ এবং লিচ্ছবি পতন থেকে মগধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কথাও উল্লিখিত হয়েছে।

‘প্রাচীন রাজগৃহ’ প্রবন্ধটি প্রথম পর্যায়ের পুরাতত্ত্বের নিরিখে লেখা মূল্যবান প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে পঞ্চপর্বত-বেষ্টিত প্রাচীন রাজগৃহ আনুমানিক পাঁচশত খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে মগধের রাজধানীরূপে পরিত্যক্ত হয়েছিল। *রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ*, জৈনগ্রন্থ, *দীঘ-নিকায়, বিমানবত্থু* ও *সুত্তনিপাত* প্রভৃতি গ্রন্থে রাজগির সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন রাজগৃহ দর্শনকালে অঞ্চলটিকে জনশূন্য দেখেছিলেন। ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ পঞ্চপর্বত বেষ্টিত স্থানকেই রাজা বিম্বিসারের প্রাচীন নগর বলে মনে করে এর সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট চারটি স্তূপ দর্শন করেন। এই চারটি স্তূপ বুদ্ধদেবের জীবনের চারটি ঘটনা নির্দেশক – ১) রাজপ্রাসাদের উত্তর দ্বারের যে স্থানে অজাতশত্রু মদমত্ত হাতিকে বুদ্ধ-সংহারের জন্য প্রেরণ করে অকৃতকার্য হন, ২) এর উত্তর-পূর্বে একস্থানে সারিপুত্র অশ্বজিৎকে ধর্মপ্রচারে ব্রতী দেখেছিলেন, ৩) উত্তরের অনতিদূরে সুগভীর গর্ত বা পয়ঃপ্রণালীর কাছে শ্রীগুপ্তের অগ্নিকুণ্ড ছিল, ৪) এর উত্তর-পূর্বে নগরপ্রাচীর যেখানে বেঁকে গেছে, সেটি জীবকের ধর্মপ্রচার কক্ষের নিদর্শন।

প্রবন্ধকার সারিপুত্র ও জীবক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত, সংহত ও সুন্দর টীকা দিয়েছেন। বুদ্ধের প্রিয়শিষ্য সারিপুত্র নালন্দায় বাস করতেন। সারিপুত্র বুদ্ধের দক্ষিণদিকে বসতেন বলে ‘দক্ষিণহস্ত শ্রমণ’ নামে অভিহিত হতেন। সারিপুত্রের নির্বাণলাভ হলে অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধের অনুমতি নিয়ে সারিপুত্রের দেহাবশেষের উপর শ্রাবস্তীতে এক স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন।

বিম্বিসারের পুত্র অভয়ের ঔরসে ও জনৈক নগরশোভিনীর গর্ভে রাজগৃহে জীবকের জন্ম হয়। জীবক তক্ষশীলায় আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। পরে রাজগৃহ প্রত্যাগমন করে বিম্বিসারের দুরারোগ্য রোগ মুক্ত করেন। একসময় বুদ্ধের আমাশয় রোগে জীবকের দেওয়া একটি পদ্মের মধ্যে ওষুধ খেয়ে তিনি ব্যধিমুক্ত হন। বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভের কুড়ি বছর পরে জীবক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন ও নিজের উদ্যানে একটি বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে তা প্রদান করেছিলেন।

‘প্রাচীন রাজগৃহ’ যখন লিখিত হয়েছে তখন প্রাচীরবেষ্টিত নিবিড় বনভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত মনিয়ার মঠ ছাড়া কিছুই চিহ্নিত হয় নি। বিখ্যাত পর্যটক ফ্রান্সিস বুকানন ১৮১২ সালে রাজগৃহ পরিভ্রমণ করেছিলেন। India Office Library-তে বুকাননের সমগ্র পাণ্ডুলিপি রয়েছে। মন্টগমারী মার্টিন এই গ্রন্থ সম্পাদনা করে *Eastern India* নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। রাজগৃহের প্রত্নস্থল সম্পর্কে বুকাননের অনুমান সবটা ঠিক নয়। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে কাপ্তেন কিট্টো তৎকালীন অধিবাসীদের কথিত প্রাচীরবেষ্টিত স্থানকে ‘হংসতৌর’ (বুকানান্ ‘হংসপুর’ বলেছেন) বলে উল্লেখ করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার কানিংহাম গিরিয়া স্তূপের উপরের স্তূপকে হিউয়েন সাঙের বর্ণিত ‘হংসস্তূপ’ বলে নির্দেশ করেছিলেন, এইক্ষেত্রে নামসাদৃশ্যটি লক্ষণীয়।

প্রাবন্ধিক প্রত্নতত্ত্ববিভাগ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মানচিত্রটির প্রতিলিপি দিয়ে প্রবন্ধের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। এতে রাজগৃহের চারদিকে প্রাচীরের ছবি রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ জ্যাকসন এই স্থান

অনুসন্ধান করে (খনন ব্যতীত) প্রায় সকল স্থানই নির্ণয় করেছিলেন, যদিও এবিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। প্রাবন্ধিক মানচিত্র অনুসারে রাজগৃহের বর্ণনা দিয়েছেন। রাজগৃহের পূর্বদিকে প্রাচীরের বাইরে পুকুরের স্থানকে চৈনিক পরিব্রাজকদের উল্লিখিত প্রাবন্ধিক জীবকের উদ্যান বলেছেন। নগরের মধ্যে উঁচু স্থানগুলিকে প্রাচীন রাজগৃহের দুর্গ বলেছেন। ক) মনিয়ার মঠের উত্তর-পশ্চিমদিকে ভূমি, খ) মনিয়ার মঠের প্রায় আটশ গজ দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত চতুর্ভুজাকার ভূখণ্ড, গ) এর কাছে এবং নগরের দক্ষিণ প্রাচীরের দক্ষিণে একটি সমকোণ চতুর্ভুজ দুর্গের ভগ্নাবশেষ থেকে প্রাবন্ধিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এই দুর্গ অতি প্রাচীন এবং প্রাচীন রাজগৃহের কেবল এই স্থান থেকে গৃধ্রকূট দৃষ্ট হয়। পুত্র অজতশত্রুর দ্বারা কারারুদ্ধ পিতা বিম্বিসার সেখান থেকে গৃধ্রকূট পর্বতে বুদ্ধকে দেখতে পেতেন। প্রবন্ধে রাজপথ, কূপ, প্রাচীর ভিত্তি, ঘরবাড়ি, কারুকার্য পাথর প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। স্মৃতিমেদুরতায় প্রবন্ধটির সমাপ্তি টেনে প্রাবন্ধিক লিখেছেন –

> রাজগৃহ বৌদ্ধগণের অত্যন্ত পবিত্র স্থান। বুদ্ধ এই স্থানে অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ... রাজগৃহের প্রত্যেক প্রস্তর, প্রত্যেক ইষ্টক, প্রত্যেক ধূলিকণার সহিত মহাভারত হইতে বৌদ্ধযুগের শেষ সময় পর্য্যন্ত স্মৃতি বিজরিত। ... আজ রাজগৃহ পরিত্যক্ত, জনশূন্য – কেবল স্মৃতিটুকুই বাকী আছে।

গিরিব্রজপুর প্রবন্ধে রাজগিরের প্রাচীন গৌরব কীর্তিত হয়েছে। রাজগির পঞ্চগিরিবেষ্টিত (বৈভার, বিপুল, রত্নগিরি, উদয়গিরি ও সোনাগিরি) অঞ্চল। *বিশ্বকোষ*-কার নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে রত্নাচলই চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের ঔড়ম্বর গুহা, পালি গ্রন্থের পাণ্ডব শৈল ও *মহাভারত*-এর ঋষিগিরি। তিনি বলেন, বর্তমানে বিপুল পালিগ্রন্থে বেপুল্লো এবং *মহাভারত*-এ চৈত্যক নামে কথিত রয়েছে। কানিংহাম রত্নগিরিকে পালিগ্রন্থের পাণ্ডব শৈল বলে মনে করেছেন। বৈভার ও বিপুলগিরির পাদদেশেই উষ্ণ প্রস্রবণগুলি রয়েছে। হিউয়েন সাঙ নিজে পাঁচশটি উষ্ণ প্রস্রবণের কথা শুনেছিলেন এবং চল্লিশটি দেখেছিলেন। এখানকার নানা রাজবংশের উত্থান-পতন, পরবর্তীকালের হিন্দু ও মুসলমান প্রভাবে প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনকীর্তিগুলি অনেকটাই লোপ পাওয়ার ফলে অশোক নির্মিত উঁচুস্তূপের স্থান অনুমান করে বের করতে হয়েছিল। প্রাচীন রাজগৃহের মধ্যভাগ বর্তমানে মণিয়ার মঠ নামক জৈন মন্দির তা *মহাভারত*-এর মণিনাগের বাসভবন না বৌদ্ধস্মৃতিরক্ষক গুহা বা ভাণ্ডারগৃহ তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।[২১] বৈভার গিরির দক্ষিণ দিকে সোণভাণ্ডার গুহায় যে জরাসন্ধের কোষাগার ছিল পাণ্ডাদের এই বক্তব্য পুরাতত্ত্ববিদরা মানেন না। তাঁদের মতে এটি জৈন সাধুদের গুহা। রাজগিরের সাত মাইল পূর্বে সিরিয়ক পর্বতের উপর জরাসন্ধের 'বৈঠক'-

কে পুরাতাত্ত্বিকরা একটি বৌদ্ধস্তূপ বলেন। এই পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে একটি ক্ষুদ্র গুহার সুড়ঙ্গ জরাসন্ধের বৈঠকের সঙ্গে যুক্ত – লোকেদের এই কথাও পুরাতত্ত্ববিদরা অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে এটি হিউয়েন সাঙ-বর্ণিত ইন্দ্রশিলা গুহা যেখানে কিংবদন্তী অনুযায়ী বুদ্ধ ইন্দ্রদেবের বিয়াল্লিশটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। বৈভার গিরিতে বুদ্ধের ধ্যানের স্থান পিপ্পল গুহার অবস্থান নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। প্রথম বৌদ্ধ মহাসভার অধিবেশনের সপ্তপর্ণী গুহার অবস্থান সন্তোষজনক ভাবে নির্ণীত হয়নি। হিউয়েন সাঙ যখন রাজগৃহে আসেন তখন রাজগৃহ ধ্বংসের মুখে থাকলেও বহু বৌদ্ধকীর্তিতে সমৃদ্ধ ছিল। অনতিদূরের নালন্দায় তখন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের কারণে রাজগৃহ সাঙের ভক্তি ও মনযোগ আকর্ষণ করেছিল। প্রাবন্ধিক খেদ প্রকাশ করে বলেছেন –

> এখন কিন্তু যে বৌদ্ধের কীর্ত্তি-কলাপে রাজগৃহ এত গৌরবান্বিত, সেই বৌদ্ধদেরই স্থান এখানে সকলের চেয়ে কম। তাহা না হইলে হয়ত স্থানটির মহিমা লোকের সম্মুখে আরও বেশি রকম জাগিয়া উঠিত। সারিপুত্রের অর্হৎ হইবার স্থান, শ্রীগুপ্তের স্তূপ, জীবন গুপ্ত নির্ম্মিত বুদ্ধদেবের বক্তৃতা গৃহ, পিপ্পল গুহা, অসুরের গুহা, করণ্ড বেণুবন, আনন্দের দেহবশেষ রক্ষার স্থান, কাশ্যপের আহুত মহাসভার স্থান, বুদ্ধদেবের জীবনীর সহিত সংশ্লিষ্ট কত শিলা, কত বিহার, স্তূপ ও স্তম্ভের ভিত্তিতে আবিষ্কারের চেষ্টা হইত।

'কাশীর ইতিহাস' প্রবন্ধে কাশী সংক্রান্ত গল্পে বিষ্ণুর অবতাররূপে বুদ্ধদেব হিন্দুপুরাণগুলিতে ঢুকে পড়েছেন। রাজা দিবোদাসকে ধর্মচ্যুত করার পরিকল্পনা রূপে বুদ্ধরূপী বিষ্ণু রাজাকে বৌদ্ধমতে দীক্ষা দিয়ে 'ধর্ম্মচ্যুত' করেন। এই কাহিনি থেকে অনুমান করা যায়, কাশীতে যথেষ্ট পরিমাণে বৌদ্ধ প্রভাব ছিল এবং সেই প্রভাবকে কৌশলে খর্ব করার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এই কাহিনির প্রচার করে বৌদ্ধধর্মকেই ধর্মচ্যুতির ধর্ম হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

পালবংশীয় রাজা মহীপালের অধীনে থাকাকালীন তিনি কাশী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থিরপাল ও বসন্তপালকে প্রতিনিধি করেছিলেন। তাঁরা কাশীর নিকটবর্তী সারনাথে বৌদ্ধমঠের সংস্কার করেন।[২২] ভিনসেন্ট স্মিথের মতানুযায়ী মহীপাল দেব ৯৭৮ থেকে ১০৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।[২৩] লামা তারানাথের মতে, বাণপালের পুত্র মহীপাল বাহান্ন বছর রাজ্যশাসন করেন। তাঁর মৃত্যুর সমকালীন তিব্বতের রাজা ছিলেন খ্রি-রল (রল-পা-চান)।[২৪] সুলতান মামুদ যখন উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ নগরসমূহ ধ্বংস করছিলেন, যখন স্থানেশ্বর, মথুরা, কান্যকুব্জ, গোপাদ্রি, কলঞ্জর,

সোমনাথ প্রভৃতি নগর ও দুর্গ একের পর একটি করে বিজয়ী বিদেশীদের অধীন হয়েছিল, তখন মহীপাল বারাণসী নগরীকে নানা কীর্তিতে সাজিয়েছিলেন।[২৫]

শরৎকুমার রায়ের আনুকূল্যে পাহাড়পুরের খননকার্য শুরু হওয়ার পর বিক্রমপুর রামপাল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য 'পৌণ্ড্রবর্ধন' প্রবন্ধে 'প্রাচীনতম'-এর নিরিখে পুণ্ড্রবর্ধন বা পৌণ্ড্রবর্ধনের দাবিকে সকল প্রত্নতত্ত্বের আগে বলে মতপ্রকাশ করেছেন। বগুড়ার সাত থেকে আট মাইল উত্তর প্রাচীন মহাস্থানগড়ই সেকালের পৌণ্ড্রবর্ধন। এর পশ্চিমদিকে চার থেকে পাঁচ মাইল দূরে বিহার ও ভাসুবিহার গ্রাম। ভাসুবিহারই হিউয়েন সাঙ কথিত পো-সি-পো বা বাস্পো। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী পৌণ্ড্রবর্ধন বৌদ্ধস্থান ছিল। মহাস্থানগড়ের উপর প্রাচীন ইঁটের স্তূপ অতীতের গৌরব চিহ্নস্বরূপ। কেবল বৌদ্ধস্থান হিসাবে নয়, জৈন, রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির সঙ্গে প্রাবন্ধিক তার যোগের কথা বলেছেন। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ *দিব্যাবদান*-এ দুই স্থানে পৌণ্ড্রবর্ধন নগরের উল্লেখ রয়েছে। হিউয়েন সাঙ মহাস্থানের সঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধনের অভিন্নতার কথা বলেছেন। এখানে কুড়িটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও তাতে তিন হাজারের উপর হীনযান ও মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ বাস করতেন। সাঙের বর্ণনানুযায়ী রাজধানীর পশ্চিমে একটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধ বিহারে সাতশ মহাযানী বৌদ্ধ থাকতেন। এর কাছে একটি অশোকস্তূপ ও একটি অবলোকিতেশ্বর মন্দির ছিল। কানিংহাম বিহারগ্রামের প্রকাণ্ড স্তূপকে (৭০০ x ৬০০ ফিট) সাঙ-বর্ণিত বৌদ্ধবিহারের স্থান বলে নির্দেশ করেছিলেন। তিনি ভাসুবিহারের ইঁটের স্তূপকে প্রাচীন অশোকস্তূপ, উত্তরের ভাঙা মন্দিরকে প্রাচীন অবলোকিতেশ্বর মন্দির বলে দাবি করেছিলেন। অন্যমতে, গোকুলগ্রামের বালা লখিন্দরের মেড়ই অশোকস্তূপ। নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর *বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস*, রাজন্যকাণ্ডে (১৯১৪) পৌণ্ড্রবর্ধনের প্রাচীন কীর্তির উল্লেখ করে অদূরে রামপাল-স্থাপিত রামবতী নগরীর ধ্বংসাবশেষ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে মহাস্থানগড়ের পশ্চিমদিকে যে বিহারগ্রাম আছে, তা জগদ্দল বিহারের স্মৃতিজ্ঞাপক। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় *বাঙ্গালার ইতিহাস*, প্রথম ভাগে (১৯০৪) রামাবতীর এই স্থানের অবস্থান স্বীকার করেন নি, কিন্তু অস্বীকারের পিছনে কোন যুক্তি তিনি দেখাননি। বগুড়ার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন যে এই স্থান প্রথমে বৌদ্ধমন্দির, পরে হিন্দুমন্দির ও আরও পরে তা ইসলামের ধর্মস্থানে পরিণত হয়েছিল।[২৬]

নলিনীমোহন সান্যালের ‘পুরাণ প্রসঙ্গ’ প্রবন্ধে (*বঙ্গবাণী*, *জ্যৈষ্ঠ*, ১৩৩৩) ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ দ্বন্দ্বের কথা উঠে এসেছে। সংস্কৃতে লিখিত বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রাদি ব্রাহ্মণদের কুক্ষিগত ছিল। বুদ্ধদেব তা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সাধারণের মধ্যে সরল, সহজবোধ্য ভাষায় প্রচার করেন। বৌদ্ধদের সমস্ত শক্তি ব্রাহ্মণদের ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়েছিল। নিম্নস্তরের সাধারণ মানুষের অধিকারকে বৌদ্ধরা স্বীকৃতি দেওয়ায় দেশে ধর্ম ও সামাজিক বিপ্লবের ফলে আগেকার আচার-ব্যবহার শিথিল হয়ে জাতিভেদ উঠে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও পতনের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান ঘতাঁর সঙ্গে সঙ্গে মাগধী ও অন্যান্য প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার হ্রাস পেয়ে সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিত হয়েছিল।

রাখহরি চট্টোপাধ্যায়ের ‘প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্র’ প্রবন্ধটি (*নারায়ণ*, ফাল্গুন, ১৩২৮) প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চায় বদ্ধমূল ধারণার মূলে আঘাত হেনেছিলেন। প্রবন্ধকারের মতে, প্রাচীন ভারতে শুধু প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল এমন নয়, ভারতের অনেক অংশ পুরাকালে প্রজাদের দ্বারাই পরিচালিত হত। তিনি নিজের বক্তব্যের সমর্থনে থমাস রীস ডেভিডস্, ভিনসেন্ট স্মিথ ও কে. পি. জয়সওয়ালের বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছিলেন। থমাস রীস ডেভিডস্ *Buddhist India* (১৯০৩) গ্রন্থে লিখেছেন যে অতি প্রাচীনকালে ভারতের যেসকল অংশ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের কাছে মাথা নত করেছিল তার কয়েক অংশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রাচীন ভারতে ন্যূনাধিক স্বাধীনতার অধিকারী হয়ে প্রজারাই খানিকটা শাসন করতেন। ভিনসেন্ট স্মিথ *Royal Asiatic Society Journal*-এ (১৯০৩) প্রাচীন পাঞ্জাবের প্রজাতান্ত্রিক স্থানসমূহের একটি মানচিত্র প্রকাশ করে তিনটি প্রজাশাসিত রাজ্যের উল্লেখ করেছিলেন। টমাসের মতে, সংস্কৃত ‘গণ’ শব্দটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত স্থান বোঝাত। জয়সওয়াল হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের (১৯১২) প্রবন্ধে এবং ‘An Introduction to Hindu Polity’ (*Modern Review*, Vol. XIV, 1913) প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতে ‘গণ’ শব্দের নানা ব্যবহার দেখিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের গণতন্ত্র প্রসঙ্গে রীস ডেভিসের মন্তব্যটি উদ্ধারযোগ্য –

> In those parts of India which came very early under the influence of Buddhism, we find, besides a still surviving number of small aristocratic republics, four kingdoms of considerable extent and power. Besides, there were a dozen or more of smaller kingdoms… No one of these was of much political importance. And the tendency towards the gradual absorption of these domains, and also of the republics, into the neighbouring kingdoms, was already in full force. The evidence at present available is not sufficient to give us an exact idea either of the extent of country, or of the number of

> the population, under the one or the other form of government; nor has any attempt been so far made to trace the history of political institutions in India before the rise of Buddhism. We can do no more, then, than state the fact – most interesting from the comparative point of view – that the earliest Buddhist records reveal the survival, side by side with more or less powerful monarchies, of republics with either complete or modified independence.[২৭]

রাখহরি চট্টোপাধ্যায় *জাতক, রামায়ণ, মহাভারত* ইত্যাদি প্রমাণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে 'প্রাচীন হিন্দুরাজা যথেচ্ছাচারী ছিলেন না'। 'তেলপত্ত জাতক'-এ পাই, তক্ষশীলার অধিপতির থেকে যক্ষিণী রাজ্যশাসন ক্ষমতা নিজের হতে তুলে নিতে চেয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে অধিপতির বক্তব্যটিতে রাজার ক্ষমতার সীমা নির্ধারিত হয়েছে – রাজ্যের সমস্ত প্রজা আমার অধীন নয় অথবা আমি সর্বতোভাবে তাদের প্রভু নই, যারা রাজদ্রোহী অথবা অন্য কোনও অপরাধে অপরাধী তারাই আমার অধীন। আবার 'একপন্ন জাতক' গল্পে দুর্দান্ত ও ক্রোধপরায়ণ রাজপুত্রকে ক্রোধপরায়ণতার জন্য প্রজারা রাজা হতে দেবেন না – এই বলে সতর্ক করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রাচীন ভারতে রাজ্যশাসন প্রজাসাপেক্ষ ছিল এবং তা 'হিন্দু'-গৌরববোধক বলেই প্রাবন্ধিক মনে করেছিলেন।

কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের 'বাঙ্গালীর অতীত' প্রবন্ধের (*বঙ্গবাণী*, পৌষ, ১৩৩৪) উত্তরকথনরূপে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বাঙ্গালীর অতীত (উত্তর)' প্রবন্ধটি (*বঙ্গবাণী*, মাঘ, ১৩৩৪) প্রকাশিত হয়েছিল। দুটি প্রবন্ধেই জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষাপটে বাঙালির অতীত গৌরবোজ্জ্বল সময়ের অনুসন্ধান করা হয়েছিল। দীনেশচন্দ্র সেন সিংহলবাসীদের সঙ্গে বঙ্গবাসীদের আচার-ব্যবহার, আকৃতি-প্রকৃতি, ভাষার শব্দগত সাদৃশ্য; প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ধনপতি, শ্রীপতি প্রমুখদের বাণিজ্যকাহিনির মৌখিক পরম্পরা; প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত করে *মহাবংস*-এ উল্লিখিত বাঙালির সিংহল বিজয়কে 'ঐতিহাসিক সত্য' বলেছিলেন। যবদ্বীপের বরোবুদুর মন্দির, বালির প্রম্বনমের নানা কারুকার্যমণ্ডিত দেবালয়, কম্বোডিয়ার ভগ্নস্তূপে বাঙালি শিল্পীর কৃতিত্ব; চীন ও জাপানে বাঙালিদের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। জাপানের হুরিয়োজি মন্দিরে রক্ষিত ধর্মগ্রন্থের (একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে লিখিত) প্রতিলিপি অক্সফোর্ড গ্রন্থাগারে রয়েছে। জাপানি বৌদ্ধ পুরোহিতদের ধর্মগ্রন্থ লিখবার সময় ব্যবহৃত অক্ষরের সঙ্গেই প্রাচীন বাংলা অক্ষরের আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। হিউয়েন সাঙের সময় নালন্দা বিহারের সর্বপ্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন বিক্রমপুরের অধিবাসী শান্তরক্ষিত। তিব্বতে বুদ্ধের মতই পূজিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামের সন্তান। তাঁদের সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বে

প্রসারিত হয়। প্রাবন্ধিক এইভাবেই প্রাচীন বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ছবি উপস্থাপিত করে বৌদ্ধবাংলা তথা বৌদ্ধভারতের ধারণাকে বুঝতে চেয়েছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাচীন বাংলার গৌরবের সঙ্গে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্রষ্টব্য চিত্র: পৃ. ৪৩৩) নানা যোগসূত্রে জড়িত। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের 'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে (*বঙ্গবাণী*, শ্রাবণ, ১৩৩১) ভারতীয় সভ্যতার আরণ্যক উৎসের কথা বলা হয়েছে। আরণ্যক উৎসের সূত্রেই তৎকালীন মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে হাজার হাজার বিদ্যার্থী সমবেত হয়ে বিদ্যালোচনা করতেন, দিনরাতে কখনোই অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের বিরাম ছিল না। চীন, কোরিয়া, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশ থেকে বিদ্যার্থীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয় বিদ্যাচর্চার জন্য আসতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথের মতে, রাজা অশোকের সময়ই নালন্দার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এই সময়ে তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না কারণ চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের ভ্রমণবৃত্তান্তে এর কোনও উল্লেখ নেই। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন যে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের অনতিবিলম্বে রাজা শক্রাদিত্য এখানে একটি সঙ্ঘারাম নির্মাণ করেন। বুদ্ধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্যরাজ, বজ্রপ্রমুখ এর শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতীয় রাজা নালন্দার তৎকালীন সর্বপ্রধান অধ্যক্ষ কমলশীলকে নিজ রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবার ফলে ভারতবর্ষের বাইরে নালন্দার খ্যাতি প্রচারিত হয়, যা একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অম্লান ছিল। কিলহর্ণের মতে নবম শতাব্দীতে নালন্দার অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। অবনতির কারণ রূপে বলা হয়েছে – ক) এর হর্ম্যসমূহ ক্রমেই প্রাচীন হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং খ) বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রাধাণ্যের জন্য এর কর্তৃত্ব খর্ব হয়েছিল। মুসলমানেরা নালন্দা ধ্বংস করলেও একে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি এবং পরেও মন্দিরের সংস্কার সাধিত হয়েছিল। মুকুটসিদ্ধ নামক মগধের জনৈক মন্ত্রী এখানে একটি মন্দির নির্মাণ করলেও কিন্তু ধর্মকলহের ফলে তা ভস্মীভূত হয়েছিল। নালন্দায় বুদ্ধ কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন।

গৌড়লেখমালা-য় নালন্দায় উৎকীর্ণ লিপির বর্ণনা রয়েছে। বীরদের প্রশস্তি, দেবপালের লিখিত মোহর, গোপালদেব-নামাঙ্কিত বাগীশ্বরী প্রস্তরলিপি, মহীপালের রাজত্বকালের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বছরের দুটি *অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা*[২৮] গ্রন্থ, 'শ্রীনালন্দা মহাবিহারীর আর্য্যভিক্ষু সঙ্কাস্য'-এর একটি মোহর, বালাদিত্য প্রস্তরলিপি নালন্দায় আবিষ্কৃত হওয়ায় অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। পালরাজ রামপালের রাজত্বের চতুর্থ বছরে গ্রহণকুম্ভ নামে এক ব্রাহ্মণের নকল করা *অষ্টসাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা* পুথির পুষ্পিকায় 'পরম ভট্টারক পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্‌ গোপালদেব'-এর নাম রয়েছে।

নালন্দার নামের অর্থ সম্পর্কে পণ্ডিতদের নানা মত রয়েছে। প্রাচীন সঙ্ঘারামের দক্ষিণে আম্রগৃহের মধ্যস্থলে একটি দীঘিতে বাসকারী নালন্দ নাগের নামানুসারে স্থানটির নামকরণ হয়েছিল বলে হিউয়েন সাঙ ও ইৎ সিৎ বলেছিলেন। হিউয়েন সাঙ আরও বলেছেন যে পুরাকালে বুদ্ধদেব এইস্থানে বোধিসত্ত্বরূপে জন্মগ্রহণ করে পরবর্তীকালে দেশের রাজা হয়ে অনবরত দান করতেন বলে এই স্থানের নাম নালন্দা হয়েছিল।[২৯]

সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিউয়েন সাঙ মগধে এসে নালন্দার বিস্তৃত বর্ণনা করে লিখেছেন যে বুদ্ধের নির্বাণের পর পাঁচজন রাজা ক্রমান্বয়ে পাঁচটি সঙ্ঘারম নির্মাণ করেছিলেন। তারপরে মধ্যভারতের জনৈক রাজা আরেকটি সুন্দর সঙ্ঘারাম এবং সকল সঙ্ঘারামের চারদিকে একটি উঁচু প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। হুণরাজ মিহিরকুলের সমসাময়িক (রাজত্বকাল ৫১০ খ্রিস্টাব্দ) মগধরাজ বালাদিত্য একটি সঙ্ঘারাম নির্মাণ করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার কানিংহামের মতে, বালাদিত্যের আগের তিনজন নরপতি যদি প্রত্যেকে পঁচিশ বছর করে রাজত্ব করে থাকেন, তবে ৪৩৫ – ৪৫০ খ্রিস্টাব্দ মধ্যে নালন্দার প্রথম মন্দিরের নির্মাণ হয়েছিল। তবে নালন্দার খননকার্য সম্পূর্ণরূপে শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়।

হিউয়েন সাঙ নালন্দার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে লিখেছিলেন যে হাজার হাজার যোজন দূরবর্তী স্থান থেকে দশ হাজার বিদ্যার্থী এখানে বিদ্যালাভের জন্য সমবেত হতেন। এর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া দুরূহ ছিল, তৃতীয় চৈনিক পর্যটক ইৎ সিৎ এখানে বিদ্যালাভের জন্য এসেছিলেন। তিনি এখানকার পাঠ্যপুস্তকাদির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। অনেক বৌদ্ধাচার্য নালন্দা থেকে তিব্বতে গিয়েছিলেন। ধর্মসংক্রান্ত পাঠ ছাড়াও হেতু, শব্দ, চিকিৎসাবিদ্যা এবং তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হত। অন্যান্য বিদ্যার

অনুশীলনও হত। ইৎ সিং-এর সময়ে এর সঙ্গে ব্যকরণ, ন্যায়দ্বার, তর্কশাস্ত্র, জাতক বাক্য এবং বেদও পড়ানো হত।[৩০] বিদ্যালাভের শেষে বিদ্যার্থীকে উপাধি প্রদান করা হত এবং প্রধান প্রধান বিদ্যার্থীর নাম প্রাচীরগাত্রে লিখিত হত। প্রাবন্ধিক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন –

অক্কোধেন জিনে কোধং, অসাধুং সাধুনা জিনে।

জিনে কদরিষং দানেন, অচ্চেন অলীক বাদিনং।

অর্থাৎ, মৈত্রীর দ্বারা ক্রোধ জয় করবে; সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করবে; ত্যাগের দ্বারা কৃপণকে জয় করবে ও সত্যের দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করবে।[৩১]

প্রাবন্ধিক বর্তমান ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এইরকম মহামন্ত্র প্রচারিত হবে এই শুভৈষণা প্রকাশ করেছেন।

সিংহল: বৌদ্ধধর্মের ইতিবৃত্ত

অস্বাক্ষরিত তিনটি প্রবন্ধ – ‘কাশীর ইতিহাস’ (*বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ,* ১২৫৯ – ১২৬০), ‘লঙ্কাদ্বীপ’ (*বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ,* ১২৫৯ – ১২৬০) ও ‘অনুরাধপুরের ইতিহাস’-এ (*বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ,* ১২৬০ – ১২৬১) শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে নানা তথ্য রয়েছে। অস্বাক্ষরিত ‘সিংহল যাত্রা’ প্রবন্ধটি (*নবজীবন,* মাঘ, ১২৯৯) ভ্রমণকাহিনি হলেও পুরাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় সমৃদ্ধ। এই প্রবন্ধের মতামতকে আপত্তি জানিয়ে কৈলাসচন্দ্র সিংহ “সিংহল যাত্রা” – প্রতিবাদ’ (*নবজীবন,* ফাল্গুন, ১২৯১) প্রবন্ধটি লেখেন। থেরবাদী বৌদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতি জানার জন্য শ্রীলঙ্কা ও বার্মার কথা জানা জরুরি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আদি বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত অনুসন্ধান শ্রীলঙ্কাকে সামনে রেখেই সূচিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকে *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ*-এ বহির্ভারত সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত হয়। আদি বৌদ্ধধর্মের সন্ধানের পাশাপাশি বাঙালির অতীত গৌরবচর্চার জন্য শ্রীলঙ্কার ইতিহাসচর্চা জরুরি ছিল।

ত্রিপিটক-বহির্ভূত পালি সাহিত্যের মধ্যে ইতিহাসাশ্রয়ী কাব্যগ্রন্থ বা বংশ সাহিত্যের পরিধি বিশাল এবং তা বহুবিস্তৃতও বটে। পালি শব্দ ‘বংস’(বংশ) ‘ধারা’, ‘বংশক্রম’, ‘ইতিহাস’ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বংস পর্যায়ের পালি গ্রন্থের উৎস সম্ভবত বুদ্ধের বংশক্রম অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব বুদ্ধদের ধারা নিয়ে রচিত *খুদ্দকনিকায়*-এর *বুদ্ধবংস*। প্রথম কালপর্বে সিংহলী ভিক্ষুরা এবং পরবর্তী কালপর্বে ব্রহ্মদেশীয় ভিক্ষুরা এই ধরনের ইতিহাসাশ্রয়ী কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন যা বংসসাহিত্য নামে পরিচিত। এই সাহিত্যের পরিধি

কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ত্বের পর্যালোচনার মধ্যে না থেকে ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, পৌরনীতি, সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থার বিবরণ, কাহিনি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সিংহলে রচিত *দীপবংস* প্রাচীনতম বংসসাহিত্য। পালিভাষায় বংস-সাহিত্যের পরম্পরা আচার্য বুদ্ধঘোষের সময়ের আগে থেকে সূচিত হয়েছিল, যা বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নরূপে চলে এসেছিল। বংস-সাহিত্যগুলির মধ্যে *দীপবংস, মহাবংস, চূলবংস, সদ্ধম্মসংগ্রহ, মহাবোধিবংস, থূপবংস, হত্থবনগল্লবিহারবংস, দাঠাবংস, ছকেসধাতুবংস, গন্ধবংস, সাসনবংস* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৩২]

'লঙ্কাদ্বীপ' প্রবন্ধে সিংহল বা শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ইতিহাস সম্পর্কে বলা হয়েছে, বুদ্ধদেব ভারত থেকে শ্রীলঙ্কার 'আদম শিখর' পর্বতশৃঙ্গে নামেন, সেখানে তিন হাত দীর্ঘ এবং এক হাত প্রস্থ পদচিহ্ন দেখা যায়। এটিকে বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবের, মুসলমানেরা আদমের এবং হিন্দুরা শিবের বলে দাবি করেন। শ্রীলঙ্কার আধুনিক ভাষাকে প্রাচীন পালিভাষার অপভ্রংশ বলা হয়েছে। সিংহলীরা *মহাবংস, রাজাবলী, রাজরত্নাকরী* ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁদের রাজবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। রাজবৃত্তান্তগুলির মতে, বুদ্ধদেব ২৩৯৮ বছর আগে লঙ্কাদ্বীপে এসে সদ্ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় বাংলাদেশের রাজা ছিলেন সিংহবাহু। সিংহবাহুর দুই পুত্র – জ্যেষ্ঠ বিজয় এবং কনিষ্ঠ সুমিত্র। বিজয়বাহু লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করেন। সিংহবাহুর মৃত্যুর পর সুমিত্রের পুত্র পাণ্ডুবাস শ্রীলঙ্কায় রাজত্ব করেন। সেইসময় থেকে ইংরেজদের রাজত্ব স্থাপনের আগে ২৩২৪ বছর ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাণ্ডুবাসের উত্তরাধিকারীরা শ্রীলঙ্কা রাজত্ব করেছিলেন। ইংরেজ অধিকারের আগে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা শ্রীলঙ্কা আংশিক অধিকার করেছিলেন।

বাঙালি ইতিবৃত্তের সঙ্গে সিংহলের যোগের অনুষঙ্গই 'সিংহলযাত্রা'-এর প্রাবন্ধিককে সিংহলের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছে। *মহাবংস*-এর প্রথম অধ্যায় অনুযায়ী সিংহলে রাক্ষস নয়, যক্ষাধিকারের কথা বলা হয়েছে। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির নবম মাসে পৌষী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেব যক্ষ-পূর্ণ সিংহলকে পবিত্র করবার জন্য গিয়েছিলেন। প্রাবন্ধিক বিজয়বাহুর বাঙালিত্বের দাবিকে 'ভ্রান্তিমূলক' বলে নিজের মতের স্বপক্ষে যুক্তি সাজিয়েছিলেন। বিজয়বাহুর পিতা সিংহবাহু মগধের অন্তর্গত 'লাল' বন্যপ্রদেশের রাজা ছিলেন। লালের রাজধানী সিংহপুরে বিজয়ের জন্ম হয়েছিল। প্রাবন্ধিকের মতে, বঙ্গরাজের কন্যা সুরূপাদেবীর পৌত্র বিজয় বাঙালির স্বজাতীয়। লালপ্রদেশ নিরূপণ করা কঠিন। আগে ছোটোনাগপুর বিভাগের কতকাংশ মগধের অন্তর্গত ছিল। অনুমান করা যায়, বর্তমান সিংহভূম আগে লালপ্রদেশের

অন্তর্গত ছিল। যৌবনে ব্যভিচারী বিজয়বাহুকে বহিষ্কৃত করা হলে তিনি সাতশ লোক নিয়ে সিংহলে যক্ষদের ধ্বংস করে লঙ্কেশ্বর হন। তিনি যক্ষরাজধানী লঙ্কাপুরী ত্যাগ করে নিজের অবতরণস্থলের বাগানে 'তাম্রপর্ণী' রাজধানী নির্মাণ করেন। ক্রমে সমস্ত দ্বীপের নাম 'তাম্রপর্ণী' হয়। বিজয়বাহুর পিতা সিংহবাহু স্বহস্তে সিংহ বধ করেছিলেন বলে তাঁর বংশের নাম 'সিংহল' হয়েছিল। সুতরাং, বিজয়ের রাজ্যের নাম সিংহল রাজ্য এবং দ্বীপের নাম 'সিংহল' দ্বীপ হয়েছিল। *মহাবংস*-এর সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী প্রাবন্ধিক এই বর্ণনা করেছেন। উত্তর সিংহলের ইতিবৃত্ত অনুযায়ী শৈব বিজয়বাহু নিজ রাজধানীতে চারটি শিবালয় নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে নীলকণ্ঠ আচার্য নামে কাশী নগরীর একজন ব্রাহ্মণ এসেছিলেন। আর কোনও ব্রাহ্মণ রাক্ষসের দেশে আসতে চাননি বলে বিজয় অনেক বৌদ্ধকে সিংহলে আনেন। বিজয়ের সিংহলে অবতরণের সময় থেকে 'সিংহল' অব্দের সূচনা হয়। মগধরাজ অজাতশত্রুর রাজ্যের আঠারো বছর অর্থাৎ বুদ্ধের নির্বাণপ্রাপ্তির বছর (৫৪৩ খ্রিস্টপূর্ব) বিজয়বাহু শ্রীলঙ্কা জয় করে সাঁইত্রিশ বছর প্রজাপালন করেছিলেন।

"সিংহল যাত্রা" – প্রতিবাদ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক 'দৃঢ়' বিশ্বাসে বলেছেন যে বিজয়সিংহ 'খাঁটী বাঙ্গালী'। *মহাবংস* গ্রন্থের ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদ অনুসারে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। বঙ্গের রাজধানী বঙ্গনগরে বঙ্গ নামে রাজার মহিষী ছিলেন কলিঙ্গ রাজকন্যা। তাঁদের কন্যার নাম সূপ্পদেবী বা সূর্পদেবী। তিনি যৌবনে মগধগামী বণিকের সঙ্গে পালিয়ে যাবার পথে 'লাঢ়' অর্থাৎ রাঢ় প্রদেশের এক সিংহ (অরণ্যবাসী দস্যু) বণিককে বধ করে সূর্পদেবীকে হরণ করেছিলেন। সিংহ-সহবাসে সূর্পদেবী যমজ পুত্র-কন্যার (সিংহবাহু ও সিংহবলী) জন্ম দিয়েছিলেন। পুত্র-কন্যা বড় হলে সূর্পদেবী পুত্রের সাহায্যে বঙ্গরাজ্যে পালিয়ে এসেছিলেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অদর্শনে সিংহ লোকালয়ে অত্যাচার শুরু করলে অত্যাচারিত প্রজারা বঙ্গরাজের কাছে অভিযোগ করেছিলেন। বঙ্গরাজ সিংহবাহুকে সিংহবধ করতে পারলে লাঢ় প্রদেশ দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কুমার সিংহবাহু সিংহ বধ করে ফিরে এসে দেখেন বঙ্গরাজ পরলোকগমন করেছেন। প্রজারা তাঁকে সিংহাসনে বসতে অনুরোধ করলে তিনি অসম্মত হয়ে মায়ের বর্তমান স্বামী অনুরকে বসিয়েছিলেন। সিংহবাহু সিংহবলীকে নিয়ে লাঢ়ে গিয়ে সিংহপুর নির্মাণ করে সিংহবলীকে বিয়ে করে রাজা হয়েছিলেন। সিংহবলীর গর্ভে বত্রিশটি সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিজয়। সিংহবাহু অত্যাচারী

বিজয়কে প্রজাদের উপর অত্যাচারের শস্তিস্বরূপ নির্বাসিত করেন। বিজয় ছয়শনিরানব্বই জন অনুচর নিয়ে সিংহল অধিকার করেছিলেন।

প্রাবন্ধিক প্রশ্ন করেছেন যে সেই সময় 'লাঢ়' প্রদেশ মগধের অন্তর্গত হলে বঙ্গরাজ কীভাবে সেই প্রদেশ দান করতেন? আর সিংহের দ্বারা অত্যাচারগ্রস্ত প্রজারাই বা কেন মগধেশ্বরের কাছে না গিয়ে বঙ্গরাজের কাছে গেলেন? *মহাবংস*-এর অনুবাদক টার্ণার পালিভাষায় 'র'-এর পরিবর্তে 'ল'-এর ব্যবহার হওয়ার জন্য 'লাঢ়'কে 'Lal' লিখেছিলেন। প্রাবন্ধিক তাঁর যুক্তি অনুসারে সিদ্ধান্তে এসেছেন – 'বঙ্গেশ্বরের দৌহিত্র পুত্র – রাঢ় প্রদেশ নিবাসী খাঁটী বাঙ্গালী বিজয় সিংহ দ্বারা সিংহল বক্ষে বিজয় পতাকা সংরোপিত হইয়াছিল'।

'অনুরাধপুরের বৃত্তান্ত' প্রবন্ধে *মহাবংস* অনুযায়ী শ্রীলঙ্কার পূর্বতন রাজধানী ও রাজাদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বিজয়ের সিংহলজয়ের কিছু পরেই (৫২৩ বঙ্গপূর্বাব্দ) অনুরাধা নামে তাঁর জনৈক পার্ষদ এই নগর স্থাপন করেছিলেন। পাণ্ডুকাভয় (৬০ বঙ্গপূর্বাব্দ) এখনে রাজপাট স্থাপন করে একে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন।[৩৩] তিস্‌স রাজার শাসনকালে এই নগরীর সৌষ্ঠব সকল দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৩৪] তিনি পবিত্র বটবৃক্ষ গঙ্গাতীর থেকে সিংহলে এসে অনুরাধাপুরের সামনে মহাবিহারে স্থাপিত করেন (৯০১ বঙ্গপূর্বাব্দ)। এর থেকে অনুমান করা যায়, মহাবিহার তখন নগরের বাইরে ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তা অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজা মহাসেন (৬২১ বঙ্গাব্দ) বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধ মতানুগামী হয়ে অনেক বড় বড় অট্টালিকা ভাঙেন, পরে মত পরিবর্তন হলে তা পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। অনুরাধাপুরের সঙ্গে মালবারের যুদ্ধ (বঙ্গাব্দ প্রথম শতক) লাগে যা চব্বিশ বছর পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়।[৩৫] এর মধ্যে অনুরাধপুর আক্রমণকারীদের অধীনে এলে রাজবংশীয়রা এই নগর পরিত্যাগ (১৭৫ বঙ্গাব্দ) করেছিলেন। নগরের পুরনো অট্টালিকাগুলি প্রাচীন উন্নত ব্যবস্থার সূচক। বুদ্ধদেবের কণ্ঠাস্থির উপরে রাজা তিস্‌স থুফুরময়া একটি অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন (৭০ বঙ্গপূর্বাব্দ)। তার কাছে যেসকল চিত্রিত প্রস্তরময় স্তম্ভ, বৃষ ও সিংহের অসংখ্য মূর্তি রয়েছে। লোবামহাপয়া নামে সুবিশাল অট্টালিকা দ্রুতগামিনের রাজত্বকালে (২২৭ বঙ্গপূর্বাব্দ) নির্মিত হয়েছিল। এই অট্টালিকা বিষয়ে চীনদেশীয় বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের বর্ণনার সঙ্গে *মহাবংস*-এর মিল রয়েছে।

অশোক (রাজত্বকাল ২৭২/২৬৮ – ২৩২ খ্রিস্টপূর্ব): বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি

মানব ইতিহাসে সম্রাট অশোক তাঁর কার্যবলীর গুণের একক হয়ে রয়েছেন। অস্বাক্ষরিত 'অশোক রাজার উপাখ্যান' (*বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ,* মাঘ, ১২৫৮), রামদাস সেনের 'ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত' (দ্বিতীয় সংখ্যা) (*বঙ্গদর্শন,* ভাদ্র, ১২৭৯), চারুচন্দ্র বসুর 'অশোকের ধর্ম্মলিপি' (*নারায়ণ,* অগ্রহায়ণ, ১৩২৩), বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের 'চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক' (*বঙ্গবাণী,* মাঘ, ১৩৩৩) প্রবন্ধগুলিতে অশোকের জীবন ও কার্যাবলী সম্পর্কে নানা তথ্য রয়েছে।

'অশোক রাজার উপাখ্যান' প্রবন্ধটি 'একেশ্বর' অশোকের জীবনী বিষয়ক প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা প্রবন্ধ যেখানে তাঁর সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য দেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধে অশোক লিপির পাঠোদ্ধারের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নানা তথ্য যেমন কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কারের সহায়তায় জেমস্ প্রিন্সেপের অশোকলিপি পাঠের উল্লেখ রয়েছে। দিল্লির কাছে ফিরোজ শাহ লাঠ নামে এক জয়স্তম্ভের গায়ের অক্ষর পড়ে তাঁরা সিদ্ধান্তে আসেন, এটি 'পিয়দশি' নামক কোনও বৌদ্ধরাজার শাসনপত্র। ভারতের পাটনার কিছু দূরে বক্রাগ্রামে, বেতিয়া জয়পুরের ভাবরাগ্রামের কাছে বনের মধ্যে, পূর্বে সমুদ্রতটে ধাউলী গ্রামের কাছে পর্বতশৃঙ্গে, পশ্চিমে সৌরাষ্ট্রের জুনাগরের কাছে, সিন্ধুনদের পশ্চিম পাড়ে আফগানিস্তানের কপর্দগিরিতে পালিতে লিখিত বিজয়স্তম্ভ পাওয়া গেছে। সিংহলী পালি বৌদ্ধগ্রন্থে প্রিয়দর্শী অশোকের (১১৬ বঙ্গপূর্বাব্দ) আদেশে ভারতের নানাস্থানে জয়স্তম্ভ ও শাসনপত্র প্রচারের কথা বলা হয়েছে। অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তির চতুর্থ বছরে পাটলিপুত্রে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। সেই সময়কার ধর্মলিপি ও শাসনপত্রে তাঁর রাজ্যাব্দের ব্যবহার সূচিত হয়েছিল। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র নিগ্রোধের পরামর্শে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ত্যাগ করে 'উত্তম' বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। নেপাল প্রভৃতি উত্তরের বৌদ্ধরা বলেন যে সমুদ্র নামের বৌদ্ধ বণিক তাঁকে অদ্ভুত কীর্তি দেখিয়ে স্বমতে আনেন। অশোক 'অহিংসা পরমোধর্ম' – এই মহানিয়মের অনুগামী হয়ে পশুহত্যা, মৃগয়া, রাজক্রীড়া বন্ধ করেন ও ব্রাহ্মণদের বদলে শ্রমণদের আহারের ব্যবস্থা করেন। তাঁর রাজ্যের সব জায়গায় প্রতি পাঁচ বছরের ব্যবধানে ধার্মিক ব্যক্তিরা একত্রে সমবেত হয়ে ধর্মবিচারে নিযুক্ত হতেন।

অশোক তাঁর রাজত্বকালের আঠারো বছরে বৌদ্ধধর্মের অভ্যন্তরীণ সমস্যা দূর করতে এক মহাসভার আহ্বান করেন যা 'তৃতীয় মহাধর্ম্ম সাঙ্কথ্য' (আনুমানিক ২৫১ খ্রিস্টপূর্ব) নামে পরিচিত হয়। এই মহাসভায় বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ সংকলিত হয়েছিল এবং নানাস্থানে ধর্মপ্রচারক প্রেরণের সিদ্ধান্ত অনুসারে

ধর্মরক্ষিত মহারাষ্ট্রে, স্থবির অপরান্তকে, মহেন্দ্র সিংহলে ধর্মপ্রচারেরর জন্য গিয়েছিলেন। গ্রিকরাজ্যসমূহেও অশোক স্থবির প্রেরণ করে নিজের মতপ্রচারে উদ্যোগী ছিলেন বলে জুনাগড় লিপিতে প্রমাণ রয়েছে। তিনি 'ধর্মমহামাত্র' নামে কর্মচারী নিযুক্ত করে সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি রাজ্যের পথের প্রতি আধক্রোশ দূরে কূপ খনন, স্থানে স্থানে পশুপাখি প্রভৃতি সকল জীবের রক্ষার জন্যে ধর্মশালা স্থাপন, নানারকম সুন্দর স্তম্ভ নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কাজ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধবন্দীদের দাস বানান নি বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন নি। তিনি হত্যাকারীদের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য তাঁদের ধর্মানুষ্ঠানে যুক্ত করতেন, পাষণ্ডদের কৌশলে ধর্মপথে আনবার জন্য কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে পেতেনিক, পূর্বে কলিঙ্গ ও সম্ভবত সমগ্র বঙ্গদেশ ও দক্ষিণে কর্ণাট পর্যন্ত তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাঁইত্রিশ বছর রাজত্ব করার পর অশোকের মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কুণাল পাঞ্জাব ও কনিষ্ঠপুত্র পাটলিপুত্রের রাজা হন এবং মধ্যম পুত্র জনোক কাশ্মীর রাজ্য গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তে শিবপূজা প্রচার করেন।

'ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত' প্রবন্ধে বিন্দুসারের মৃত্যুর (২৬৩ খ্রিস্টপূর্ব) পর অশোকের সিংহাসন দখল; একচল্লিশ বছর রাজত্বের পর অশোকের মৃত্যু (২২২ খ্রিস্টপূর্ব) ও *বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, বায়ুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ* গ্রন্থে তাঁর বিবরণের উল্লেখ রয়েছে। *মহাবংস* অনুযায়ী চণ্ডাশোক থেকে অশোকের রূপান্তরের কথা প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম গুরুত্ব হারানোয় বৌদ্ধধর্মের বিশেষ উন্নতি ঘটেছিল। তিনি চুরাশি হাজার বিহার এবং কীর্তিস্তম্ভ ভারতের নানা স্থানে নির্মাণ করেছিলেন। প্রবন্ধে অশোকের নানা জনহিতকর কার্যাবলী, ধর্মপ্রচারের উল্লেখ করে প্রিয়দর্শী ধর্মাশোক নামের যাথার্থ বিচার করা হয়েছে। *দীপবংস* ও *মহাবংস* অনুযায়ী সিংহলে অশোকপুত্র মহেন্দ্রের ধর্মপ্রচারের উল্লেখ করা হয়েছে। অশোকের সময়ে মগধে সংঘটিত বৌদ্ধাচার্যদের তিনটি সভায় বুদ্ধের উপদেশ সূত্রগুলির সটীক ত্রিপিটক সংগ্রহ ও পালিভাষায় সিংহলীদের জন্য বুদ্ধঘোষের ত্রিপিটকের অর্থকথা সংকলনের তথ্যও প্রবন্ধে পরিবেশিত হয়েছে। প্রবন্ধে অশোক-পরবর্তী রাজত্বকালের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে যেখানে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর সাতজন ময়ূরীয় (মৌর্য) বৌদ্ধরাজা ভারতবর্ষ শাসন করার পর শুঙ্গ রাজত্বের সূচনা হয়েছিল। পুষ্পমিত্র শুঙ্গ ১৮৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে একটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধস্তূপ তৈরি করেছিলেন। শুঙ্গবংশের পর কণ্ববংশের রাজত্বকালে (৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) হিন্দুধর্মের প্রাবল্য বৃদ্ধিতে বৌদ্ধধর্ম

ম্লান হয়ে গিয়েছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পর কান্যকুব্জের 'হিন্দু' রাজা 'ভুবন বিখ্যাত' হর্ষবর্ধন প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর রাজত্ব করে ৩৫০ খ্রিস্টাব্দে লোকান্তরিত হন। হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ ছিলেন একথা ইতিহাস সমর্থিত, তাই তাঁকে আমরা 'বৌদ্ধ' বলেই মনে করি।

'আর্য্যবীরগণের দিগ্বিজয়' প্রবন্ধে 'আর্য্যবৈজয়ন্তী' ওড়ানোই প্রাবন্ধিকের লক্ষ্য হওয়ায় সংস্কৃত সাহিত্য অনুযায়ী রঘু, অর্জুন, ভীম, নকুল, ললিতাদিত্য, বাপ্পারাও, দেবপালদেবের সংক্ষিপ্ত বিবরণের সূত্রেই অশোকের নাম এসেছে। মগধ সাম্রাজ্যের 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক' (রাজত্বকাল ২৬৩ –২২৩ খ্রিস্টপূর্ব) সমস্ত ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ার কিছু অংশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ভারত ও আফগানিস্তানের গিরিগাত্রে 'ভারতেতিহাসে প্রসিদ্ধং' অশোকের অনুশাসন খোদিত রয়েছে।

'চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক যে অভিন্ন নন – এই কথাই যুক্তির মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। গ্রিকবীর সেলুকসের থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত বিস্তীর্ণ জনপদের উদ্ধারকারী ভারতীয় রাজা Sandrocottus নামে পরিচিতি। নগেন্দ্রনাথ বসু *বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস*, বৈশ্যখণ্ডে তঁকে তৃতীয় মৌর্য্যনরপতি অশোকচন্দ্রগুপ্ত বা অশোক বলেছেন। প্রাবন্ধিক এই মতের বিরোধিতা করে Sandrocottus–কে প্রথম মৌর্যচন্দ্রগুপ্ত ও অশোককে আলাদা বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন।

'অশোকের ধর্ম্মলিপি' প্রবন্ধে অশোক চরিত্রের মহত্ত্ব, সাম্রাজ্যের মূল শক্তি ও 'অশোক-যুগের প্রকৃত ইতিহাস' জানার জন্য তাঁর খোদিত ধর্মলিপি বা অনুশাসনলিপির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাঁর ধৌলি ও জৌগড় প্রাচীন কলিঙ্গে অবস্থিত হওয়ায় এই লিপি 'কলিঙ্গ অনুশাসন' (অভিষেকের চোদ্দ ও পনেরো বছর অর্থাৎ ২৫৪ – ২৫৫ খ্রিস্টপূর্বে খোদিত) নামে পরিচিত। এই অনুশাসনে তিনি রাজনীতির উচ্চ আদর্শ প্রকাশ করে রাজনীতি ও ধর্মনীতির সামঞ্জস্যে এক 'অভিনব ধর্ম্মরাজ্য' স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। শাসন সম্পর্কে তাঁর মত হল – দণ্ড ও নিদিধ্যাসনের উপায়ে ধর্মবৃদ্ধি হয়, কিন্তু তার মধ্যে ধর্মনিয়ম অকিঞ্চিৎকর, নিদিধ্যাসনই শ্রেয়। মানুষের ধর্মবৃদ্ধি ও পারলৌকিক কুশল কামনায় তিনি কতগুলি 'ধর্মনিয়ম'-এর প্রচলন করেন। চৌদ্দটি শিলা বা গিরিলিপি অশোকের অভিষেকের তেরো ও চোদ্দ বছরে বা ২৫৬ – ২৫৭ খ্রিস্টপূর্বে খোদিত হয়েছিল। প্রথম অনুশাসনে প্রাণিহত্যা নিবারণ; দ্বিতীয়ে সর্বজীবে করুণা; তৃতীয়ে ধর্ম-তত্ত্বাবধারণের ব্যবস্থা; চতুর্থে ধর্মাচরণ ও বৃদ্ধি; পঞ্চমে ধর্মমহামাত্রের কর্তব্য;

ষষ্ঠে বার্তাবহদের প্রজাদের প্রয়োজনের অনুসন্ধান; সপ্তমে সংযম, একগ্রতা, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিষয় বর্ণন; অষ্টমে বিহারযাত্রা বা মৃগয়ার পরিবর্তে ধর্মযাত্রার উপকারিতা ও ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণ-শ্রমণদের দান, স্থবিরদের দর্শন, ধর্মপ্রচার, ধর্মজিজ্ঞাসা ইত্যাদি; নবমে 'ধর্মমঙ্গল', মহাফলদায়ক প্রকৃত মঙ্গলানুষ্ঠান; দশমে প্রকৃত মঙ্গলরূপে পারলৌকিক মঙ্গল; একাদশে ধর্মদানের শ্রেষ্ঠত্ব; দ্বাদশে অসাম্প্রদায়িক ঔদার্য; ত্রয়োদশে প্রকৃত বিজয়রূপে ধর্মবিজয় এবং চতুর্দশে আগের অনুশাসনগুলির বিস্তৃতি ও সংক্ষেপের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

অশোকের ভাব্‌ড়া অনুশাসন লিপিতে (অভিষেকের তেরো বছরে ২৫৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) তাঁর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তাঁর রাজত্বের শেষভাগে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে মানলে, অভিষেকের তেত্রিশ বা চৌত্রিশ বছরকে এই লিপি খোদাইয়ের কাল ধরতে হবে। 'দেবানং প্রিয় পিয়দসি'র পরিবর্তে 'পিয়দসিরাজ' একমাত্র এই অনুশাসনের মধ্যেই দেখা গেছে। মগধের বৌদ্ধসংঘকে উদ্দেশ করে বুদ্ধের সুভাষিত সদ্ধর্মকে তিনি কীভাবে চিরস্থায়ী করবেন তা এখানে উক্ত হয়েছে। এই লিপিতে তিনি কেবল 'ধর্ম্ম' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। প্রাবন্ধিকের বক্তব্য অনুসারে অশোক 'ধর্ম্ম' ও 'সদ্ধর্ম্ম'-এর মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন। ২৪১ – ২৪২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সংঘের বিবাদ-বিসম্বাদ রহিত করার জন্য সারনাথ, কোশাম্বী ও সাঁচী স্তম্ভলিপিতে অশোককে একদিকে রাজা ও অন্যদিকে সংঘাধিপতি বলা হয়েছে। অশোকের দ্বিতীয় দেবী প্রধানা মহিষী তিবলমাতা কালুবাকির (তিবরমাতা কারুবাকি) আম্রকানন, প্রমোদ উদ্যান, দানশালা প্রভৃতি দানের কথা দেবী অনুশাসনে খোদিত হয়েছে। রূপনাথ, সাসেরাম ও বৈরাটলিপিতে (অভিষেকের তেরো বছর ২৫৭ খ্রিস্টপূর্ব অথবা একেবারে রাজত্বকালের শেষভাগে খোদিত) অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ, শিক্ষার্থীরূপে আড়াই বছর অবস্থান, একবছর সংঘে যোগদান এবং 'অপ্রমাদ' হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। তিনি রুম্মিন্‌দী ও নিগ্লিভ স্তম্ভলিপি (অভিষেকের কুড়ি বছরে খোদিত) লুম্বিনীতে স্থাপন করে সেই গ্রামকে নিষ্কর ও অষ্টভাগী করেছিলেন। তিনি বরাবর গুহাগুলি (অভিষেকের বারো ও উনিশ বছরে খোদিত) আজীবকদের দান করে অসাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিলেন।

হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সম্পদ অশোকের মাস্কি অনুশাসনেই সর্বপ্রথম 'দেবনাং পিয়স অশোক' পদ দেখা গেছে। এটি রূপনাথ, সাসেরাম, বৈরাট ও সুবর্ণগিরি জাতীয় এবং এর প্রতিপাদ্য বিষয়ও এক। এইসকল শ্রেণির অনুশাসনের মধ্যে আছে – 'জংবুদীপাসি অংমিসং দেবা ... মিসং দেবা কটা'। সিল্‌ভাঁ

লেভি 'মিসা' (মাগধী 'মিসা'কে মিশ্রা অর্থে ব্যবহার করে) এবং 'মুসা'র অর্থপার্থক্য করে অনুবাদে লিখেছেন – জম্বুদ্বীপে অপ্রচলিত দেবতাদেরকে প্রচলিত করেছি অর্থাৎ আমার ধর্মমধ্যে গ্রহণ করেছি। এই অর্থ গ্রহণ করলে অশোককে উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে দেখা সম্ভব। রামকৃষ্ণ দেবদত্ত ভাণ্ডারকর, ফ্রেডরীখ উইলিয়ম টমাস, এম. ডি. হূলটস প্রমুখ এই অর্থ গ্রহণ করলেও এস. এন. রাও, দেভুলাপল্লী বেঙ্কট কৃষ্ণশাস্ত্রী প্রমুখ এটি মানতে নারাজ। মাস্কি অনুশাসন ভারতের ইতিহাসের এক মহা ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশক যেখানে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাটের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। আগে গ্রিক ও সিংহলী ইতিবৃত্ত, চিন পরিব্রাজকদের ভ্রমণকাহিনি, *অশোকাবদান* ও হিন্দুপুরাণের সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান করতে হত।

অশোকের সমগ্র ধর্মলিপি এখনও অনাবিষ্কৃত। তাঁর অনুশাসনাবলীর মর্ম হল জীবে দয়া, গুরুজনে ভক্তি ও সর্বধর্মে সমভাব। অহিংসাধর্ম প্রচার ও জীবে দয়ার সাপেক্ষে জৈনরা অশোককে জৈনধর্মী বলে দাবি করেছেন। তাঁর অভিষেকের প্রথম থেকে কলিঙ্গবিজয় পর্যন্ত আট-দশ বছরের কোনো ঘটনা কোন অনুশাসনের মধ্যে খোদিত হয়নি। *মহাবংস* গ্রন্থে বর্ণিত অশোকের সময়ে মহাস্থবির মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌সের সভাপতিত্বে তৃতীয় বৌদ্ধমহাসভার অধিবেশনের বিবরণকে ঐতিহাসিক ভিত্তিশূন্য বলে পরিত্যাগ করা চলে না বলে প্রাবন্ধিক মত প্রকাশ করেছেন। *মহাবংস*-এর মধ্যে সিংহল ও অন্যান্য দেশে প্রচারক পাঠানোর কথা থাকলেও অনুশাসনের মধ্যে তা স্পষ্ট করে কোথাও উল্লেখিত হয়নি। প্রবন্ধকার বলেছেন যে অশোকের অনুশাসনের মধ্যে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত অংশই *মহাবংস*-এ বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্ম ও জাতিভেদ প্রসঙ্গ

'জৈন বৌদ্ধ ও ভারতের জাতিরহস্য' প্রবন্ধে (*বঙ্গবাণী*, মাঘ, ১৩৩৪) কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী জৈন-বৌদ্ধের ইতিবৃত্তের অন্তরালে একটি বিদেশীয় উপনিবেশক জাতির গূঢ় প্রচ্ছন্ন ইতিহাসের সন্ধান করেছেন। হিন্দু শিক্ষাদীক্ষা ভাবসংস্কার বিকৃত ও কলুষিত হয়ে বৌদ্ধ-জৈন উভয় জাতিকেই 'বিধর্মী ঘৃণিত জাতি' বলে জ্ঞান করে থাকেন। জৈনের ছাড় থাকলেও কিন্তু বৌদ্ধের প্রতি ভারতের হিন্দুদের বিজাতীয় হিংসা-দ্বেষ পোষণ বিষয়ে সত্য তথ্য নিরূপণের জন্য প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধের লিখেছিলেন। বৌদ্ধরা বুদ্ধের অনুগামী, ত্রিশরণ চতুরার্যসত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণকারী। বৌদ্ধধর্মে আর্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ররা প্রবেশ

করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় – বুদ্ধের শিষ্য কাশ্যপ (পূর্বাশ্রমে ব্রাহ্মণ) ত্রিপিটকের অভিধর্ম, বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভাই আনন্দ (পূর্বাশ্রমে ক্ষত্রিয়) সূত্র এবং বুদ্ধের ভৃত্য উপালি (পূর্বাশ্রমে শূদ্র ক্ষৌরকার) বিনয় সংকলন করেছিলেন।

প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে কণিষ্ক ও অশ্বঘোষের সময়ে বৌদ্ধরা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হন – মহাযান এবং হীনযান। যাঁরা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী, সংসার-বিরাগী হয়ে প্রব্রজ্যা নিয়ে নিজের চিত্ত নির্মল করেছিলেন তাঁরা মহাযানী; কণিষ্ক ও অশ্বঘোষ এঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আর যাঁরা গৃহস্থ, বিষয় ভোগে আসক্ত, তাঁরা হীনযানী; পারিযাত্র অধিপতি নাগার্জুন (বুদ্ধের নির্বাণের পাঁচশ বছর পরে) তাঁদের অগ্রণী ছিলেন। এই নাগার্জুন মগধের মাধ্যমিকবাদী নাগার্জুন (বুদ্ধের নির্বাণের দেড়শ বছর পরে) নন। আমাদের মতে, প্রবন্ধে বৌদ্ধদের শ্রেণিবিভাগ সংক্রান্ত বক্তব্যে অস্পষ্টতা আছে। 'হীনযান' অর্থে তিনি কি 'থেরবাদী' বুঝিয়েছেন? থেরবাদী ভিক্ষুদের বোঝালে, তিনি তাঁদের সম্পর্কে 'গৃহস্থ, বিষয় ভোগে আসক্ত' বিশেষণ কীভাবে ব্যবহার করলেন? মনে হয়, তিনি থেরবাদীদের উদ্দেশে নয়, ভ্রষ্ট বৌদ্ধদের উদ্দেশেই এই বিশেষণ ব্যবহার করেছেন যা তাঁর পরবর্তী বক্তব্যেও পরিস্ফুট হয়েছে।

পারিযাত্র অধিপতি নাগার্জুনের অনেক সমধর্মী পারিষদ যেমন – বাদরায়ণ, জৈমিনি, ভৃগু, গৌতম, ভরদ্বাজ, কুশীতক প্রমুখেরা শাস্ত্র কলুষ করতে তাঁর সহায়তা করেন। কণিষ্কের সময় নাগার্জুন দলভুক্ত হীনযান সম্প্রদায় দুরভিসন্ধিবশত নিজেদের 'বৌদ্ধ' বলে স্বীকার করেছিলেন। কারণ কণিষ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁরা শাস্ত্রগ্রন্থ কলুষ করার সঙ্গে সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরও অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত*-এর 'সূচনা' অংশটি নিজেদের ইচ্ছানুসারে পরিবর্তন করেছিলেন।

বুদ্ধের পরিনির্বাণ সম্বৎ সম্রাট অশোকের শিলালেখে দেখা যায়। কণিষ্কের সময় 'সম্বৎ' নামে তাঁর রাজ্যাব্দ ব্যবহৃত হওয়ার পর 'শকাব্দ' ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছিল। এটি হিন্দু-বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই ব্যবহার করতেন। বিংশ শতকে জৈনদের 'বীরাব্দ' (মহাবীরের নির্বাণকাল ৫২৭ খ্রিস্টপূর্ব অনুযায়ী) ব্যবহার প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক প্রশ্ন তুলেছেন – যদি বীরাব্দ সেই সময় প্রচলিত হয়ে থাকে, তাহলে তা এতকাল অজ্ঞাত ছিল কেন? প্রাচীন জৈন লেখকরা তা কেন ব্যবহার করেন নি? এর কোন সদুত্তর না

থাকায় তিনি এটিকে বৌদ্ধদের বিরোধিতা করার জন্য জৈনদের উদ্ভাবিত মিথ্যা অব্দ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

আর্যবর্তের সম্রাট হর্ষবর্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাক্ষিণাত্যের চালুক্য পুলকেশী ৫৫৬ শকে জিনমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। হর্ষবর্ধন তাঁর রাজ্যের চব্বিশ বছরে ভারত ও বিদেশের অনেক ধর্ম সম্প্রদায়কে আহ্বান করে তাঁদের পৃথক পৃথক আবাসস্থান দিয়েছিলেন, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে একদিন রাতে অগ্নি উপাসক পারসিক ও মগ (Majii) পুরোহিত সঙ্ঘ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। পুলকেশী এই আক্রোশে দেশের নিরীহ বৌদ্ধদের অকারণে হত্যা করে, সত্য তথ্যকে গোপনের জন্য সুধন্বা নামে স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুরাজার উপর হত্যার দায় আরোপ করেছিলেন। *শঙ্কর বিজয়*-এ বৌদ্ধদের নিন্দা ও সুধন্বার প্রশংসা রয়েছে। যে জাতি অপর জাতির প্রতি জাতিক্রোধ হয়ে এরকম নিধনবার্তা উল্লাসের সঙ্গে বর্ণনা করতে পারেন তাঁদের জাতিরহস্য জানানোর জন্য প্রাবন্ধিক ভারতীয় জাতিতত্ত্বের ‘জটিল দুর্জ্ঞেয় অনিষ্পত্ত রহস্য’কে বুঝতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, শঙ্করাচার্য বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধজাতিকে ভারত থেকে বহিষ্কার করেছিলেন – এই মত ‘বহুকাল-পরিপুষ্ট কুসংস্কার’ মাত্র। শঙ্কর বুদ্ধদেবের নিন্দা করলেও বৌদ্ধদের ‘মায়াবাদ’ সমর্থন করে প্রকারান্তরে বুদ্ধের মতেই আস্থা রেখেছিলেন। তিনি কপিলের সাংখ্যমতের ‘প্রকৃতিবাদ’ খণ্ডন করে ব্রহ্ম ও মূল প্রকৃতিকে এক ও অভিন্ন বলে সমর্থন জানিয়েছিলেন। পদ্মপুরাণকার ত্রিমূর্তির ভগবান শঙ্করের প্রতি বৌদ্ধমায়াবাদের মোহজাল প্রচারের অভিযোগ আরোপ করেছিলেন। প্রবন্ধকার শঙ্করের স্বপক্ষে বলেছেন যে তিনি যদি বৌদ্ধ-বিদ্বেষী হতেন তবে পূর্ণবর্মা বা রাজ্যবর্ধনের নামোল্লেখ আর বৌদ্ধহন্তা পুলকেশী-শাসিত কেরলের কালদীত্ত ছেড়ে মগধে থেকে ভাষ্য রচনা করতেন না।

পারসিক উপনিবেশকরা ভারতে বাস করে হিন্দুজাতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে প্রথমে নিজেদের অগ্নিকুল ক্ষত্রিয় বলতেন। এঁরা চারকুলে বিভক্ত – প্রমার, চৌহান, শোলাঙ্কি (সরউগী), পারিহার। প্রাবন্ধিক গোত্র ধরে দেখিয়েছেন – বাদরায়ণ, পুলকেশী, কুমারপাল, নাগার্জুন শঙ্কলায়ণ (শোলাঙ্কি) গোত্রসম্ভূত। প্রমার ব্রাহ্মণ, চৌহান ক্ষত্রিয়, শোলাঙ্কি বৈশ্য ও পরিহার ক্ষত্রিয় হয়েছিল। আর্যাবর্তে পারিয়া (পরিহার) বিদ্বিষ্ট ও অত্যাচারিত জাতিরূপে পরিচিত। প্রাবন্ধিক বৌদ্ধদের উপর কলঙ্কলেপনের চক্রান্তের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যেমন – সদাচারী বৌদ্ধ গৃহস্থেরা নাগার্জুনের নির্বাসিত দলের

অভ্যুদয় কালে ‘ঘৃণিত পারিয়া’ বলে পরিচিত হয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যে জাতিবিদ্বেষ হলে সুধন্বা বা পুলকেশীর জাতভাইরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য হয়ে পারিয়া নাম ত্যাগ করে বৌদ্ধ গৃহস্থদের আক্রোশবশত ‘পারিয়া’ নামে অভিহিত করতেন।

প্রাবন্ধিকের মতে ‘বড় পুণ্যদেশ’ ভারতে দ্বেষ, হিংসা আগে ছিল না। বুদ্ধদেব এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে হিন্দু ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও সাধারণের সহানুভূতি লাভ করেন। হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে কোন সমস্যা ছিল না। রাজা অশোক বৌদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণ, শ্রমণ উভয়কেই সম্মান করতেন, অর্থ, ভূমি দান দ্বারা তৃপ্ত করতেন। বৌদ্ধদেরও আগে কপিলের সাংখ্য এবং মনুস্মৃতিতে পশুবধ নিষিদ্ধ হয়েছিল। প্রাবন্ধিক *মনুস্মৃতি*-র বিতর্কিত অংশগুলি বিদেশী ঔপনিবেশিকদের দ্বারা ভৃগু-অত্রি-গৌতমের নামে আরোপিত ও অনুপ্রবিষ্ট বলে মনে করেন। বৌদ্ধরা চোরের ন্যায় দণ্ডনীয় – *রামায়ণ*-এর এই মতটিও প্রক্ষিপ্ত বলে তাঁর অভিমত। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী তীর্থের পাণ্ডাগণ সকলেই পারসিকদের অগ্নিকূল-জাত, এঁরা কেউই আর্য মুনি-ঋষিদের বংশধর নন। তিনি দাক্ষিণাত্যের পরস্পরবিরোধী রামানুজ ও শঙ্কর সম্প্রদায়ের জাতীয় স্বভাবের লক্ষণ দেখে অনুমান করেছেন, এঁরা ‘পাশ্চাত্যের কুটিল জাতিরই বংশধর’; এঁদের উত্তরপুরুষ বাচস্পতি মিশ্র ও বল্লাল-চরিতকার আনন্দভট্ট বল্লাল সেনের উপর কৌলিন্য প্রথার দোষ চাপিয়েছেন। পারসিক বংশীয় অগ্নিকুলেরই শাখা থেকে জাত সুবর্ণ বণিকরা বাংলায় ব্যবসা আরম্ভ করে ঔদার্যগুণে সমাজে সম্মান পেয়েছিলেন।

প্রাবন্ধিকের মতে বুদ্ধদেবের শাক্য বংশও ভারতের উপনিবেশক, তাঁরা চীন থেকে প্রথমে শাকদ্বীপ (শাক – সেগুন গাছ, বার্মা শাকদ্বীপ নামে ঋষিদের কাছে পরিচিত) বা বার্মায় উপনিবেশ স্থাপন করার পর নেপাল-তরাইয়ের কপিলবস্তুতে এসে ইক্ষ্বাকুবংশীয় বলে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁদের সামাজিক অনুষ্ঠানে মনুমত অনুসৃত হয়নি। স্বগোত্রে বা স্ববংশে বিবাহ বার্মার রাজাদের মধ্যে এবং সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসে প্রচলিত ছিল।

আমরা এই প্রবন্ধে কোথাও কোথাও প্রাবন্ধিকের মাত্রাতিরিক্ত আবেগ লক্ষ করি, যার ফলে কোথাও কোথাও তথ্যগুলি অতিশয়োক্তির মত শোনায়। যেমন – বৌদ্ধ-হিন্দুর সম্পর্ক বাস্তবে তত মধুর ছিল না, থাকবার কথাও নয়। অথচ এদের সম্পর্ক নিয়ে প্রাবন্ধিক ঢালাও প্রশস্তি করেছেন। প্রচলিত মতে, দিগম্বর জৈনবংশজাত যুগীরা নাথ উপাধি নিয়ে নিজেদের গোরক্ষনাথ-মৎসেন্দ্রনাথ অথবা শঙ্করের

বংশধর বলে প্রচার করেন। জৈন নগ্ন তীর্থঙ্কর এবং তাঁদের উলঙ্গ চেলারা বিয়ে করতেন না। কিন্তু কালক্রমে শরীরি চাহিদার জন্য তাঁদের অবনতি ঘটে এবং সেবাদাসীর প্রচলন থেকে সহজিয়া প্রেমের উৎপত্তি হয় – এঁরাই তথকথিত বৌদ্ধ সহজিয়া মতের উদ্ভাবক। এর সঙ্গে বৌদ্ধ নাম কলঙ্কিত হওয়ায় প্রাবন্ধিক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। বৌদ্ধরা নির্মল চরিত্র ও সংসারবিরাগী থাকতেন, স্ত্রীজাতির সঙ্গে আলাপধর্ম সংঘ অনুসারে নিষিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধদের প্রতি প্রাবন্ধিকের নরম মনোভাবের ফলে তিনি সহজিয়া বৌদ্ধদের ইতিহাস যথাযথ ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। প্রাবন্ধিক ভারতের জাতিরহস্য আলোচনায় সিদ্ধান্তে এসেছেন যে জৈন-বৌদ্ধের ইতিবৃত্তের অন্তরালে 'মহাদুষ্কর্মান্বিত' পারসিক উপনিবেশক জাতির গূঢ় ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এঁরাই ভারতবর্ষে নানাপ্রকার অনাচার-দুর্নীতি এনে ও শাস্ত্রাদি কলুষিত করে ভারতের পরাধীনতা এনেছিলেন। শাস্ত্রে যেখানে অনুদার বিরুদ্ধমত দৃষ্ট হবে তা এঁদের কাজ বলে নিন্দিত হবে এবং পবিত্র শাস্ত্র থেকে সেই অংশগুলিকে বাদ দিয়ে পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা সকলের কর্তব্য বলে প্রাবন্ধিক মত প্রকাশ করেছেন। উগ্র স্বাজাত্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিতর্কিত হলেও ভারতবর্ষের সমাজতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে এই ধরণের আলোচনা খুবই জরুরি ছিল।

অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ 'জৈনধর্ম্ম'-এ (*আর্য্যদর্শন*, শ্রাবণ, ১২৮২) জৈনধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের কথা এসেছে। প্রাবন্ধিক লিখেছেন – শ্রমণ শব্দে বৌদ্ধ, জৈন বা ব্রাহ্মণ কোন প্রকার বিশেষ সম্প্রদায়কে বোঝায় না। কোন কোন পণ্ডিতদের মতে শ্রমণ অর্থে শূদ্রজাতীয় সন্ন্যাসীদেরকে বোঝায়। প্রমাণী অর্থাৎ প্রমাণবাদীরা বৌদ্ধ ও জৈনদের মতো বেদের প্রতিবাদ করেছেন। 'প্রমাণী' শব্দের তাৎপর্য পর্যালোচনা করলেও প্রতীতি হবে যে বৌদ্ধ ও জৈনরা এই শব্দের প্রতিপাদ্য হতে পারে না, কারণ প্রমাণবাদীরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত প্রমাণান্তর স্বীকার করেন না। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের উপাসকেরা নানাবিধ আখ্যায়িকোক্ত সিদ্ধপুরুষদের অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস করে থাকেন। সুতরাং, বৌদ্ধদের কীভাবে প্রমাণী বলে নির্দেশ করা যেতে পারে?

যাবতীয় জৈন গ্রন্থে বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্মই এক মূল থেকে উৎপন্ন বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। বৌদ্ধরা বুদ্ধ এবং জৈনরা মহাবীরের শিষ্য। বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়েই সমসাময়িক ব্যক্তি। প্রবন্ধকারের অভিমত অনুযায়ী জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর বৌদ্ধগ্রন্থাদি থেকেই নিজ প্রস্তাবিত ধর্মের মূলসূত্রগুলি সকল সংগ্রহ করেছিলেন। সেকেন্দ্রা নগরীর অধিবাসী ক্লেমেন্স লিখেছেন যে খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকে বৌদ্ধধর্মের

উপাসকরা ভারতবর্ষে বাস করতেন। সেইসময়ে রচিত অনেক হিন্দুগ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের প্রতিবাদ দেখতে পাওয়া যায়। আবার পরবর্তীকালে শঙ্করাচার্য প্রমুখের কঠোর প্রতিবাদে বৌদ্ধেরা ভারত ত্যাগ করে সিংহল, পূর্ব উপদ্বীপ, চীন প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছিলেন। তখন হিন্দুধর্মাবলম্বী গ্রন্থকারেরা 'বৌদ্ধ' শব্দের অর্থে জৈনধর্মের উপাসকদের বুঝতেন, কিন্তু প্রাচীনতর কালের হিন্দু গ্রন্থকাররা কখনোই এরকম প্রমাদে পড়েন নি। তাঁদের প্রযুক্ত বৌদ্ধ শব্দে প্রকৃত বৌদ্ধদেরই বুঝতে হবে। বিহার ও বারাণসীতে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের উদ্ভব ও প্রচার হয়েছিল। বারাণসীর রাজারা খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের উপাসক ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে গুজরাটরাজ বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে হেমচন্দ্রের চেষ্টায় গুজরাট রাজকুমার স্বধর্ম পরিত্যাগ করে জৈনধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কথিত আছে, জৈনরা খ্রিস্টিয় নবম শতকে বৌদ্ধদের উচ্ছেদের অব্যবহিত পরেই করমণ্ডল উপকূলে প্রবেশ করেছিলেন। জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের থেকে 'অনেক আধুনিক পদার্থ'।

জৈনরা খ্রিস্টিয় অষ্টম ও নবম শতকে সর্বপ্রথম ভারতের নানাস্থানে লব্ধপ্রসর হয়ে উঠেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদসাধনে শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি হিন্দু সম্প্রদায়ের মত জৈন সম্প্রদায়ও অবিরত চেষ্টা করেছিলেন। কাঞ্চীনগরীর বৌদ্ধেরা জৈন পুরোহিত অকলঙ্কের সঙ্গে বাদবিতণ্ডার ফলে কাঞ্চী থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। মধুরারাজ বরপাণ্ড্য জৈনধর্ম অবলম্বন করে বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করলে বৌদ্ধেরা প্রাণভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। গুজরাটের রাজারাও বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করে জৈনধর্ম অবলম্বন করে বৌদ্ধদের প্রতি নির্দয়ভাবে অত্যাচার করেছিলেন।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের পাঠ পর্যালোচনা করে প্রাবন্ধিক সিদ্ধান্তে এসেছেন যে জৈনরা বৌদ্ধধর্মের সারোদ্ধার করে তাতে কিছু নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করে একটি অভিনব ধর্মের উদ্ভাবন করেছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনরা এক ও অভিন্ন ধর্মপ্রণালীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্তির উপাসনা করলেও উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ থাকাতে ক্রমে শত্রুতা উপস্থিত হয়েছিল। হিন্দুরা বিধর্মী বৌদ্ধদের দমন করতে উদ্যত হয়েছে দেখে জৈনরা নিজেদের অভীষ্টসাধনের উদ্দেশ্যে হিন্দুদের আশ্রয়গ্রহণ করে হিন্দুধর্মের অনেক আচার ব্যবহার নিজেদের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। জৈনরা হিন্দু দেবদেবীদের ভক্তি, বেদবিহিত আচার প্রভৃতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা, জাতিভেদ স্বীকার এবং ব্রাহ্মণদের পুরোহিত নিযুক্ত করেছিলেন। প্রথমদিকে জৈনধর্মে জাতিবিচার না থাকলেও বৌদ্ধ দলনের জন্যে হিন্দুদের সঙ্গে মিলনের সময়ে জৈনরা জাতিভেদ

স্বীকার করেন। জৈনধর্মাবলম্বীরা স্বধর্ম পরিত্যাগ করে হিন্দুসমাজে প্রবেশ করতে চাইলে তাঁরা জাতি অনুসারে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রভৃতি জাতির মধ্যে গণ্য হতে পারেন, কিন্তু জাতিভেদহীন বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। একবার সনাতন হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলে বহু প্রায়শ্চিত্তের পরও হিন্দুসমাজে প্রবেশ করা যায় না।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'জাতিভেদ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত' প্রবন্ধে (*বঙ্গবাণী*, চৈত্র, ১৩৩৩) বর্তমান ভারতের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার উদ্ভবের সংক্ষিপ্ত সূত্রে বাংলায় ৩৬টি জাতির (কার্যক্ষেত্রে ৬০/৭০-এরও বেশি) মধ্যে জাতি ও বর্ণ অনুসারে কোন বৈষম্য না থাকার কথা বলা হয়েছে। নৃতত্ত্বের দিক থেকে একজন নমঃশূদ্র ও একজন ব্রাহ্মণের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য বোঝা যায় না। এর কারণ হিসাবে একসময়ে বাংলায় বৌদ্ধমতের অত্যন্ত বিস্তারলাভের প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক এই কথা উল্লেখ করেছেন। প্রায় হাজার বছর ধরে এখানে বৌদ্ধ প্রভাব বর্তমান ছিল, তখন জাতিভেদের বাঁধন শিথিল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ আবার তার সমস্ত কঠোরতা নিয়ে ফিরে এসেছিল। প্রাবন্ধিক বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে জাতিভেদহীন বৌদ্ধ আদর্শের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

বৌদ্ধধর্মের গ্রহণযোগ্যতা

শরৎচন্দ্র পালের 'জাপানী পুরাণ' (*নারায়ণ*, কার্তিক, ১৩২৭) প্রবন্ধে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশের অতি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে চীন, চীন থেকে কোরিয়া, কোরিয়া থেকে জাপানবাসীরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। জাপানের ইতিহাসে কথিত আছে যে ৫৫২ খ্রিস্টাব্দে হাকুসাই নামে একজন কোরিয়ান রাজা মিকাডো-কিন-মেইকে বুদ্ধদেবের একটি স্বর্ণপ্রতিমূর্তি ও কিছু বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক উপহার দেন। মিকাডোর এই নবধর্ম গ্রহণে ইচ্ছা থাকলেও শিন্টোধর্মাবলম্বী মন্ত্রীদল রাজসভা থেকে এই প্রতিমূর্তি অপসারণের অনুরোধ করলে মিকাডো বুদ্ধমূর্তিটি সোগানোইনামে নামক এক ভক্তকে উপহার দেন। তিনি তাঁর গ্রাম্য আবাসটিকে সর্বপ্রথম বৌদ্ধমন্দিরে পরিবর্তিত করেন।

শিবেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের বহুল ও সহজ প্রচারের কারণ' প্রবন্ধটিতে (*বঙ্গবাণী*, চৈত্র, ১৩৩২) বৌদ্ধধর্ম ভারতের মানুষকে কীভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিল তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভারতের

ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যক্ত করে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরিস্থিতি ও তাঁর ধর্মপ্রচার, বিম্বিসার, অশোক, কণিষ্কের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও প্রচারের উদ্যোগ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যামরাজ্য, নেপাল, তিব্বত, মোঙ্গলিয়া, চিন, জাপান প্রভৃতি বহির্বিশ্বে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। প্রাবন্ধিকের মতে, দেশের রাজার সাহায্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অত্যাচারে লোকে সে ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের অসামান্য ব্যক্তিত্ব, তাঁর সহজ ও সরল পালিভাষায় জনসাধারণের সহজবোধ্য উপদেশ ও সহজসাধ্য অহিংসা ও সর্বজীবে দয়া এবং পবিত্র জীবনযাপন – এই বাণী স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে নির্বিচারে প্রচার করার ফলেই সেইসময়কার মানুষের প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল। এতদিনের বিক্ষোভ ও অত্যাচার-জর্জরিত সমাজ যে একটা পরিবর্তন চাইছিলেন তারা তা বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পেলে তাকে সহজে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ‘দলের কথা’ (*বঙ্গবাণী*, ফাল্গুন, ১৩৩১) প্রবন্ধটিতে সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষাপটে সংঘশক্তির প্রায়োজনের কথা বলা হয়েছে। সংঘশক্তির দৃষ্টান্ত হিসেবে বৌদ্ধসংঘের অতীত গৌরবোজ্জ্বল সময়ের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তথাগতের ধর্ম সমগ্র এশিয়ায় ‘একটা প্রকাণ্ড শক্তি’ হয়ে উঠবার পিছনে বৌদ্ধ সংঘবাদের ভূমিকা অপরিসীম। বৌদ্ধধর্মে ত্রিরত্নের একটি রত্ন সংঘকে দেবতা এবং ধর্মের সঙ্গে সমান আসনে বসানো হয়েছে। ধর্ম ও বিনয়ের উপর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা থাকলেও সংঘের প্রতি সমান শ্রদ্ধাবান ও হিতকামী হতে হয়। বাংলা বা ভারতে সংঘভাবনা জরুরি। দল বেড়েই সমাজ বা জাতি গড়ে ওঠে, দল (সংঘ) সমাজের হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত হলে জাতি সমৃদ্ধ হয়। দল বাঁধার পথ জাতীয় জীবনের অভ্যুদয় যাত্রার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং সবচেয়ে সমীচীন পথ। এর ভিতরকার বিরোধকে জয় নয়তো সমন্বয় করে বৌদ্ধ সম্প্রদায় সাফল্য অর্জন করেছিলেন। সংঘের ‘দেবতা বুদ্ধ, তার বন্ধনসূত্র ধর্ম্ম’। দেবতা ও ধর্ম থেকে বিচ্যুতি ঘটলে সংঘ অসার প্রাণশূন্য হয়ে পড়ে, তখন তা শুধুই ‘একটা দল’, ‘একটা ঘোট’ হয়ে পড়ে।

দেশের উন্নতির জন্য সংঘবন্ধনকারীদের তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে দেবতা ও ধর্মবিচ্যুত সংঘ অভীষ্ট লাভের সহায় না হয়ে পরিপন্থী হয়ে পড়ে। জাতীয় সকল সংঘের এক দেবতা ও দেশ, সংঘের সেবার লক্ষ্য দেবতা আর তার উপায় ধর্ম যা সংঘবন্ধনের সূত্রও বটে। দেশের অভ্যুদয় দলের লক্ষ্য লাভের জন্য বিশিষ্ট কর্মপ্রণালীই দলের ধর্ম। শক্তির অপব্যবহারের প্রবৃত্তি নিবারণ করবার একমাত্র

উপায় বৌদ্ধদের মতো নিরন্তর সঙ্ঘের সঙ্গে দেবতা ও ধর্মের জপ করা ও দলের প্রত্যেক কাজকে ধর্মের কষ্টিপাথরে নিয়ত যাচাই করা। প্রাবন্ধিক বৌদ্ধ সংঘের গঠন ও শৃঙ্খলা পদ্ধতি কীভাবে বর্তমান সময়ের সাংগঠনিক কাঠামোকে পরিপুষ্টি দান করতে পারে সে সম্পর্কে মতপ্রকাশ করে প্রাচীন বৌদ্ধসংঘের আদর্শে দেশহিত সাধনের প্রস্তাব করেছেন।

উপসংহার

দীনেশচন্দ্র সেন *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সূচনাকালকে 'হিন্দু ও বৌদ্ধযুগ' (৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ) বলে অ্যাখ্যায়িত করেছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের কলহে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে যা বাংলাভাষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। গ্রন্থের অধ্যায় সূচিত হয়েছে এইভাবে –

> বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ভারতবর্ষের ত্রিসীমা হইতে তাড়িত হইয়াছে। যে অধ্যায়ে আমরা অশোক, শীলভদ্র ও দীপঙ্করকে পাইয়াছিলাম, উহা ভারত-ইতিহাসের এক স্বতন্ত্র অধ্যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুকরণে কত শত বাঙ্গালা পদ বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার উদার বুদ্ধ দেব-স্তোত্র বঙ্গীয় কবিতায় কোন উৎসাহের উদ্রেক করে নাই। ... যাঁহার লোকমধুর চরিত্র-কাহিনীতে এক অপূর্ব্ব উন্নত আদর্শ প্রতিফলিত, যাঁহার পবিত্র নিবৃত্তি ও আত্ম-সংযম প্রকৃতই মহাকাব্যের বিষয়, সেই বুদ্ধদেবের একটি সামান্য বন্দনাও প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে সুলভ নহে। ... হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানই বঙ্গভাষা ও গৌড়ীয় অন্যান্য ভাষার শ্রীবৃদ্ধির কারণ; এই জন্যই সেই সকল ভাষার সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি এই অবজ্ঞা দৃষ্ট হয়।[৩৬]

বাংলায় এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিউয়েন সাঙ মুঙ্গের এবং সমুদ্রের অন্তর্বর্তী প্রদেশসমূহে ১১৫০০ পুরোহিত দেখেছিলেন। পালরাজাদের সময়েও বৌদ্ধধর্ম বাংলায় প্রবল ছিল। খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মগধের রাজধানী ওদন্তপুরীতে মুসলমানরা বহুসংখ্যক বৌদ্ধভিক্ষুর প্রাণ সংহার করেছিলেন। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতের পণ্ডিত বুদ্ধগুপ্তনাথ এই দেশে কিছুটা এই ধর্মের প্রাদুর্ভাব দেখেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত পুথি বাংলার লেখকরা ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে লিখেছিলেন। চূড়ামণিদাস, গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রমুখ বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করার লক্ষ্যে প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধদের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ণ-প্রণেতা বঙ্গীয় কবি রামানন্দ নিজেকে বুদ্ধাবতার বলে প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। বাংলার প্রচলিত ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্মের বিকৃত ও একপ্রকার রূপান্তর এবং *ধর্মমঙ্গল* গ্রন্থগুলিতে ক্রমশঃ বৌদ্ধপ্রভাবের বিলয়ের ছবি পাওয়া যায়।

দীনেশচন্দ্র 'হিন্দু ও বৌদ্ধযুগ'-এর নিদর্শনরূপে *শূন্যপুরাণ,* নাথগীতিকা, কথাসাহিত্য, ডাক ও খনার বচনের উল্লেখ করেছেন। বঙ্গসাহিত্যের আদিযুগের একটি প্রধান দিক নির্দেশক স্তম্ভ *গোরক্ষ-বিজয়*-এ বৌদ্ধযুগের চরিত্রবল, উচ্চনীতি, গুরুভক্তি প্রভৃতি মহৎ গুণরাশিকে উজ্জ্বল করে দেখানো হয়েছে। নাথধর্মে বৌদ্ধ ও শৈবধর্মের শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিশে গিয়েছিল। পৌরাণিক ধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী এবং বৌদ্ধশক্তির পরিণতির যুগে নানা গ্রাম্য কথা রচিত হয়েছিল। প্রমাণস্বরূপ দীনেশচন্দ্র কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন – ক) কথাসাহিত্য ও এর মধ্যে থাকা ব্রতকথার ভাষা প্রাচীন। খ) ব্রতকথার এবং রূপকথার মধ্যে অতীত সমুদ্রযাত্রার অনেক ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে। পৌরাণিক যুগে হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। 'হিন্দু ও বৌদ্ধযুগ'-এ রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্র সামাজিক মর্যাদায় প্রায় সমকক্ষ ছিল। জাতিভেদ শিথিল ছিল, কারণ বিবাহ সময়ে জাতি সম্বন্ধে কোন কথাই উঠত না। বৌদ্ধ সময়ের চিহ্ন এখানে বর্তমান। গ) ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দী বা তার অব্যবহিত পরে বাংলার অধিকাংশ নিম্নবর্গের হিন্দু এবং বৌদ্ধ মুসলমান ছিলেন। তাঁরা ধর্মান্তরিত হবার পরেও তাদের 'জাতীয় বৃত্তি' ছাড়তে পারেননি। হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী থাকার সময় তাঁরা পাঁচালী গাইতেন, পূজা করতেন, রূপকথা শুনতেন। জ্বরাসুর প্রভৃতি গাথা, সাপের মন্ত্র, তন্ত্র হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবতাদের স্তুতিবাদে পূর্ণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মালঞ্চমালার রূপকথার গল্পে বৌদ্ধ-হিন্দু ধর্মে বর্ণিত নারীর সকল আদর্শ ও গুণরাশির সমন্বয় ঘটেছে। ডাক ও খনার বচন রচনার সময় বৌদ্ধপ্রভাব বাংলা থেকে উৎপাটিত হয়নি বলেই এতে পুকুর-খনন, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি লোকহিতের কথা রয়েছে। দীনেশচন্দ্র বৌদ্ধযুগে প্রচলিত, কিন্তু বর্তমানে অপ্রচলিত শব্দের সুবিশাল তালিকা *শূন্যপুরাণ* থেকে দিয়েছেন।[৩৭] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কার করবার পরেও তিনি এই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে তা অন্তর্ভুক্ত করেননি। চর্যাপদের ভাষাকে তিনি বাংলা বলে মেনে নিতে পারেননি বলেই হয়তো তাকে গ্রন্থে স্থান দেননি।

শরৎকুমার রায় *বৌদ্ধ-ভারত* গ্রন্থে কালগত ইতিহাসের থেকে গুণগত ইতিহাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করে লিখেছিলেন – 'বৌদ্ধ-ভারত বৌদ্ধযুগের নহে, বৌদ্ধ-সভ্যতার ইতিহাস'।[৩৮] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন 'বৌদ্ধযুগ'-এর সন্ধানের সূত্রে অবহট্‌ঠ কবিতা, চর্যাগীতির সূত্র ধরে বৌদ্ধসাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুসন্ধান করেছিলেন।[৩৯] রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের গ্রন্থে আদ্যকাল, মধ্যকাল, ইদানিন্তন কাল – এই তিন ভাগে বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ করেছিলেন।[৪০] বাংলা

সাহিত্যের যুগ-নিচয় আর রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের যুগ-পর্যায়কে মনোমোহন ঘোষ তাঁর *বাংলা সাহিত্য*-এ আলাদা ভাবে ভাগ না করে বাঙালির জাতীয় জীবনে সংঘটিত ঘটনা পরম্পরা অনুসারে যুগবিভাগ করেছিলেন – ক) প্রাচীন কাল ও আদিযুগ (৮০০ – ১২০০ খ্রিস্টাব্দ); খ) মধ্যকাল (১২০০ – ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ); গ) যুগান্তর কাল (১৭১৭ – ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ); ঘ) আধুনিক কাল (১৮০০ – বর্তমান কাল)।[৪১] তমোনাশ দাশগুপ্ত *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থে আদিযুগের সাহিত্য (অষ্টম থেকে দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দ) বা 'আদি যুগ'কে 'হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি এই যুগকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন – চতুর্থ অধ্যায়: ভাষা ও অক্ষর এবং ডাকার্ণব। ক) বাঙ্গালা ভাষা ও অক্ষর এবং খ) ডাকার্ণব; পঞ্চম অধ্যায়: চর্য্যাপদ। ক) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়। (কানুভট্ট সংগৃহীত)। খ) বোধিচর্য্যাবতার (খণ্ডিত) ও দোহাকোষ (সরহবজ্র রচিত)। ষষ্ঠ অধ্যায়: খনার বচন; সপ্তম অধ্যায়: শূন্য পুরাণ বা ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি (রামাই পণ্ডিত); অষ্টম অধ্যায়: গোপীচন্দ্রের গান ও গোরক্ষ-বিজয়; নবম অধ্যায়: ব্রতকথা।[৪২] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ *বাংলা সাহিত্যের কথা* গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক ভাগে ভাগ করেছেন। 'প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের ধারা' (৬৫০ – ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ) প্রবন্ধে আলোচনার বিষয় রূপে তিনি নাথপন্থা-গীতিকা-সিদ্ধাগণ, তান্ত্রিক বৌদ্ধমত বা সহজযান, চর্যাগানের সাহিত্যমূল্য, বৌদ্ধযুগে বাংলার সমাজচিত্র, বৌদ্ধগানের ভাষা, চর্যাপদের ব্যাকরণ, ধর্মপূজা, 'ধর্ম'-সাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্ব, *শূন্যপুরাণ* ও তার লেখক, *ধর্মমঙ্গল*, *ধর্মমঙ্গল*-এর হরিশচন্দ্র পালা, ময়ূরভট্ট, লাউসেনের কাহিনি, লোকসাহিত্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শহীদুল্লাহ 'বৌদ্ধযুগ' শব্দবন্ধটির উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধযুগ তথা প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবনের কিছু পরিচয় সর্বানন্দের অমরকোষের টীকা (১১৫৯ খ্রিস্টাব্দ) আর সরহপাদের দোহাকোষ থেকে পাওয়া যায়।[৪৩] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা* গ্রন্থে আদি ও মধ্যযুগের ভাগের মধ্যে 'চর্যাপদের সমকালীন সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ অবহট্ট রচনাবলী' ও 'চর্যাপদ' নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৪৪] গোপাল হালদার তাঁর *বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপ-রেখা* গ্রন্থে 'প্রাচীনযুগ' (৯০০ খ্রিস্টাব্দ – ১২০০ খ্রিস্টাব্দ) অংশে 'বাঙ্‌লা ভাষা ও বাঙালীর সাহিত্য ও চর্যাপদ' পরিচ্ছেদে আমাদের আলোচ্য সময় নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৪৫] ভূদেব চৌধুরী *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থে 'আদিযুগ', 'আদিযুগ-পরিণাম' – এইভাবে সাহিত্যকাল নিরূপণ করেছেন।[৪৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে ‘বৌদ্ধযুগ ভারতবর্ষের একটি প্রধান যুগ’, এটি ‘আর্য ভারতবর্ষ ও হিন্দু ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ’। আর্যযুগে ভারতের আগন্তুক ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ চলেছিল। বৌদ্ধযুগে এইসকল বিরুদ্ধ জাতিদের মাঝখানকার বেড়াগুলি ‘একধর্মবন্যায়’ ভেঙেছিল। শুধু তাই নয়, বাইরের নানা জাতি এই ধর্মের আহ্বানে ভারতবাসীদের সঙ্গে মিশেছিল। তারপরে এই মিশ্রণকে যথাসম্ভব স্বীকার করে এবং একে নিয়ে ব্যবস্থা খাড়া করে ‘আধুনিক হিন্দুযুগ’ মাথা তুলেছিল। বৈদিকযুগ ও হিন্দুযুগের মধ্যে আচারে ও পূজাতন্ত্রে যে গুরুতর পার্থক্য ছিল তার মাঝখানের ‘সন্ধিস্থল বৌদ্ধযুগ’। এই যুগে আর্য ও অনার্য এক গণ্ডির মধ্যে এসে পড়ার ফলে উভয়ের মানসপ্রকৃতি ও বাহ্য আচারের মধ্যে আদান-প্রদান ও রফানিস্পত্তির চেষ্টা সূচিত হয়েছিল। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে থেরবাদ তত্ত্বের দিকে আর মহাযান হৃদয়ের দিক-প্রকাশক। মহাযান সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগুলিকে আলোচনা করে দেখলে আমাদের পুরাণগুলির সঙ্গে সকল বিষয়েই তার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়, যার কিছু অংশ বৌদ্ধধর্মের নিজেরই বিশুদ্ধ স্বরূপগত; কিন্তু তা অনেকটা ভারতের অবৈদিক সমাজের সঙ্গে অতীত প্রাগ্‌বৈদিক উপাদানের মিশ্রণ-জনিত। বৌদ্ধযুগে যখন নানা জাতির সংমিশ্রণে বৌদ্ধযুগের শেষ ভাগে ক্রমশ এদের প্রভাব আর-সমস্তকে ঠেলে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা করবার চেষ্টা, যা নিতান্ত অনার্য তাকে আর্যবেশ পাবার প্রয়াস, এটাই ‘হিন্দুযুগের ঐতিহাসিক সাধনা’।[৪৭]

‘বৌদ্ধযুগ’ বলে কোন যুগের অস্তিত্বের কথা ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যায় না। ইতিহাস চর্চা বা সাহিত্যেতিহাস চর্চার স্বার্থেই এই যুগবিভাগের পরিকল্পনা ঘটে থাকে। ঊনবিংশ শতকে জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের জন্যই অতীত ভারতের গৌরবের প্রতি ঝুঁকবার একটা প্রবণতা ছিল। স্বভাবতই এই অনুসন্ধিৎসার সামনে বাংলা বা ভারতবর্ষের ঐক্যের প্রসঙ্গটা অত্যন্ত জরুরী ছিল। ভারতবর্ষকে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ রূপ দেওয়ার স্বপ্ন বৌদ্ধ সময়কালেই সূচিত হয়। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে বৌদ্ধ আদর্শ ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। উদার বৌদ্ধ অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, শিল্প সংস্কৃতি, বিশ্বশান্তি নানা দিক থেকে একটা নতুন পথের সন্ধান দিতে পেরেছিল। ‘বৌদ্ধযুগ’-এর প্রকল্প যে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এই যুগ বিভাজনকে অনেকেই গুরুত্ব দেননি বা ব্যবহার করেন নি। কিন্তু, ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধসংস্কৃতিকে অস্বীকারও করতে পারেন নি। ঊনবিংশ শতকে ‘বৌদ্ধযুগ’-এর বিনির্মাণ অত্যন্ত জরুরি ও অনিবার্য ছিল। বিংশ শতকেও স্বাধীনতা

প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত এই ভাবনা ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনার স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'বৌদ্ধযুগ'-এর পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন বা পরিপ্রশ্ন উঠলেও এই পরিকল্পনার জনপ্রিয়তা এখনো ম্লান হয়নি। আজকের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এই অভিধার সমালোচনা না করে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রেক্ষাপটে এর বিচার করাটা জরুরি। 'বৌদ্ধযুগ' সেই সময়ে স্বাজাত্যবোধের উদ্বোধন ঘটিয়ে নতুন একটি দিশা দেখিয়েছিল তা অনস্বীকার্য।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। ভারতে বৈদিক ধারা বা প্রাতিষ্ঠান-বিরোধী ধর্মরূপে বৌদ্ধধর্ম যে ভূমিকা পালন করে এসেছে তার জের এখনো চলছে। ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রায় বিলুপ্তির পরও তার প্রভাব অনস্বীকার্য। ধর্মকে বাদ দিলেও একটা বিকল্প দার্শনিক প্রতিষ্ঠান রূপেও এর গুরুত্ব ভারতেতিহাসে অপরিসীম। রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে – তা বিম্বিসার-অজাতশত্রু-প্রসেনজিৎ-অশোকের কাল থেকে হাল আমলের তিব্বত বিষয়ে দলাই লামা বা বিশ্বশান্তি-প্রসঙ্গ যাই হোক না কেন। নারীমুক্তির ভাবনা বা নারীর নিজ মতপ্রকাশের অধিকার ভিক্ষুণী সংঘের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে বা *থেরীগাথা*-য় প্রকাশিত হয়েছে। শুধু প্রেম ও করুণার ধর্ম রূপেই নয়, নির্যাতিত মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা বৌদ্ধধর্ম; তা বিকল্প এক চিন্তন-মননের ভাষ্যও হয়ে উঠেছে। 'বৌদ্ধযুগ'-এর আদর্শ এইক্ষেত্রে ভারতমুক্তির দিশারী। মহাত্মা গান্ধির বর্ণবৈষম্য ও জাতপাতের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন অথবা জাতপাতের কারণে আজীবন অত্যাচারিত ও অপমানিত বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের বৌদ্ধধর্মের শরণগ্রহণ; আম্বেদকরের নেতৃত্বে দলিতদের সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা ও শেষে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের (আনুষ্ঠানিকভাবে ১৪ অক্টোবর, ১৯৫৬ ধর্মান্তরিত হন) পিছনে বুদ্ধের চিরন্তন আদর্শ কার্যকরী হয়েছে। আম্বেদকর *The Buddha and His Dharmma* (১৯৫৭) গ্রন্থের সূচনায় ভারতবর্ষের কিছু শ্রেণির মানুষের পরিবর্তমান মানসিকতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা হয়তো ভারতেতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ পালাবদলের দিক নির্দেশক হতে পারে।

টীকা ও উৎস নির্দেশ

১। সেন, প্রবোধচন্দ্র। (২০০১)। দত্ত, ভবতোষ। (সম্পাদিত)। *বাংলার ইতিহাস-সাধনা*। বিবিধ বিদ্যা সংগ্রহ ৯। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পৃ. ৫ – ৬

২। রায়, নীহাররঞ্জন। (২০০৫)। প্রথম অধ্যায়। *বাঙ্গালীর ইতিহাস*। আদিপর্ব। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ॥ ৫, ৪১

৩। সেন, প্রবোধচন্দ্র। (২০০১)। দত্ত, ভবতোষ। (সম্পাদিত)। *বাংলার ইতিহাস-সাধনা*। বিবিধ বিদ্যা সংগ্রহ ৯। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৩, ১৬ – ১৮

৪। বিশদ তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: সেন, দীনেশচন্দ্র। (২০০২)। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। (সম্পাদিত)। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। নবম সংস্করণের ভূমিকা। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. [৮] – [১১] ও ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। (১৯৭২)। *ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যেতিহাস-চর্চা*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী। পৃ. ৩, ১২

৫। ন্যায়রত্ন, রামগতি। (১৯৯১)। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। (সম্পাদিত)। *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব*। কলকাতা: সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। পৃ. [র], [ল]

৬। রমেশচন্দ্রের উদ্ধৃতিটির জন্য দ্রষ্টব্য: ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। (১৯৭২)। *ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যেতিহাস-চর্চা*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী। পৃ. ২৬ – ২৭

৭। দ্রষ্টব্য: সেন, প্রবোধচন্দ্র। (২০০১)। দত্ত, ভবতোষ। (সম্পাদিত)। *বাংলার ইতিহাস-সাধনা*। বিবিধ বিদ্যা সংগ্রহ ৯। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পৃ. ২৮ – ২৯ ও সেন, দীনেশচন্দ্র। (২০০২)। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। (সম্পাদিত)। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। নবম সংস্করণের ভূমিকা। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. [৬১ – ৬৩]

৮। দ্রষ্টব্য: সেন, দীনেশচন্দ্র। (২০০২)। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। (সম্পাদিত)। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। নবম সংস্করণের ভূমিকা। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. [৮], [১৩]; ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। (১৯৭২)। ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যেতিহাস-চর্চা। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী। পৃ. ৩০ – ৩২ ও সেন, প্রবোধচন্দ্র। (২০০১)। দত্ত, ভবতোষ। (সম্পাদিত)। *বাংলার ইতিহাস-সাধনা*। বিবিধ বিদ্যা সংগ্রহ ৯। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পৃ. ২৭, ২৯

৯। সেন, প্রবোধচন্দ্র। (২০০১)। দত্ত, ভবতোষ। (সম্পাদিত)। *বাংলার ইতিহাস-সাধনা*। বিবিধ বিদ্যা সংগ্রহ ৯। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পৃ. ৩০ – ৩১, ৩৪ – ৩৬

১০। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৭ – ৪৯

১১। সেন, দীনেশচন্দ্র। (২০০৬)। *বৃহৎ-বঙ্গ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ॥০

১২। সেন, প্রবোধচন্দ্র। (২০০১)। দত্ত, ভবতোষ। (সম্পাদিত)। *বাংলার ইতিহাস-সাধনা*। বিবিধ বিদ্যা সংগ্রহ ৯। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পৃ. ৫২ – ৫৫, ৫৯ – ৬৭

১৩। রায়, নীহাররঞ্জন। (২০০৫)। সরকার, যদুনাথ। পরিচয়-পত্র। *বাঙ্গালীর ইতিহাস*। আদিপর্ব। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ১০]

১৪। রায়, নীহাররঞ্জন। (২০০২)। *ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ১২৩ – ১২৬, ১৩১, ১৩৬, ১৪৩

১৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০০২)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি'। (১৩১৬)। *রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ৩৬

১৮। রায়, নীহাররঞ্জন। (২০০২)। 'উনিশশতকী বাঙালির পুনরুজ্জীবন: পুনর্বিবেচনা'। *ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ১৪৯

১৯। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: রায়, অনিন্দ্য। (সম্পাদিত)। *দিশা সাহিত্য*। (জুলাই – সেপ্টেম্বর, ২০১০ ও জানুয়ারি – জুন, ২০১১) বড়ুয়া, সুমিতকুমার। 'রবীন্দ্র দৃষ্টিতে শিবাজি: জাতীয় বীরের সন্ধানে'। পৃ. ৯০ – ১০৫ ও ৮৪ – ৯৭

২০। দত্ত, বিমলচন্দ্র। (২০১৫)। *বৌদ্ধ ভারত*। মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র। ভিক্ষু, সুমনপাল। (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ ভারত*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী। পৃ. ৭৮ – ৮৫

২১। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭২ – ৭৮

২২। সেন, দীনেশচন্দ্র। (২০০৬)। *বৃহৎ-বঙ্গ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ২৬১

২৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৬৩

২৪। Chattopadhyaya, Debiprasad. (Edited). (2010). Chimpa, Lama. Chattapadhyaya, Alaka. (Translated from Tibetan). *Tāranātha's History of Buddhism in India*. New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Limited. P. 284

২৫। সেন, দীনেশচন্দ্র। (২০০৬)। *বৃহৎ-বঙ্গ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ২৬৩ ও বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। (২০১২)। *বাঙ্গালার ইতিহাস*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ১১

২৬। রামাবতী সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত আমরা উপস্থাপিত করছি – রামপাল ও কৈবর্তরাজ ভীমের যুদ্ধে ভীম নিহত হলে সম্ভবত সমগ্র বরেন্দ্রভূমি রামপাল কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল। বিদ্রোহ দমনান্তে রামপালদেব গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যে রামাবতী নামের একটি নূতন নগরী নির্মাণ করেছিলেন। শ্রীহেতুর চণ্ডেশ্বর ও ক্ষেমেশ্বর এই নূতন নগরের উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করেছিলেন। রামপালদেব এই নগরে জগদ্দল মহাবিহার নামে একটি বিহার নির্মাণ করেছিলেন। রামাবতী পাল-রাজবংশের শেষ রাজধানী এবং রাম পালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের রাজত্বকালেও রামাবতী গৌড়রাজ্যের রাজধানী ছিল। খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতেও এই নগরী বিদ্যমান ছিল। দ্র: বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। (২০১২)। *বাঙ্গালার ইতিহাস*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ১৭৯

২৭। Davis, T. W. Rhys. (2010). *Buddhist India*. Delhi: Low Price Publishers. p. 1 – 2

২৮। *অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা* গ্রন্থ সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তথ্য দিয়েছেন – মহীপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে একখানি *অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা* গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল। এটি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই

গ্রন্থের পুষ্পিকায় লিখিত আছে: ‘পরমেশ্বরপরমভট্টারকপরমসৌগতশ্রীমন্মহীপালদেবপ্রবর্দ্ধমানন বিজয়রাজ্যে সম্বৎ ৫ অশ্বিনি কৃষ্ণে।’ মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে তাড়িবাড়ি মহাবিহারবাসী শাক্যচার্য্য স্থবির সাধুগুপ্তর ব্যয়ে নালন্দাবাসী কল্যাণমিত্র চিন্তামণি একখানি *অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা* গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে এই গ্রন্থখানি আবিষ্কার করে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে এনেছেন। এর পুষ্পিকায় লেখা আছে: ‘... শ্রীনালন্দাবস্থিতকল্যাণমিত্রচিন্তামণিকস্য – লিখিত ইতি’।

দ্রষ্টব্য: বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। (২০১২)। *বাঙ্গালার ইতিহাস*। কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং। পৃ. ১৫৪ – ১৫৫

২৯। নালন্দা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বহু মত প্রচলিত। তার দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল –

ক) বিমলাচরণ লাহা *Historical Geography of Ancient India* গ্রন্থে বলেছেন, ‘নালন্দা’ নামটি নালন্দা নামের এক ড্রাগন থেকে নেওয়া হয়েছে। এই ড্রাগনটি নালন্দা মহাবিহারের দক্ষিণে একটি আম্রকাননের মধ্যে অবস্থিত একটি বিহারে বসবাস করত। ড্রাগন চৈনিকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হওয়ায় এই বিবরণটির উৎস সম্ভবত চৈনিক সূত্র বলে ভিক্ষু সত্যপাল মনে করেন। হিউয়েন সাং শব্দটির এইরকম অর্থ করতে চেয়েছেন যে এমন একজন ব্যক্তি যিনি দান করে কখনোও সন্তুষ্ট হন না এবং এই ব্যক্তির উদার হৃদয় কখনোও পুরোপুরি সন্তোষ লাভ করে না।

দ্রষ্টব্য: ভিক্ষু, সুমনপাল।(সম্পাদিত)। (২০১০)। সত্যপাল, ভিক্ষু। ‘নালন্দার ঐতিহাসিক গুরুত্ব’। *নালন্দা*। নালন্দার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংখ্যা। কলকাতা: নালন্দা। পৃ. ১৮

খ) মহাসুদস্সন জাতকের (সংখ্যা ৯৫) বর্ণনা মতে সারিপুত্রের জন্মস্থান হল নালগ্রাম বা নাল, এই থেকে এই স্থানের মাহাত্ম্য বলে অনেকে মনে করেন। চৈনিক উৎস থেকে জানা যায়, এখানে একটি পুকুর ছিল যার নাম নাল, সেখানে প্রচুর পদ্ম ফুটত, সেই থেকেই নাম নালন্দা। অন্য মতে, বোধিসত্ত্ব কোনও এক জন্মে এখানকার দান পারমী গুণসম্পন্ন এবং সহৃদয় রাজা ছিলেন। তাঁর মুখে কখনও ‘আমি দেব না’ (ন অলম্ দা) এই কথা শোনা যেত না। সেই থেকেই এই নামের উৎপত্তি। পরবর্তীকালে খনন কার্যের ফলে এখানে একটি ‘নাল’ অর্থাৎ পদ্ম সরোবরের অস্তিত্ব থেকেই এই স্থানের নাম নালন্দা হয়।

দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত। মুখার্জি, বন্দনা। ‘তিব্বতী উৎসে নালন্দা’। *নালন্দা*। নালন্দার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংখ্যা। কলকাতা: নালন্দা। পৃ. ১৬৩

৩০। ভারতবর্ষে নালন্দার ইতিহাসে দুটি আয়াম – প্রথমত, পঞ্চমহাবিদ্যায় বৌদ্ধমতের অভিনব উদ্ভাবনা; দ্বিতীয়ত, বৌদ্ধমতের যুগোপযোগী বিবর্তনের প্রয়োগ। প্রথমটি, বৌদ্ধিক তথা চৈতসিক; দ্বিতীয়টি, বিকাশাত্মক প্রায়োগিক। বৌদ্ধ মহাবিহারে পঞ্চমহাবিদ্যা সামান্যভাবে পাঁচটি মুখ্য বিষয়ের শিক্ষামূলক চর্চা ও অভ্যাস। বিষয়টি হল – শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা। তাদের অনুষঙ্গরূপে এগারোটি অথবা তেরোটি বিদ্যাস্থান ধরা হোত। যেমন – অলঙ্কারশাস্ত্র-কাব্য-নাটকাদি, সাহিত্য ছন্দমাত্রা, বা অভিধান। হেতুবিদ্যার ক্ষেত্রে পূর্বপক্ষীয় গৌতমীয় ন্যায়, জৈন ন্যায়, লোকন্যায়। শিল্পবিদ্যার ব্যাপকতা বেশি মৃৎশিল্প, দারুশিল্প, ধাতব শিল্প, রত্নমাণিক্যাদি শিল্প। চিত্রকলা ও প্রতিমা নির্মাণ, এমনকি বাসগৃহ নির্মাণ, যেমন – কুঠি, আরাম, হর্ম্য থেকে বিহার নির্মাণের বাস্তুশিল্প, চিকিৎসা বিদ্যায় সামুদ্রিক, জ্যোতিষ,

শারীরবিদ্যা, অস্থিবিদ্যা, বিষনিরাকরণ প্রভৃতি। তিব্বতের বৌদ্ধদের শিক্ষাপ্রণালীতে প্রয়োজনানুসারে এইসকল বিষয় প্রয়োজন সাপেক্ষভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত। পাঠক, সুনীতিকুমার। 'তিব্বতী স্রোতে নালন্দার মনীষীদের বৌদ্ধবিদ্যার অন্বীষা'। *নালন্দা*। নালন্দার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংখ্যা। কলকাতা: নালন্দা। পৃ. ১২। এছাড়াও, বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত। ভট্টাচার্য, বেলা। 'নালন্দায় বৌদ্ধশিক্ষা ও সাহিত্য'। *নালন্দা*। নালন্দার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংখ্যা। কলকাতা: নালন্দা। পৃ. ১২ – ৬২

৩১। মহাস্থবির, ধর্মাধার। (অনূদিত)। (১৯৫৪)। কোধবগ্‌গো। *ধম্মপদ*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার। পৃ. ৮২

৩২। বড়ুয়া, শুভ্রা। (অনূদিত)। (২০০৪)। ভূমিকা। *মহাবংস*। কলকাতা: গোবিন্দপ্রসাদ বড়ুয়ার ব্যক্তিগত উদ্যোগ। পৃ. (পাঁচ), (সাত)

৩৩। রাজা পাণ্ডুকাভয়ের রাজত্বকাল ৭০ বছর (১০৬ – ১৭৬ বুদ্ধাব্দ)। *মহাবংস*-এর দশম পরিচ্ছেদ (পাণ্ডুকাভিষেক), ১০৬ সংখ্যক অংশে আছে – বুদ্ধিমান মহীপতি পাণ্ডুকাভয় সাঁইত্রিশ বছর বয়সে রাজা হয়ে রম্য সমৃদ্ধিশালী অনুরাধপুরে পূর্ণ সত্তর বছর রাজত্ব করেছিলেন। দ্রষ্টব্য: বড়ুয়া, শুভ্রা। (অনূদিত)। (২০০৪)। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪

৩৪। রাজা পাণ্ডুকাভয়ের রাজত্বকাল ৩ বছর (৮৯২ – ৪৯৫ বুদ্ধাব্দ)। *মহাবংস*-এর চৌত্রিশ পরিচ্ছেদ (একাদশ রাজা), ১৫ সংখ্যক অংশে আছে – মহাচূড় রাজার তিষ্য নামে খ্যাত পুত্র তিন বছর রাজত্ব করেছিলেন। প্রাগুক্ত। পৃ. ২২৪

৩৫। রাজা পাণ্ডুকাভয়ের রাজত্বকাল ২৭ বছর (৮০৮ – ৮৩৫ বুদ্ধাব্দ)। *মহাবংস*-এর সাঁইত্রিশ-এর দশম পরিচ্ছেদ (পাণ্ডুকাভিষেক), ১ সংখ্যক অংশে আছে – জ্যেষ্ঠতিষ্যের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ মহাসেন রাজা হয়ে সাতাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৫১

৩৬। সেন, দীনেশচন্দ্র। (২০০২)। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। (সম্পাদিত)। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। দ্বিতীয় খন্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ৪৮

৩৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৮ – ১০৬

৩৮। রায়, শরৎকুমার। (২০০০)। *বৌদ্ধ-ভারত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. [৭]

৩৯। সেন, সুকুমার। (২০০৪)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৩৮ – ৭৬

৪০। ন্যায়রত্ন, রামগতি। (১৯৯১)। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। (সম্পাদিত)। *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব*। কলকাতা: সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। পৃ. র – ল

৪১। ঘোষ, মনোমোহন। (১৯৫৫)। বাংলা সাহিত্য। কলকাতা: ইণ্ডিয়ান্ পাবলিসিটী সোসাইটী। দ্র. সূচীপত্র।

৪২। দাশগুপ্ত, তমোনাশচন্দ্র। (১৯৫১)। আদিযুগ। *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৩১ – ৮৪

৪৩। দ্রষ্টব্য: সূচিপত্র। শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ। (২০০০)। *বাংলা সাহিত্যের কথা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স। পৃ. ৭০

৪৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। (১৯৫৯)। *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। পৃ. ১৩ – ৩৬

৪৫। হালদার, গোপাল। (২০১২)। *বাঙ্লা সাহিত্যের রূপ-রেখা*। প্রথম খণ্ড: প্রাচীন ও মধ্যযুগ। কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী। পৃ. ১ – ৩১

৪৬। চৌধুরী, ভূদেব। (১৯৯৫)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা* (১ম পর্যায়)। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ix – x

৪৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৯৫৫)। *ইতিহাস*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ৭৮

উপসংহার

বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতির উৎস ভারত হলেও তা বিশ্ব-সংস্কৃতির বিষয়। সেই অর্থে আমরা বিশ্বধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতির একটা রূপকে ভারতের আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় 'ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে বাংলা সাময়িকপত্রে বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি' গবেষণা সন্দর্ভে সুবিশাল ক্ষেত্রের খুব সংকীর্ণ অংশের অনুসন্ধান করেছি। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে আমাদের আলোচনা প্রাধান্য পেলেও তা ভবিষ্যতকে কীভাবে প্রাণিত করেছে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই কালপর্বে বাংলা সাময়িকপত্রে বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি বিষয়ে বেশ কিছু চিন্তক সক্রিয় সারস্বত যোগদান করেছিলেন। এর ফলে সারস্বত মণ্ডলী থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি গঠনমূলক তর্ক-বিতর্ক, প্রশ্ন-পরিপ্রশ্নের পরিবেশে সামাজিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। মূলত তিনটি ধারায় এই কার্যকলাপ বিলসিত হয়েছিল – ব্রাহ্মবাদী সংস্কারপন্থী ধারা, হিন্দু জাতীয়তাবাদী ধারা এবং গবেষণাধর্মী ধারা। এই বাইরেও নানা ধারা রয়েছে। এই চর্চার ধারাবাহিক ফলশ্রুতিতে বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে বৌদ্ধবিদ্যাচর্চা ন্যায় দর্শনের পূর্বপক্ষ হিসাবে নয়, স্বতন্ত্র বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল। থেরবাদী ও মহাযানী মূল ও টীকাগ্রন্থ, দার্শনিক ও সাহিত্যগ্রন্থগুলির আবিষ্কারের সঙ্গে ব্যাপক ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, শিল্পসংক্রান্ত অনুসন্ধানের ফলে একটা নতুন অভিমুখ তৈরি হয়েছিল যেখানে বাঙালি চিন্তকদের অবদান গুরুত্বময়। ভারত ও বহির্ভারতের মতো বাংলায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি তৎকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের মাধ্যম রূপে গণ্য হওয়ায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও প্রতিগ্রহণ ঘটেছে।

বাঙালি চিন্তকদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি বিষয়ে মতান্তর থাকায় প্রশ্ন-পরিপ্রশ্ন, আলাপ-আলোচনার ফলে বাংলা সাময়িকপত্রগুলি ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, সমাজসংস্কার ও সমাজ সেবামূলক কর্ম, শিক্ষা, নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। বাংলা তথা ভারতে প্রায় লুপ্ত বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতির অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনুসন্ধিৎসুরা নানা সমস্যার মধ্যে পড়েছিলেন। শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, চীন, জাপান প্রভৃতি এশীয় দেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবহমান ধারার সাপেক্ষে বাংলা তথা ভারতের বৌদ্ধধর্মের স্বরূপের অনুসন্ধান চ্যালেঞ্জস্বরূপ ছিল। এর পিছনে বাঙালি ও ভারতীয় জাতিসত্তার লুপ্ত গৌরবকে অনুভব করার গভীর তাগিদকে অস্বীকার করা চলে না। ঊনবিংশ শতকের নবজাগ্রত হিন্দু

জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় আত্মানুসন্ধানে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিনির্মাণের চেষ্টায় বাংলার চিন্তকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকার প্রতিফলন সাময়িকপত্রের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতে বৈদিক ধারা বা প্রাতিষ্ঠান-বিরোধী ধর্মরূপে বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ধর্মকে বাদ দিলেও একটা বিকল্প দার্শনিক প্রতিষ্ঠান রূপে এর গুরুত্ব ভারতেতিহাসে অপরিসীম। রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে বিম্বিসার-অজাতশত্রু-প্রসেনজিৎ-অশোকের কাল থেকে হাল আমলের তিব্বত বিষয়ে দলাই লামা বা বিশ্বশান্তি প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছে। নারীমুক্তির ভাবনা, বর্ণবৈষম্য ও জাতপাতের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের পিছনে বৌদ্ধ আদর্শ শুধু প্রেম ও করুণার ধর্ম নয়, নির্যাতিত মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষারূপেও বিকল্প এক চিন্তন-মননের ভাষ্য হয়ে উঠেছে। বৌদ্ধদর্শন বাস্তবসম্মত, সরল-সাধারণ এবং প্রত্যেকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপযোগী। আবার চর্যাচর্যের মাত্রা অনুসারে গভীরতর অনুসন্ধিৎসুরা মনন, মেধা ও আধ্যাত্মিকতার নান্দনিক অভিযাত্রায় তাকে অবলম্বন করতে পারেন। বৌদ্ধধর্ম আচারসর্বস্বতা বিরোধী মৈত্রীময় মানবসম্পর্ক ও হৃদয়বৃত্তি বিকাশের প্রতি গুরুত্বদান করার ফলে তা আধুনিক কাল ও মনের অধিকতর উপযোগী। সার্বিক অর্থেই বৌদ্ধধর্ম জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত জীবনধর্ম রূপে যাপন থেকে সৌন্দর্য সংরচনায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

আমরা বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি যা তর্কশাস্ত্রসম্মত বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার ধারার সংযোজিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন, যার প্রত্যক্ষবাদী সিদ্ধান্তসমূহের প্রয়োগ অত্যন্ত গূঢ় ও গঠন যুক্তিযুক্ত। এর ফলে মানুষ মননের স্বরূপ ও সকল অভিজ্ঞতার প্রকৃতি বিশ্লেষণে সক্ষম একটি নূতন মাধ্যম বা অভিব্যক্তি পেয়েছে। এটি একটি অখণ্ড অথচ জায়মান ও পরিবর্তনসাধ্য নৈতিক প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে যা নিজে লক্ষ্য না হলেও লক্ষ্যবস্তুতে উপনীত হওয়ার সোপান। বৌদ্ধসংস্কৃতি অভিসম্বোধির ব্যবহারতত্ত্ব একটি নতুন ধারা বিকশিত করে তুলেছে যা নৈতিক উদ্দেশ্য বা চেতনা-সমন্বিত, কুশল কর্মনির্ভর, জাতি ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে গণতন্ত্রসম্মত সংগঠনের পক্ষে, সম্পত্তি বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার, অধিকার ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সাম্যবাদসম্মত। এটি পৃথিবীর সকল জাতিকে কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলার প্রেরণা যোগায় এবং সর্বোপরি প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ ও যুদ্ধবিগ্রহের পরিবর্তে মৈত্রী, করুণা, শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির ভিত্তিতে একটি মহান মানবজাতি গড়তে

নিরন্তর প্রয়াসী। তাই Applied Buddhism, Engaged Buddhism, Green Buddhism, Buddhist Economics প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মের নানা প্রয়োগিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে।

বৌদ্ধসাহিত্য ও তার প্রতিগ্রহণের ফলে মানুষ বিভিন্ন ভাষায় পরিব্যাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য, মানবিক আবেদনে প্রাণবন্ত, ভাবে উদ্দীপনাময় এবং ব্যঞ্জনায় মহিমময় সাহিত্যের সন্ধান পেয়েছে। এটি এমন এক মৌলিক শিক্ষারীতির জন্ম দিয়েছে যা অনুসন্ধিৎসু প্রবৃত্তিসম্পন্ন আর চিন্তা ও আদর্শের অবাধ বিনিময়ের প্রতি মানুষকে সমুৎসাহিত করে তোলে। প্রদেশিকতাকে ছাড়িয়ে সর্বভারতীয় অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৌদ্ধদর্শন ও সাহিত্য পথিকৃতের মর্যাদার অধিকারী। বহির্ভারতের সঙ্গে ভারতের সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্যের যোগসূত্রের ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। চর্যাগান, বুদ্ধনাটক প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্য সূচিত হয়েছিল। চর্যাগান ও দোহার অধিকার নিয়ে বাংলার সঙ্গে হিন্দি, ওড়িয়া ও অসমিয়ার তর্ক-বিতর্ক বিংশ শতকের প্রথমার্ধের জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক রিক্থ সচেতনতার গুরুত্বময় অভিব্যক্তি। বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতিগ্রহণে কথাসাহিত্য ও নাটকের ক্ষেত্রে বিকল্প পথের অনুসন্ধানের ফলে বিষয়, ভাষা, ভাবনা, অভিপ্রায় প্রভৃতিতে সাহিত্য সামগ্রিকভাবে সম্ভাবিত হয়েছিল। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের কবিতা ও কথাসাহিত্যের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বৌদ্ধপ্রসঙ্গ প্রায়শই এসেছে, সেই ধারা আজও অব্যাহত। কাব্য-কবিতা ও নাটকের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ভাবধারার প্রতিগ্রহণ সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হয়েছে। দু'পার বাংলায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপাদান হিসাবে বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির নিরীক্ষার ক্ষেত্রটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময়।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে জাতীয় প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্রের অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে বুদ্ধচরিত্রের প্রাসঙ্গিকতা বিচার্য বিষয় হয়েছিল। বুদ্ধচরিত্রের আকর গ্রন্থের আলোচনার সঙ্গে এই চর্চার বিবর্তন দেখানো হয়েছে। বুদ্ধজীবন নিয়ে বাঙালির আগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষণামূলক অনুসন্ধিৎসার থেকেও ব্যক্তিগত রুচিবোধ, পছন্দ-অপছন্দ বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। বেদদ্রোহী অথবা করুণাঘন বুদ্ধচরিত্র ঊনবিংশ শতকের সমাজ-ধর্ম-রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। বুদ্ধচরিত-কেন্দ্রিক লেখাগুলির ক্ষেত্রে মুখ্যত দুটি প্রবণতা লক্ষ করা যায় – সমাজ সচেতন ঐতিহাসিক যুগপুরুষ বা জাতীয় চরিত্ররূপে বুদ্ধদেবের সঙ্গে বৌদ্ধদর্শন ও সংস্কৃতি ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষিতে বুদ্ধদেবকে হিন্দু প্রতিনিধিত্বকারী দেবতা বা অবতার বা মহামানব রূপে বিচার।

বৌদ্ধসংস্কৃতি শিল্পভাবনায় সুপরিশুদ্ধ মানুষী কল্পনার অনুভবনীয় পরিপ্রকাশ ঘটিয়ে নতুন ধরণের শিল্পরীতিকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে, যার শিক্ষাগত মূল্য অপরিসীম। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও মূর্তিতত্ত্বে বৌদ্ধশিল্পের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় শিল্পের ধারণা গড়ে উঠেছে। ভারতীয় শিল্পের প্রতি পক্ষপাত কোথাও কোথাও একদেশদর্শীতায় আক্রান্ত হলেও ভারতীয় শিল্পের অখণ্ড দৃষ্টিতে আলোচনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধশিল্পের বিবর্তনের দিকটি চমৎকার ফুটে ওঠে। বৌদ্ধশিল্পের সূত্র ধরেই এর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সমগ্র দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ভারতীয় শিল্প ভাবধারা প্রতিগৃহীত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের জনমানসে এক পরিশীলিত শিল্পীত বোধ তৈরি করতে যেমন বৌদ্ধশিল্প সক্রিয় ছিল, তেমনিই ঊনবিংশ শতকের সমাপ্তি আর বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে শিল্পের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা গঠনে বৌদ্ধশিল্পের পরোক্ষ প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য। বর্তমান শিল্পচিন্তার ক্ষেত্রে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহমান বৌদ্ধশিল্পের প্রাসঙ্গিতা আজও অম্লান।

প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ ইতিবৃত্তের সঙ্গে ঊনবিংশ শতকে 'বৌদ্ধযুগ'-এর নির্মাণের পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। ইতিহাসের সাক্ষ্য না থাকলেও 'বৌদ্ধযুগ'-এর ধারণা ঊনবিংশ শতকে জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের স্বার্থে জরুরি হয়ে পড়েছিল। বাংলা বা ভারত ঐক্যের প্রসঙ্গ, ভারতের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক একতার স্বপ্ন, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে বৌদ্ধ আদর্শের গ্রহণযোগ্যতা, উদার বৌদ্ধ অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, শিল্প সংস্কৃতি, বিশ্বশান্তি নানা দিক থেকেই তা একটা নতুন পথের সন্ধান দিতে পেরেছিল। 'বৌদ্ধযুগ'-এর প্রকল্প সবার কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও ভারতের প্রেক্ষাপটে তাকে অস্বীকার করার উপায় ছিল না। তাই, ঊনবিংশ শতকে 'বৌদ্ধযুগ'-এর বিনির্মাণ অত্যন্ত জরুরি ও অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। বিংশ শতকেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত এই ভাবনা ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনার স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'বৌদ্ধযুগ'-এর পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন বা পরিপ্রশ্ন উঠলেও এই পরিকল্পনার জনপ্রিয়তা এখনো ম্লান হয়নি।

বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে হিন্দু, সাংখ্য, লোক, জৈন, খ্রিস্টদর্শনের সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে যা ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সামাজিক ধর্মসংস্কৃতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লক্ষ করার মত, হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষিতে ইসলামের সঙ্গে বৌদ্ধসংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে প্রায় কোন কথাই ওঠে নি। ঊনবিংশ শতকে হিন্দুধর্মের কুৎসা করে খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণ ও মানবতাবাদের ধারক-বাহক রূপে

'মহামানব' যিশুখ্রিস্টের ব্যাপক প্রচারের প্রেক্ষিতে কৃষ্ণচরিত্রের দাবিকে পিছনে ফেলে বুদ্ধচরিত্র একইসঙ্গে ভারতের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি, বহির্জগতের কাছে ভারতীয় সভ্যতার মুখ ও ভারত-বহির্ভূত ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতিরোধকরূপে বিবেচিত হয়েছেন। হিন্দুদেবতা হিসাবে বুদ্ধচরিত্রের উপস্থাপনার মধ্যে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার এবং পৃথক ধর্ম ও দার্শনিক প্রতিষ্ঠানরূপে বৌদ্ধধর্মকে অস্বীকার করবার ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসী রাজনীতিও কার্যকর ছিল। সিদ্ধার্থের দাম্পত্য জীবনচিত্রণের প্রবণতার মধ্যে লোকায়ত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারা, বঙ্কিমী দাম্পত্য প্রবণতা ও হিন্দু গার্হস্থ্যাশ্রমের সমর্থনও থাকতে পারে। ঊনবিংশ শতকের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষাপটে বুদ্ধচরিত্র নির্মাণে সত্যাসত্য শুভাশুভের দ্বান্দ্বিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শায়নে স্ববিরোধ সত্ত্বেও সত্য ও শুভের প্রতীকরূপে, ভক্তির আশ্রয়স্থলরূপে প্রাচীন ভারতের গৌরব বুদ্ধচরিত্রকেই আদর্শ করা হয়েছে। আবার বিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বামপন্থী তাত্ত্বিকেরা 'নাস্তিক' 'মানবতাবাদী' বুদ্ধের চরিত্র, সাম্যবাদ বিষয়ে বৌদ্ধদর্শন ও মার্কসবাদের নৈকট্য নিয়ে ভাবনাচিন্তা সূচিত হয়েছিল। এই বিষয়ে একটা ইঙ্গিত আমরা করেছি, কিন্তু এর বিস্তারিত আলোচনা আমাদের গবেষণার পরিধির বাইরে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিতে বৌদ্ধশিল্পকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে তাকে হিন্দুধর্মের সঙ্গে অখণ্ডভাবে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। বৌদ্ধশিল্পকে ভারতশিল্প এবং সময়বিশেষে সমগ্রটাই হিন্দুশিল্প বলার প্রবণতার সঙ্গে সামগ্রিক অর্থে তা ভারতীয় শিল্পের গৌরব বলে স্বীকৃত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষাপটে হিন্দু পুনরুত্থান আন্দোলনের সঙ্গে বৌদ্ধ পুনরুত্থান আন্দোলন সূচিত হয়েছিল। প্রায় অস্তিত্বহীন বৌদ্ধধর্ম নিজের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে গেলেও তার সহযোগী এবং প্রতিযোগির ভূমিকায় হিন্দুধর্ম ছিল। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টার পাশাপাশি হিন্দুসংস্কৃতি বৌদ্ধসংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন করে তার গৌরবকে গ্রাস করতে চেয়েছে। সেই প্রচেষ্টা এখনো সক্রিয় থাকার ফলে উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে একটা আততি লক্ষ করা যায়। এই কালপর্বে সবচেয়ে গুরুত্ব পাওয়া হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাত ও সমন্বয়ের সম্পর্ক জটিল এবং অস্থির। তাই বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন, বৌদ্ধসাহিত্য, বৌদ্ধশিল্প ও বৌদ্ধযুগকে হিন্দু বলে চালানোর একটা সচেতন রাজনীতি একটা বিতর্কের পরিবেশ তৈরি করেছিল। আমাদের গবেষণায় এই দিকে আলোকপাত করা হলেও তার

বহুস্তরীয় জটিলতার আরো বিশ্লেষণ জরুরি। এই ভবিষ্যৎ গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটি এখানে সূচিত হল মাত্র।

বৌদ্ধবিদ্যাচর্চা একবিংশ শতকের যাপনের অভিমুখকে সম্ভাবিত করছে। বৌদ্ধ-প্রসঙ্গ জনপ্রিয় চিন্তন ও সুকুমার বৃত্তিচর্চার সহায়ক এবং গভীরভাবে মানবকেন্দ্রিক সামাজিক ভাবনা সম্পৃক্ত যা মানুষ থেকে সকল প্রাণের সঙ্গে ভাবৈক সূত্রে যুক্ত। পরিবেশ চিন্তা, জীবজগতের পারস্পরিক সহনশীলতায় এর অবদান নিয়ে চিন্তাভাবনার এক বিশাল ক্ষেত্র রয়েছে। চিন্তা-চেতনা-সংস্কৃতির ভিন্নমুখী ধারার ধারক ও বাহক বৌদ্ধসংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি যে আজও যুক্ত, তাঁর রিক্থের মধ্যে যে বৌদ্ধসংস্কৃতি আজও বহমান তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আমরা এই গবেষণা সন্দর্ভের মধ্যে দিয়ে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলা সাময়িকপত্রে বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতিচর্চার একটা অভিমুখকে বুঝবার চেষ্টা করেছি। এই বিষয়ে আমাদের আলোচনা একটি সুবিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের সূচনামুখ মাত্র। এই বিষয়ে গবেষণার অনালোকিত দিকের যে সন্ধান আমরা পেয়েছি তা সম্ভাবিত হলে ভবিষ্যতে বিদ্যাচর্চা লাভবান হবে বলে আমরা আশা রাখি। আমাদের আলোচনায় উক্ত বিষয়কে চিনে নেওয়া গেলেও তার সুপরিব্যাপ্ত বহুকৌণিক তাৎপর্যকে বুঝতে ভবিষ্যতে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

কয়েকটি নির্বাচিত চিত্র-পরিচিতি

বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মহাবিহারের মূল বুদ্ধমূর্তি।

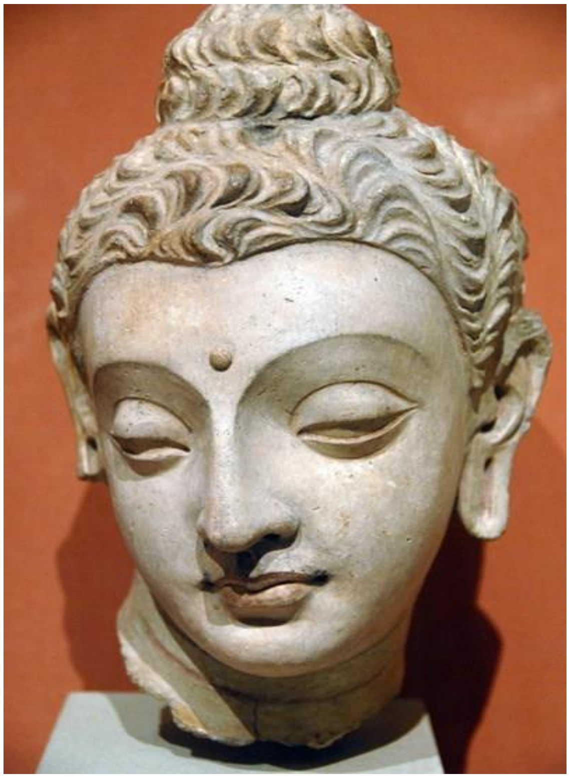

তক্ষশীলা থেকে প্রাপ্ত বুদ্ধের মুখ, গান্ধার শিল্প।

শ্রীলঙ্কার মহামেঘবন থেকে আনা চারা থেকে মহীরূহে পরিণত বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ।

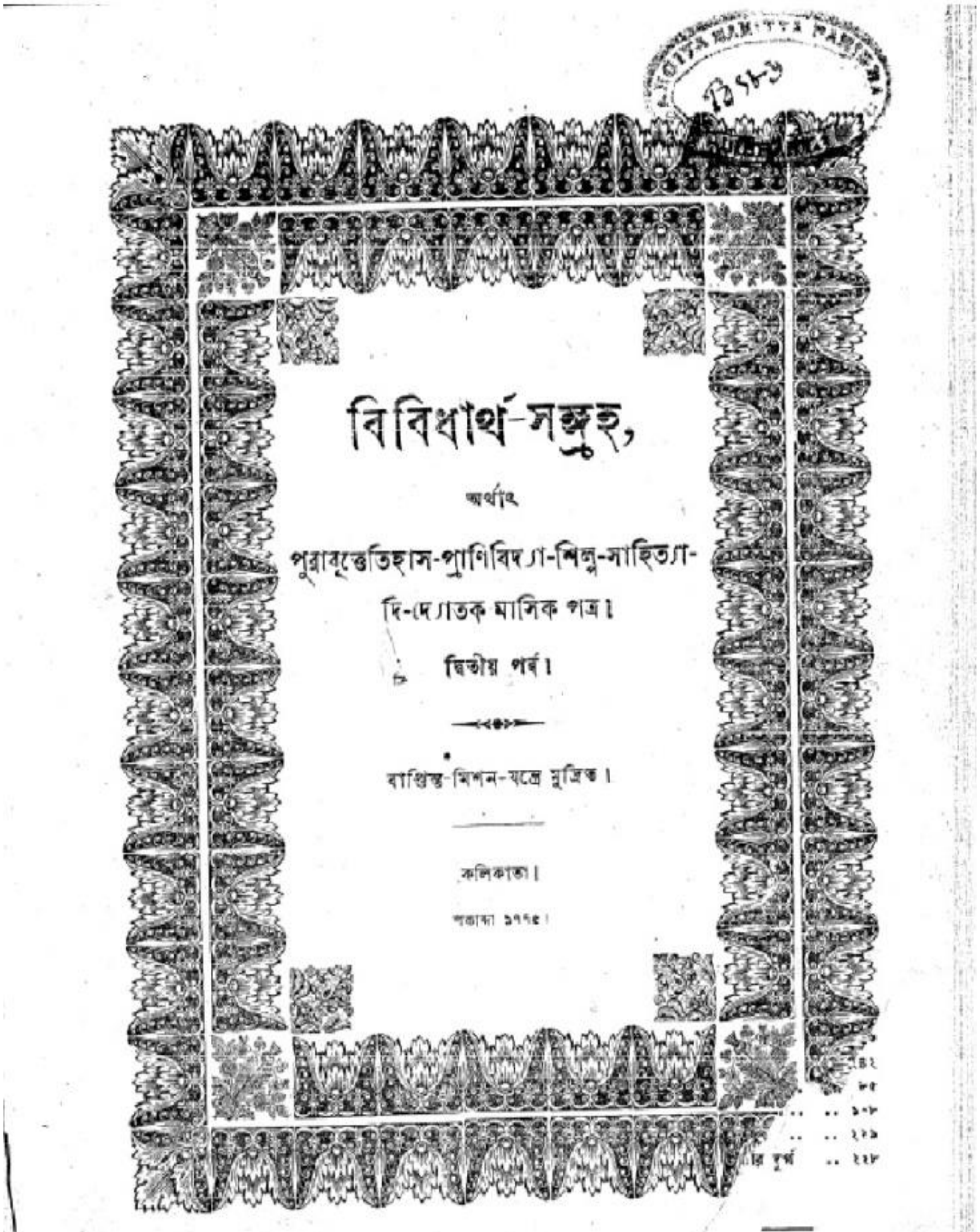
বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যা-
দি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

বাপ্তিস্ত-মিশন-যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

শকাব্দা ১৭৭৫।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ*-এর আখ্যাপত্র।

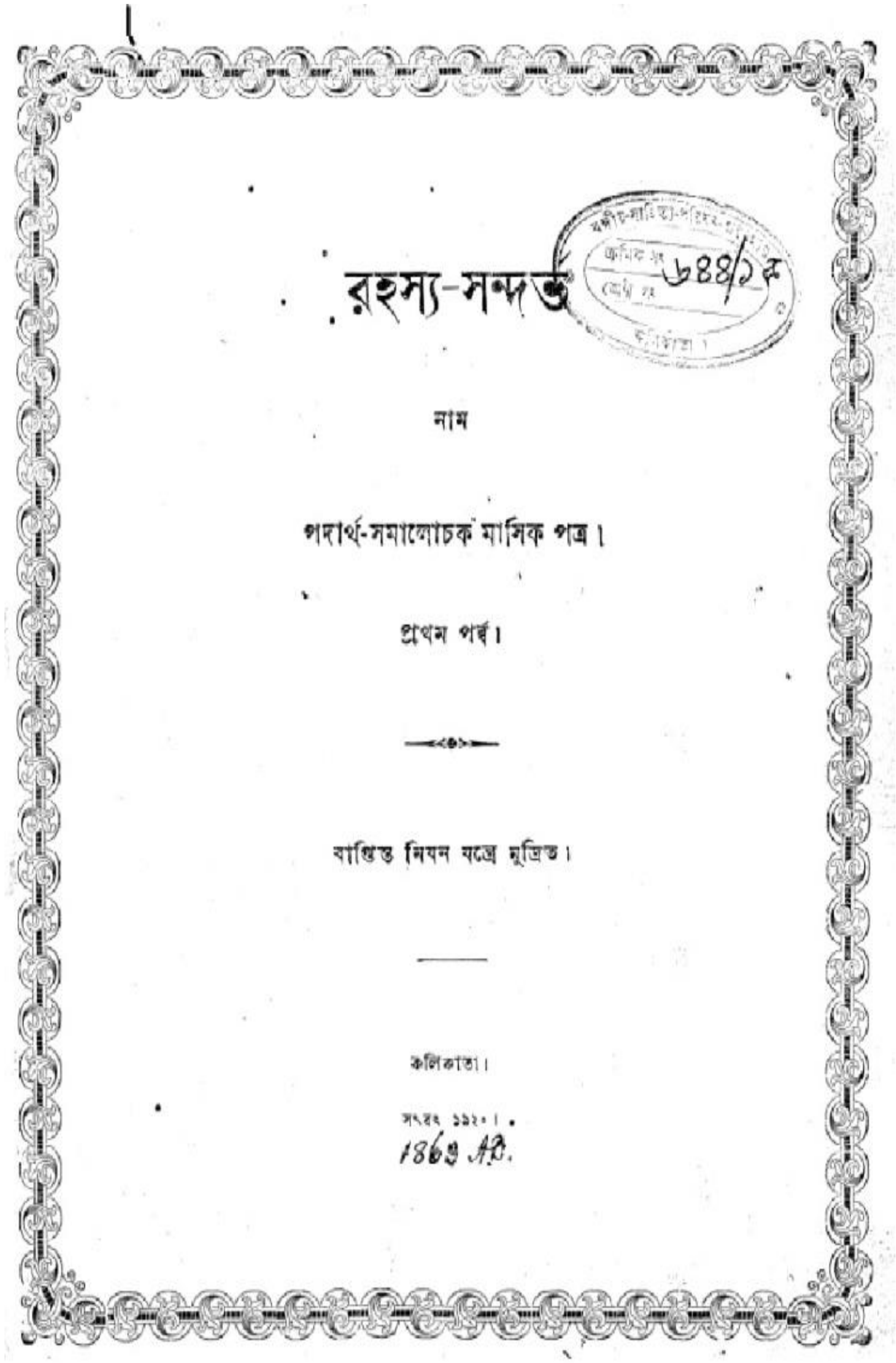
রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

প্রথম পর্ব্ব।

বাপ্তিস্ত মিষন যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সংবৎ ১৯২০।

1863 A.D.

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত *রহস্য সন্দর্ভ*-এর আখ্যাপত্র।

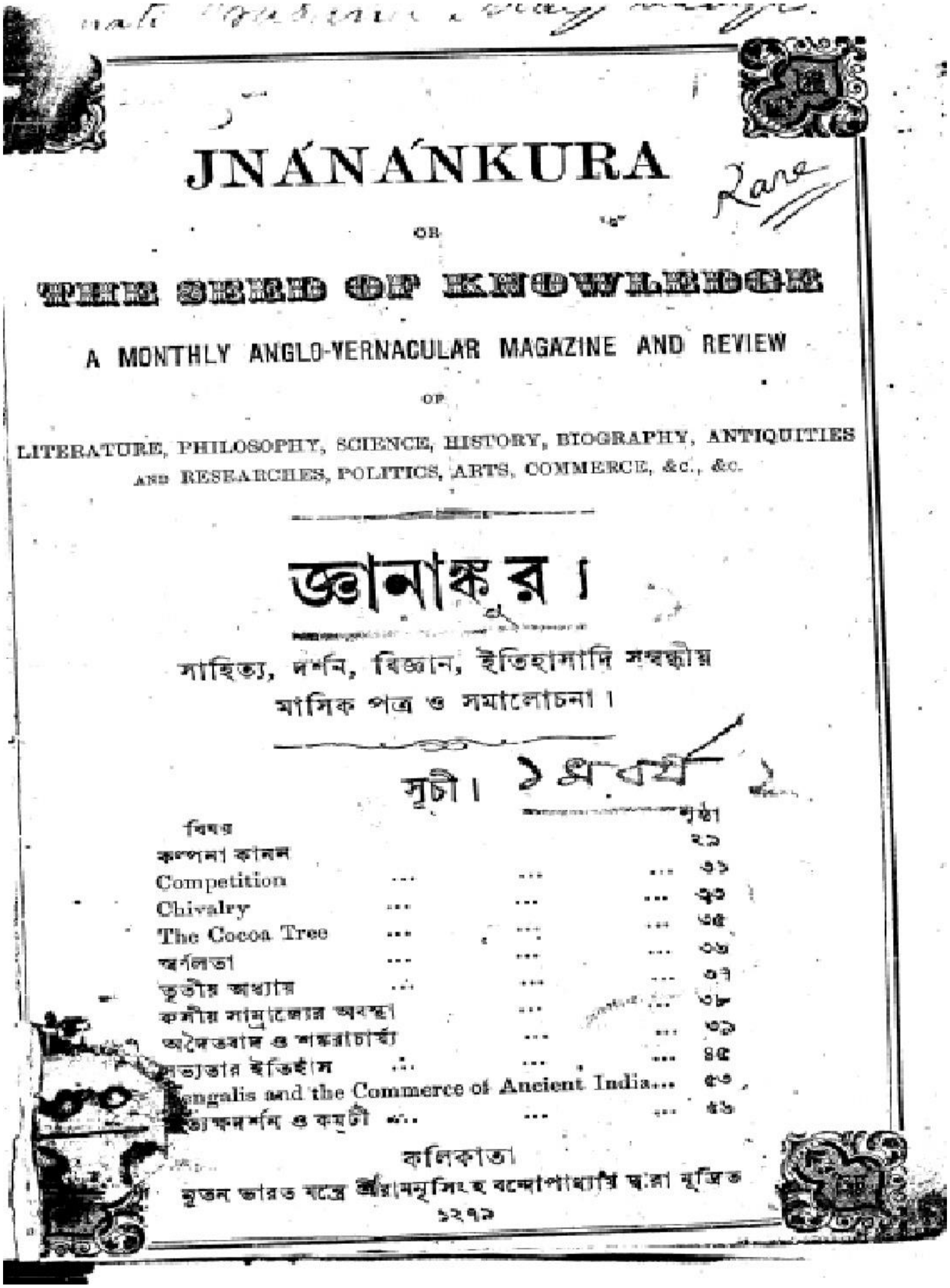

JNÁNÁNKURA

OR

THE SEED OF KNOWLEDGE

A MONTHLY ANGLO-VERNACULAR MAGAZINE AND REVIEW

OF

LITERATURE, PHILOSOPHY, SCIENCE, HISTORY, BIOGRAPHY, ANTIQUITIES AND RESEARCHES, POLITICS, ARTS, COMMERCE, &c., &c.

জ্ঞানাঙ্কুর।

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি সম্বন্ধীয়
মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সূচী। ১ম বর্ষ

বিষয়	পৃষ্ঠা
কল্পনা কানন	২৯
Competition	৩১
Chivalry	৩৩
The Cocoa Tree	৩৫
স্বর্ণলতা	৩৬
তৃতীয় অধ্যায়	৩৭
কশ্মীর সাম্রাজ্যের অবস্থা	৩৮
অদ্বৈতবাদ ও শঙ্করাচার্য্য	৩৯
সভ্যতার ইতিহাস	৪৫
Bengalis and the Commerce of Ancient India	৫৩
ক্ষদর্শন ও কম্‌টী	৫৬

কলিকাতা
নূতন ভারত যন্ত্রে শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত
১২৭৯

শ্রীকৃষ্ণ দাস সম্পাদিত *জ্ঞানাঙ্কুর*-এর আখ্যাপত্র-এর আখ্যাপত্র।

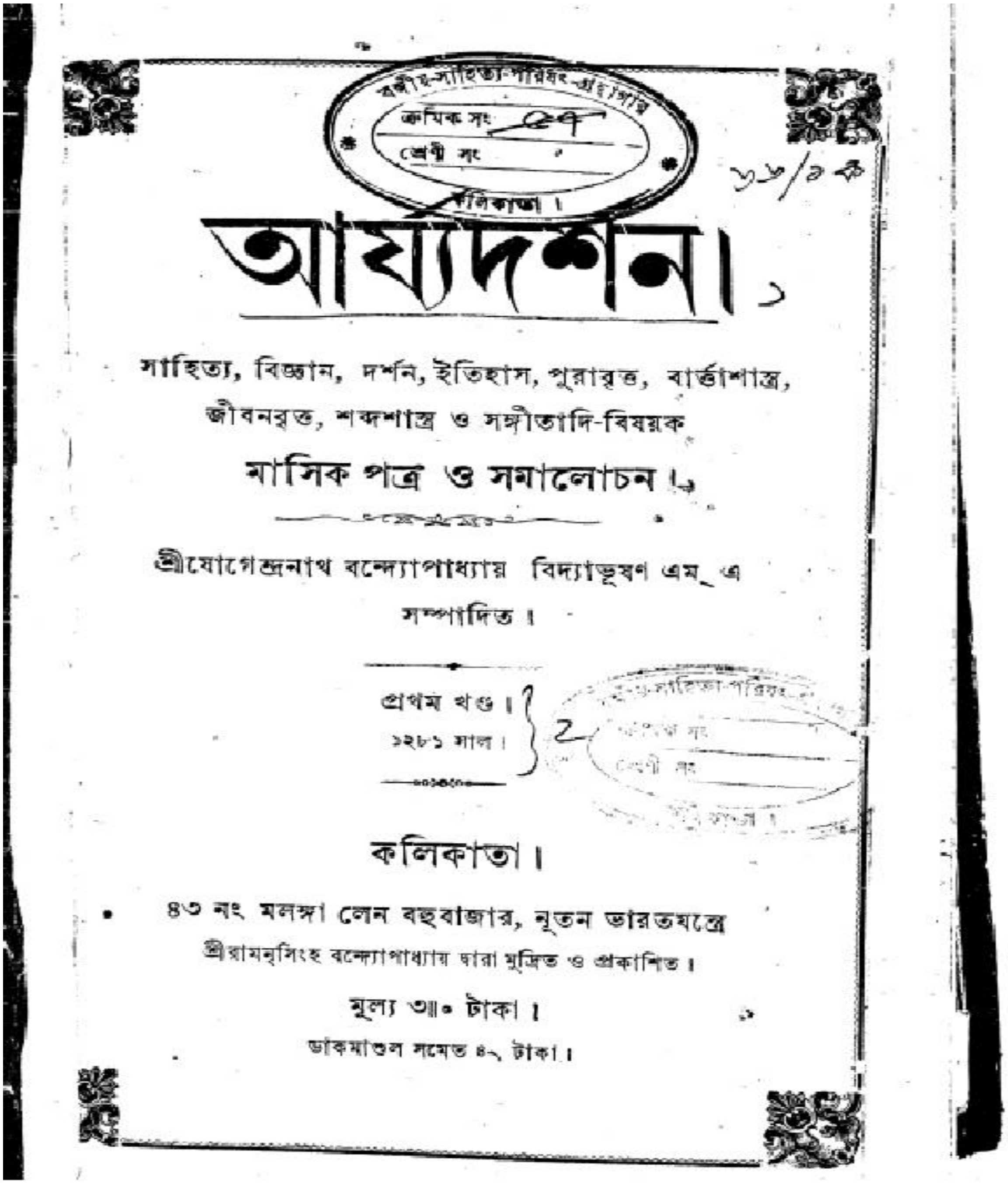
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আর্য্যদর্শন।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, বার্ত্তাশাস্ত্র,
জীবনবৃত্ত, শব্দশাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি-বিষয়ক
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ এ
সম্পাদিত।

প্রথম খণ্ড।
১২৮১ সাল।

কলিকাতা।

৪৩ নং মলঙ্গা লেন বহুবাজার, নূতন ভারতযন্ত্রে
শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৩৷৷০ টাকা।
ডাকমাশুল সমেত ৪৲ টাকা।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত *আর্য্যদর্শন*-এর আখ্যাপত্র।

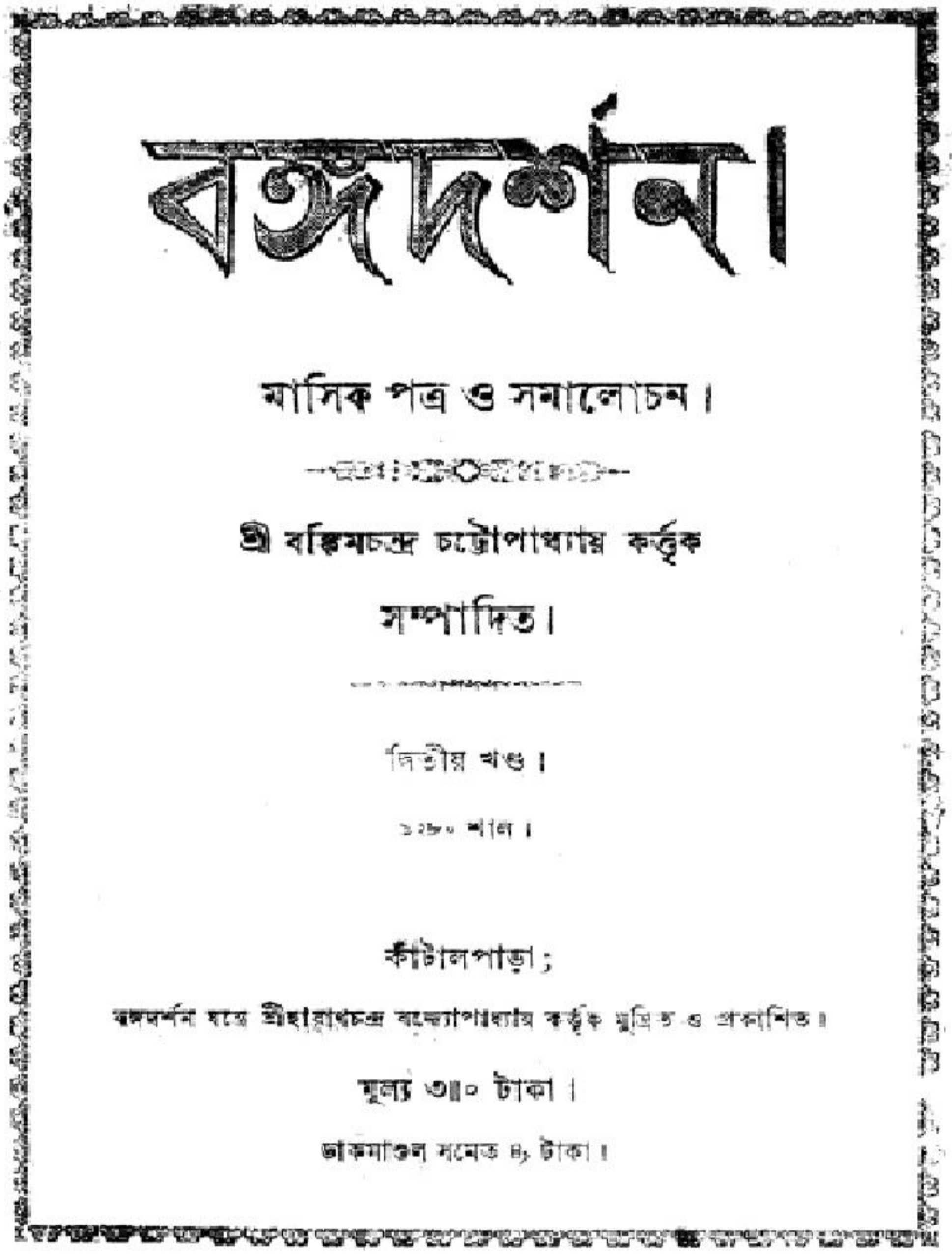
বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

১২৮০ শাল।

কাঁটালপাড়া;

বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৩॥০ টাকা।

ডাকমাশুল সমেত ৪৲ টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন*-এর আখ্যাপত্র।

নবজীবন।

১ম ভাগ।] শ্রাবণ ১২৯১। [১ম সংখ্যা।

সূচনা।

যাহা সকলেই বুঝেন, তাহা বুঝাইতে যাওয়া ঘোরতর বিড়ম্বনা; জানিয়া শুনিয়া সে বিড়ম্বনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন দেখি না। সুতরাং বঙ্গভাষায় আর একখানি উচ্চ-অঙ্গের সাময়িকপত্র প্রকাশিত হওয়া, যে এই সময়ে আবশ্যক হইয়াছে, তাহা আর নাই বুঝাইলাম। তবে আর বলিব কি? বলিবার কথা অনেক আছে।

আর একখানি উচ্চ-অঙ্গের সাময়িকপত্রের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু এত দিন ধরিয়া যে ভাবে সাময়িক পত্র সকল চলিতেছিল, সেইরূপ পত্রেই কি বর্ত্তমান বাঙ্গালির অভাব পূরণ এবং মানসিক তৃপ্তিসাধন হইবে? আমাদের তাহা বোধ হয় না। বাঙ্গালির হৃৎক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত। যখন তত্ত্ববোধিনী প্রকাশিত হয়, সেই এক যুগ; বিবিধার্থ সংগ্রহ, আর এক যুগ; বঙ্গদর্শন প্রভৃতির আবির্ভাবে তৃতীয় যুগ; এখন আবার যুগান্তর উপস্থিত। নূতন দিকে বাঙ্গালির দৃষ্টি পড়িয়াছে; বঙ্গবাসী নূতন অভাব অনুভব করিয়া, অভিনব পথে অগ্রসর হইতে উদ্যত; বাঙ্গালি আজি কালি নব উৎসাহে উৎসাহিত; আমরা এই উৎসাহের উৎসবে যোগ দান করিতে সংকল্প করিয়াছি। আমরা বিবেচনা করি-

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত *নবজীবন*-এর আখ্যাপত্র।

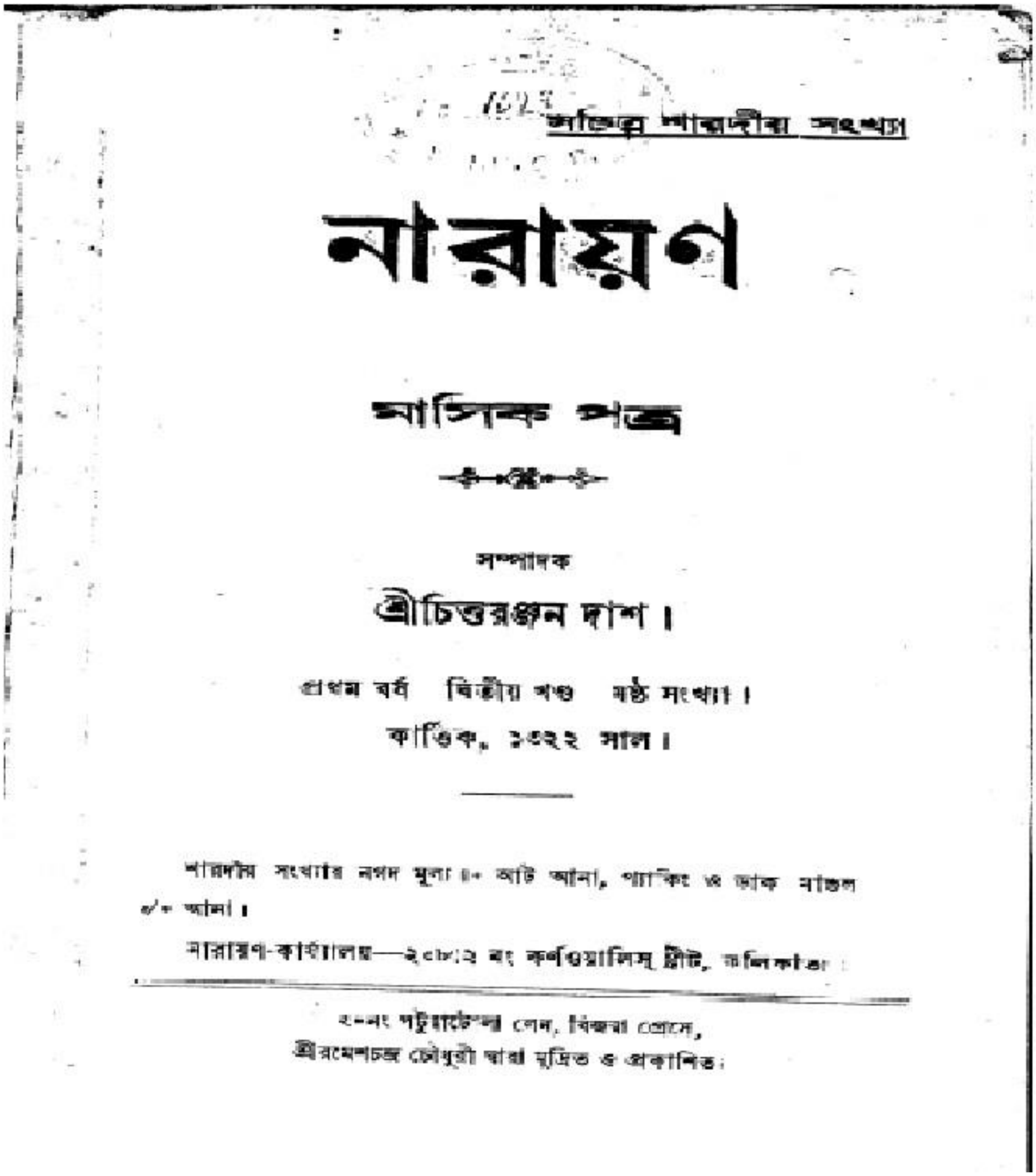

অতিরিক্ত শারদীয়া সংখ্যা

নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড ষষ্ঠ সংখ্যা।

কার্ত্তিক, ১৩২২ সাল।

শারদীয় সংখ্যার নগদ মূল্য ৷৹ আট আনা, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৵৹ আনা।

নারায়ণ-কার্য্যালয়—২৮।২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২২নং পটুয়াটোলা লেন, বিজয়া প্রেসে,
শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত *নারায়ণ*-এর আখ্যাপত্র।

বঙ্গবাণী

"আবার তো'রা মানুষ হ।"

ফাল্গুন, ১৩২৮ [১ম সংখ্যা

বঙ্গবাণী

তুষার-ফলকে ঊষার আলোক, হিমাদ্রি-শিখর-ভাগে
চমকে, মৃদুল দীপনে তপ্ত কাঁচা কাঞ্চন–রাগে।
হীরক-কুচির রুচির দীপ্তি, ঝলকে ঝর্ণা 'পরে ;
সানুর সোপানে অসীম সুষমা গলিয়া দুলিয়া ঝরে।
নেহারি সেথায়, বিহরে তোমার-ই উজল অঙ্গ খানি ;
হসিত মাধুরী-ভূষিত নিত্য তুমি গো বঙ্গবাণী।

অরুণ-পরশে তরুণ পদ্ম, সরসী ভূষিয়া সাজে ;
যেন সে কবির মানসে তোমার শোভন আসন রাজে।
ললিত বিলাসে লুলিত পবন, লহরী তুলিয়া জলে,
শিহরি' তোমার চরণ চুমিয়া, বিহরে সরোজ-দলে।
ছন্দ নাচিয়া বন্দে তোমায়,—প্রাচীর অঙ্গ-বাণী !
সঙ্গীত-রসে উৎসবময়ী, তুমি গো বঙ্গবাণী।

দীনেশচন্দ্র সেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত *বঙ্গবাণী*-এর আখ্যাপত্র।

কৃপাশরণ মহাস্থবির (১৮৬৫ ১৯২৬)।

অনাগারিক ধর্মপাল (১৮৬৪ – ১৯৩৩) ও স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ – ১৯০২)।

শিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলন (১৮৯৩)

কুমরাহারে প্রাপ্ত প্লাকে বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মহাবিহারের চিত্র।

সম্রাট অশোক নির্মিত সাঁচি স্তূপ।

তালিবানি ধ্বংসের আগে ও পরে বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি।

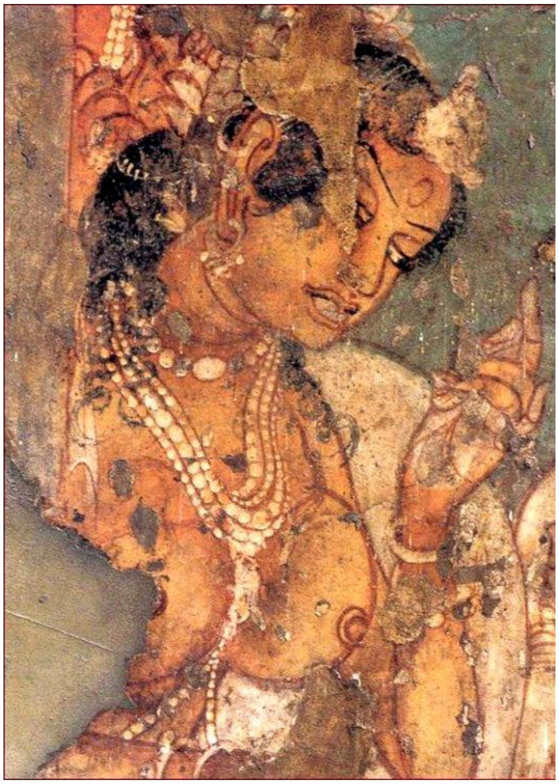

অজন্তার চিত্র।

মহাযানী পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ।

মহাযানী দেবতা হেবজ্র।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপ।

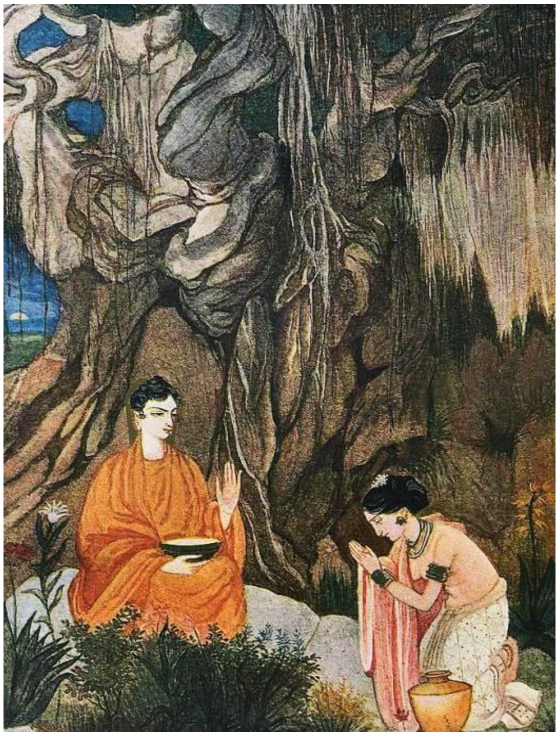

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১ – ১৯৫১) অঙ্কিত চিত্র ‘বুদ্ধ ও সুজাতা’।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১ – ১৯৫১) অঙ্কিত চিত্র ‘তিষ্যরক্ষিতা’।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১ – ১৯৫১) অঙ্কিত চিত্র ‘বুদ্ধের বোধিলাভ’।

মহাপরিনির্বাণ, কুশিনগর।

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা সহায়ক গ্রন্থাবলী

যে সকল উপাদান সরাসরি গবেষণাপত্রে ব্যবহৃত হয়েছে –

১) বাংলা

আরণ্য, স্বামী হরিহরানন্দ। মহাস্থবির, জ্যোতিপাল। (সম্পাদিত ও অনূদিত)। (২০০৫)। শান্তিদেব কৃত *বোধিচর্য্যাবতার*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

আলী, সৈয়দ মুজতবা। (২০০৫)। *সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড।

আহম্মদ, নাজিমুদ্দীন। (২০০৫)। *সিল্করোডের গৌরবময় প্রত্নসম্পদ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ। (২০১০)। *সাময়িকপত্র প্রসঙ্গে*। কলকাতা: পারুল প্রকাশনী।

গুপ্ত, অঘোরনাথ। (১৯৯২)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। *শাক্যমুনিচরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী

গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ। (১৯৩৬)। *কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য*। কলকাতা: ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।

গুহ, রণজিৎ। (২০১২)। *দয়া রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা*। কলকাতা: তালপাতা।

ঘোষ, ঈশানচন্দ্র। (অনূদিত)। (২০০৪)। *জাতক*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ঘোষ, ঈশানচন্দ্র। (অনূদিত)। (২০০১)। *জাতক*। ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র। (১৯৭৯)। ভট্টাচার্য, দেবীপদ। (সম্পাদিত)। *বুদ্ধদেব চরিত*। *গিরিশ রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

ঘোষ, নির্ম্মলকুমার। (১৯৯৫)। *ভারত শিল্প*। কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড।

ঘোষ, বিনয়। (২০০৯)। *বাংলার নবজাগৃতি*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান।

ঘোষ, মনোমোহন। (১৯৫৫)। বাংলা সাহিত্য। কলকাতা: ইণ্ডিয়ান্ পাবলিস্টী সোসাইটী।

চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার। (২০০৪)। *চর্যাগীতির ভূমিকা*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরি।

চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার। (১৯৫৬)। *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালির উত্তরাধিকার*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরি।

চক্রবর্ত্তী, শ্যামাপদ। (২০০৪)। *অলঙ্কার-চন্দ্রিকা*। কলকাতা: কৃতাঞ্জলি প্রকাশনী।

চক্রবর্ত্তী, সত্যজ্যোতি। (২০০৯)। সায়ণ মাধবীয় *সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্যশ্রী।

চট্টোপাধ্যায়, অলকা। (২০১০)। *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী*। কলকাতা: অনুস্টুপ।

চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ। (১৯৭৪). *মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। (১৯৬৪)। *বঙ্কিম-রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

চৌধুরী, বিনয়েন্দ্রনাথ। (সম্পাদিত)। (১৯৯৫)। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ সাহিত্য*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।

চৌধুরী, ভূদেব। (১৯৯৫)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা* (১ম পর্যায়)। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

চৌধুরী, সত্যজিৎ। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। (১৯৭৮)। (সম্পাদিত)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক গ্রন্থ*। কলকাতা: সান্যাল প্রকাশনী।

চৌধুরী, সাধনকমল। (২০০৬)। *উপনিষদ ও বুদ্ধ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

চৌধুরী, সাধনকমল। (অনূদিত)। (২০০২)। *বিশুদ্ধ সুত্তনিপাত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদিত)। (২০১৪)। *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।

চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদিত)। (২০০১)। *মহামানব গৌতম বুদ্ধ*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।

চৌধুরী, সুকোমল। (১৯৭৩)। *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী।

চৌধুরী, হেমেন্দুবিকাশ। (সম্পাদিত)। (২০০১)। *প্রসঙ্গ: আফগানিস্থানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

চৌধুরী, হেমেন্দুবিকাশ। (সম্পাদিত)। (১৯৯৫)। *জগজ্জ্যোতি*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

চৌধুরী, হেমেন্দুবিকাশ। (সম্পাদিত)। (২০১৪)। *জগজ্জ্যোতি*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

জাকারিয়া, সাইমন। (২০০৭), *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক*। ঢাকা, বাংলাদেশ: বাংলা একাডেমী।

জানা, নরেশচন্দ্র। জানা, মানু। সান্যাল, কমলকুমার। (সম্পাদিত)। (১৯৮১) ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ। *স্বরচিত জীবন-চরিত*, কলকাতা: অনন্য প্রকাশন।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। (১৯৯৭)। *অবনীন্দ্র রচনাবলী*। অষ্টম খন্ড। কলকাতা: প্রকাশ ভবন।

ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ। (২০০২)। চক্রবর্তী, বরুণকুমার। (সম্পাদক)। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (সম্পাদিত)। (২০১৩), ঘোষ, বারিদবরণ। ভূমিকা। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংগ্রহ ১*। ১৮৩৩ শক। ১৩১৮ সাল। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৯৫৫)। *ইতিহাস*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০১২)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০১২)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০১২)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০০৩)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। সপ্তম খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০০৩)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। দশম খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০১৫)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। দ্বাদশ খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০০২)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। (১৩১৬)। *রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ। (অনূদিত)। (২০০০)। *অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ। (১৯৯৮)। *বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

তর্করত্ন, পঞ্চানন। (সম্পাদিত)। (২০১০)। *বিষ্ণুপুরাণম্*। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স।

ত্রিপাঠী, অমলেশ। (২০০৯)। *বাংলার র‍্যানেশাঁস বাঙালীর সংস্কৃতি*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

দত্ত, অক্ষয়কুমার। (২০১৪)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদক)। *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*। দ্বিতীয় ভাগ। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

দত্ত, বিজিতকুমার। (২০১২)। *বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড।

দত্ত, বিমলচন্দ্র। (২০১৫)। *বৌদ্ধ ভারত*। মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র। ভিক্ষু, সুমনপাল। (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ ভারত*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

দত্ত, ভবতোষ। (২০০৮)। *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

দত্ত, ভবতোষ। সরকার, বিজলি। (২০০৬)। *বঙ্গদর্শন পরম্পরা*। কাঁটালপাড়া, নৈহাটি: বঙ্কিম-গবেষণা কেন্দ্র।

দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ। (২০০৩)। রায়, অলোক। (সম্পাদিত)। *সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ*। সাহিত্য সংসদ। কলকাতা।

দাক্ষী, অলিভা। (২০১১)। *চর্যা-গীতি ভাষা ও শব্দকোষ*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

দাশ, আশা। (১৯৬৯)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস।

দাশ, নির্মল। (২০১০)। *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

দাশগুপ্ত, তমোনাশচন্দ্র। (১৯৫২)। *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। (১৯৬৫)। বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রা.) লিমিটেড।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। (২০০৪)। *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।

দাশ, শিশিরকুমার। (সংকলন ও সম্পাদনা)। (২০০৩)। *সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ। (২০০৫)। *ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড।

দাস, ক্ষুদিরাম। (২০০৯)। *বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

দাস বাহাদুর, রায় শরচ্চন্দ্র। (অনূদিত)। (২০০০)। ক্ষেমেন্দ্র, মহাকবি। *বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

ন্যায়রত্ন, রামগতি। (১৯৯১)। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। (সম্পাদিত)। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব। কলকাতা: সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স।

রায়, অন্নদাশঙ্কর। (২০০৪)। *বাংলার রেনেসাঁস*। কলকাতা: বাণীশিল্প।

রায়, অলোক। (১৯৬৯)। *রাজেন্দ্রলাল মিত্র*। কলকাতা: বাগর্থ।

রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল। (১৯৯৬)। রায়, রথীন্দ্রনাথ। (সম্পাদিত)। *দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

রায়, নীহাররঞ্জন। (২০০৫)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস*। আদিপর্ব। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

রায়, নীহাররঞ্জন। (২০০২)। *ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

রায়, শরৎকুমার। (২০০০)। *বৌদ্ধ ভারত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

রায়, শিবনারায়ণ। (২০০৯)। *প্রবন্ধ সংগ্রহ – ২*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

রায়চৌধুরী, নৃপেন্দ্রনাথ। (১৯৯৫)। রায়, অশোককুমার। (সম্পাদিত)। *নৃপেন্দ্রনাথ রচনাসম্ভার*। কলকাতা: এবং মুসায়েরা।

রায়চৌধুরী, সুব্রত। (২০১২)। *অঘোরনাথ গুপ্ত*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

পাত্র, চিত্তরঞ্জন। (২০০৬)। ভূমিকা। *দাঠা বংস*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূলচন্দ্র। (১৯৬৬)। *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। (২০০০ – ২০০১)। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মডার্ন।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। (১৯৬৪)। *হে মহাজীবন*। কলকাতা: মহাবোধি সোসাইটি অব্ ইণ্ডিয়া।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। (২০০১)। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ। (সম্পাদিত)। *রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী*। প্রথম খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। (২০১২)। *বাঙ্গালার ইতিহাস*। কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। (২০০৮)। *অক্ষয়চন্দ্র সরকার*। *রামগতি ন্যায়রত্ন*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। (১৯৮২)। *রাজেন্দ্রলাল মিত্র*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। (১৯৯৬)। *সুরেশচন্দ্র সমাজপতি*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। (সংকলিত ও সম্পাদিত)। (২০০৮)। *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*। প্রথম খণ্ড। ১২১২ – ১২৩০। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। (১৯৯৬)। বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা। মিত্র, গজেন্দ্রকুমার। (সম্পাদিত)। বিভূতি-রচনাবলী। পঞ্চম খণ্ড। *দেবযান*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড।

বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, মানবেন্দু। (সম্পাদিত ও অনূদিত)। (২০০৩)। মহর্ষি-বাৎস্যায়ন প্রণীতং *কামসূত্রম্*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। (২০১১-২০১২)। *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। কলকাতা: মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। (১৯৯৯)। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা। কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।

বড়ুয়া, দীপককুমার। (২০০৮)। *বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

বড়ুয়া, প্রণবকুমার। (২০০৭)। *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। ঢাকা, বাংলাদেশ: বাংলা একাডেমী।

বড়ুয়া, বেণীমাধব। (অনূদিত)। (১৯৩৯)। *মধ্যম-নিকায়*। দয়াধন-উমাবতী সিরিজ-৩। কলকাতা: যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড।

বড়ুয়া, বেণীমাধব। (২০১১)। চৌধুরী, হেমেন্দুবিকাশ। (সম্পাদিত)। *নির্বাচিত রচনাবলী*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

বড়ুয়া, বেণীমাধব। (১৯২২)। *বৌদ্ধ-পরিণয় পদ্ধতি*। কলকাতা: পুলিনবিহারী চৌধুরী। সাঙ্গুভেলি টিকাকোম্পানী। কলকাতা। প্যারীমোহন চৌধুরী। লক্ষ্ণৌ। সুধীরচন্দ্র বড়ুয়া। বর্ম্মাষ্টেসনারি সাপ্লাই কোম্পানী। ২৪/৩ মির্জ্জাপুর ষ্টীট্।

বড়ুয়া, মনোরঞ্জন। (২০১৬)। *বৌদ্ধতীর্থ পর্যটন*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।

বসু, রাজশেখর। (২০০৯)। (সারানূদিত)। *বাল্মীকি রামায়ণ*। কলকাতা: ভারবী।

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। (২০১০)। *নিবেদিতা লোকমাতা*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। (১৯৮৯)। *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস।

বড়ুয়া, শুভ্রা। (অনূদিত)। (২০০৪)। *মহাবংস*। কলকাতা: গোবিন্দপ্রসাদ বড়ুয়ার ব্যক্তিগত উদ্যোগ।

বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল। (১৯৮৮)। *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

বড়ুয়া, সুমঙ্গল। (অনূদিত)। (১৯৩৪)। *অঙ্গুত্তর-নিকায়*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী।

বাগচী, প্রবোধচন্দ্র। (১৯৯৭)। *বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

বিদ্যারত্ন, কালীপ্রসন্ন। (২০১১)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। *বুদ্ধদেব-চরিত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। (২০০৬)। *বুদ্ধদেব অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সম্পূর্ণ জীবন চরিত ও উপদেশ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

বিবেকানন্দ, স্বামী। (২০০৬)। *পত্রাবলী*। কলকাতা: উদ্বোধন কার্য্যালয়।

বিবেকানন্দ, স্বামী। (২০১৩)। *স্বামী বিবেকান্দের বাণী ও রচনা*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: উদ্বোধন কার্য্যালয়।

বিবেকানন্দ, স্বামী। (২০১২)। *স্বামীজীর বাণী ও রচনা*। ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।

বিবেকানন্দ, স্বামী। (২০০৫)। *স্বামী বিবেকান্দের বাণী ও রচনা*। দশম খণ্ড। কলকাতা: উদ্বোধন কার্য্যালয়।

বিশ্বাস, দিলীপকুমার। (২০০৮)। *ইতিহাস ও সংস্কৃতি*। প্রবন্ধ সংগ্রহ: ৩য় খণ্ড। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী।

বিশ্বাস, দিলীপকুমার। (১৯৮৩)। *রামমোহন-সমীক্ষা*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী।

ব্রহ্মচারী, শীলানন্দ। (১৯১৫)। *কর্মযোগী কৃপাশরণ*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। (১৯৭২)। ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যেতিহাস-চর্চা। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। (২০০৮)। *বঙ্গদর্শন পত্রিকা ও বঙ্কিমচন্দ্র*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ। (২০১৫)। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*। কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ ও সপ্তর্ষি প্রকাশন।

ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ। (২০০১)। *বাংলার বাউল ও বাউল গান*। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।

ভট্টাচার্য, বেলা। (সম্পাদিত)। (২০০৩ – ২০০৪)। *বৌদ্ধকোষ*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য, বেলা। (সম্পাদিত)। (২০০৪ – ২০০৫)। *বৌদ্ধকোষ*। পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য, বেলা। (সম্পাদিত)। (২০০৭)। *বৌদ্ধকোষ*। ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য, বেলা। (সম্পাদিত)। (২০০৭)। *হরপ্রসাদ স্মরণে*। কলকাতা: পালি বিভাগ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য্য, বিধুশেখর। (২০১৪)। মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র। ভিক্ষু, সুমনপাল। (সম্পাদিত)। প্রবেশক। *পালিপ্রকাশ*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ। (২০০৪)। *বৌদ্ধদের দেবদেবী*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন।

ভট্টাচার্য, সুভাষ। (২০১৩)। *সংসদ ইতিহাস অভিধান*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

মহাথের, ধর্মপাল। (১৯৯৩)। *জাতক নিদান*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার।

মহাথের, ধর্মপাল। (২০০২)। *সদ্ধর্ম রত্নমালা*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

মহাথেরো, প্রিয়ানন্দ। মহাথেরো, এস. ধর্মপাল। (১৯৮০)। *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মে মহাস্থবিরদের অবদান*। অগ্রসার প্রকাশনা সিরিজ – ১। কাতালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ: বাংলাদেশ ভিক্ষু মহাসভা। নব পণ্ডিত বিহার।

মহাস্থবির, ধর্মাধার। (অনূদিত)। (১৯৫৪)। *ধম্মপদ*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার।

মহাস্থবির, ধর্মাধার। (২০০৯)। *সদ্ধর্মের পুনরুত্থান*। কলকাতা: ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী।

মহাস্থবির, ধর্মাধার। (অনূদিত)। (২০১৩)। *মিলিন্দ-প্রশ্ন*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

মহাস্থবির, ধর্ম্মরত্ন। (সংকলিত ও অনূদিত)। (১৯৪১)। মহাপরিনিব্বান সুত্তং। চট্টগ্রাম: প্রবর্ত্তক প্রেস।

মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত। (১৯৭০)। *বাঘ ও অজন্তা*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী।

মজুমদার, পরেশচন্দ্র। (১৯৯২)। *বাঙলা ভাষা পরিক্রমা*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

মুখোপাধ্যায়, বিমলাকান্ত। (সম্পাদিত)। (২০০৮)। কবিরাজ, বিশ্বনাথ। *সাহিত্যদর্পণ:*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

মুখোপাধ্যায়, ভূদেব। (২০১০)। সান্যাল, মনস্বিতা। বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন। (সম্পাদিত)। *প্রবন্ধ সমগ্র*। কলকাতা: চর্চাপদ।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র। (১৯৮৮)। *বাংলা দেশের ইতিহাস*। কলকাতা: জেনারেল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

মুখোপাধ্যায়, সুখময়। (২০১৪)। *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম*। কলকাতা: ভারতী বুক স্টল।

মুখোপাধ্যায়, সুজিতকুমার। (অনূদিত)। (১৯৪৭)। *শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। (সম্পাদিত)। (২০১০)। জয়দেব। *গীতগোবিন্দ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। (সম্পাদিত)। (২০০০)। *বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

মিত্র, অশোক। (২০০৭)। *ভারতের চিত্রকলা*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

মিত্র, কৃষ্ণকুমার। (১৯৯৮)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। *বুদ্ধচরিত ও বৌদ্ধধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ। (২০০০)। *বাংলা সাহিত্যের কথা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

শাস্ত্রী, জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায়। (১৯৯৯)। *ললিতবিস্তর*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

শাস্ত্রী, শিবনাথ। (২০০৯)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। অষ্টম পরিচ্ছেদ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। কলকাতা: নিউ এজ।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (১৯৪৬)। *প্রাচীন বাংলার গৌরব*। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (১৯৯১)। চৌধুরী, সত্যজিৎ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন। ভট্টাচার্য, সুমিত্রা। (সম্পাদিত)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (২০০১)। চৌধুরী, সত্যজিৎ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন। ভট্টাচার্য, সুমিত্রা। (সম্পাদিত)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (১৯৮৯)। চৌধুরী, সত্যজিৎ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন। ভট্টাচার্য, সুমিত্রা। (সম্পাদিত)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (সম্পাদিত)। (২০১৫)। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

শীলভদ্র, ভিক্ষু। (অনূদিত)। (২০১১)। *দীঘ নিকায়*। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ-৬। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।

শীলভদ্র, ভিক্ষু। (অনূদিত)। (২০১৫)। ভিক্ষু, সুমনপাল। (সম্পাদিত)। *সুত্ত নিপাত*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

শীলভদ্র, ভিক্ষু। (অনূদিত)। (১৯৫০)। *থেরীগাথা*। কলকাতা: মহাবোধি সোসাইটি।

সরকার, দীনেশচন্দ্র। (২০০৯)। *পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত*। কলকাতা: সাহিত্যলোক।

সরকার, সাধনচন্দ্র। (১৯৯৭)। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদক)। *বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।

সুগত, ভিক্ষু। (২০১১)। *ত্রিপিটক পরিচিতি*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

সেন, অমূল্যচন্দ্র। (২০১৬)। সুমনপাল ভিক্ষু। (সম্পাদক)। *অশোকলিপি*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।

সেন, কৃষ্ণবিহারী। (২০০৪)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। *অশোকচরিত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশন।

সেন, দীনেশচন্দ্র। (২০০২)। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। (সম্পাদিত)। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

সেন, দীনেশচন্দ্র। (২০০২)। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। (সম্পাদিত)। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। দ্বিতীয় খন্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

সেন, দীনেশচন্দ্র। (২০০৬)। *বৃহৎ-বঙ্গ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

সেন, নবীনচন্দ্র। (১৯৫৬)। *অমিতাভ*। কলকাতা: প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী।

সেন, নবীনচন্দ্র। (১৯৫৯)। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। দাস, সজনীকান্ত। (সম্পাদিত)। *নবীনচন্দ্র রচনাবলী*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।সেন, প্রবোধচন্দ্র। (২০০১)। দত্ত, ভবতোষ। (সম্পাদিত)। *বাংলার ইতিহাস-সাধনা*। বিবিধ বিদ্যা সংগ্রহ ৯। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

সেন, প্রবোধচন্দ্র। (২০১১)। *ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং।

সেন, রামদাস। (১৯৯৭)। ঘোষ, বারিদবরণ। (সম্পাদিত)। *বুদ্ধদেব তাঁহার জীবন ও ধর্ম্মনীতি*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

সেন, সুকুমার। (২০০২)। *চর্যাগীতি পদাবলী।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সেন, সুকুমার। (১৯৫৭)। (সম্পাদিত)। চূড়ামণি দাসের *গৌরাঙ্গবিজয়*। কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি।

সেন, সুকুমার। (২০০৪)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সেন, সুকুমার। (২০০২)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।* পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সেন, সুকুমার। মুখোপাধ্যায়, তারাপদ। (সম্পাদিত)। (২০০৮)। আদিখণ্ড। প্রথম পরিচ্ছেদ। কৃষ্ণদাস বিরচিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল। (১৯৭৭)। *বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক*। কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড।

সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল। (২০১১)। *স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা সাধক*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। (২০১৩)। *উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম ও অনান্য প্রসঙ্গ*। কলকাতা: সাহিত্যশ্রী।

সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র। (সম্পাদক)। (২০১০)। *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

সেনগুপ্ত, সুব্রত। (২০১০)। *দেড়শো বছরের (১৮০১ – ১৯৫০) বাংলা সাময়িক-পত্রে বৌদ্ধপ্রসঙ্গ*। কলকাতা: সেনগুপ্ত, কৃষ্ণা (ব্যক্তিগত উদ্যোগ)।

স্মৃতিতীর্থ, কৃষ্ণচন্দ্র। (২০০৬)। (সম্পাদিত)। গোস্বামী, রাধাবিনোদ। (সংকলিত)। মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন-প্রণীতম্ শ্রীমদ্ভাগবতম্। গিরিজা।

স্থবির। (অনুবাদক)। (১৯৩৫)। *থেরগাথা*। রেঙ্গুন: রেঙ্গুন বৌদ্ধ-মিশন প্রেস।

স্থবির, প্রজ্ঞানন্দ। (অনূদিত)। (১৯৩৭)। *মহাবর্গ*। দয়াধন-উমাবতী সিরিজ – ১। কলকাতা: যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড।

হাজরা, কানাইলাল। (২০১৪)। ভিক্ষু, সুমনপাল। (সম্পাদক)। *আদি-বুদ্ধ*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।

হাজরা, কানাইলাল। দাশ, আশা প্রমুখ। (সম্পাদিত)। (১৯৮৫ - ৮৬)। *বৌদ্ধকোষ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

হালদার, অসিতকুমার। (২০১০)। *অজন্তা*। কলকাতা: লালমাটি।

হালদার, গোপাল। (১৯১২)। *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা*। প্রথম খণ্ড: প্রাচীন ও মধ্যযুগ। কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী।

হালদার (দে), মণিকুন্তলা। (২০১০)। চৌধুরী, সুকোমল। (সম্পাদক)। *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

২) সাময়িকপত্র

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়' (দত্ত, নবকুমার। *অবসর,* চৈত্র, ১৩১৪)।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। 'ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ বিহার' প্রবন্ধে (সরকার, প্রফুল্লকুমার সম্পাদিত। *আনন্দবাজার প্রত্রিকা,* শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৪)।

অস্বাক্ষরিত। 'জৈনধর্ম্ম'-এ (বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন,* শ্রাবণ, ১২৮২)।

অস্বাক্ষরিত। 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' (বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন,* চৈত্র, ১২৮৯)।

অস্বাক্ষরিত। 'বুদ্ধদেব ও তদুদ্ভাবিত ধর্ম্ম-প্রণালী' (বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন,* আষাঢ়, ১২৮১)।

মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর। 'ভারতের নীতি গৌরব' (বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন,* ভাদ্র, ১২৮৫)।

সেন, রামদাস। 'শাক্যসিংহের আবির্ভাব কাল' (বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন,* ভাদ্র – আশ্বিন, ১২৯২)।

হরপ্রসাদ, শাস্ত্রী। 'বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম' (সারদানন্দ, স্বামী সম্পাদিত। *উদ্বোধন,* আষাঢ়, ১৩২৪)।

অস্বাক্ষরিত। 'শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়' (দাস, শ্রীকৃষ্ণ সম্পাদিত। *জ্ঞানাঙ্কুর,* শ্রাবণ, ১২৮০)।

অস্বাক্ষরিত। 'বুদ্ধদেবের জীবন বৃত্তান্ত' (দাস, শ্রীকৃষ্ণ সম্পাদিত। *জ্ঞানাঙ্কুর,* জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১)।

মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর। 'মসলা বাঁধা কাগজ' (দাস, শ্রীকৃষ্ণ সম্পাদিত। *জ্ঞানাঙ্কুর* মাঘ, ১২৮০)।

রায়, নীহাররঞ্জন। 'উনিশশতকী বাঙালির পুনরুজ্জীবন: পুনর্বিবেচনা' (রায়, শিবনারায়ণ সম্পাদিত। *জিজ্ঞাসা,* বৈশাখ, ১৩৮৭)।

বড়ুয়া, সুমিতকুমার। 'শ্রীমৎ বিশুদ্ধাচার মহাস্থবিরকৃত *সীবলী ব্রতকথা:* ধ্রুপদী ও লোকায়ত ভাবনার মেলবন্ধন' (তালুকদার, প্রসেনজিৎ সম্পাদিত। *জ্যোতি,* বাংলাদেশ: হীরক জয়ন্তী। শাসনতিলক ভদন্ত বিমলজ্যোতি স্মারক '১৬, ২০১৫)।

চট্টোপাধ্যায়, চিন্তামণি। 'গণেশ পুরাণ ও বৌদ্ধধর্ম্ম' (পাকড়াশী, অযোধ্যানাথ সম্পাদিত। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* মাঘ, ১২৭৩)।

চট্টোপাধ্যায়, চিন্তামণি। 'বিষ্ণুপুরাণ ও বৌদ্ধধর্ম্ম' (ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* বৈশাখ, ১৩০৪)।

চট্টোপাধ্যায়, চিন্তামণি। 'বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম্ম' (ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ও ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* ভাদ্র, ১৩২৬)।

ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ। 'আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত' (ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ – অগ্রহায়ণ, ১৩০৬ এবং বৈশাখ, ১৩০৭)।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ' (ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* পৌষ, ১৩৩৮)।

বেদান্ততীর্থ, গিরিশচন্দ্র। 'হিন্দু ও বৌদ্ধ' (ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* বৈশাখ, ১৩৩৫)।

মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র। 'বোধগয়া প্লাকের নূতন কথা (অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ন মিঃ ভিনসেন্ট এ, স্মিথের অভিমত)' (ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ও ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* আষাঢ়, ১৩২৪)।

অস্বাক্ষরিত। 'বিজয়চন্দ্র মজুমদারের পাঁচটি প্রবন্ধ' (মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন সম্পাদিত। *বিষয়: চর্যাপদ। দশদিশি।* ২০১২ – ২০১৩)।

বসু, বুদ্ধদেব। 'সাহিত্যপত্র' (ঘোষ, সাগরময় সম্পাদিত। *দেশ,* বৈশাখ, ১৩৬০)।

বড়ুয়া, সুমিতকুমার। 'রবীন্দ্র দৃষ্টিতে শিবাজি: জাতীয় বীরের সন্ধানে' (রায়, অনিন্দ্য সম্পাদিত। *দিশা সাহিত্য,* জুলাই – সেপ্টেম্বর, ২০১০ ও জানুয়ারি – জুন, ২০১১)।

অস্বাক্ষরিত। 'ভারত ভ্রমণ' (সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত। *নবজীবন,* আশ্বিন, ১২৯১)।

অস্বাক্ষরিত 'পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব'-এ (সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত। *নবজীবন,* চৈত্র, ১২৯১)।

অস্বাক্ষরিত 'য়ুরোপে দর্শন ও ধর্ম্মপ্রচার' চারটি প্রবন্ধের (সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত। *নবজীবন,* মাঘ, ১২৯৩; চৈত্র, ১২৯৩; আশ্বিন, ১২৯৪ ও পৌষ, ১২৯৪)।

অস্বাক্ষরিত 'ভারতে ব্রাহ্মণ বাস' (সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত। *নবজীবন,* অগ্রহায়ণ, ১২৯৫)।

অস্বাক্ষরিত। 'দেবগিরি' (সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত। *নবজীবন,* জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬)।

অস্বাক্ষরিত। 'সিংহল যাত্রা' প্রবন্ধটি (সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত। *নবজীবন,* মাঘ, ১২৯৯)।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এর প্রবন্ধগুলিতে (সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত। *নবজীবন,* শ্রাবণ, ১২৯১ – চৈত্র, ১২৯২)।

সিংহ, কৈলাসচন্দ্র। ''সিংহল যাত্রা'' – প্রতিবাদ' (সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত। *নবজীবন,* ফাল্গুন, ১২৯১)।

সেন, রামদাস। 'শাক্যসিংহের জন্ম ও বাল্যজীবন' (সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত। *নবজীবন,* চৈত্র, ১২৯২)।

সেন, রামদাস। 'শাক্যসিংহের লিপিশিক্ষা' (সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত। *নবজীবন,* শ্রাবণ ১২৯৩।

সেন, রামদাস। 'বুদ্ধচরিত। গোপার স্বপ্নদর্শন' (সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত। *নবজীবন,* পৌষ, ১২৯৩)।

সেন, রামদাস। 'শাক্যসিংহের শুদ্ধোদনের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া নিষ্ক্রমণ' (সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত। *নবজীবন,* মাঘ, ১২৯৩)।

সেন, রামদাস। 'বুদ্ধচরিত' (সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত। *নবজীবন,* আষাঢ়, ১২৯৪)।

মজুমদার, বিজয়চন্দ্র। 'অশ্বঘোষ' (রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত,* ফাল্গুন, ১৩১১)।

মজুমদার, বিজয়চন্দ্র। 'অশ্বঘোষ' (বুদ্ধচরিত) (রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত,* চৈত্র, ১৩১১)।

মজুমদার, বিজয়চন্দ্র। 'একটি জাতক-কথা (সুসীম জাতক)' (রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত,* চৈত্র, ১৩১৩)।

মজুমদার, বিজয়চন্দ্র। 'পালি সাহিত্য' (রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত,* মাঘ, ১৩২৭)।

চট্টোপাধ্যায়, রাখহরি। 'প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্র' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* ফাল্গুন, ১৩২৮)।

পাল, শরৎচন্দ্র। 'জাপানী পুরাণ' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* কার্তিক, ১৩২৭)।

বসু, চারুচন্দ্র। 'অশোকের ধর্ম্মলিপি' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* অগ্রহায়ণ, ১৩২৩)।

মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র। 'ডাক্তার স্পুনারের নূতন আবিষ্কার' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* মাঘ, ১৩২২)।

রায়, সুধীরচন্দ্র। 'বাংলার চিত্রকলা' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* শ্রাবণ, ১৩২৪)।

শাস্ত্রী, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র। 'গৌতমবুদ্ধ' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* চৈত্র, ১৩২৮)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে?' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* অগ্রহায়ণ, ১৩২১)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'নির্বাণ' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* পৌষ, ১৩২১)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'নির্বাণ কয় রকম?' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* মাঘ, ১৩২১)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'বৌদ্ধধর্ম কোথা হইতে আসিল?' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২১)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'হীনযান ও মহাযান' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* আষাঢ়, ১৩২২)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'মহাযান কোথা থেকে আসিল?' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* শ্রাবণ, ১৩২২)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'সহজযান' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* ভাদ্র, ১৩২২)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* আশ্বিন, ১৩২২)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল?' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। নারায়ণ, পৌষ, ১৩২২)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'এখনো একটু আছে' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* মাঘ, ১৩২২)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'উড়িষ্যার জঙ্গলে' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* চৈত্র, ১৩২২)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'জাতক ও অবদান' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* শ্রাবণ, ১৩২৩)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'দলাদলি' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* কার্তিক, ১৩২৩)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'মহাসাংঘিক মত' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* মাঘ, ১৩২৩)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'থেরাবাদ ও মহাসাংঘিক' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* চৈত্র, ১৩২৩)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'মানুষ ও রাজা' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* বৈশাখ, ১৩২৪)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* ভাদ্র, ১৩২৪)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'বেনের মেয়ে' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* কার্তিক, ১৩২৫ – অগ্রহায়ণ, ১৩২৬)।

শ্রী। 'বাঙ্গালীর আদর্শ' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* ফাল্গুন, ১৩২৬)।

সরকার, গুরুদাস। 'ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্য ও উড়িষ্যার শিল্পকলা' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* চৈত্র, ১৩২৬)।

সমাদ্দার, যোগীন্দ্রনাথ। 'প্রাচীন রাজগৃহ' (দাশ, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত। *নারায়ণ,* আশ্বিন – কার্তিক, ১৩২৪)।

সেন, রামদাস। 'শাক্যসিংহের মূর্ত্তি ও অঙ্গলক্ষণ' প্রবন্ধে (রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত,* জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩)। শাস্ত্রী,

মুখার্জি, বন্দনা। 'তিব্বতী উৎসে নালন্দা' (ভিক্ষু, সুমনপাল সম্পাদিত। *নালন্দা*। নালন্দার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংখ্যা। ২০১০)।

ভট্টাচার্য, বেলা। 'নালন্দায় বৌদ্ধশিক্ষা ও সাহিত্য' (ভিক্ষু, সুমনপাল সম্পাদিত। *নালন্দা*। নালন্দার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংখ্যা। ২০১০)।

সত্যপাল, ভিক্ষু। 'নালন্দার ঐতিহাসিক গুরুত্ব' (ভিক্ষু, সুমনপাল সম্পাদিত। *নালন্দা*। নালন্দার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংখ্যা। ২০১০)।

রায়চৌধুরী, নৃপেন্দ্রনাথ। 'বৌদ্ধ কলা-শিল্পের অনুপ্রেরণা ও বাঘগুহার পরিচয়' (সেন, অমূল্যচরণ সম্পাদিত। *পঞ্চপুষ্প,* বৈশাখ, ১৩৩৮)।

হরপ্রসাদ, শাস্ত্রী। হরপ্রসাদ লিখিত গ্রন্থের ভূমিকা 'মুনীন্দ্র দেবরায় রচিত *সিংহল ভ্রমণ'* (সেন, অমূল্যচরণ সম্পাদিত। *পঞ্চপুষ্প,* কার্তিক, ১৩৩৯)।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' (বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস সম্পাদিত। *প্রচার,* শ্রাবণ, ১২৯১)।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'কৃষ্ণচরিত্র' (বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস সম্পাদিত। *প্রচার,* আশ্বিন, ১২৯১ – মাঘ, ১২৯১)।

গঙ্গোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুকুমার। (অনুবাদক সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। 'সিংহ ও হস্তীর উপাখ্যান' (চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ সম্পাদিত। *প্রবাসী,* কার্তিক, ১৩২৬)।

গুপ্ত, মণীন্দ্রভূষণ। 'সিংহলের চিত্র' (চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ সম্পাদিত। *প্রবাসী,* বৈশাখ, ১৩৪১)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'মূর্তি' (চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ সম্পাদিত। *প্রবাসী,* মাঘ, ১৩২০)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'সাদৃশ্য' (চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ সম্পাদিত। *প্রবাসী,* চৈত্র, ১৩৩৪)।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'মাতৃ-অভিষেক' (চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ সম্পাদিত। *প্রবাসী,* শ্রাবণ, ১৩১৭)।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'স্বাদেশিকতা' (*জীবনস্মৃতি*) (চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ সম্পাদিত। *প্রবাসী,* ফাল্গুন, ১৩১৮)।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'বুদ্ধদেব' (চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ সম্পাদিত। *প্রবাসী,* আষাঢ়, ১৩৪২)।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'মৈত্রীসাধন' (চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ সম্পাদিত। *প্রবাসী,* মাঘ, ১৩৪৮)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে (চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ সম্পাদিত। *প্রবাসী,* মাঘ, ১৩৩০)।

মৈত্র, অক্ষয়কুমার। 'ভারত-চিত্রচর্চা' (চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ সম্পাদিত। *প্রবাসী,* কার্তিক ১৩২৯)।

হালদার, অসিতকুমার। 'বাঘগুহা' প্রবন্ধে (চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ সম্পাদিত। *প্রবাসী,* ভাদ্র, ১৩২৪)।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'কাদম্বরী চিত্র' (চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ সম্পাদিত। *প্রদীপ,* মাঘ, ১৩০৬)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'ডাক ও খনা' (বসু, সুশীলচন্দ্র সম্পাদিত। *প্রাচী,* শ্রাবণ, ১৩৩০)।

সেন, অমূল্যচন্দ্র। সম্রাট অশোকের শিলালিপি' (দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *পরিচয়,* চৈত্র, ১৩৪৬ – জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭; পৌষ, ১৩৪৭; ফাল্গুন, – চৈত্র, ১৩৪৭)।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'কালান্তর' (দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *পরিচয়,* শ্রাবণ, ১৩৪০)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'শিল্পে অধিকার' (নায়েক, মনীন্দ্র সম্পাদিত। *প্রবর্তক,* ফাল্গুন – চৈত্র, ১৩২৩)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'পালবংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা' (নায়েক, মনীন্দ্র সম্পাদিত। *প্রবর্তক,* কার্তিক, ১৩৩০)।

অস্বাক্ষরিত 'সাংখ্যদর্শন'। (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন,* পৌষ, ১২৭৯)।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধে (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন,* বৈশাখ, ১২৭৯)।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। *বিষবৃক্ষ* (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন,* বৈশাখ, ১২৭৯ – ফাল্গুন, ১২৭৯)।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'সাম্য' প্রবন্ধ পর্যায়ক্রমে (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন,* জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০; আষাঢ়, ১২৮০ এবং কার্তিক, ১২৮২)।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। *চন্দ্রশেখর* (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন,* শ্রাবণ, ১২৮০ – ভাদ্র, ১২৮১)।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন,* ভাদ্র, ১২৮০; অগ্রহায়ণ ১২৮০)।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'আমার মন' (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন,* মাঘ, ১২৮০)।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'বাঙ্গালির বাহুবল' (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন,* শ্রাবণ, ১২৮১)।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন,* মাঘ, ১২৮১)।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত *প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ*-এর আলোচনা' (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন,* চৈত্র, ১২৮১)।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। *কৃষ্ণকান্তের উইল* (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন,* পৌষ – ফাল্গুন, ১২৮২; বৈশাখ – মাঘ, ১২৮৪)।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'লোকশিক্ষা' (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন,* অগ্রহায়ণ, ১২৮৫)।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন,* অগ্রহায়ণ, ১২৮৭)।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'বাঙ্গালির উৎপত্তি' (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন,* পৌষ ১২৮৭ – জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮)।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' (চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন,* জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। ‘আমাদের গৌরবের দুই সময়’ (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন*, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৪)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। ‘ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ’ (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন*, শ্রাবণ, ১২৮৪)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। ‘বাঙ্গালার সাহিত্য’ (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন*, ফাল্গুন, ১২৮৭)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। *কাঞ্চনমালা* (চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন*, আষাঢ়, ১২৮৯ – মাঘ, ১২৮৯)।

সেন, রামদাস। ‘ভারতীয় পুরাবৃত্ত’ (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন*, ভাদ্র, ১২৭৯)।

সেন, রামদাস। ‘ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত’ (দ্বিতীয় সংখ্যা) (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন*, ভাদ্র, ১২৭৯)।

সেন, রামদাস। ‘বৌদ্ধ ধর্ম্ম’ (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন*, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২)।

সেন, রামদাস। ‘বৌদ্ধ মত ও তৎ সমালোচন’ (চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন*, ফাল্গুন, ১২৮২)।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ‘স্বদেশ’ (ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *নবপর্যায় বঙ্গদর্শন*, পৌষ, ১৩০৯)।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ‘উৎসবের দিন’ (ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *নবপর্যায় বঙ্গদর্শন*, মাঘ, ১৩১১)।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ‘শিবাজী উৎসব’ (ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *নবপর্যায় বঙ্গদর্শন*, আশ্বিন, ১৩১১)।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ‘ধম্মপদং’ (ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *নবপর্যায় বঙ্গদর্শন*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২)।

অস্বাক্ষরিত। ‘উপ্‌পলা’ (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী*, কার্তিক, ১৩৩০)।

অস্বাক্ষরিত। ‘পুস্তক পরিচয়’ (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী*, আশ্বিন, ১৩৩১)।

অস্বাক্ষরিত। ‘পুস্তক-পরিচয়’ (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী*, আশ্বিন, ১৩৩২)।

অস্বাক্ষরিত। ‘পুস্তক-পরিচয়’ (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী*, ভাদ্র, ১৩৩৪)।

অস্বাক্ষরিত। ‘বঙ্গবাণীর নৈবেদ্য’ ‘যীশুখৃষ্ট কি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন?’ (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী*, চৈত্র, ১৩৩৩)।

গুপ্ত, কৃষ্ণবিহারী। ‘বাঙ্গালীর অতীত’ (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী*, পৌষ, ১৩৩৪)।

গুপ্ত, শিবেন্দ্রনাথ। ‘ভারতে বৌদ্ধধর্মের বহুল ও সহজ প্রচারের কারণ’ (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী*, চৈত্র, ১৩৩২)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। ‘শিল্পে অনাধিকার’ (সেন, দীনেশচন্দ্র ও মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী*, ফাল্গুন, ১৩২৮)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। ‘শিল্পে অধিকার’ (সেন, দীনেশচন্দ্র ও মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী*, চৈত্র, ১৩২৮)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। ‘দৃষ্টি ও সৃষ্টি’ (সেন, দীনেশচন্দ্র ও মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী*, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। ‘শিল্প ও ভাষা’ (সেন, দীনেশচন্দ্র ও মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী*, আষাঢ়, ১৩২৯)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। ‘শিল্পের সচলতা ও অচলতা’ (সেন, দীনেশচন্দ্র ও মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী*, শ্রাবণ, ১৩২৯)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। ‘সৌন্দর্যের সন্ধান’ (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী*, কার্তিক, ১৩২৯)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। ‘শিল্প ও দেহতত্ত্ব’ (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী*, অগ্রহায়ণ, ১৩২৯)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'অন্তর বাহির' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* ফাল্গুন, ১৩২৯)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'মত ও মন্ত্র' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* চৈত্র, ১৩২৯)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'সন্ধ্যার উৎসব' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* বৈশাখ, ১৩৩০)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* আশ্বিন, ১৩৩০)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* অগ্রহায়ণ, ১৩৩০)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'শিল্পের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভালোমন্দ' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* মাঘ, ১৩৩০)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'শিল্পবৃত্তি' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* অগ্রহায়ণ, ১৩৩১)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'সুন্দর' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* ফাল্গুন, ১৩৩১)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'অসুন্দর' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* চৈত্র, ১৩৩১)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'জাতি ও শিল্প' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'অরূপ না রূপ' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* কার্তিক, ১৩৩২)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'রূপবিদ্যা' ('রূপরেখা' নামে প্রকাশিত) (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* পৌষ, ১৩৩২)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'স্মৃতি ও শক্তি' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* ফাল্গুন, ১৩৩২)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'আর্য ও অনার্য শিল্প' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* চৈত্র, ১৩৩২)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'আর্যশিল্পের ক্রম' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* বৈশাখ, ১৩৩৩)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'রূপ' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'খেলার পুতুল' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* পৌষ, ১৩৩৩)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'রূপের মান ও পরিমাণ' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* চৈত্র, ১৩৩৩)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'ভাব' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'লাবণ্য' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* কার্তিক, ১৩৩৪)।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'তথ্য ও সত্য' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* ভাদ্র, ১৩৩৩)।

দেবী, সুনীতি। 'নির্ব্বাণ' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* ফাল্গুন, ১৩৩০)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধকুমার। 'অন্ধ কুণাল' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* কার্তিক, ১৩৩১)।

ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণানন্দ। 'জৈন ও বৌদ্ধ ভারতের জাতিরহস্য' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* মাঘ, ১৩৩৪)।

ভট্টাচার্য, বিশ্বেশ্বর। 'গিরিবজ্রপুর' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* পৌষ, ১৩৩২)।

ভট্টাচার্য, বিশ্বেশ্বর। 'পৌণ্ড্রবর্ধন' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* চৈত্র, ১৩৩২)।

ভট্টাচার্য, বিশ্বেশ্বর। 'চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* মাঘ, ১৩৩৩)।

মজুমদার, বিজয়চন্দ্র। 'চর্যা ও দোহার রচনার সময়' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* ফাল্গুন, ১৩৩২)।

মজুমদার, বিজয়চন্দ্র। 'চর্যার ও দোহার রচয়িতাদের পরিচয়' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* মাঘ, ১৩৩২)।

মজুমদার, বিজয়চন্দ্র। 'বৌদ্ধগণ ও দোহা' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* পৌষ, ১৩৩২)।

মজুমদার, বিজয়চন্দ্র। 'বৌদ্ধগণ ও দোহার ভাষা' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* চৈত্র, ১৩৩২)।

মজুমদার, বিজয়চন্দ্র। 'বৌদ্ধগানে কাহ্নুর রচনা' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* কার্তিক, ১৩৩৩)।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র। 'গয়া' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* কার্তিক, ১৩৩৪)।

মুখোপাধ্যায়, অরীন্দ্রজিৎ। 'বৌদ্ধ ভারত' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* ভাদ্র, ১৩৩৩)।

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। 'সহজিয়া ও চণ্ডীদাস' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* পৌষ, ১৩৩৩)।

মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার। 'ভারতশিল্পের মূলসূত্র' প্রবন্ধে (ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন,* জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯)।

রায়, প্রফুল্লচন্দ্র। 'জাতিভেদ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* চৈত্র, ১৩৩৩)।

সমাদ্দার, যোগীন্দ্রনাথ। 'মগধ' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* ভাদ্র, ১৩৩০)।

সমাদ্দার, যোগীন্দ্রনাথ। 'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* শ্রাবণ, ১৩৩১)।

সরকার, গুরুদাস। 'হে বজ্র' প্রবন্ধের (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* অগ্রহায়ণ, ১৩৩০)।

সরকার, প্রফুল্লকুমার। 'ভারতীয় চিত্র-পরিচয়' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* ভাদ্র, ১৩৩০)।

সান্যাল, নলিনীমোহন। 'পুরাণ প্রসঙ্গ' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩)।

সেন, দীনেশচন্দ্র। 'ঘোষ পাড়া কর্ত্তাভজার দল' (সেন, দীনেশচন্দ্র ও মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯)।

সেন, দীনেশচন্দ্র। 'বাঙ্গালীর অতীত (উত্তর)' প্রবন্ধটি (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* মাঘ, ১৩৩৪)।

সেন বর্ম্মণ, প্রভাসচন্দ্র। 'পাহাড়পুরের স্তূপ' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* শ্রাবণ, ১৩৩৩)।

সেনগুপ্ত, প্যারীমোহন। 'বুদ্ধগয়ার পথে' (মজুমদার, বিজয়চন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গবাণী,* অগ্রহায়ণ, ১৩৩০)।

হরপ্রসাদ, শাস্ত্রী। 'ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাস' (দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত। *বঙ্গশ্রী,* মাঘ, ১৩৩৯)।

হরপ্রসাদ, শাস্ত্রী। 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের মূল সূত্র' (ঘোষ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ সম্পাদিত। *মাসিক বসুমতী,* ফাল্গুন, ১৩৫৬)।

হরপ্রসাদ, শাস্ত্রী। 'ভারতের ভক্তি সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব' (ঘোষ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ সম্পাদিত। *শারদীয়া বসুমতী,* ১৩৫৭)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'বর্ণিকা ভঙ্গম' (গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *বিচিত্রা,* পৌষ, ১৩৬৫)।

অস্বাক্ষরিত। 'অশোক রাজার উপাখ্যান' (মিত্র, রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত। *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ,* মাঘ, ১২৫৮)।

অস্বাক্ষরিত। 'বৌদ্ধদিগের মঠ' (মিত্র, রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত। *বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,* ভাদ্র, ১২৫৯)।

অস্বাক্ষরিত। 'ইলোরার গুহা' (মিত্র, রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত। *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ,* ফাল্গুন, ১২৫৯)।

অস্বাক্ষরিত। 'কাশীর ইতিহাস' (মিত্র, রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত। *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ,* ১২৫৯ – ১২৬০)।

অস্বাক্ষরিত। 'লঙ্কাদ্বীপ' (মিত্র, রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত। *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ,* ১২৫৯ – ১২৬০)।

অস্বাক্ষরিত। 'অনুরাধপুরের ইতিহাস' (মিত্র, রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত। *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ,* ১২৬০ – ১২৬১)।

অস্বাক্ষরিত। 'অজন্তা নগরের গুহা' (মিত্র, রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত। *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ,* কার্তিক, ১২৬৫)।

যা. কু. সি.। 'শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত' (মিত্র, রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত। *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ,* ১২৬৪)।

হরপ্রসাদ, শাস্ত্রী। 'ভারতের লুপ্ত রত্নোদ্ধার' (ঘোষ, চারুচন্দ্র সম্পাদিত। *বিভা,* আষাঢ়, ১২৯৪)।

হরপ্রসাদ, শাস্ত্রী। 'জাতিভেদ' (ঘোষ, চারুচন্দ্র সম্পাদিত। *বিভা,* আশ্বিন ও কার্তিক, ১২৯৪)।

হরপ্রসাদ, শাস্ত্রী। 'কুশীনগর' (ঘোষ, চারুচন্দ্র সম্পাদিত। *বিভা,* আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ, ১২৯৪)।

মৈত্র, অক্ষয়কুমার। 'ভারত-চিত্রচর্চা' (সেন, জলধর ও বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ সম্পাদিত। *ভারতবর্ষ,* আশ্বিন, ১৩২৯)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। 'পরিচয়' (দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী,* বৈশাখ, ১৩২১)।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'শিবাজী উৎসব' (দেবী, সরলা সম্পাদিত। *ভারতী,* আশ্বিন, ১৩১১)।

ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ। 'ধনিয়া সূত্ত' (দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী,* শ্রাবণ, ১৩১৫)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম প্রচারকগণ' (দেবী, সরলা সম্পাদিত। *ভারতী,* আষাঢ়, ১৩০৮)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'মগধের প্রাচীন ইতিহাস' (দেবী, সরলা সম্পাদিত। *ভারতী,* ভাদ্র, ১৩০৮)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধ্বংস' (দেবী, সরলা সম্পাদিত। *ভারতী,* অগ্রহায়ণ, ১৩০৮)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'অঙ্গুত্তর নিকায়' (দেবী, সরলা সম্পাদিত। *ভারতী,* শ্রাবণ, ১৩০৯)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'প্রাচীন ভারতের লিচ্ছবিজাতি' (দেবী, সরলা সম্পাদিত। *ভারতী,* মাঘ, ১৩০৯)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'প্রাতিমোক্ষ' (দেবী, সরলা সম্পাদিত। *ভারতী,* চৈত্র, ১৩১০)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'কুমারজীব' (দেবী, সরলা সম্পাদিত। *ভারতী,* বৈশাখ, ১৩১১)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'শূন্যবাদ' (দেবী, সরলা সম্পাদিত। *ভারতী,* আষাঢ়, ১৩১১)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' (দেবী, সরলা সম্পাদিত। *ভারতী,* কার্তিক, ১৩১১)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'অমোঘ বজ্র (বৌদ্ধ প্রচারক – খৃঃ অব্দ ৭০৪ – ৭৭৪' (দেবী, সরলা সম্পাদিত। *ভারতী,* বৈশাখ, ১৩১২)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'তিব্বতদেশের বজ্রভৈরব' (দেবী, সরলা সম্পাদিত। *ভারতী,* আশ্বিন, ১৩১২)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়' (দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী,* বৈশাখ, ১৩১৫)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'সিকিম ভ্রমণ: ভূমিকা' (দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী,* মাঘ, ১৩১৫)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'লঙ্কায় বুদ্ধের দন্ত' (দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী,* ভাদ্র, ১৩১৭)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'অক্ষয়চন্দ্র সরকার' (গঙ্গোপাধ্যায়, মণিলাল ও মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন সম্পাদিত। *ভারতী,* ভাদ্র, ১৩২৯)।

সেন, রামদাস। 'শাক্যবংশের উৎপত্তি' (ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *ভারতী,* ফাল্গুন, ১২৯২)।

অস্বাক্ষরিত। 'সমালোচনা। অশোকচরিত।– শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত।' *ভারতী ও বালক*-এ (দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। পৌষ, ১২৯৯)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'মিহিনতালে পাহাড়ের গাত্রস্থিত শিলালিপি' (গঙ্গোপাধ্যায়, মণিলাল ও মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন সম্পাদিত। *ভারতী,* বৈশাখ, ১৩৩০)।

ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ। 'তেবিজ্জ সূত্ত' (ব্রাহ্মণ সুখকের প্রতি বুদ্ধদেবের উপদেশ) (দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক,* আশ্বিন, ১৩০৭)।

সেন, রামদাস। 'শাক্যসিংহের মাতামহকুলের ইতিহাস' (দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক,* বৈশাখ, ১২৯৩)।

সেন, রামদাস। 'শাক্যসিংহের কৌমার জীবনের কথা' (দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক,* ভাদ্র, ১২৯৩)।

সেন, রামদাস। 'শাক্যসিংহের উদ্যানযাত্রা' (দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক,* ফাল্গুন, ১২৯৩)।

সেন, রামদাস। 'শাক্যসিংহের মগধ বিহার' (দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক,* কার্তিক, ১২৯৪)।

সেন, রামদাস। 'শাক্যসিংহের কৌমার জীবনের কথা' প্রবন্ধে (দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক,* ভাদ্র, ১২৯৩)।

সেন, রামদাস। 'শাক্যসিংহের উদ্যানযাত্রা।' প্রবন্ধে (দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক,* ফাল্গুন, ১২৯৩)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ' (বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র, চট্টোপাধ্যায়, ফকিরমোহন ও বাগচী, যতীন্দ্রমোহন সম্পাদিত। *মানসী,* বৈশাখ, ১৩২১)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'অভিভাষণের পরিশিষ্ট' (বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র, চট্টোপাধ্যায়, ফকিরমোহন ও বাগচী, যতীন্দ্রমোহন সম্পাদিত। *মানসী,* আষাঢ়, ১৩২১)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'খানাকুল-কৃষ্ণনগর পঞ্চদশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর মূল সভাপতির সম্বোধন' (রায়, জগদীন্দ্রনাথ ও মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার সম্পাদিত। *মানসী ও মর্ম্মবাণী,* কার্তিক, ১৩৩১)।

সান্যাল, দীননাথ। 'রামমোহন রায়' (রায়, জগদীন্দ্রনাথ ও মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার সম্পাদিত। *মানসী ও মর্ম্মবানী,* অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪)।

অস্বাক্ষরিত। 'শিব ডেগণ পাগোডা'-য় (মিত্র, রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত। *রহস্য-সন্দর্ভ,* ১২৭৯)।

অস্বাক্ষরিত। 'সিংহল দ্বীপের দেবালয়' প্রবন্ধে (মিত্র, রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত। *রহস্য সন্দর্ভ,* ১২৭৯)।

অস্বাক্ষরিত। 'পুরাবৃত্ত পাঠের ফল' (মিত্র, রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত। *রহস্য সন্দর্ভ,* ১২৭৯)।

অস্বাক্ষরিত। 'বামিয়ান নগরের বুদ্ধমূর্ত্তি' (মিত্র, রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত। *রহস্য-সন্দর্ভ,* শ্রাবণ, ১২৭০)।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'মেয়েলি ছড়া' (সাধনা, ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত। আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০১)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'তিব্বতের ষোড়শ মহাস্থবির' (সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত। *সাহিত্য,* বৈশাখ, ১৩১২)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'তিব্বতীয় বৌদ্ধ চিত্রফলক' (সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত। *সাহিত্য,* আষাঢ়, ১৩১২)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'তাসিলামার ভারত ভ্রমণ' (সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত। *সাহিত্য,* শ্রাবণ, ১৩১৩)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'শূন্যপুরাণ' (সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত। *সাহিত্য,* আশ্বিন, ১৩২১)।

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। 'শূন্য' (সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত। *সাহিত্য,* কার্তিক, ১৩২১)।

মজুমদার, বিজয়চন্দ্র। 'নির্ব্বাণ' (সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত। *সাহিত্য,* বৈশাখ, ১৩১৬)।

মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার। 'ভারতশিল্প তত্ত্ব' প্রবন্ধে (সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত। *সাহিত্য,* শ্রাবণ, ১৩২৯)।

মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার। 'ভারতীয় শিল্পাদর্শ' প্রবন্ধে (সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত। *সাহিত্য,* চৈত্র, ১৩১৮)।

বড়ুয়া, বেণীমাধব। 'বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান' (চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ সম্পাদিত। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ৫২ বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৫২)।

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ। 'বৌদ্ধগান ও দোহা: আলোচনা' (মিত্র, খগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ*, ২৭ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩২৭)।

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ। 'ভুসুকু' (মিত্র, খগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ*, ৪৮ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৪৮)।

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ। 'বৌদ্ধগান ও দোহার পাঠ আলোচনা' (মিত্র, খগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ*, ৪৮ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৪৮)।

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ। 'সিদ্ধ কানুপার দোহা ও তাহার অনুবাদ' (মিত্র, খগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ*, ৪৯ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৪৯)।

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ। 'চর্যাপদের পাঠ-আলোচনা' (*সাহিত্য পত্রিকা,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শীত, ১৩৭০)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'বাংলার বৌদ্ধ সমাজ: হিন্দু ও বৌদ্ধ' (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার সম্পাদিত। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ৩৬ বর্ষ, ১৩৩৬)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'রামাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল' (বসু, নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ৪ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩০৪)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'বৌদ্ধ-ঘণ্টা ও তাম্রমুকুট' (বসু, নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ১৭ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩১৭)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'বাংলার পুরানো অক্ষর' (মিত্র, খগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ২৭ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩২৭)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'হিন্দু বৌদ্ধে তফাত' (লাহা, নরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ৩১ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৩১)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন' (লাহা, নরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ৩৩ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৩৩)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'বাংলার বৌদ্ধ সমাজ: হিন্দু ও বৌদ্ধ' (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার সম্পাদিত। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ৩৬ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৬)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'রত্নাকর শান্তি' (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার সম্পাদিত। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ৩৮ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৮)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'বৃহস্পতি রায়মুকুট' (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার সম্পাদিত। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ৩৮ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৩৮)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। 'পুরুষোত্তমদেব' (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার সম্পাদিত। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ৩৯ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৯)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। ‘বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ’ (বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র সম্পাদিত। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ২১ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩২১)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। ‘সম্বোধন: সাহিত্য-পরিষৎ ১৩২২’ (বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র সম্পাদিত। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ২২ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩২২)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। ‘সভাপতির অভিভাষণ: সাহিত্য-পরিষৎ ১৩২৯’ (মিত্র, খগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ২৯ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩২৯)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। ‘বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সভাপতির অভিভাষণ: ১৩৩৫’ (লাহা, নরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ৩৫ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৫)।

সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র। ‘দুটি বৌদ্ধ গল্প’ (‘শোকবিজয়’ এবং ‘লালসা এবং সংযম’) (সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত। *সাহিত্য,* কার্তিক, ১২৯৮)।

স্বপন বসু ‘নবজীবন সম্পর্কে দু-চার কথা’ প্রবন্ধে (দাস, প্রভাতকুমার সম্পাদিত। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ১০৯ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪০৯)।

৩) ইংরেজি

Arnold, Edwin. (2010). Publishers’ Note. *The Light of Asia or The Great Renunciation (Mahâbhinishkramana) Being The Life and Teaching of Gautama Prince of India and Founder of Buddhism*. New Delhi: Low Price Publication.

Bagchi, Jhunu. (1993). *The History and Culture of the Palas of Bengal and Bihar (Cir. 750 A. D. Cir. 1200 A. D)*. New Delhi: Abhinav Publications.

Basak, Radhagovinda. (1963). *Mahvastu Avadana*. Vol. I. Calcutta: Sanskrit College.

Basak, Radhagovinda. (1963). *Mahavastu Avadana*. Vol. II. Calcutta: Sanskrit College.

Beal, Samuel. (Edited). (2008). *Si-Yu-Ki/ Buddhist Records of the Western World*. Translated from the Chinese of Hiuen Tsang (A. D. 629). Book VIII. Delhi: Low Price Publications.

Bhattacharyya, Binoytosh. (2013). *The Indian Buddhist Iconography*. New Delhi: Cosmo Publications.

Chatterji, Suniti Kumar, (1975). *The Origin and Development of the Bengali Language*. Calcutta: Rupa & Co.

Chattopadhyaya, Debiprasad. (Edited). (2010). Chimpa, Lama. Chattapadhyaya, Alaka. (Translated from Tibetan). *Tāranātha’s History of Buddhism in India*. New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Limited.

Chowdhury, Hemendu Bikash. (Edited). (2009). *Jagajjyoti*. Bhikkhu Jagadish Kashyap Birth Centenary Volume. Kolkata: Bauddha Dharmankur Sabha.

Chowdhury, Hemendu Bikash. (Edited). (2014). *Jagajjyoti*. 150 Birth Anniversary Tribute to Anagarika Dharmapala & Sir Asutosh Mookherjee. Kolkata: Bauddha Dharmankur Sabha.

Chowdhury, Hemendu Bikash. (Edited). (2015). *Jagajjyoti*. 150 Birth Anniversary Tribute to Karmayogi Kripasaran Mahasthavir. Kolkata: Bauddha Dharmankur Sabha.

Chaudhury, Sukomal. (1987). *Contemporary Buddhism in Bangladesh*. Calcutta: Atisha Memorial Publishing Society

Coomaraswamy, Ananda K. Horner, I. B. (1948). *The Living Thoughts of Gotama the Buddha*. Great Britain: Cassell and Company Limited.

Coomaraswamy, Ananda K. (2003). *Buddha and the Gospel of Buddhism*, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Coomaraswamy, Ananda K. (1999). Coomaraswamy, Mrs Ananda K. (Edited). *Introduction to Indian Art*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Coomaraswamy, Ananda K. & Nivedita, Sister. (1967). *Myths of the Hindus & Buddhists*. New York: Dover Publications. INC

Davis, T. W. Rhys. (2010). *Buddhism Being a Sketch of the Life and Teachings of Gautama, the Buddha*. Delhi: Low Price Publishers.

Davis, T. W. Rhys. (2010). *Buddhist India*. Delhi: Low Price Publishers.

Dharmapala, Anagarika Hewavitarne. (1997). *Buddhism in its Relationship with Hinduism*. Calcutta: Maha Bodhi Book Agency.

Dharmapala, Anagarika. (2010). *The World's Debt to Buddha*. Kolkata: Maha Bodhi Book Agency.

Fergussion, James. (1998). *History of Indian and Eastern Architecture*. Vol-1. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Jecobs, Josaphat. (Edited and Induced). (1895). *Barlaam and Josaphat*. London: David Nutt, in the Strand.

Havell, E. B. (1920). *Ideals of Indian Art*. New York: E. P. Dutton and Company.

Mitra, Rajendralālā. (1971). *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*. Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar.

Muller, F. Max. Williams, Monier. Stephen, Reginald. Childers, Robert C. (1953). *Studies in Buddhism*. Calcutta: Susil Gupta (India) Ltd.

Oldenberg, Harmann. (1997), Shrotri, Shridhar B. (Translatrd). *The Doctrine of the Upaniṣadas and the Early Buddhism*. Delhi: Motilal Banarsidass Publications.

Saraswati, Sarasi Kumar. Sarkar, Khitish Chandra. (1936). *Kurkihar, Gaya and Bodhgaya*. Rajshahi.

Sarkar, Susobhan. (2002). *On the Bengal Renaissance*. Kolkata: Papyrus.

Smith, Vincent. (2013). Hunter. W. W. A. (Edited). *Asoka The Buddhist Emperor of India*. New Delhi: Low Price Publications.

Thomas, Edward J. (2004). *The History of Buddhist Thought*, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Vivekananda, Swami. (2007). *The Complete Works of Swami Vivekananda*. Vol –I. Kolkata: Advaita Ashrama.

Vivekananda, Swami. (2006). *The Complete Works of Swami Vivekananda*. Vol – VI. Kolkata: Advaita Ashrama.

Vivekananda, Swami. (2006). *The Complete Works of Swami Vivekananda*. Vol – VII. Kolkata: Advaita Ashrama.

Yu, Chai-Shin. (1999). *Early Buddhism and Christianity*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited.

৪) জার্নাল

Ahmed, Syed Jamil. 'Buddhist Theatre in Ancient Bengal' (The Asiatic Society of Bangladesh: *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, 1995).

Sastri, Haraprasad. 'Buddhism in Bengal since the Mohammadan Conquest' (*Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1885)

Sastri, Haraprasad. 'Bengali Buddhist Literature' (*The Calcutta Review*, 1917)

Thero, Dodamgoda Rewatha (ed). (Sarnath: Maha Bodhi Society of India. Mulagandha Kuty Vihara. *Dharmadoot*, Sir Alexander Cunningham Commemorative Number. 2007)

Jayaswal, K. P. 'An Introduction to Hindu Polity' (Chattopadhyay, Ramananda, ed. *Modern Review*, Vol. XIV, issue 3, 1913)

Nivedita, Sister. 'Buddha and Yashodhara' (Chattopadhyay, Ramananda. ed. *Modern Review*, vol. XXVI. Issue 4 1919)

Nivedita, Sister. 'The Ancient Abbey of Ajanta'. (Chattopadhyay, Ramananda. ed. *The Modern Review*, vol VII, issue 2 1910)

Barua, Dipak Kumar. 'Indological Resesrches and Alexander Csoma De Koros'. (Bhattacharya, Bela, ed. University of Calcutta: *Journal of the Department of Pali*, Volume: 9, 1999).

Biswas, Aiswarya. 'Biswas, Aiswarya. 'On Evolution of Buddha-Concept'. Halder (De), Manikuntala, ed. (University of Calcutta. *Centenary Volume of the Department of Pali*. (2007 – 2009)

যে সকল উপাদান গবেষণাপত্রে সরাসরি ব্যবহৃত না হলেও আমাদের চিন্তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে –

১) বাংলা

ওকাকুরা, কাকুকো। (প্রকাশকাল নেই)। বসু, সুধা। (অনূদিত) *প্রাচ্যের আদর্শ*। কলকাতা: কল্পন।

কোসাম্বী, ধর্মানন্দ। (২০১১)। *ভগবান বুদ্ধ*। ভট্টাচার্য, চন্দ্রোদয়। (অনূদিত)। নতুন দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি।

গুপ্ত, মণীন্দ্রভূষণ। (২০০০)। *সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঘোষ, ঈশানচন্দ্র। (২০০৮)। *জাতক-মঞ্জরী*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ঘোষ, ঈশানচন্দ্র। (অনূদিত)। (২০০৭)। *জাতক*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ঘোষ, ঈশানচন্দ্র। (অনূদিত)। (২০০১)। *জাতক*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ঘোষ, ঈশানচন্দ্র। (অনূদিত)। (২০০৭)। *জাতক*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ঘোষ, ঈশানচন্দ্র। (অনূদিত)। (২০০৭)। *জাতক*। পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। (২০১৪ – ২০১৬)। *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী*। প্রথম – পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। (২০০৮)। *ভারত সংস্কৃতি*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড।

চৌধুরী, সাধনকমল। (অনূদিত)। (২০০৫)। *থূপবংশ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

চৌধুরী, সাধনকমল। (২০০৫)। *মহাবংশ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

চৌধুরী, সুকোমল। (অনূদিত)। (২০১৪)। *সংযুক্ত নিকায়*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।

চৌধুরী, হেমেন্দুবিকাশ। (সম্পাদিত)। (২০১১)। *বুদ্ধ প্রণাম*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

চক্রবর্তী, রজনীকান্ত। (২০০৯)। ভট্টাচার্য, মলয়শঙ্কর। (সম্পাদিত)। *গৌড়ের ইতিহাস*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

জানা, রাধারমণ। (১৯৮৫)। *পালিভাষা-সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

দাশ, আশা। (১৯৯৪)। *জাতকে রামকথা ও ভারতকথার স্বরূপ-সন্ধান*। কলকাতা: ভারবী।

দাশ, আশা। (২০০৩)। *দ্বীপবংশ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

দাশগুপ্ত, নলিনীনাথ। (২০০১)। *বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। (২০১১)। *বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা*। কলকাতা: ভারবি।

দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ। (২০০৪)। *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড।

দাস, রামকৃষ্ণ। (অনূদিত)। (২০১৪)। *বৌদ্ধধর্ম পরিচয়* [লাদাখে পরম পবিত্র দালাই লামাজী প্রদত্ত প্রবচনের সংকলন (সন ২০০২ – ২০০৩)]। কলকাতা: তথাগত।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। (১৯৯৭)। *ভারতশিল্পে মূর্তি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। (২০০০)। *ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০০৩)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। (প্রথম – অষ্টাদশ খণ্ড)। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৯৯৩)। *বুদ্ধদেব*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

নিবেদিতা, ভগিনী। (২০১৩)। দাশগুপ্ত, প্রসেনজিৎ। পাল, সৌম্যেন। (সম্পাদিত)। *অজন্তা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

রহমান, এম. মতিউর। (পরিকল্পনা, সংকলন ও সম্পাদনা)। (২০১৩)। *বৌদ্ধ দর্শন: তত্ত্ব ও যুক্তি*। প্রথম খণ্ড। বাংলাদেশ: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

রহমান, এম. মতিউর। (পরিকল্পনা, সংকলন ও সম্পাদনা)। (২০১৩)। *বৌদ্ধ দর্শন: তত্ত্ব ও যুক্তি*। দ্বিতীয় খণ্ড। বাংলাদেশ: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী। (অনুবাদক)। (২০০৮)। প্রথম ভাগ। *ঈশ উপনিষদ – ১, উপনিষদ,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। (২০১২)। *বাংলা সাময়িক-পত্র ১২৭৫ (ইং ১৮৬৮) – ১৩০৭ (ইং ১৯০০)* [দ্বিতীয় খণ্ড]। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী। (২০০৪)। *"পুনর" বিষয়ে পুনর্বিবেচনা: 'হিন্দুত্বে'র সালতামামি*। কলকাতা: অবভাস।

বড়ুয়া, অমল। (১৯৮৭)। *গৌতম বুদ্ধ*। কলকাতা: বোধি প্রকাশন।

বড়ুয়া, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। (২০০৯)। *বৌদ্ধ উপাখ্যান: রসবাহিনী*। চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বড়ুয়া, রথীন্দ্রবিজয়। (২০১০)। *জাতক প্রেমকথা*। কলকাতা: গড়িয়া সংস্কৃতি সংসদ।

বড়ুয়া, ব্রহ্মাণ্ডপ্রতাপ। (২০১৩)। *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন।

বড়ুয়া, শিমুল। (২০১২)। *বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*। চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ: অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী।

বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল। (২০০৮)। *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

বড়ুয়া, শশাঙ্কমোহন। (২০১০)। *কাব্যে ধর্মপদ*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

বসু, মণীন্দ্রমোহন। (২০০১)। *চর্য্যাপদ*। কলকাতা: সাহিত্য সেবক সমিতি।

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। (২০১৪)। *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস।

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। (২০১৩)। *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস।

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। (২০১১)। *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস।

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। (২০১৩)। *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*। পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস।

বিশ্বাস, দিলীপকুমার। (২০০৬)। *ইতিহাস ও সংস্কৃতি*। প্রবন্ধ সংগ্রহ: ২য় খণ্ড। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী।

বাগচী, প্রবোধচন্দ্র। (২০০১)। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

ব্রহ্মচারী, শীলানন্দ। (১৯৯১)। *অভিধর্ম-দর্পণ*। উত্তর চব্বিশ পরগণা: মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর ট্রাষ্টি বোর্ড।

ব্রহ্মচারী, শীলানন্দ। (১৯৮৩)। *বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা,* উত্তর চব্বিশ পরগণা: মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর ট্রাষ্টি বোর্ড।

ব্যাপটিস্ট, এগার্টন সি.। (২০১০)। চৌধুরী, সুকোমল। (অনুবাদক)। *ভবচক্র*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।

ভট্টাচার্য, দীপক। (সম্পাদিত)। (২০০৪)। *ভারত ও ভারততত্ত্ব, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ*। অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্য সম্মাননা গ্রন্থ। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। (২০০০)। *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস*। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, বেলা। (সম্পাদিত)। (১৯৯৭ – ১৯৯৮)। *বৌদ্ধকোষ*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য, বেলা। (সম্পাদিত)। (২০০০ – ২০০১)। *বৌদ্ধকোষ*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য, রমণচন্দ্র। (২০০৩)। *গৌতম বুদ্ধ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ভট্টাচার্য, শক্তিপদ। (১৯৯৮)। *বঙ্গবাণী এবং সাহিত্য রচনাপঞ্জী*। কলকাতা: সাহিত্যলোক।

ভাদুড়ী, সন্ধ্যা। (১৯৫৭)। *মহাবস্তুর গল্প*। কলকাতা: বিহার সাহিত্য ভবন (প্রাইভেট) লিঃ।

মহাস্থবির, গুণালঙ্কার। (অনূদিত)। (২০১৬)। ভিক্ষু, সুমনপাল। (সম্পাদিত)। *ধর্ম-প্রসঙ্গ*। কলকাতা: বোধি নিধি পাবলিকেশন।

মহাস্থবির, ধর্মাধার। (সময়কাল অনুল্লিখিত)। *বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*। কলকাতা: ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী।

মহাস্থবির, ধর্মাধার। (অনূদিত)। (২০০৭)। *শাসনবংশ*। কলকাতা: ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী।

মহাস্থবির, ধর্মাধার। (অনূদিত)। (১৯৫৬)। *মধ্যম নিকায় (দ্বিতীয় ভাগ)*। রাজেন্দ্র সিরিজ-১। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার।

মহাস্থবির, প্রজ্ঞানন্দশ্রী। (১৯৮৭)। *পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: প্রজ্ঞা প্রকাশনী

মহাস্থবির, প্রজ্ঞালোক। (২০০৭)। *উদানং*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।

মহাস্থবির, সুগতবংশ। (১৯৯৯)। *বৌদ্ধ গল্প গুচ্ছ*। কলকাতা: ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী।

মহাথের, শীলালঙ্কার। (২০১০)। *রাহুল চরিত*। তাইওয়ান: দি কর্পো রেট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউণ্ডেশন।

মহাথেরো, প্রজ্ঞাবংশ। বড়ুয়া, নীহার রঞ্জন (অনূদিত ও সম্পাদিত)। (২০১১)। *গল্পে গল্পে মহামঙ্গল ও জীবন চর্যা*। চট্টগ্রাম: প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী।

মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার। (১৯৮২)। *ভারতশিল্পের কথা*। কলকাতা: সাহিত্যম্।

মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার। (২০১২)। *রচনাসংগ্রহ*। রাজনারায়ণ পাল। (সম্পাদিত)। কলকাতা: পারুল।

মজুমদার, বিজয়চন্দ্র। (১৯২৫?)। *থেরীগাথা*। উয়ারী, ঢাকা: সাধনা লাইব্রেরী।

মুৎসুদ্দি, শ্রীবীরেন্দ্রলাল। (অনূদিত ও সম্পাদিত)। (২০০৪)। *অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহ বা সংক্ষিপ্ত-সার অভিধর্ম্ম*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। (১৯৭৮)। *চীনে বৌদ্ধ সাহিত্য*। কলকাতা: বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ।

মিশ্র, সুবিমল। (সম্পাদক)। (২০১২)। *নব্যভারত নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন*। দুষ্প্রাপ্য পত্রিকামালা: ১। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী। (অনূদিত)। (২০০৮)। প্রথম ভাগ। *ঈশ উপনিষদ – ১*। *উপনিষদ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

শরীফ, আহমদ। (২০০৭)। *বাঙলা ও বাঙলা সাহিত্য*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (২০০০)। চৌধুরী, সত্যজিৎ। সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর। ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন। ভট্টাচার্য, সুমিত্রা। (সম্পাদিত)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

শাস্ত্রী, ভিক্ষু শীলাচার। (২০১৫)। *বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম*। সম্পাদনা: থেরো, ভদন্ত সুমনোপ্রিয়। রাউজান, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ: থেরো, ভদন্ত সুমনোপ্রিয়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত।

শীলভদ্র, ভিক্ষু। (২০০০)। *বুদ্ধবাণী*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।

সাংকৃত্যায়ন, রাহুল। (২০০৯)। চট্টোপাধ্যায়, মলয়। (অনূদিত)। *বৌদ্ধ দর্শন*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড।

সেন, অমূল্যচরণ। (১৯৯৯)। *অশোকচরিত*। কলকাতা: জীনরতন মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট।

সেন, দীনেশচন্দ্র। (২০০৬)। *বৃহৎ-বঙ্গ*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

সেন, ক্ষিতিমোহন। (২০১২)। *চিন্ময় বঙ্গ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

সরকার, সৌমেন্দ্রনাথ। (২০১২)। *চর্যাগীতিকোষ*। কলকাতা: রত্নাবলী।

স্থবির, জ্যোতিঃপাল। (সম্পাদিত ও অনূদিত)। (১৯৬৩)। *পুদ্গাল-প্রজ্ঞপ্তি বা পুদ্গাল-প্রজ্ঞপ্তি-প্রকরণ*। কুমিল্লা, পূর্ব্ব পাকিস্তান: বরইগাঁও পালি পরিবেণ সিরিজ – ২।

স্থবির, ধর্ম্মতিলক। (অনূদিত)। (২০১০)। *বুদ্ধবংশ*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

২) ইংরেজি

Akira, Hirakawa. (2007). (Translated and Edited by Groner, Paul). *A History of Indian Buddhism/ From Sakyamuni to early Mahayana*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Ambedkar, B. R. (2007). Introduction. *The Buddha and His Dhamma*. Nagpur: Buddha Bhoomi Publication.

Banerjee, Anukul Chandra. (1973). *Buddhism in India and Abroad*. The World Press Private LTD. Calcutta.

Bapat, P.V. (2012). *2500 Years of Buddhism*, New Delhi: Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India

Barua, Beni Madhab. (1974). Chaudhury, Binayendra Nath. (Edited). Studies in Buddhism. Calcutta: Saraswat Library.

Barua, B. M. (1997), *Prolegomena to a History of Buddhist Philosophy*, Delhi: Pilgrims Book Pvt. LTD.

Barua, Dipak Kumar. (2010). *An Analytical Study of Four Nikāyas*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Barua, Sudhanshu Bimal. (1991). *Studies in Tagore and Buddhist Culture*. Sahitya Samsad

Basak, Radhagovinda. (1969). *A Study of the Mahāvastu-Avadāna*. Culcutta: The Alumni Association. Department of AncientIndian History & Culture, University of Calcutta.

Basu, Ratna. (Edited). (2007). *Buddhist Literary Heritage in India: Text and Context*. New Delhi: National Mission for Manuscripts & Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Bhattacharji, Sukumari. (2011). *Buddhist Hybrid Sanskrit Literature*. Kolkata: The Asiatic Society.

Bhattacharyya, Binoytosh. (1964). *An Introduction to Buddhist Esoterism*. The Chowkhamba Sanskrit Studies. Vol. XLVI. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office.

Chakravarti, Uma. (2015). *The Social Dimensions of Early Buddhism*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Chowdhury, Hemendu Bikash. (Edited). (1989). *Dr. B. M. Barua Birth Centenary Commemoration Volume*. Calcutta: Bauddha Dharmankur Sabha.

Chaudhury, Sukomal. (1983). *Analytical Study of the Abhidharmakosa*. Calcutta: Firma KLM (Pvt.) Limited.

Chau, Bhikkhu Thich Minh. (1964). *Milindapanha and Nagasenabhikshu- sutra (A Comparative Study)*. Calcutta: Firma KLM (Pvt.) Limited.

Coomaraswamy, Ananda K. (1956). *The Transformation of Nature in Art*. New York: Dover Publication.

Coomaraswamy, Ananda Kentish. (2007). *Hinduism and Buddhism*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Conze, Edward, (Edited). (in collaboration with Horner, I.B., Snellgrove, D. Waley, A.). (2008). *Buddhist Texts through the Ages*, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Conze, Edward. (2012). *Buddhist thought in India*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Das, Asha. (1992). *Ananda The man and monk*, Calcutta: Mahabodhi Book Agency.

Dasgupta, Subrata. (2007). *The Bengal Renaissance Identity and Creativity from Rammohun Roy to Rabindranath Tagore*. New Delhi: Permanent Black.

Davis, Mrs. C. A. F. Rhys. (2010). *Stories of the Buddha, Being Selections from the Jataka*. Delhi: Low Price Publishers.

Davis, T. W. Rhys. (2010). *Buddhism its History and Literature*. Delhi: Low Price Publishers.

Dhar, Satchidananda. (1986). *Transformation and Trend of Buddhism in the 20th Century*. Calcutta: Firma KLM (Pvt.) Limited.

Dutt, Romesh C. (2004). *Civilisation in the Buddhist Age B.C. 320 to A. D. 500*. Delhi: Low Price Publications.

Dutta, Asok. (2008). *Excavations at Moghalmari* (2003-04 to 2007-08). Kolkata: The Asiatic Society

Eisenstein, Elizabeth L. (1979). *The Printing Press as an Agent of Change: Communication and Cultural transformations in Early-Modern Europe*. Vol – I. Cambridge: Cambridge University Press. p. xii

Eliot, Sir Charles. (2003). *Hinduism and Buddhism* An Historical Sketch. Vol-I, II and III. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Hardy, R. Spence. (1995). *A Manual of Buddhism/ In its Modern Development*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Hazra, Kanai Lal. (2002). *Buddhism and Buddhist Literature in Early Indian Epigraphy*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Hazra, Kanai Lal. (2008). *History of Theravada Buddhism in South-East Asia with special reference to India and Ceylon.*New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Hazra, Kanai Lal. (2009). *The Rise and Decline of Buddhism in India*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Keith, A. Berriedale. (1979). *Buddhist Philosophy in India and Ceylon*, New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation.

Law, Bimala Churn. (1986). *Concepts of Buddhism*, Delhi: Gian Publishing House.

Law, B. C. (2004). *Heaven and Hell in Buddhist Perspective*. Varanasi: Pilgrims Publishing.

Muller, F. Max. (Edited). (2013). *(Translated from Pali by* Muller, F. Max). *The Secred Books of the East. Vol: 1. Buddhist Suttas,* New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Limited.

Muller, F. Max. (Edited). (2013). *(Translated by Various Oriental Scholars*). *The Secred Books of the East, Vol: 10. Part I, Dhammapada. Part II Sutta-Nipata.* New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Limited.

Muller, F. Max. (Edited). (2007). (Translated from Pali by Davis, T. W. Rhys & Oldenberg, Hermann.). *The Secred Books of the East/ Vinaya Texts. Vol: 13, Part: I. The Patimokkha, The Mahavagga I-IV.* New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Limited.

Muller, F. Max. (Edited). (1996). (Translated from Pali by Davis, T. W. Rhys & Oldenberg, Hermann.). *The Secred Books of the East/ Vinaya Texts. Vol: 17, Part: II. The Mahavagga, V-X. The Kullavagga, I-III.* New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Limited.

Muller, F. Max. (Edited). (2008). (Translated from Pali by Davis, T. W. Rhys & Oldenberg, Hermann.) *The Secred Books of the East/The Fo-Sho-Hing-Tsan-King/The Life of Buddha, by Asvaghosha Bodhisattva/ Translated from Sanskrit into Chinese by Dharmaraksha, A.D. 420 and from Chinese into English by Samuel Beal. Vol: XIX.* Delhi: Low Price Publications.

Muller, F. Max. (Edited). (2013). (Translated from Pali by Davis, T. W. Rhys & Oldenberg, Hermann.). *The Secred Books of the East/ Vinaya Text. Vol: 20, Part III. The Kullavagga IV-XII*. New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Limited.

Muller, F. Max. (Edited). (2005). *(Translated from Pali by* Muller, F. Max). *The Secred Books of the Eas. Vol: 49. Buddhist Mahayana Texts.* New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Limited.

Muller, F. Max. (Edited). (2009). (Translated by Kern, H.). *The Secred Books of the East/ The Saddharma-Pundarika or The Lotus of the True Law. Vol: XXI.* New Delhi: Low Price Publications.

Thera, Piyadassi. (2005). *The Buddha's Ancient Path*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Warder, A. K. (2008). *Indian Buddhism*, New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Limited.

Internet source

http://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20299/v299.pdf

www.mogalmari.blogspot.in

http://www.ub.uniheidelberg.de/English/fachinfo/suedasien/zeitschriften/bengali/overview.html